প্রভাত গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীভবন
৪/১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ২৫

শ্রীভবন প্রকাশিত
প্রথম মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মূল্য ১২·০০

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪

সূচী-পত্র

ষোড়শী

ভূমিকা

এই গ্রন্থে আমার ষোলটি ছোট গল্প প্রকাশিত হইল; তাই ইহার নাম রাখিলাম "ষোড়শী।"

গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে "ভারতী", "বঙ্গদর্শন" ও "প্রবাসী" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমবাবুর অনুবাদকর্ত্তী শ্রীমতী এম, এস, নাইট মহোদয়া এই গ্রন্থের কতিপয় গল্প ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত বিদুষী মহিলাকে প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ দিবার এই সুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম।

রঙ্গপুর
আশ্বিন, ১৩১৩

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



জন্ম ২২শে মাঘ, ১২৭৯ ॥ মৃত্যু ২২শে চৈত্র, ১৩৩৮

বউ-চুরি

॥ ১ ॥

যে সময়ে নব্য-বঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার একটা ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

মহামায়া বর্দ্ধমান জেলার একটি সুনিবিড় পল্লীগ্রাম। সুনিবিড় অর্থাৎ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুড়ি মাইল এবং পোষ্ট অফিস হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে দেবী মহামাযার একটি বিগ্রহ স্থাপিত আছে—সেই হইতে ইহার নামোৎপত্তি।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটির একটি ক্ষুদ্র জমিদার আছেন তাঁহার নাম বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মধ্যম পুত্র অনাথশরণ বি-এ পরীক্ষা দিয়া কয়েক দিন হইল বাড়ী আসিযাছে। ছেলেটির বয়স বাইশ বৎসর হইবে, বেশে পারিপাট্য আছে, চেহারাটি মন্দ নহে। কিন্তু পিতা তাহার উপরে কযেকটি কারণে অত্যন্ত চটা। প্রথমতঃ, সে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া থাকে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিযাছে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহে ষোড়শী স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। তাহার কারণ কি জান? সে বলে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করি নাই, সে আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী। যদি জিজ্ঞাসা কর উহাকে বিবাহ করিলে কেন? সে বলিবে, যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন আমার এ সমস্ত মতাদি ছিল না। বালিকার দশা কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব, তাহার পর ব্রাহ্মবিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, সেই আইন অনুসারে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিব; ও তখন ভালবাসিয়া আর যাহাকে ইচ্ছা স্বামিত্বে বরণ করিতে পারিবে।

বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া অনাথশরণের একটি প্রাণের বন্ধু জুটিয়াছিল, তাহার নাম হেমন্তকুমার সিংহ। সে দীক্ষিত ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই অনাথের মনে ধারণা জন্মিল যে, সে হেমন্তকুমারের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী নগেন্দ্রবালাকে ভালবাসে। মনের এই চপলতায় প্রথমে অনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু

হেমন্তকুমার তাহাকে সান্ত্বনা দিল। সে বলিল, ভালবাসা একটি ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ, কোনও অবস্থাতেই তাহাতে পাপ স্পর্শিতে পারে না। বিশেষতঃ হেমন্তকুমারের প্রবল বিশ্বাস, প্রেম-সম্পর্ক-বিহীন পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত বিবাহ বিবাহই নয়। অনাথ মন্দাকিনীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করে নাই, সুতরাং সে তাহার স্ত্রী নহে ভগিনী, এই অদ্ভুত মত হেমন্তই অনাথের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়াছে। নগেন্দ্রবালাও যে অনাথের প্রতি প্রণয়শালিনী, ইহাও দুই বন্ধু অনুমান করিয়া লইযাছে। এই বিবাহ হইলেই যথার্থ আদর্শ বিবাহ হয়, ইহাই হেমন্তকুমারের মত। কিন্তু অনাথের তথাকথিত স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব। নগেন্দ্রবালার প্রতি প্রণয় ব্যক্ত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত অনাথের নাই। হেমন্ত প্রায়ই বলিত—প্রাণে প্রাণে যোগ, আত্মায় আত্মায় মিলন ইহাই ভালবাসার চরম সফলতা,—বিবাহ নাই হইল। কিন্তু নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইন হইবার কথা উঠা পর্য্যন্ত, তাহারা অন্যরূপ পরামর্শ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নকাল বিগত প্রায়। জ্যৈষ্ঠমাসের আম-পাকানো রৌদ্র বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অনাথশরণ বহির্ব্বাটীর কক্ষে ডেস্কের সম্মুখে চেযারে উপবিষ্ট। এই কক্ষটি তাহার নিজস্ব। এইখানেই রাত্রে শয়ন করে। ভিত্তিগাত্রে কয়েকখানি বিলাতী ছবির সঙ্গে একটি একতারা টাঙ্গানো, প্রভাতে ও সায়াহ্নে এইটি বাজাইয়া সে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া থাকে। গৃহ-সজ্জার মধ্যে একটি ক্লক, একটি আলমারি, একটি আলনা এবং শয়নের খাট ছাড়া কিছুই নাই।

ডেস্কের ভিতর হইতে অনাথ হেমন্তকুমারের একখানি সদ্য-প্রাপ্ত চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার যেখানে যেখানে নগেন্দ্রবালার নাম ছিল, সেখানে সেখানে চুম্বন করিল। চিঠি রাখিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কি যেন ধ্যান করিতে লাগিল। ঠং ঠং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল।

অনাথ তখন ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া, পত্রখানি খামে বন্ধ করিল। এক টুকরা কাগজ লইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—

"আজ রাত্রি বারোটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তুমি একবার আমার ঘরে আসিও।"

লিখিয়া, কাগজখানিকে পাকাইয়া গুটাইয়া ছোট করিল। পূর্ব্বকথিত খামশুদ্ধ চিঠিখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, অঙ্গন জনশূন্য। প্রথম কক্ষে, তাহার

বউদিদি কয়েকজন সখীকে লইয়া তাস খেলিতেছেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পালঙ্কের উপর জননী নিদ্রামগ্না। কুলুঙ্গীর কাছে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটি দাঁড়াইয়া চুরি করিয়া কুল-আচার ভক্ষণ করিতেছে। কাকাকে দেখিয়া সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল। কাকা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তৃতীয়টি পূজার ঘর; নারায়ণশিলা আছেন; মূর্ত্তিবিদ্বেষবশতঃ ইদানীং অনাথশরণ এই কক্ষে প্রবেশ করিত না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মেঝের উপর বঁটি পাতিয়া বসিয়া তেঁতুল কাটিতেছে। দক্ষিণ হস্তের কাছে কলার পাতার উপর কতকটা কাটা তেঁতুল; বঁটির নিম্নে একরাশি কাঁইবীচি ছড়ান। মন্দাকিনীর ওষ্ঠাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অঞ্চলাগ্র গলায় জড়ানো। মন্দা আপন মনে হেঁট হইয়া তেঁতুল কাটিতেছিল, স্বামীকে দেখিতে পায় নাই। অনাথ প্রায় এক মিনিটকাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিবাহের পর এই সে প্রথম মন্দাকে ভাল করিয়া দেখিতেছে!

উঠানে আমগাছের শাখা হইতে একটা পাকা আম বাতাসে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মন্দা চমকিয়া বাহিরের পানে চাহিল;—দেখিল বারান্দায় স্বামী দাঁড়াইয়া। তৎক্ষণাৎ সে বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আধহাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবিগুলি ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

অনাথ মৃদুপদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। মন্দাকিনীর পা লক্ষ্য করিয়া পাকানো কাগজখানি ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে মন্দা কাগজখানি কুড়াইয়া লইল। প্রথমতঃ দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার কাছে আসিয়া কাগজখানি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহার পর বাহিরে চাহিল। একটা আমগাছে কাঁচা পাকা অসংখ্য আম ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার ভিতরে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। অনেক দূরে ঘুঘু ডাকিতেছে। আবার কাগজখানি পড়িল; আবার আমগাছ পানে চাহিল। গাছের ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। মন্দা কাগজখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। গলবস্ত্র হইয়া নারায়ণশিলার সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। উঠিয়া আবার জানালার কাছে গিয়া কাগজখানি পাঠ করিল।

আজ তাহার জীবনের কি দিন! বিবাহের পর এই প্রথম স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। জরগায়ে মন্দার বিবাহ হইয়াছিল; ফুলশয্যা হইতে পায় নাই। যে তিনদিন শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে তেরো বৎসরের। মাঝে একবার আসিয়া কয়েক মাস ছিল, তখন অনাথের নূতন "মতাদি" হইয়াছে। পরিজনবর্গের বহু আকিঞ্চন সত্ত্বেও অনাথ অন্তঃপুরে শয়ন করে নাই। এবার রাগ করিয়া তাহাকে কেহ বাটীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করে নাই। অনাথের মাতা প্রতিদিনই নবীনাগণকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেন। কেহ কর্ণপাত করিত না। এতদিনে স্বামীর কি মনে পড়িয়াছে? মন্দার এ জীবনটা তবে কি বিফল হইবে না? তাহার আত্মীয়াগণের, সখীদের স্বামীর ভালবাসার কথা সোহাগের কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইত। মনে হইত, কি পাপ সে করিয়াছে যাহার জন্য ঈশ্বর তাহাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছেন? এইবার কি সে সব দুঃখ তবে দূর হইবে?

হঠাৎ মন্দাকিনীর চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। অর্গলিত দুয়ারে বাহির হইতে কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিতেছে।

ব্যস্ত হইয়া মন্দাকিনী দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার ছোট ননদ হরিমতি। হরিমতি বালবিধবা। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার এ দশা ঘটিয়াছে। হরিমতি মন্দার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়; তবু দুই জনে খুব ভাব। দুই জনে দুই জনের সকল সুখদুঃখের ভাগী।

মন্দাকে দেখিয়া হরিমতি চমকিয়া বলিল, "তোর কি হয়েছে লা?"

মন্দা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "হবে আবার কি?"

"দোর বন্ধ করে কি করছিলি?"

মন্দা চুপ করিয়া রহিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হরিমতির ভারি সন্দেহ হইল। সে মন্দার গলাটি জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বলবিনে ভাই?"

"বলব।"

"কখন বলবি?"

"রাত্তিরে।"

"না এখন বল্।"

মন্দাও বলিবে না হরিমতিও ছাড়িবে না। শেষে মন্দা বলিল।

শুনিয়া হরিমতি প্রথমটা চুপ করিযা রহিল। তাহার পর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

মন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস কেন ভাই?"

হরিমতি বলিল, "হাসছি তোর বরটির রকম দেখে। আমি যা ভেবেছিলাম তাই। এবার এসে অবধি ছোড়দার উস্‌খুস্‌ করে বেড়ান হচ্চে। বলেওছিলাম বড় বউদিদিকে।"

"কি বলেছিলি?"

"বলেছিলাম, ওগো, এবার হয়ত ছোড়দার মন হয়েছে। এবার তোমরা চেষ্টা কর দেখ, এবার হয়ত ঘরে আসবেন। তা বউদিদি বললেন—মন হয়েছে ত আসুক না, আমি কি বারণ করেছি নাকি? আমি বললাম—এতদিন আসেননি, এখন আপনা হতে কি আসতে পারেন? লজ্জা করে হয়ত। তিনি বললেন—সেবার অমন ক'রে আমাদের অপমান করলে, আবার আমি সাধতে যাব? আমি তেমন মেয়ে নই। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দু মাস ত ছুটী আছে। ভুগুক, জব্দ হোক।"

মন্দা বলিল, "আমি কিন্তু ভাই যেতে পারব না।"

"কেন?"

"সে আমার ভারি লজ্জা করবে।"

হরিমতি হাত নাড়িয়া বলিল, "ওলো দেখিস! কচিখুকীটি কিনা! বরের কাছে যেতে লজ্জা করবে! কতক্ষণে যাবি, ঘণ্টা গুণছিস, তাই বল্‌। মুখে আর ন্যাকামো করতে হবে না।"

মন্দা বলিল, "না ভাই, ঠাট্টা রাখ্‌। আমার ভয় হচ্চে।"

"প্রথম দিনটে ভয় হতে পারে। তা একদিন বই ত নয়।"

"রোজ রোজ আমি যাব বুঝি? তা হলে একদিন ধরা পড়তে হবে না?"

"ধরা না পড়লে আর উপায় কি ভাই? একদিন লজ্জা ত ভাঙ্গতেই হবে?"

"তার চেয়ে তুই বরং বউদিদিকে বল্‌গে আর একবার। তিনি যা হয় করবেন।"

"আচ্ছা তা বলব; কিন্তু আজকের দিনটা চুরি করেই তোদের দেখা হোক! দেখিস চুরির কাঁচা আমটা পেযারাটার মতন চুরির সব জিনিষই বড় মিষ্টি।"

॥ ২ ॥

"ছোট বউ, ও ছোট বউ, ঘুমুলি ভাই ?"

রাত্রে শয্যায় হরিমতি মন্দাকিনীকে ডাকিল। মন্দাকিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বারোটা হয়েছে ?"

"বারোটা ছেড়ে এই একটা বাজলো ছোড়দার ঘড়িতে।"

"তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?"

"নাঃ—আমার চোখে কি আর ঘুম আছে ? যত ঘুম তোর। যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।"

এই কথা বলিয়া হরিমতি প্রদীপ জ্বালিল। আলনা হইতে একখানা ধোয়া দেশী শাড়ী পাড়িয়া বলিল, "নে এইখানা পর্।"

মন্দা বলিল, "না ভাই,—আর অততে কায নেই।"

হরিমতি বলিল, "দূর ছুঁড়ি, এই ময়লা কাপড় প'রে বুঝি যায় ?" বলিয়া মন্দার আঁচল ধরিয়া টান দিল। তখন মন্দা হরিমতির আদেশ পালন করিতে পথ পাইল না।

কাপড় পরা হইলে হরিমতি বলিল, "বল্, এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি ?"

মন্দাকিনী একটা প্রচলিত দেশীয় ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া লইল। কারণ এ সময় হরিমতিকে রাগানো সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইবে না। সুতরাং বলিল, "নইলে আমি বউ মানুষ একলা যাব নাকি ?"

দুইজনে দুয়ার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। মন্দাকিনীর পায়ে মল ছিল, ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। হরিমতি সে শব্দে চমকিয়া বলিল, "আ মরণ! মল চারগাছা খুলিসনি ? ভাবে বিভোর হয়েছিস যে!"

মন্দাকিনী মল খুলিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া আসিল। তার পর দুইজনে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। কাছাকাছি পর্য্যন্ত গিয়া হরিমতি মন্দাকিনীর কাণে কাণে বলিয়া দিল, "দোর ভেজিয়ে রাখব; আস্তে আস্তে সাবধানে আসিস এখন।" বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

মন্দা ধীরে ধীরে সিঁড়ি চারিটি ভাঙ্গিয়া স্বামীর ঘরের বারান্দায় উঠিল। দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। প্রবেশ করিতে তাহার অত্যন্ত

ভয় হইতে লাগিল। বুকটি দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। পা আর উঠে না। শেষে সাহসে ভর করিয়া দুয়ারটি নিঃশব্দে খুলিয়া প্রবেশ করিল।

দেখিল, মাথার শিয়রে বাতি জ্বালিয়া স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন।

পিছু ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মন্দাকিনী খিল দিল। বাতিটা নিবাইয়া দিল। ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, এখন তাহা যেন হাসিয়া উঠিল। স্বামীর বিছানায়, স্বামীর মুখে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। মন্দা দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ সেই সুপ্ত মুখখানি দেখিল; ভাবিল—ইনি আমার স্বামী! আমার স্বামী ত বড় সুন্দর।

এইরূপে এক মিনিট অতিবাহিত হইল। মন্দা মনে মনে বলিল—"বেশ মানুষ ত! লোককে ডেকে এনে নিজে দিব্যি করে নিদ্রে হচ্ছে।"

কি করিবে কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে স্থির করিল, কখনও ত পদসেবা করিতে পাই নাই; এই প্রথম সুযোগ ছাড়ি কেন?

তখন সে সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে উপবেশন করিয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আরামে অনাথশরণের নিদ্রা গভীরতর হইল। জানালা দিয়া মিঠা মিঠা দক্ষিণা বাতাস আসিতেছে। এই ভাবে কিয়ৎকাল—প্রায় আধ ঘণ্টা—কাটিলে, মন্দা স্বামীর পার কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুইটা বাজিবামাত্র অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চেতনা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত অনুভব করিল, তাহার মন যেন কিসের প্রতীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ক্রমে স্মরণ হইল, আজ মন্দাকিনীকে আসিতে বলিয়াছে; যতক্ষণ জাগিয়াছিল, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন সাড়ে বারোটা হইয়া গেল, তখন মন্দাকিনী আসিবে না বুঝিয়া শয়ন করিয়াছে। এই ভাবিতে ভাবিতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। অমনি তাহার পা মন্দাকিনীর গাঁয়ে ঠেকিল। কোমল স্পর্শে অনাথ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল মন্দাকিনী ঘুমাইতেছে। জ্যোৎস্না তখন সরিয়া গিয়াছে; মন্দাকিনীর মুখখানির উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে অনাথ সুপ্তিমগ্না নবযৌবনা পত্নীকে দেখিতে লাগিল। বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। ঠোঁট দু'খানি এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে; মন্দা বুঝি তখনও স্বপ্ন দেখিতেছিল?

স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া অনাথ ভাবিতে লাগিল, এ বড় সুন্দর ত! এ যেন নগেন্দ্রবালার চেয়েও সুন্দর। দুই তিন মিনিট এই ভাবে কাটিলে অনাথ সহসা

মুখ ফিরাইয়া লইল ; চক্ষু বুজিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ে বল দাও।"

চন্দ্রালোক হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে ভাবিয়া অনাথ তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিল। কেরোসিনের তীব্র আলোকে মনে হইল বুঝি স্বপ্নজড়িমা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দাকিনীর পায়ে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইল।

মন্দা উঠিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কাপড় চোপড়গুলা কিছুতেই যেন আর বাগ মানে না! অনেক চেষ্টার পর, রীতিমত ঘোমটা দিয়া অনাথের পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া, মুখ নত করিয়া বসিল।

অনাথ ডাকিল, "মন্দাকিনী।"

মন্দা নিমেষমাত্র কাল ঘোমটার ভিতর হইতে অনাথের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার চক্ষু নামাইল।

"মন্দাকিনী আজ তোমায় কেন ডেকেছি জান ?"

মন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল সে জানে না।

অনাথ বলিল, "তবে শোন। আমার সঙ্গে তোমায় কলকাতায় যেতে হবে। যাবে ?"

মন্দা উত্তর করিল না।

অনাথ বলিল, "যাবে কি ?"

অতি মৃদুস্বরে মন্দা বলিল, "আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানে যাব।"

"আমার বাপ মার অমতে অজান্তে। যেতে পারবে ?"

মন্দা কোনও উত্তর করে না।

অনাথ বলিল, "কথা কও। এখন লজ্জার সময় নয়। যেতে পারবে ? বল।"

মন্দা বলিল, "মা বাপের অজান্তে কেন ? তাঁদের অনুমতি নাও না! এখন ত সকলেই বিদেশে স্ত্রী নিয়ে যাচ্চে।"

"সে প্রস্তাব আমি হারু কাকাকে দিয়ে করিয়েছিলাম। বাবার মত নেই। বলেছেন—ওর এখন মতিগতির স্থিরতা কি ? নিজে যে চুলোয় ইচ্ছে হয় সেই চুলোয় যাক। বাড়ীর বউটাকে যে জুতো মোজা পরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে, সে আমি বেঁচে থাকতে দেখতে পারব না।"

"তুমি আমায় ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে যাবে সত্যি কি ?"

"আমরা দু'জনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হব।"

মন্দাকিনী প্রমাদ গণিল। স্বামী কি রহস্য করিতেছেন? বলিল, "আমি ঠাকুর দেবতা মানি, আমি কি ক'রে ব্রহ্মজ্ঞানী হব?"

অনাথ রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "ও সকল বিশ্বাস তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে। ওসব ভুল। আমি কি ক'রে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"

"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। আমার কি বুদ্ধি আছে?"

"তোমাকেও লেখাপড়া শেখাব। কলকাতায় গিযে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো।"

মন্দাকিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "লেখাপড়া যদি শিখতে হয় তবে আমি তোমার কাছে শিখব। বুড়ো বয়সে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

অনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি ভুল বুঝছ। আমরা দু'জনে একত্রে এক বাড়ীতে থাকব না ত।"

মন্দাকিনী বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কোথায় থাকব?"

"সেই ইস্কুলেই; সেইখানে মেয়েরা পড়ে, থাকে, রীতিমত সকল বন্দোবস্ত আছে।"

মন্দা স্থিরস্বরে বলিল, "তবে আমি যাব না।"

অনাথ দেখিল যেখানে রোগ, সেখানে চিকিৎসা হইতেছে না। সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। বলিল, "কেন আমি এত দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি তুমি কিছু শুনেছ?"

মন্দা বলিল, "শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।"

"তবে বুঝিয়ে বলি শোন। প্রথমতঃ, আমাদের বিবাহ ভালবাসার বিবাহ নয়। দ্বিতীয়তঃ, তার অনুষ্ঠানাদি পৌত্তলিক মত অনুসারে হয়েছে। এই দু'টি কারণে, আমার মতে, আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং তুমি আমার স্ত্রী নও, বোনের মত। বুঝলে?"

"না, ছিছি!"

"তবে আর একটা কথা খুব স্পষ্ট ক'রে বলি শোন। আমি তোমায় ভালবাসিনে।"

মন্দা বলিল, "তা ত দেখতেই পাচ্চি।"

"আমি আর একজনকে ভালবাসি।"

"তবে আমায় কলকাতায় নিয়ে কি করবে?"

"দেখ মন্দা, আমি তোমায় ভাল না বেসে বিয়ে করেছি, সেই তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। তার উপর তোমার বাকী জীবনটা নিষ্ফল করে দিয়ে আর সর্ব্বনাশ করব না। আমরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাবে। তখন তুমি স্বাধীন হবে, যাকে ইচ্ছে বিবাহ কোরো। এই জন্যে কলকাতায় গেলে আমাদের একত্র বাস অসম্ভব। সব কথা বুঝতে পারলে ?"

মন্দাকিনী বেশী করিয়া ঘোমটা দিল। কোনও উত্তর করিল না, প্রশ্ন করিল না, কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথ জানিতে পারিল, মন্দা কাঁদিতেছে।

ইহাতে অনাথ মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ইচ্ছা করিল মন্দার মুখের আবরণ খুলিয়া তাহার চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দেয় ; কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাকে বাধা দিল। এই গভীর রাত্রে, নির্জ্জন গৃহে, যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং শুধু বলিল, "মন্দা, কাঁদ কেন ? আমি তোমার মঙ্গলের জন্যেই ত বলছি।"

কিন্তু মন্দাকিনী কিছুই বলিল না, তাহার ক্রন্দনও থামিল না।

অনাথ ডাকিল, "মন্দা !"—এবার স্বর অন্যরূপ ; এ যেন আদরের স্বর। এ স্বর শুনিয়া মন্দা বেশী কাঁদিতে লাগিল।

অনাথ বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কথায় মন্দার এত দুঃখ কেন ? এত ক্লেশ কেন ? একটা ভাবী পরিত্রাণের আনন্দ অনুভব করিল না ? আমি ভালবাসি না—ভালবাসিতে পারি না,—তাহা জানে ; এ বন্ধন ছিন্ন হইলে, জীবনের সুখময় পথে চলিবার অবসর পাইবে। তথাপি এ প্রস্তাবে এত দুঃখ কেন ? তবে কি আমায় ভালবাসে ?

এই সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। মন্দা উঠিয়া বলিল, "আমি যাই।"

অনাথ মন্দাকে স্পর্শ করিল, তাহার হাতখানি ধরিল, ধরিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমায় খুলে বল মন্দা।"

মন্দা কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "আমার এখন মাথার ঠিক নেই।"

"তবে কাল আবার এস। আসবে ?"

"দেখব।"

"দেখব না মন্দা, কাল নিশ্চয় এস।" অনাথের কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

মন্দা বলিল, "আচ্ছা।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

॥ ৩ ॥

পরদিন যখন অনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। প্রথমেই মন্দাকিনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি ছবির মত তাহার মনে উদয় হইল।

অনাথ উঠিয়া বসিল। দেখিল চুলে পরিবার একটি সোণার কাঁটা বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেটি তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রাতে সে প্রতিদিন সঙ্গীত ও উপাসনা করিয়া থাকে, কখনও বাদ যায় না। আজ আর তাহা হইয়া উঠিল না। আজ তাহার মনটা বড় উদ্‌ভ্রান্ত।

গ্রামের বাহিরে নদীতীরে গিয়া অনাথ পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে দেখিতে পাইল, বাটির একজন ভৃত্য মাখন সর্দ্দার ছুটিতে ছুটিতে তাহার অভিমুখে আসিতেছে।

হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মন চমকিয়া উঠিল। কি হইয়াছে? ও কি আমাকে ডাকিতে আসিতেছে? মন্দাকিনীর কিছু হয় নাই ত? অথবা সে কিছু করিয়া বসে নাই ত?

মাখন সর্দ্দার নিকটস্থ হইলে অনাথ দেখিল সে কাঁদিতেছে।

দ্রুতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মাখন? কি হয়েছে?"

মাখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর দাদাঠাকুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। রোজা ডাকতে যাচ্ছি। কাটি ঘা।"

কাটি ঘা অর্থে সর্পাঘাত। অনাথ ভাবিল মন্দাকিনীকে সর্পে দংশন করিয়াছে। মাখন ততক্ষণ অনেক দূরে। কাহার এরূপ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইল না।

তখনই অনাথ বাড়ী ফিরিল। প্রথমে সহজ পদবিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে গতির বৃদ্ধি করিল; পরে দৌড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় বাড়ীতে আসিতে একটু ঘুরিতে হয়। বাগানের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিল। বাগানে বাগানে বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিয়দ্দূরে গাছের আড়ালে হরিমতি ও মন্দাকিনীকে দেখিতে পাইল। তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান

করিতে যাইতেছে। দেখিয়া অনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উভয়েরই মাথার কাপড় খোলা। মন্দাকিনীর মুখখানি বিষণ্ণতা মাখা, হরিমতির চক্ষু দুইটি কৌতুকপূর্ণ। প্রথমে হরিমতিরা অনাথকে দেখিতে পায় নাই, কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল। মন্দাকিনী ব্যস্ত হইয়া ঘোমটা দিল। হরিমতি অনাথের প্রতি যেন গোপনে হাস্য করিতেছে, যেন তাহার চক্ষু দুইটি দাদাকে বলিতেছে—'আমি সব জানি গো সব জানি।'

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "হরি কাকে সাপে কামড়েছে?"

হরিমতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সাপে কামড়েছে? কই কাকে তা ত জানিনে।"

অনাথ বৈঠকখানায় গিয়া শুনিল, মাখন সর্দ্দারের স্ত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে। তখন সে মাখনের বাড়ীর অভিমুখে চলিল। সেখানে গিয়া দেখিল, অনেক লোক জমিয়াছে, রোজাগণ উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বাঁচিল না। মাখন যখন রোজা লইয়া আসিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখিযা মাখনের যে কান্না! পাঁচ বৎসরের বালকের মত ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনেকে সেই শোকাবহ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, হায় হায় করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। অনাথও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিল। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, একজন কৃষকের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ে এত ভালবাসা? ইচ্ছা করিল হেমন্তকুমারকে আনিয়া একবার এ দৃশ্য দেখায়। সে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে, পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, মন্ত্রপড়া বিবাহে ভালবাসা কিছুতেই জন্মিতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল হেমন্তকুমারের একখানি পত্র আসিয়াছে।

সত্যমেব জয়তে

কলিকাতা।
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

গত কল্য তোমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। অন্য একটা সুসংবাদ আছে। কান্তপুরের রাজা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীরঞ্জন রায়

বাহাদুর তাঁহার পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলেন, বৈকালে দুই ঘণ্টা পড়াইতে হইবে। বেতন পঞ্চাশ টাকা। আমি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। তোমায় তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন; কিন্তু তাহা হইলে তোমায় এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব তুমি পত্র পাঠমাত্র পূর্ব্ব পরামর্শমত শ্রীমতী মন্দাকিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া আইস। তোমার উত্তর পাইলেই বালিকাবিদ্যালয়ে তাঁহার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

আমার সহিত দেখা হইলেই নগেন্দ্রবালা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগিনী মন্দাকিনীকে লইয়া আসা সম্বন্ধে তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা বা শঙ্কা করিও না। যদি বাধা প্রাপ্ত হও ত স্মরণ করিও, পৃথিবীতে অধিকাংশ শুভকার্য্য সম্পাদনেই বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; ঈশা স্বীয় প্রিয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা তোমার সহায় হউন।

ভবদীয়
শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

অনাথ হেমন্তকুমারের পত্রের কোনও উত্তর দিল না। মন্দাকিনীর অশ্রুমাখা মুখখানি কেবল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সম্মত নয়! সে যে ভারি দুঃখিত! কি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে?

অদ্য প্রভাতে মাখন সর্দ্দারের ব্যাপার দেখিয়া তাহার মত ও বিশ্বাসে একটু আঘাত লাগিয়াছে। হয়ত মন্দাকিনী তাহাকে ভালবাসে, তাই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাবে সে অত দুঃখাতুর! বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়সঞ্চার না হইলে পরে যে তাহা হইবেই না, তাহার স্থিরতা সম্বন্ধে অনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া তাহার হাতে একটি পত্র দিয়া সবেগে পলায়ন করিল। খাম আটা দিয়া বন্ধ, ভিতরে চিঠি রহিয়াছে, অথচ কোন শিরোনামা নাই। অনাথ খামখানি ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল; তাহাতে লেখা আছে:—

প্রিয়তমেষু,

তুমি আমায় যেখানে লইয়া যাইবে, যাইতে প্রস্তুত আছি। যে দিন যে সময়ে বলিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজ রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

চরণাশ্রিতা দাসী
শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী

এই পত্র পাইয়া অনাথ ভারি বিস্মিত হইল। যাইতে প্রস্তুত ? বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে আর দুঃখ নাই ?

কয় পংক্তি অনাথ বারংবার পাঠ করিল। যদি দুঃখ নাই, তবে ভালবাসে না। অথচ লিখিয়াছে 'প্রিয়তমেষু'—'চরণাশ্রিতা দাসী'—ইহার অর্থ কি ? ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, ওগুলা বাঁধিগৎ, ওগুলার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাহার মনে ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। মনকে সে দুই তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে তোমাকে ভালবাসে না বাসে তাহাতে তোমার কি ? মন বলিল—নাঃ— তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। নগেন্দ্রবালার মানসী প্রতিমাকে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বুকে চাপিয়া ধরিল। ভাবিল, আর একদিনও বিলম্ব করা হইবে না। কল্যই মন্দাকিনীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। রাত্রি একটার সময় বাহির হইবে। দুই ক্রোশ দূরে রতনপুর গ্রাম ; সে অবধি পদব্রজে যাইবে। সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে যাইবে। তারকেশ্বর দিয়া যাইলে আট ক্রোশ, পাণ্ডুয়া দিয়া যাইলে এগার ক্রোশ ; পাণ্ডুয়া দিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। একটু দূর হইবে, বিলম্ব হইবে, তা আর কি হইবে ? সারা রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক আয়োজনে তাহার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মন্দাকিনীকে লিখিল :—

প্রিয় ভগিনী,

আজ রাত্রি একটার সময় যাত্রা করিতে হইবে। ঐ সময় আমার ঘরে আসিও। জিনিষপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় একখানি বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই লইও না।

শ্রীঅনাথশরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি একটার সময়, স্ত্রীকে চুরি করিয়া অনাথ পলায়ন করিল।

॥ ৪ ॥

দুই দিন পরে বেলা বারোটার সময় যখন পাণ্ডুয়ার বাজারে অনাথশরণ গোশকট হইতে মন্দাকিনীর সহিত অবতরণ করিল, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়াছে। দুইজনেই স্বেদাক্ত কলেবর। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া অনাথ একটা দোকানে উঠিল। দোকানী অভ্যর্থনা করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসাইল। একটা ঝি আসিয়া মন্দাকিনীকে আড়ালে স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে লইয়া গেল।

সেই ঘরের পশ্চাতেই বারান্দা। বারান্দার নিম্নেই একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। জল বড় নির্ম্মল, মন্দাকিনীর শরীর বড় উত্তপ্ত; পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ। ঝিকে বাজার করিতে পাঠাইয়া মন্দাকিনী স্নান করিতে নামিল। তখনও সে যথেষ্ট বিশ্রাম করে নাই; গায়ের ঘাম পর্য্যন্ত মরে নাই। যতক্ষণ ঝি ফিরিল না, ততক্ষণ,—আধঘণ্টা হইবে,—মন্দা জলে পড়িয়া রহিল। ঝি আসিলে উঠিয়া মাথা গা মুছিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

এই অত্যাচারের প্রতিফল পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। রন্ধন সমাপ্ত হইবার পুর্ব্বেই মন্দা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল।

অনাথ স্নান করিয়া জল খাইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল গাড়ীর খবর লইতে, এবং হেমন্তকুমারকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে, এই ব্যাপার। মন্দার গায়ে হাত দিল, গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। চক্ষু দুইটি জবাফুলের মত লালবর্ণ। শীতে হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সঙ্গে না আছে বিছানা বালিস, না আছে বাহুল্য বস্ত্র। মন্দা কিসেই বা শয়ন করে, কি বা গায়ে দেয়?

অনাথ বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানি কম্বল চেয়ে এনে বিছানা ক'রে দিচ্ছি।"

মন্দাকিনী বলিল, "তুমি আগে খেতে বস। তোমাকে ভাত বেড়ে দিই, তারপর শোব এখন।"

অনাথ বলিল, "পাগল! এখন ভাত বাড়তে হবে না। তোমার এমন অসুখ, আমি কি খেতে পারি?"

মন্দা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমার অসুখ তা কি? তা ব'লে তুমি উপবাসী থাকবে? দু'দিনের কষ্টে তোমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে।"

অনাথ দোকানীর নিকট চাহিয়া একখানা বালাপোষ আর খান দুই তিন কম্বল লইয়া আসিল। সেইগুলি দিয়া বিছানা করিয়া মন্দাকে বলিল, "শোবে এস।"

মন্দা বলিল, "ওকি কথা? তুমি না খেলে আমি শোব না।"

অনাথ শুনিল না,—মন্দাকিনীকে শয়ন করাইল। বিছানায় শুইয়া মন্দাকিনী দুই তিন বার বলিল, "ভাত বেড়ে নিয়ে খাও তুমি আপনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে কষ্ট হবে।" কিন্তু আর বেশীক্ষণ জিদ করিবার শক্তি তাহার রহিল না; অল্পে অল্পে জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল।

তিন দিন পরে যখন মন্দাকিনীর জ্ঞান হইল, তখন সে চক্ষু খুলিয়া দেখিল, বিছানার কাছে স্বামী বসিয়া।

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা কেমন আছ?"

মন্দা বলিল, "ভাল আছি। তুমি ভাত খেয়েছ?"—বলিতে বলিতে আশে পাশে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সে দোকান নহে, কাহার গৃহ; পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিযাছে। জিজ্ঞাসা করিল, "একি! আমি এ কোথায় রয়েছি?"

অনাথ বলিল, "মন্দা, তোমাকে যে আর কথা কইতে শুনব, তা ভাবিনি। তিন দিন কেটে গেছে। এ এখানকার জমিদারের বাগানবাড়ী।"

মন্দা বলিল, "তিন দিন!"

"হ্যাঁ মন্দা, তিন দিন তুমি অচেতন হয়ে ছিলে। এখন যদি বাঁচাতে পারি, তবেই সব সার্থক।"

মন্দা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিল, "তোমায় একটা কথা বলব?"

অনাথ বলিল, "কি মন্দা?"

"আমাকে বাঁচিও না।"

এ কথা শুনিয়া অনাথের চক্ষু দিয়া জল আসিতে লাগিল। বলিল, "ছি মন্দা ও কথা কি বলতে আছে? তুমি ভাল হবে, তুমি বাঁচবে।"

মন্দার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। জলভরা চোখ দুইটি অনাথের পানে ফিরাইয়া বলিল, "কি হবে আমার বেঁচে? আমায় যেতে দাও।"

অনাথ বলিল, "না মন্দা, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।"

"কি করবে আমায় নিয়ে?"

"আমি তোমায় ভালবাসব।"

রোগিণীর দুর্ব্বল মস্তিষ্ক চিন্তার ভার আর সহিতে পারিল না। চক্ষু মুদিয়া মন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। অনাথ সহাস্যমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "দুপুরবেলাকার ওষুধটায় বেশ ফল হয়েছে। জ্ঞান হয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে কথাবার্ত্তা কয়েছেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "তবে আর ভাবনা নেই। এ জ্বরটুকু দুদিনে সারিয়ে দেবো; কিন্তু আপনি যে মারা গেলেন। এ তিন দিন ত এক রকম না খেয়ে আপনি ঠায় বসে আছেন। আপনার মত পত্নীপ্রেমিক স্বামী আমি খুব কম দেখেছি।"

অনাথ মনে মনে বলিল, 'খুব কমই বটে।' প্রকাশ্যে বলিল, "আমার স্ত্রী, আমি ত স্বভাবতঃই করব; কিন্তু আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।"

প্রবীণ ডাক্তারবাবু আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিতচিত্ত হইয়া বলিলেন, "আমি বেশী কি করেছি? আমি যা করেছি, সেই ত আমার পেশা, জীবিকা।"

"আপনি যদি বাবুদের ব'লে এ বাগানবাড়ী খুলিয়ে না দিতেন, তাহলে দোকানের সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে কম্বলের উপর শুযে আমার স্ত্রী ক'দিন বাঁচতেন?"

ডাক্তারবাবু কথা উল্টাইয়া, অন্য কথা পাড়িলেন। তাঁহার পর ঔষধ-পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন রাত্রি দশটায় মন্দার জ্বর মগ্ন হইল। সে সারারাত্রি সুনিদ্রা উপভোগ করিল। তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনাথও কয়দিনের পর খুব ঘুমাইল।

॥ ৫ ॥

প্রভাতে যখন ডাক্তারবাবু আসিলেন, তখন মন্দাকিনী তাঁহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল। জ্বর ছাড়িয়াছে শুনিয়া ডাক্তারবাবু অত্যন্ত আনন্দ

প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আর কিছুমাত্র ভয় নাই। এখন ইঁহাকে খুব প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন।

ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে, অনাথ মন্দাকে নিয়মিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইল। তাহার পর দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

মন্দা বলিল, "এ ক'দিন কি খেলে?"

"ডাক্তারবাবুদের বাড়ী থেকে ভাত আসত।"

"তবে চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? একেবারে শুকিয়ে যে আধখানি হয়ে গেছ। আমিই তোমার যত কষ্টের মূল। আমার জন্যে কেন এত করলে?"

অনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "যদি আমার ব্যারাম হয়, তা হ'লে তুমি আমার জন্যে করতে না?"

মন্দা বিছানার দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে বলিল, "আর ব্যারামের প্রার্থনায় কায নেই।"

অনাথ মন্দার একখানি হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "প্রার্থনা নাই করলাম, হলে করতে কি না?"

"করি না ত কি?"

"কেন?"

অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে মন্দা বলিল, "তুমি যে আমার স্বামী।"

অনাথ মন্দার হাতখানি চাপিযা বলিল, "তুমি যে আমার স্ত্রী।"

মন্দা সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে থেকে?"

"যে দিন তোমায় ভালবেসেছি।"

মন্দাকিনী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "তুমি না ব্রাহ্ম? তুমি না মিছে কথা বল না?"

অনাথ বলিল, "আমি ব্রাহ্ম, আমি মিছে কথা বলিনে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

"তবে সে দিন বললে 'ভালবাসব'।"

অনাথ নিরুত্তর। বলিল, "তুমি ত আমায় ভালবাস না।"

"কিসে জানলে?"

"তুমি ত আমাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হতে দিতে সম্মত হয়েছিলে। তাই ত কলকাতায় যাচ্ছিলে।"

মন্দা হাসিয়া বলিল, "তা বুঝি ?"

"কি তবে ?"

"আমি বুঝি আসতে চেয়েছিলাম ? ঠাকুরঝিই ত আমাকে পাঠালে।"

"তার ভারি ইচ্ছে তোমার আর একটি বিয়ে হয় ?"

"হ্যাঁ—পাত্রও ঠিক করে দিয়েছিল।"

"কে ?"

"যমরাজা।"

অনাথ হাসিতে লাগিল। মন্দা বলিল, "ঠাকুরঝিই বলেছিল তোকে যেমন দাদা বাড়ী থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তুই তেমনি পথে তার মন ডাকাতি করবি। না যদি পারিস, তবে—"

অনাথ বাধা দিয়া বলিল, "তবে ঐ বিয়ের বন্দোবস্ত ? তা ডাকাতিই করেছ বটে ! এদিকে অন্য বিয়ের যোগাড়যন্ত্রটিও বেশ ক'রে তুলেছিলে।"

মন্দা বলিল, "কিন্তু সে ভালবাসার বিয়ে হচ্ছিল না ! তাই ব্যাঘাত হল। কখন আমি তোমার মনে ডাকাতিটে করেছি, শুনতে পাইনে ?"

"সে সব পরে বলব।"

"কখন করেছি, সেইটে বল না !"

"কখন ? যে দিন প্রথম আমার বিছানায় পা'র তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তখন আরম্ভ করেছ আর কি ! তার পর সারাপথে।"

চাণক্যপণ্ডিত বুধগণের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন, ঘৃতকুম্ভসমা নারী এবং তপ্তাঙ্গারসম পুরুষকে একত্র স্থাপন করিবে না, করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই নরনারী যদি স্বামী স্ত্রী হয় এবং তাহাদের বয়স যদি তরুণ হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে ?

মন্দা অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল, "পথে কেন তবে আত্মসমর্পণ করনি ?"

অনাথ কিছু না বলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মন্দা মৃদুস্বরে বলিল, "নগেন্দ্রবালা ? আমার স্বামীকে নগেন্দ্রবালা নেবে, নগেন্দ্রবালার বড় সাধ্যি ! চল একবার কলকাতায়, তাকে আমি দেখব !"

অনাথ বলিল, "কলকাতায় ত যাব না। পশ্চিম যাব, তোমার শরীর সারাতে।"

মন্দা এ কথা যেন কাণে তুলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি সে তোমায় ভালবাসে? তা হলে তার ত ভারি দুঃখ হবে।"

"সে আমায় ভালবাসে কিনা, সেই জানে আর ঈশ্বর জানেন।"

"বলেনি? জিজ্ঞাসা করনি?"

"তার সঙ্গে কখনও এ কথা হয়নি।"

"তুমি ভালবাসতে তা সে জানে?"

"কি করে জানবে?"

মন্দা অভিমান ভরে বলিল, "সে না জানুক, তুমি ত বাসতে!"

অনাথ বলিল, "কই আর বাসতাম? তা হলে তুমি এত শীঘ্র এত সম্পূর্ণভাবে আমাকে জয় করলে কি ক'রে? এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল আমি যথার্থ ভালবাসতাম না। শুধু চোখের ভালবাসা ছিল, অন্তরে প্রবেশ করেনি। তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, তার আচার ব্যবহারের সৌন্দর্য্য, এই সমস্ত আমাকে মুগ্ধ করেছিল।"

দুইদিন পরে মন্দা পথ্য পাইল। দুইটি দিন দুইজনে বাগানবাড়ীতে বড়ই আনন্দে যাপন করিল।

আজ সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া, কল্য প্রভাতের গাড়ীতে তাহারা মুঙ্গের যাত্রা করিবে। সমস্ত ঠিক ঠাক।

সন্ধ্যার পর ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া অনাথ হেমন্তকুমারের নিকট হইতে এই পত্র পাইল—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং

কলিকাতা।
২৫ জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার।

প্রিয় ভ্রাতঃ,

ভগিনী মন্দাকিনীর অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহার আরোগ্যবিধান করুন।

আজ তোমায় একটি দারুণ দুঃসংবাদ দিব, প্রস্তুত হও। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, নগেন্দ্রবালা তোমাকে ভালবাসেন। আমারও বিশ্বাস তাহাই ছিল; কিন্তু কল্য সন্ধ্যাকালে আমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়াছে। শুনিলাম, শরতের সঙ্গে নগেন্দ্রবালার বিবাহ স্থির। আরও শুনিলাম, দুই বৎসর

হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ। সুতরাং নগেন্দ্রবালার ব্যবহারে তুমি যে অনুমান করিয়াছিলে তোমার প্রতি তিনি প্রণয়বতী, তাহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র।

এখন তুমি কি করিবে? এ দুঃসহ শোক কেমন করিয়া বহন করিবে?

তোমার আর একটা ভুল হইয়াছে। হিন্দুমতে যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, নূতন ব্রাহ্মবিবাহ আইনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং তোমরা উভয়ে ব্রাহ্ম হইলেও সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ বন্ধ।

তুমি কি কলিকাতায় আসিবে? চারি পাঁচ দিনের মধ্যেও যদি ভগিনী আরোগ্য লাভ করেন, এখানে আসিতে পার, তাহা হইলেও পূর্ব্বকথিত রাজবাড়ীর সেই কার্য্যটি হস্তান্তরিত হইবে না; কিন্তু আমার পরামর্শ, ভগিনীকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া তুমি কিয়দ্দিন হিমালয়ের কোনও নিভৃত প্রদেশে গমন করতঃ তপস্যা ও উপাসনার দ্বারায় চিত্তস্থির ও আত্মশান্তিবিধান করিবে।

ভবদীয়

শ্রীহেমন্তকুমার সিংহ

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তারবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া অনাথ স্ত্রীকে পত্রখানি দেখাইল। মন্দা পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তবে আর নগেন্দ্রবালার উপর আমার রাগ নেই। মুঙ্গেরে না গিয়ে কলকাতাতেই চল, নগেন্দ্রবালার বিয়েটা দেখতে হবে।"

অনাথ বলিল, "তাই চল। মুঙ্গেরে যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আমায় ভুলে যেতে নগেন্দ্রবালাকে অবসর দেওয়া।"

শুনিয়া মন্দাকিনী ভারি অভিমানের ভান করিল। বলিল, "তাই তখন মনের কথা খুলে বললেই ত হত! বলা হল তোমার শরীর সারাবার জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি।"

বাহিরে অন্ধকার বকুলগাছে একটা কোকিল বসিয়াছিল, সে হয়ত মানবের ভাষা বুঝিতে পারে। বুঝি মন্দাকিনীর এ ছলনাময় মানকথা শুনিয়া সে ভারি আমোদ পাইল, তাই মুহুর্মুহু ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিল। অনাথ স্ত্রীকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "না গো, না,—তা নয়।"

সারদার কীর্তি

॥ ১ ॥

ষ্টীমারে খুলনা যাইতেছিলাম—সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন। ক্যাবিন রিজার্ভ করা ছিল। সারা দ্বিপ্রহর দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। সন্ধ্যার কিয়ৎ পূর্ব্বে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি ভাবিলাম এই অবকাশে ছাদে গিয়া একটু সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া আসি।

সেইমাত্র ষ্টীমার মাণিকদহঘাট ছাড়িয়াছে। ক্যাবিনের ভিতর বসিয়া মনে হইয়াছিল, আর বেলা নাই; বাহির হইয়া দেখিলাম সূর্য্যাস্ত হইতে তখনও বিলম্ব রহিয়াছে। সুতরাং ছাদে যাওয়া হইল না। অলসভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটি অপরিচিত যুবা আমার কাছে আসিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দূরের দৃশ্য দেখিবার জন্য চশমা বদলাইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়াছিলাম। চশমা খুলিয়া যুবকটির মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। পূর্ব্বে তাহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

লোকটির বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। একহারা চেহারা, চক্ষু বসা, মাথায় বড় বড় চুল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য অবস্থার পরিচায়ক।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীসারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায। নিবাস কুমারখালি।"

"আমাকে চিনলেন কি করে?"

যুবক একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল, "মশায়কে বাঙ্গলা দেশে কে আর না চেনে? আপনার তুল্য স্বদেশহিতৈষী বাগ্মী—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কি চান আপনি?"

"আমি যা চাই, তা ক্রমে নিবেদন করছি। সে অনেক কথা। যদি দয়া করে শোনেন, তবে কৃতার্থ হই।"—বলিয়া লোকটা ডেকের তক্তার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যাপারটা কি আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম হয়ত কিছু অর্থসাহায্য চাহে। অন্যদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "তা বলুন শুনছি।"

"মশায়, একটু নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। একটু ওদিকটেয় যাবেন কি?"

"চলুন"—বলিযা আমি অগ্রসর হইলাম।

সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। আমার পাশে দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ চাহিযা রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া মনে করিলাম, পূর্ব্বে হয়ত এ অবস্থাপন্ন ছিল, এখন এরূপ দশা হইয়াছে। যাচ্ঞার ভাষা বুঝি মুখে আসিয়া বাধিয়া যাইতেছে।

"আপনাকে আমি প্রণাম করলাম কেন বুঝতে পেরেছেন?"

"না, কেন বলুন দেখি?"

"আপনি আমার পিতা।"

শুনিযা হাহা করিযা হাসিযা ফেলিলাম। বলিলাম, "কি রকম?"

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আপনি আমার পিতা কিনা ঠিক বলতে পারিনে, কিন্তু আপনার স্ত্রী আমার মাতা।" বলিয়া আকাশের পানে চাহিযা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিল।

বুঝিলাম, লোকটা পাগল। পূর্ব্বের অশ্রদ্ধার ভাবটা মন হইতে তিরোহিত হইয়া, একটা দযা হইল।

সে বলিতে লাগিল, "আপনি অবিশ্বাস করছেন? আপনি ভাবছেন লোকটা পাগল? তিনি আমার মা বটেন, তবে এ জন্মের মা নন। আসল কথাটা তবে খুলে বলি। আমি পাঁচ বচ্ছর ধ'রে কাসরোগে কষ্ট পাচ্ছি। কত রকম চিকিৎসা করালাম, কিছুই হল না। মেট্রোপলিটনে বি-এ পড়ছিলাম, পড়া বন্ধ করতে হল। দেখুন না চেহারাখানা, একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়েছি। বেশী দিন আর বাঁচতে হবে না। দিন সাতেক হল, গ্রামের বাইরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়ে সারা সন্ধ্যেটা উপুড় হয়ে প'ড়ে রইলাম। 'মা মা' বলে কত কাঁদলাম, কত প্রার্থনা করলাম। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে এলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, যেন মা বিশালাক্ষী আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—আপনার নাম ক'রে—তাঁর যিনি স্ত্রী—তিনি আর জন্মে তোর মা ছিলেন। তুই তাঁকে মদ খেয়ে একদিন বাপান্ত ক'রে গাল দিয়েছিলি, সেই পাপে তোর এই কঠিন রোগ হয়েছে। তাঁর কাছে যা, তাঁর পাদোদক পান করগে যা, ভাল হয়ে যাবি। ব'লেই মা বিশালাক্ষী অন্তর্দ্ধান করলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথায় যাচ্চেন ?"

হাত দু'টি যোড় করিয়া সে বলিল, "সব শুনেছেন, আর এ অধমকে 'আপনি' বলে কেন সম্ভাষণ করেন ? 'তুমি' বলুন বা 'তুই' বলুন।"—বলিয়া হেঁট হইয়া আমার জুতা দুইটা ছুঁইয়া স্বীয় ললাটস্পর্শ করিল।

"তুমি এখন কোথা যাচ্চ ?"

"আমি যাচ্চি দৌলতপুর। সেখানে আমার মামার বাড়ী। সেখান থেকে কলকাতায যেতাম, আপনার সন্ধানে।"

"আমি কলকাতায যাচ্চি, এ সংবাদ আপনাকে কে দিলে ?"

আকুলস্বরে সে বলিল, "আবার 'আপনাকে' ?"

"তোমায় কে বললে ?"

"কেউ বলেনি। আমি কি জানিনে যে কলকাতায় এবার কন্‌গ্রেসের অধিবেশন ? আমি কি জানিনে যে ব্যারিষ্টারশ্রেষ্ঠ মিষ্টার অতুল ব্যানার্জ্জি না হলে স্বদেশহিতকর কোন কার্য্যই হবার যো নেই ? দেশের মধ্যে কে এমন—"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "তা ভালই হয়েছে। আপনার—তোমার অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সারদা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মা কি আপনার সঙ্গেই আছেন ?"

"আছেন। আজই চাও পাদোদক ?"

"আজ পেলে কি আর কালকের জন্যে অপেক্ষা করিতে পারি ?"

"তবে দাঁড়াও এখানে।" বলিয়া আমি ক্যাবিন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ক্যাবিন পরিত্যাগের পর বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়াছিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই মুখে হাতের আড়াল করিয়া একটি হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

আমি তাঁহার শয্যার নিকট বসিয়া তাঁর হাতখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "একটি বড় মজা হয়েছে।"

"কি গা ?"

"তোমার ছেলে এসেছে।" বলিয়াই অনুশোচনায় মরিয়া গেলাম! আমাদের একটি দুই বৎসরের সন্তান ছিল, সে এই ঘটনার দেড় বৎসর পূর্ব্বে

চলিয়া গিয়াছে। আমি একটা অসাবধানতায় আমার স্ত্রীর মনে কি শোকস্মৃতি জ্বালিয়া দিলাম!

তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলছ?"

আমি তাঁহাকে কাছে টানিয়া বলিলাম, "ষ্টীমারে একজন সন্ন্যাসীর দর্শন পেয়েছি। তিনি আমার হাত দেখে বলেছেন শীগ্‌গির আমার ছেলে হবে।"

উপস্থিত বুদ্ধিতে এইটুকুর বেশী যোগাইল না। কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাঁহার দুইটি চোখের কোণে জল দেখা দিল। আমি তাঁহাকে বক্ষে বাঁধিলাম। মুখচুম্বন করিলাম। রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিলাম, নিজের চোখও মুছিলাম। কি কথা বলিয়া চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরাই ভাবিতে লাগিলাম।

গবাক্ষপথে দেখিলাম, সূর্য্যাস্তকাল সমুপস্থিত। বলিলাম, "চল, ছাদে চল সূর্য্যাস্ত দেখিগে। পদ্মাবক্ষে সূর্য্যাস্ত কখনো ত দেখিনি।"

তিনি উঠিলেন। পাশের কামরায় গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া, কেশবেশ বাহিরে যাইবার মত করিয়া আসিলেন।

দুইজনে ছাদে গিয়া পদচারণা করিতে লাগিলাম। সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল। ষ্টীমার হুহু শব্দে জল কাটিয়া ছুটিতেছে। ক্রমে নাগরকান্দি ষ্টেশন ঘাট নিকটবর্ত্তী হইল, আমরা ছাদ হইতে নামিয়া গেলাম।

সিঁড়ির পাশে সারদা দাঁড়াইয়া। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি আমার মা?"—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আমার স্ত্রীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবাক হইয়া আমার পানে চহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "একটা কথা আছে, ক্যাবিনে গিয়ে বলব।"

সারদার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। কোথা হইতে ভাল আপদ জুটিয়াছে! বলিলাম, "অপেক্ষা করুন না। আপনি অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন?"

সারদা সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। বলিয়া গেল, "আমি ঐ এঞ্জিনের কাছে থাকব।"

স্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনে গিয়া সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি পাদোক জল দিতে পারব না।"

আমি বলিলাম, "তাতে আর হানি কি ?"

"তুমি ঐ গাঁজাখুরী কথা বিশ্বাস কর নাকি ?"

"করিনে। কিন্তু ওর মনে যদি ঐ বিশ্বাস হয়, তবে হয়ত উপকার পাবে। এমন অনেক শুনতে পাই।"

"কি শুনতে পাও ? জন্মান্তরের মা বাপকে স্বপ্ন দেখে, ডাক্তারকে ফাঁকি দিয়ে তাদের পাদোকজল খেতে যায় ?"

"না ;—একটা কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস করলে রোগ অনেক সময় আরাম হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী চুপ করিয়া রহিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তা, শুধু জলই একটু দাওগে না। বিশ্বাস হলেই হল যে পাদোকজল।"

"তার দরকার কি ? সে যে ছলনা করা হবে"—বলিয়া চায়ের একটা পেয়ালাতে একটু জল ঢালিলাম।

আমার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে মোজা খুলিলেন। বলিলেন, "ভাল জ্বালা ! তোমাকে যেমন বোকা ভালমানুষটি পেয়েছে ! বিলেতে যে কোনও মেম ভুলিয়ে তোমায় বিয়ে করে ফেলেনি, সেই আমি আশ্চর্য্য হই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হলে তোমার কপালের এ কষ্টটা কোথায় যায় বল ? এতদিন তুমি ত তাহলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী !"

ঠাট্টা করার লোভটি আমার স্ত্রী সম্বরণ করিতে পারেন না, কিন্তু উল্টিয়া একটু ঠাট্টা কর দেখি, তাহা আর সহ্য হয় না। বলিলেন, "যাও যাও, তোমার আর চালাকি করতে হবে না। ভারি রসিকতা হল কিনা !"

আমি বাক্যব্যয় না করিয়া পেয়ালাটি লইয়া তাঁহার কোমল পদপল্লব ধারণ করিলাম।

তন্মুহূর্ত্তেই তিনি পা কাড়িয়া লইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, "পা ছোঁয়া কেন ?" আমায় উত্তরের অবসর না দিয়া, আমার হাত হইতে পেয়ালা লইয়া জলে পদাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন। পার্শ্বস্থ টেবিলে সেটি রাখিয়া বলিলেন, "বেয়ারাকে বল দিয়ে আসুক।"

আমি উঠিয়া বলিলাম, "বেয়ারা কি তাকে চেনে ? আমিই দিয়ে আসি।" বলিয়া পেয়ালাটি তুলিয়া লইলাম।

তিনি বলিলেন, "ও কি কর? কথা বললে শোন না কেন?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "দেখ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা। এত লেখাপড়া শিখলে ভাই, তবু এই সামান্য প্রেজুডিস্‌টে গেল না?"

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

॥ ২ ॥

কন্‌গ্রেস শেষ হইয়াছে, ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছি. একদিন সন্ধ্যার সময় দরোয়ান শ্লেট হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা দেখা করিতে আসিলে কার্ড আনে না, তাহাদের জন্য একখানা শ্লেট রাখিয়া দিয়াছিলাম। শ্লেটে ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে, "সারদাপ্রসন্ন চাটার্জ্জি।"

দুই মাসের পুরাতন কথা, সহসা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি কোনও নূতন মক্কেল আসিয়াছে।

ডাকিয়া পাঠাইলাম। চেহারা দেখিবামাত্র সারদাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম। আসিয়াই সে আমাকে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

"কি হে? কেমন আছ বল দিকিন? কিছু উপকার টুপকার পেলে?"

সারদা প্রথমতঃ কথার কোন উত্তর না দিয়া, বুকে হাত দিয়া বারকতক কাসিল। শেষকালে বলিল, "বেশ দিনকতক সেরে গিয়েছিল (খক্ খক্)—আবার (খক্ খক্)—দিন পাঁচ সাত" (খক্ খক্ খক্)—আর বলিতে পারিল না, কাসিতে কাসিতে নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

তাহার কাসির ধমক থামিলে বলিলাম, "পাদোকজলের কর্ম্ম নয়। ওষুধ খাও।"

"পাই কোথা?"—বলিয়া আবার কাসিতে আরম্ভ করিল।

সাড়ে সাতটা বাজে। বাড়ীতে একটা ডিনার পার্টি ছিল। এখনি লোকজন আসিতে আরম্ভ হইবে। এ সময় এ আসিয়া জুটিল কেন? তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার অভিপ্রায়ে পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিলাম। সারদাকে দিয়া বলিলাম, "এই নাও, কোনও ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে একটা ওষুধ পত্র খাওগে, পাদোকজলে কি রোগ ভাল হয়?"

এই সময় মিষ্টার বোসের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। আমি সারদাকে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আজ আমি ভারি ব্যস্ত আছি—যাও!"

সারদা টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক বেলা হইয়াছে। উঠিয়া সার্সির কাছে দাঁড়াইয়া নিম্নে বাগানের পানে দৃষ্টিপাত করিলাম। কালো সার্জ্জের চাদর গায়ে দিয়া কে একজন পায়চারি করিতেছে। আমার পানে যতক্ষণ পিছন ফিরিয়া ছিল, ততক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সম্মুখ ফিরিলেই দেখিলাম সারদা। পিত্ত জ্বলিয়া গেল। প্রভাত হইতে না হইতেই আসিয়া জুটিয়াছে! এখনি দরোয়ান শ্লেট লইয়া আসে দেখিতেছি!

চায়ের টেবিলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের সহিত তাহার কার্ড উপস্থিত। আমার স্ত্রী তখনও নামেন নাই। সারদা আসিয়া প্রথমেই আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "কাল সারা রাত আমার নিদ্রা হয়নি। আমার প্রতি আপনার এই অহেতুক স্নেহ দেখে আমি অবাক হয়ে আছি। আমি কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই, আমার চিকিৎসার জন্যে পাঁচ পাঁচটা টাকা! এ টাকা ক'টি ফিরিয়ে নিন।" বলিয়া টাকা কয়টি টেবিলে রাখিয়া দিল।

সারদার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। বলিলাম, "না না, ও টাকা আর ফিরে দিতে হবে না; তোমার চিকিৎসা ব্যয়ের জন্যে দিয়েছি।"

সারদা বারকতক কাসিয়া বলিল, "দেখুন, দৈবশক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস। ডাক্তারি কবিরাজিতে আমার বিশ্বাস নেই। এ অবস্থায় ওতে অর্থব্যয় কি মিছে হবে না?"

আমি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলাম, "একেবারে বিশ্বাস না থাকলে ফল হওয়া শক্ত বটে।"

সে বলিল, "আমার আন্তরিক বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা ঠাকুরুণের (উদ্দেশে করপুটে প্রণাম করিল) পাদোকজল দুবেলা খেতে পাই, আর তাঁকে দুবেলা প্রণাম করতে পাই, তা হলে আমি একেবারে আরাম হয়ে যাই। নইলে এ যাত্রা আমার নিষ্কৃতি নেই।" বলিতে তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলাম। দুইবেলা পাদোদক দিতে এবং প্রণাম

লইতে আমার স্ত্রী রাজি হইবেন কি? এই সময় লোকটা অত্যন্ত কাসিতে লাগিল। তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার মনে ভারি দয়া হইল। ভাবিলাম—আহা রাজি হওয়া উচিত। আমার স্ত্রীকে রাজি করাইব। কত রকমে লোকে পরের উপকার করে। এই সামান্য উপায়ে যদি ইহার উপকার হয়, যদি ইহার প্রাণটা বাঁচে, তাহা হইলে করা উচিত।

সারদাকে বলিলাম, "তুমি নীচে গিয়ে কর্ম্মচারীদের ঘরে অপেক্ষা কর। আমি তোমায় ডেকে পাঠাব।"

স্ত্রীর সন্ধানে গেলাম। শুনিলাম তিনি স্নানের ঘরে। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দর্শন পাইলাম।

বারান্দায় একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া তিনি চুল শুকাইতে বসিলেন। আমি বলিলাম, "সারদা আবার এসেছে।"

"সেই ষ্টীমারের সারদা? আবার কেন এসেছে?"

বাঃ—আমার স্ত্রীর কি স্মরণশক্তি! আমি কিন্তু শ্লেটে সারদার নাম দেখিয়া প্রথমতঃ উহাকে চিনি নাই।

"তার কাসি আবার বেড়েছে।"

"আর আমি পাদোকজল দিতে পারব না কিন্তু। একবার দিয়ে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কায করেছি। আমি পীর না পয়গম্বর যে আমার পাদোকজল খেয়ে ওর ব্যারাম ভাল হবে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মত সকলে ত উচ্চশিক্ষিত নব্য আলোকপ্রাপ্ত নয়;—ওর যদি তাই বিশ্বাস হয়! সেবার ত ভাল হয়ে গিয়েছিল বললে।"

আমি দেখিলাম, এবার একটু বেগ পাইতে হইবে। স্পষ্টতঃ ইনি মনে করিয়াছেন, সেবারকার মত এক পেয়ালা পাদোদক দিলেই চুকিয়া যাইবে। যদি শুনেন, তা নয়, এখন কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত দুইবেলা উক্ত মহার্ঘ দ্রব্যটি বিতরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িবেন।

তথাপি বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যতটা বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়াছিলাম—ততটা হইল না। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ডাক্তারি কবিরাজি কোন ওষুধে ওর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই? দু'বেলা আমার পাদোকজল খাবে? তাতেই ও ভাল হবে?"

"ও ত তাই বলছে। বলছে নইলে এ যাত্রা ও বাঁচবে না। আহা ওর প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমার স্ত্রী মৌন থাকিয়া সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

সারদাকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাতে সে আনন্দে অধীর হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাসা কোথায়?"

"আমার এখানে কেউ নেই।"

"কোথায় থাকবে?"

"এখানে আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না দয়া করে? যদি এত দয়া করলেন"—বলিয়া চুপ করিল।

আমি বলিলাম, "আমার কর্ম্মচারিদের একটা মেসের মত আছে। সেখানেই থাকতে পার।"

সারদা বলিল, "সে ত বেশ হবে। কাল রাত্রে আমি সেইখানেই খেয়েছিলাম কিনা"—বলিয়া সারদা কাসিতে আরম্ভ করিল।

কাসি থামিলে বলিল, "আজ একবার যদি অনুমতি করেন, তবে মার শ্রীচরণ দর্শন করি।"

স্ত্রীর কাছে তাহাকে লইয়া গেলাম। সারদা তাঁহাকে প্রণাম করিল। আর স্ত্রী তাহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

টেবিলে গ্লাসে জল ছিল। সারদা তাহাই একটু হাতে লইয়া মাটীতে বসিয়া, পাদোদক খাইল। পান করিয়া অবশিষ্ট অংশ মাথায় মুছিয়া ফেলিল।

এইরূপ দুই তিন দিন করিল। তাহার রোগের কিছুমাত্র উপশম দেখা গেল না। আমাকে সারদা বলিল, "মা কি ভাল মনে আমায় পাদোদক দিচ্ছেন না? এবার সারছে না কেন?"—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সেদিন এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ওষুধ খাবে না বিষুধ খাবে না, পাদোকজল খেয়ে মানুষের রোগ ভাল হয়? যত সব অনাসৃষ্টি আবদার!"

আমি বলিলাম, "দেখ, ইচ্ছাশক্তিতে বোধ হয় কিছু কায হয়। তুমি

পাদোকজল দেবার সময় মনে মনে খুব আগ্রহের সহিত ভেবো, এই জলে এর রোগ ভাল হবে।"

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "দিনকের দিন যেন সং হচ্চ। বিলিতি ময়ূরপুচ্ছ ক্রমশঃই তোমার গা থেকে খসে খসে পড়ছে।"

আমি কপট অভিমান সহকারে বলিলাম, "অর্থাৎ আমাকে প্রকারান্তরে দাঁড়কাক বলা হল। এতই যদি কালো দেখছিলে, তবে বিয়ে করলে কেন? ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—"

আমার স্ত্রী এবার আর চটিলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবাই তোমার মত কালো হলে জগৎ আলো হয়ে যেত।"

কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমি যে একজন সুপুরুষ, তাহা বিলাতের অনেক বিবিই স্বীকার করিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

প্রতিদিন সারদার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কাসি প্রায় সারিয়া উঠিল, মুখের ফ্যাকাসে রঙ কালো হইতে লাগিল। চোখের কোলে মাংস জমিতে লাগিল। দেখিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। আমার স্ত্রীও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রায়ই সারদাকে ডাকাইয়া ফাযফরমাস করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিদিগকে বিশ্বাস করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে না পাঠাইতে পারিতেন, তাহা সারদাকে ভার দিতেন।

২৭শে বৈশাখ একটি বিবাহ উপলক্ষ্যে বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক রাত্রি অবধি থাকিবার কথা ছিল। বিবাহান্তে থিয়েটারের অভিনয় হইবে। বাড়ী ফিরিতে অন্ততঃ রাত্রি দুইটা বাজিবে, ইহা আমাদের চাকর বাকর কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়াছিলাম। সারদাকে কিছুদিন হইতে আমার আইন পুস্তকের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম, "আজ লাইব্রেরীতে শুয়ো। একটু সজাগ থেকো।"

সে বলিল, "আমাকে বলতে হবে না, আমি আজ জেগেই থাকব এখন, যতক্ষণ আপনারা না ফেরেন।"

জাগিয়াই সে ছিল বটে, পরে প্রমাণ পাইলাম।

ফিরিতে রাত্রি তিনটা বাজিল। আমার স্ত্রী বেশপরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি একা শয়ন কক্ষের দ্বারমুক্ত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

বড় সিন্দুকের সম্মুখে সারদা বসিয়া আছে। আশে পাশে খানকতক রূপার বাসন ছড়ান। বাসনের আলমারী খোলা। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সারদা 'বাবা—বাবা' বলিযা অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহার কাছে গিয়া দেখিলাম, সে বন্দী। এই সিন্দুকে যে কলটি লাগান ছিল, তাহার একটু ইতিহাস আছে। বিলাতে অবস্থানকালীন আমি নীলামে অনেক মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছিলাম। একটি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়, কলটা সেই ব্যাঙ্কের। কলে একটা তালা আছে কিন্তু তাহার চাবি নাই। ঘূর্ণ্যমান কযেকটা অঙ্গুরীয়াকার ধাতুখণ্ডের যথাসন্নিবেশে একটা নির্দ্দিষ্ট ইংরাজি নাম সাজাইতে হয, তাহার পর টানিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু খুলিবার পূর্ব্বে তৎসংলগ্ন একটা পিন স্থানভ্রষ্ট করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া খুলিতে চেষ্টা করিলে, যে খুলিতেছে সে তৎক্ষণাৎ বন্দী হইবে। দুইদিক হইতে দুইটা লৌহ খণ্ড স্প্রিঙের জোরে ছুটিয়া গিয়া হাত বাঁধিয়া ফেলিবে। আমার স্ত্রীর অসাবধানতায় সারদা কোনও দিন খুলিবার নামটি জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আবার এ ব্যাপার আছে, তাহা ত সে জানিত না!

পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া সুখ নাই। সারদাকে দেখিতে নিরীহ ভালমানুষটি। যাহারা বলে, মানুষের মুখ দেখিয়া স্বভাব চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়, তাহারা মূর্খের মূর্খ। আইনের ব্যবসায করিতে করিতে আমি এ মতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলাম; সারদার এই আচরণে আমার বিপক্ষমত স্থায়ী হইয়া পড়িল।

তাহার কাছে গিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বলিলাম, "খুব কায করেছিস—উপযুক্ত পুত্রের কাজ করেছিস।"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সারদা কাতর স্বরে বলিল, "বাবা, আমার দোষ নেই।"

ইচ্ছা করিল তাহার মুখে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করি। কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করিলাম।

এই সময়ে আমার স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সারদাকে তদবস্থ দেখিয়া চমকিত হইলেন। কাঁপিতে লাগিলেন। আমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি কাণ্ড!"

আমার স্ত্রীকে দেখিযা সারদা দ্বিগুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। আমি রাগিয়া বলিলাম, "চুপ রও শূয়ার—মেরে হাড় গুঁড়ো করে ফেলব।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "ও ঘরে চল।"—বলিয়া আমার হস্তধারণ করিয়া প্রায় টানিয়া লইয়া গেলেন।

একটা কৌচে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "কি হবে?"

"কি আর হবে? পুলিশে দেবো।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, কায নেই পুলিশে দিয়ে। ছেড়ে দাও। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এ কায করে ফেলেছে। প্রথম অপরাধের মার্জ্জনা হাওয়া উচিত। ও যদি অনুতাপ করে, নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে, তবে ওকে সে অবসর দাও। পুলিশে দিলে ওর জীবন একেবারে মাটি হয়ে যাবে।"

সারদা যদি চুরি করিয়া পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইত, তবে তাহাকে ক্ষমা করা অসম্ভব হইত বটে। কিন্তু সে নাকি অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাই তাহার প্রতি যেন কতকটা দয়া অনুভব করিলাম। কিন্তু সেটা করিলে কি সামাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় না? স্ত্রীকে সেই কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন, "না; পুলিশে দিলেই সামাজিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের উপরই সামাজিক কর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত। একটা জীবনকে চিরদিনের জন্যে নষ্ট করে দিও না।"

সারদাকে ছাড়িয়া দিলাম।

কলিকাতায় কন্‌গ্রেস হইয়াছিল কবে?—১৮৯৬ সালে। তিন বৎসর পরে সারদার নিকট হইতে সে দিন একখানি পত্র পাইয়াছি। সে এখন জামালপুর মিউনিসিপালিটিতে ট্যাক্স দারোগার কার্য্য করিতেছে। তাহার মাতুল তাহার জন্য পাঁচশত টাকা জামিন দিয়া ঐ কাযটি জুটাইয়া দিযাছেন। কিছুদিন তাহার অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল, প্রায় ভিক্ষাকে উপজীবিকা করিতে হইয়াছিল। তাহার প্রতি আমাদের 'অহেতুক স্নেহ' সম্বন্ধে অনেক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহার কাসিটা এবার অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

এবার বোধ হয় বাঁচিবে না! ইচ্ছাটা, এখানে আসে কিছুদিনের জন্য। অথচ সে প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেছে না। তাহার পত্রের শেষ কয় ছত্র এই :

"যদি আপনার কাছে যাইতে পারিতাম, যদি আমার মাতৃদেবীর পাদোদক পান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হযত আরোগ্য লাভ করিতাম। কিন্তু কোন্ মুখে আর সে প্রস্তাব করিব? আমার যদি মৃত্যু হয তবে সেই শাস্তিই আমার উপযুক্ত।"

আমার স্ত্রী এই পত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "একটা কথা রাখবে?"

"কি?"

"তাকে আসতে লেখ।"

"চাকরি করছে, এখানে এসে কি করবে?"

"ছুটী নিযে আসুক।"

"কেন, পাদোক জল দেবে বলে?—তার চেয়ে একটা শিশি করে আউন্স চারেক পাদোক জল পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেই হয়।"

"না না—তাকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে কবছে। তুমি জান, এ জীবনের জন্যে আমার কাছে সে ঋণী? আমার কাছে যে উপকৃত, তাকে আমার ভারি ভাল লাগে, এটা আমার একটা দুর্ব্বলতা।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "আমিই ধন্য যার এমন স্ত্রী, পাদোদক খেয়ে কত লোক জীবন পেয়ে যায়।"

"আহা ঠাট্টা কর কেন? আমার পাদোদক পান ক'রে সে জীবন পেয়েছে আমি কি বলছি? জীবন মানে তার নৈতিক জীবন ভেবে বলেছিলাম। তুমি তাকে পুলিশে দিলে তার কি সর্ব্বনাশ হত বল দিকিনি!"

আমি বলিলাম, "নৈতিক জীবন ছাড়া ভৌতিক জীবনও তুমি দিয়েছ তাকে। তুমি পাদোদক না দিলে হয়ত এতদিন বাঁচত না।"

আমার স্ত্রী একথা শুনিয়া ভারি হাসিতে লাগিলেন। হাসির অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া আমি তাঁহার পানে নির্ব্বোধের মত চাহিয়া রহিলাম। হাসি থামিলে বলিলাম, "অত হাসছ কেন?"

"তুমি বুঝি মনে করেছ সারদা আমার পাদোদক খেয়ে ভাল হয়েছে?"

"তবে কি? তোমায় প্রণাম ক'রে ক'রে?"

"না গো না তাও না। একটা রহস্য আছে। প্রথম দু' তিনদিন যখন

দেখলাম, তার কাসিটা ক্রমশঃই বেড়েই যাচ্ছে, তখন জলে পদস্পর্শ করার পরিবর্ত্তে, এ বেলা একটা ও বেলা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের এক ফোঁটা করে স্পর্শ করাতে লাগলাম। ওয়াইন গ্লাসে ঔষধ তৈরি করে টেবিলে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিতাম। সারদা এলে বলতাম—ঐ জল রেখেছি নিয়ে যাও।"

স্ত্রীর বুদ্ধি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

সারদাকে আসিতে লিখিলাম।—সে উত্তর দিল, 'এ কালামুখ আর আপনাদিগকে দেখাইতে ইচ্ছা নাই।' অগত্যা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছুইটা কিনিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে পার্শেল ফিরিয়া আসিল। যে দিন প্রভাতে পার্শেল ফিরিল, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি আমার পূর্ব্ব পরিচিত। সারদাকে লেখা আমার পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, "এর কোনও সন্ধান দিতে পারেন ?"

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সারদা মিউনিসিপ্যালিটির বারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করিযা পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রী এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

প্রিয়তম

॥ ১ ॥

প্রিয়তমার সঙ্গে তরঙ্গিণীর সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত রকমের—তাহাকে ঠিক সখিত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী ও প্রণয়িণীর মতই আচরণ করিত। তাহাদের পত্রগুলি প্রেমলিপি ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাতে আদর সোহাগ ও মান অভিমানের প্রাচুর্য্য থাকিত। দেখা হইলে দুইজনে নিভৃত স্থানে গিয়া উপবেশন করিত; কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে তাহাদের মুখে কথা ফুটিত না। তরঙ্গিণী কতদিন প্রিয়তমার গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—'প্রিয়, ভাই, তুই আমাকে বেশী ভালবাসিস না তোর বরকে?' প্রিয়তমা বলিযাছে—'তোকে।' একদিন প্রিয়তমা তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল, সেদিন আর তরঙ্গিণী অন্ন জল মুখে তুলিল না। কত করিয়া তবে প্রিয়তমা সখীর মান ভাঙ্গাইল। সেই অবধি প্রিয়তমা কপটতাচরণ আরম্ভ করিয়াছে।

তরঙ্গিণী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার পরিধানে কালাপেড়ে দেশীয় সূক্ষ্ম বসন এবং হাতে সোণার চুড়ী আছে বটে, কিন্তু সীমন্তে সিন্দুর নাই। আট বৎসর বয়সে বিবাহিত হইয়া নয় বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে।

তরঙ্গিণী যখন প্রথম শ্বশুরগৃহবাসে আসে, তখন তাহার সঙ্গিনীর মধ্যে ছিলেন শুধু শ্বাশুড়ী ও দিদিশ্বাশুড়ী। প্রিয়তমা তাহাদের প্রতিবেশিনী, কিন্তু তাহার সাহচর্য্য লাভ প্রথমেই হয় নাই, সেও তখন নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। প্রিয়তমা ফিরিয়া আসিলে প্রথম সাক্ষাতেই তরঙ্গিণী তাহাকে ভালবাসিল।

বিধবা বালিকা তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সখীর প্রতি অর্পণ করিল। তাহাকে সে কখনও ডাকিত প্রিয় বলিয়া, কখনও বলিত প্রিয়তম। চিঠিতেও তাহাকে প্রিয়তমা না বলিয়া, প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রতি সন্ধ্যায় নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরের সহিত দেখা হইত, তাহা ছাড়া তরঙ্গিণী প্রতিদিন প্রিয়কে চিঠিও পাঠাইত। তরঙ্গিণীর শ্বশুরালয়, কিন্তু প্রিয়তমার পিত্রালয়। প্রিয়তমা মনে করিলেই তরঙ্গিণীর কাছে আসিতে পারিত; প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিতে হইত না। খিড়কী খুলিয়া

পুকুরের ধার দিয়া বাগানের ভিতর দিয়া তরঙ্গিণীদের খিড়কী দরজায় উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল। পথ উভয়ের সমান, কিন্তু তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তাহাকে কোথাও যাইতে আসিতে দিতে ভালবাসিতেন না। তাহাতে কিছু ক্ষতি ছিল না; তরঙ্গিণীদের বাড়ীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও নির্জ্জন হওয়াতে এইখানেই দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের, আমোদ প্রমোদের সুবিধা হইত।

তরঙ্গিণীর ভালবাসার অত্যাচার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কিন্তু প্রিয়তমা সে সমস্ত সকরুণ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে থাকিল। সে ভাবিত আমার স্বামী আছে, ভালবাসার পাত্র আছে; আহা তরঙ্গিণীর যে কেহ নাই, কিছু নাই। তাই সব সময় মনে না আসিলেও মুখে তাহাকে আদর করিত।

প্রিয়তমা তরঙ্গিণীকে সচরাচর বলিত তরী; কখনও বলিত তরণী, কখনও বলিত সাধের তরণী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতে থিয়েটারে 'মৃণালিনী'র অভিনয় দেখিযাছিল; সে অবধি মাঝে মাঝে সে তরঙ্গিণীর গলাটি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গান করে—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।

প্রিয়তমা শুধু তরঙ্গিণীকে আদর করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত না। তরঙ্গিণী যেমন কথায় কথায় তাহার উপর অভিমান করিত, প্রিয়তমাকেও সেইরূপ করিতে হইত। যদি কোনও দিন রাগ না করিত, তাহা হইলে তরঙ্গিণী বলিত—'তোমার ত বয়ে গেল। তুমি কি আমাকে ভালবাস যে রাগ করবে?' প্রথম প্রথম এই মৌখিক মান অভিমান প্রিয়তমার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইত, কিন্তু ক্রমে সমস্ত বেশ অভ্যস্ত হইয়া গেল। নিতান্ত কর্ত্তব্য পালন করিতেছি বলিয়া আর মনে হইত না।

॥ ২ ॥

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তরঙ্গিণী আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"দারুণ মানেরি ভরে করেছি তার অপমান।
কোথায় সে গেল সখি, আন্ তারে ডেকে আন্।"

তরঙ্গিণীর কণ্ঠবিনিঃসৃত মৃদুতান ভ্রমর গুঞ্জনের মত শুনাইতেছিল। আজ প্রভাতে যখন প্রিয়তমা তরঙ্গিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তন

তরঙ্গিণী রাগে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই।—প্রিয়তমা কাঁদকাঁদ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। অন্য দিন তাহারা দিনে দশবার করিয়া নিজ নিজ ছাদে উঠিয়া পরস্পরকে দর্শন করে; আজ সারাদিন তরঙ্গিণী প্রায় ছাদেই যাপন করিয়াছে, তথাপি একটিবারও প্রিয়তমার দেখা পায় নাই। নিরাশ হইয়া তরঙ্গিণী এইমাত্র ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তরঙ্গিণী একবার ভাবিল প্রিয়কে একখানা চিঠি লেখে। কিন্তু আজ প্রভাতে তাহার অভিমানের কারণ, পূর্ব্ব দিনে লিখিত পত্রখানির উত্তর না পাওয়া। সুতরাং চিঠি লিখিতে তরঙ্গিণী ইতস্তত: করিতে লাগিল। অথচ সকালবেলার আচরণটা নিতান্তই রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়তমারও কি যথেষ্ট দোষ নাই? প্রিয়তমার স্বামী আসিয়াছে সত্য; তাই বলিয়া কি সে একটিবার ছাদে আসিবার অবসর পায় না? আর তরঙ্গিণী যে রাগ করিল, তা কাহার দোষ? প্রিয়তমারই ত দোষ! কেন সে নিয়মিত সময়ে পত্রোত্তর দেয় নাই? স্বামী কি তাহার হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? না, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল? না, কালি ফেলিয়া দিয়াছিল?

ক্রমে অন্ধকার হইল। দাসী আসিয়া টেবিলের উপর একটি জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া গেল। তরঙ্গিণী টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, বাক্সটি খুলিয়া চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিল। একখানি সুন্দর রঙীন কাগজ লইয়া চিঠি লিখিল। তরঙ্গিণী উত্তম লেখাপড়া জানিত। বিধবা হওয়া অবধি ছয় বৎসরকাল সে পিত্রালয়ে ছিল। তাহার দাদা তাহাকে সযত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অবসর পাইলে দু:খিনী ভগিনীটির আজন্মবৈধব্য তবু কিয়ৎ পরিমাণে সহনীয় হইবে।

চিঠিখানি শেষ করিয়া তরঙ্গিণী সেখানিকে খামের মধ্যে পুরিল। শিরোনামা লিখিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিল চিঠি পাঠাইবে কিনা। এ কি পায়ে ধরিয়া মানভিক্ষা করা হইতেছে না?

এই সময় তরঙ্গিণীর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। পনেরো বৎসর বয়স হইতে মাঝে মাঝে তাহার হিষ্টিরিয়া হইতেছে। বেশী অধ্যয়ন অথবা বেশী চিন্তা করিলে, কিংবা বেশীক্ষণ মন খারাপ করিয়া থাকিলে এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করিত। আজ ত সারা দিনটা সে মন খারাপ করিয়াই আছে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিল, রোগ আসন্ন

জানিতে পারিলে শীতল জল পান করিবে এবং মুখে চক্ষে জলের ঝাপটা দিবে। ঘরের কোণে জল রাখা ছিল, তরঙ্গিণী জল পান করিয়া মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। চেয়ারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। ক্রমে চেয়ার সুদ্ধ সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গেল।

তরঙ্গিণীর এই ব্যাধি আছে বলিয়া, বাটীর লোক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। পাশের ঘরে এক দাসী ছিল, সে শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে সংবাদ দিল।

গতকল্য তরঙ্গিণীর খুড়শ্বশুর হৃদয়নাথবাবু স্ত্রী পুত্র লইয়া বাটী আসিয়াছেন, পুত্র সুধীরচন্দ্রের শুভ উপনয়ন।

তরঙ্গিণীর শাশুড়ী তখন মাকে লইয়া পাল্কী করিয়া সুধীরের উপনয়নে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ছিলেন শুধু নবাগতা ছোটকাকী। তিনি ছুটিয়া আসিলেন : তাঁহার এক বোনের হিষ্টিরিয়া আছে ; মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার নিয়মাদি সব তাঁহার জানা ছিল। ঝির সাহায্যে তরঙ্গিণীকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন এবং চেতনা সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। হঠাৎ নিকটস্থ টেবিলের উপর রঙীন খামখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দক্ষিণ হস্তে তরঙ্গিণীকে পাখা করিতে করিতে, বাম হস্তে খামখানি তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলি সাহায্যে চিঠিখানি বাহির করিয়া খামখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। চিঠির ভাঁজ খুলিয়া আলোকে পড়িলেন—'প্রিয়তম' !

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত পা অবশ হইয়া আসিল। নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। ঝিকে বলিলেন, "তুই বাতাস কর্ আমি শীগগির আসছি।"—বলিয়া পাখা ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ইঁহার স্বামী হৃদয়নাথ মীরাটের প্রধান ডাক্তার। বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। লোকটি পরম হিন্দু। এক সময়ে নাকি গোমাংসও ইঁহার উদরস্থ হইয়াছিল ; কিন্তু সে সব ভূত-কথা। আপাততঃ তাঁহার মস্তকে একটি প্রকাণ্ড 'শিখা' দোদুল্যমান। স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত বিরোধী। ইঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগতা। সুধীর সেই প্রথমার গর্ভজাত। এই দ্বিতীয় সংসারটি এখনও কোন সন্তান-সন্ততি

সংসারে আনিতে কৃতকার্য্য হন নাই। আর বড় আশাও নাই কারণ ইঁহার বয়ঃক্রম এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইয়াছে।

হৃদয়নাথ একটি ঘরে একাকী বসিয়া কি লিখিতেছিলেন, সহসা তাঁহার পত্নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রী চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

হৃদয়নাথ চশমা আঁটা চক্ষু দুইটি স্ত্রীর পানে ফিরাইয়া বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি ?"

"দেখ না পড়ে।"

"কে লিখেছে ?"

"যেই লিখুক—দেখ না।"

হৃদয়নাথ চিঠিখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেন :—

প্রিয়তম,

তুমি এমন নিষ্ঠুর ? এই তুমি আমায় ভালবাস ? আমি যদি রাগ করি, অভিমান করি, তাহা হইলে কি তুমি সে অভিমান ভাঙ্গাইবে না ? ফেলিয়া চলিয়া যাইবে ? কাল সকালে আমি তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তার জবাব দাও নাই কেন ? তাইত আমি রাগ করিয়াছিলাম, তাইত তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কহিলাম না। আমি কেন রাগ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জানিতে না ? যদি না জানিতে তবে জিজ্ঞাসা করিলেও ত পারিতে। তুমি চলিয়া গেলে পর আমার ভারি কষ্ট হইল। আজ প্রায় সারাদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছাদে কাটাইলাম, তুমি তোমাদের ছাদে আসিলে না কেন ? শেষে আমি মান খোয়াইয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমি যদি আমার বেদনা না বুঝিবে তবে কে বুঝিবে প্রিয়তম ? তোমার সাধের তরণী বুঝি পুরাণো হইয়াছে, তাই এ অনাদর ?

তোমারই।

চিঠি পড়িয়া হৃদয়নাথ বলিলেন, "এ কার চিঠি ?"

"কার আবার, মেঝ বউয়ের।"

"আমাদের মেঝ বউমার ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মেঝ বউমার। সর্ব্বনাশী শেষে এই করলে ! কুলে কালি দিলে ! এ ত আমি তখনি জানি। যার কপাল পুড়েছে, তার

আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা কেন ? গহনা পরা কেন ? পাণ খাওয়া কেন ?”

স্ত্রীর বক্তৃতা-স্রোতে হৃদয়নাথ বাধা দিয়া বলিলেন, “দেখ, তুমি ঠিক জান এ তাঁরই হস্তাক্ষর ?”

“তোমার কথা শুনে গা জ্বলে যায় ! এ আবার নতুন করে জানতে হবে না কি ? আজ চার বচ্ছর ধরে যে কালামুখী আমায় চিঠি লিখছে।”

“তা হলে, এখন কি হয় ?”

“কি হয়, ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদায় করে দাও। কাশীতে পাঠিয়ে দাও।”

“লোকে শুনবে না ?”

“শুনতে কি কারু বাকী থাকবে ? তুমি কার মুখে সরা চাপা দেবে ?”

হৃদয়নাথ স্ত্রীর হস্তে পত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, “দেখ, বোধ হয় তা নয় ; এমনটাই কি হতে পারে ?”

“না তা কি আর হতে পারে ? তুমি যেমন ভালমানুষটি, সবাইকে নিজের স্ত্রীর মত সতীলক্ষ্মী মনে কর।”

হৃদয়নাথের ওষ্ঠপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। বলিলেন, “দেখ, আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না যে, বউমা পাপে ডুবেছেন। আর যদি, তুমি যা বলছ তাই হয়, তা হলে এখনও হয়ত উনি ধর্ম্মচ্যুত হননি, হবার উপক্রম হয়েছে মাত্র।”

“উপক্রম হয়েছে মাত্র বইকি ! তুমি বুঝি ভেবেছ শুধু চিঠিপত্র চলেছে ?”

“আমার ত তাই মনে হয়।”

“যেমন তোমার বুদ্ধি, তার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কেন, চিঠিতে ত স্পষ্ট লেখাই রয়েছে !”

“কি লেখা রয়েছে ?”

“তবে কি পড়লে চিঠি ? তুমি ত নিজে পড়েছ, আমি শুধু শুনেছি। চিঠিতে ত লেখাই রয়েছে ‘তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন ভাল ক’রে কথা কইলাম না।’ শুধু কি চিঠি চলেছে ? দেখাশুনো হয়েছে সব হয়েছে।”

এই সময় ঝি আসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সংবাদ দিল—“ছোট মা শীগগির এস গো, মেঝ বউমা বড্ড কি রকম করছেন।”

ছোটগিন্নি ঝির সহিত চলিয়া গেলেন। হৃদয়নাথ একাকী বসিয়া নানারূপ

চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার প্রকৃতিটি কিছু শীতল। মনোবৃত্তিগুলি সহসা উত্তেজিত হয় না ; কোনও একটা বিষয়ে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করেন না। কিন্তু যে প্রকারে হউক, একবার তিনি জাগ্রত হইলে, কোনও বিষয়কে সত্য বলিয়া স্থির করিলে, আর কিছুতেই তাহা হইতে স্খলিত হন না। ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সম্বন্ধে তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে আজন্মবিধবা, সংসারের শত প্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন বটে। তাহাতে আবার তরঙ্গিণী লেখাপড়া জানে। স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে যে সমস্ত তর্ক উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, স্ত্রীলোক লিপিলিখনক্ষমা হইলে সমাজে অপবিত্র প্রণয়ের প্রসার বৃদ্ধি হইবে। হৃদয়নাথ স্বচক্ষে ইহার প্রমাণ দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিদ্বেষ তাঁহার মনকে তরঙ্গিণীর বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষাক্ত করিতে লাগিল। ভাবিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ইহা বলা উচিত কিনা। না বলিলেও ত প্রতিকারের কোনও সম্ভাবনা নাই। এখানে তরঙ্গিণীকে রাখা আর কোনও মতে চলিতে পারে না। আজিও জানাজানি হয় নাই ; কিন্তু ব্যাপার যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহার ত আর অধিক বিলম্বও নাই। তখন যে সমাজে মুখ দেখান দুষ্কর হইবে। পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দেওয়াও কঠিন হইবে। উহাকে স্থানান্তরে পাঠাইলেই বা ফল কি? যেখানে যাইবে, সেখানেই মরিবে।

যখন রাত্রি আটটা বাজিল, তখন বড় গৃহিণী ও তাঁহার জননী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বধূগতপ্রাণা। তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ উপরে গেলেন। গিয়া দেখেন তখনও মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। ঝি ও ছোটগিন্নি তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

এমন ত কখনও হয় না, এতক্ষণ ত মূর্চ্ছা কখনও থাকে না। এ কি সর্ব্বনাশ হইল ?

কখন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, সমস্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী বলিলেন, 'ভারি অন্যায় হয়েছে।' ছোটগিন্নীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, অতক্ষণ ধরিয়া একা ঝির হাতে রোগীকে সমর্পণ করিয়া যাওয়া ভাল হয় নাই।

ঝি বলিল, "বাছা, আমার গায়ে কি ক্ষ্যামতা আছে? আমি কি একলা

ওনারে ধরে রাখতে পারি ? হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে খাট থেকে দুম্ করে প'ড়ে গেলেন, সেই অবধি মুখে একটু একটু রক্ত উঠছে।"

ক্রমে কর্ত্তা বাড়ী আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "হৃদয় তুমি এতক্ষণ কি করছ ?—যাও যাও, কিছু বিহিত কর। ক্রমেই যে কেস খারাপ হয়ে যাচ্চে।"

হৃদয়নাথ অনিচ্ছুকের মত রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষার পর বলিলেন, পড়িয়া গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডস্থ রক্তকোষে আঘাত লাগিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তরঙ্গিণীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

॥ ৩ ॥

প্রিয়তমার স্বামীর নাম অনঙ্গমোহন। গ্রীষ্মাবকাশে কলেজ বন্ধ হওয়ায় সে কল্য প্রভাতে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। তরঙ্গিণীর সহিত প্রিযতমার সখিত্ব সংবাদ সে পত্রেই পাইয়াছিল। মিলনের প্রথম রাত্রে তাহারা পরস্পরকে লইয়া বিভোর, তরঙ্গিণীর কথা কহিবার অবসর পায় নাই। পরদিন রাত্রি দশটার সময় প্রিয়তমা স্বামীর নিকট আসিল। প্রথম কথাবার্ত্তার পরই অনঙ্গ বলিল, "তোমার তরঙ্গিণীর চিঠিপত্র দেখাও না।"

প্রিয়তমা বলিল, "সে কি দেখাতে পারি ? সে যে বারণ ক'রে দিয়েছে কারুকে দেখাতে।"

অনঙ্গ বলিল, "আমি বুঝি কারুর মধ্যে গণ্য হলাম ! আমাকে দেখাতে হবে।"

প্রিয় বলিল, "তবে তরীকে জিজ্ঞাসা করি আগে।"

"সে যদি হুকুম না দেয় ?"

"না দেয় ত কেমন করে দেখাব ?"

অনঙ্গ রাগ করিল। বলিল, "না দেখাও না দেখাবে। আমি তোমার পর, সেই তোমার আপনার।"

প্রিয়তমা এ কথায় প্রতিবাদ না করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

পরদিন গিয়া সে তরঙ্গিণীকে সব কথা বলিল। তরঙ্গিণী বলিল, "না ভাই না ভাই, লক্ষ্মীটি আমার, তোর পায়ে পড়ি, চিঠি তাঁকে দেখাসনে।"

সে রাত্রে অনঙ্গমোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম পেলে ?"

প্রিয় বলিল, "না, সে ত কিছুতেই রাজি হয় না।"

ইহাতে তাহার স্বামী ভারি অভিমান করিল। আজকালকার দিনে লিখিতে লজ্জা হয়—আমাদের স্ত্রীবৎসল যুবা নায়কটি বালকের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

প্রিয়তমা তখন বাক্স হইতে চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "ওগো দেখ গো দেখ। অত দুঃখুতে কায নেই।"

অনঙ্গ চিঠির বাণ্ডিল দূরে ফেলিয়া দিল। বলিল, "যাও আমি দেখতে চাইনে।"

এই অপমানে প্রিয়তমা মর্ম্মাহতা হইল। মেঝের উপর বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহাকে তদবস্থ থাকিতে দেখিয়া অনঙ্গের রাগ ভাঙ্গিল। স্ত্রীর কাছে গিয়া বলিল, "ওগো কাঁদতে হবে না।"

ইহাতে প্রিয়তমা আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গ তখন নানাপ্রকারে স্ত্রীকে আদর করিয়া সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। চিঠির বাণ্ডিলটি কুড়াইয়া আনিয়া, প্রথম চিঠিখানির প্রতি চক্ষু রাখিয়া বলিল, "তরঙ্গিণীর ত হাতের লেখাটি বেশ, না?"

"খাসা লেখা, ঠিক পুরুষ মানুষের মত!"

"আচ্ছা তুমি দু' চারখানি ভাল ভাল চিঠি বেছে দাও, আমি পড়ি।"

প্রিয়তমা একখানি নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "এইখানা পড়।"

অনঙ্গ যতক্ষণ সেখানি পড়িতে লাগিল, প্রিয়তমা ততক্ষণ আরও খান কয়েক চিঠি বাছিয়া বাছিয়া স্বামীর হাতে দিল। অনঙ্গ সবগুলি একে একে পড়িয়া মুখখানি বিমর্ষ করিয়া রহিল।

প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

অনঙ্গ বলিল, "দেখ, তুমি আর তোমার সখীর সঙ্গে ভাব রাখতে পাবে না।"

"কেন?"

"না। এ যে রকম চিঠি, তাতে যদি আমি সব না জানতাম, ত মনে করতাম প্রণয়ের চিঠি।"

"কেন সখীতে সখীতে প্রণয় কি দোষের?"

"দোষের কিনা সে বিচারে কায নেই। আমি ছাড়া আর কাউকে তুমি

ভালবাসতে পাবে না। কোনও সখীকে এতদূর ভালবাসলে আমার প্রাপ্য ভালবাসায় কম প'ড়ে যাবে।"

প্রিয়তমা হাসিয়া বলিল, "তুমি পাগল নাকি ?"

"হাসির কথা নয়, আমার প্রাণটা কেমন করছে এ সব চিঠি পড়ে। সখীতে সখীতে এ রকম চিঠি লেখালেখি করে কস্মিনকালে আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

"সে যে নিত্যি আমায় চিঠি লেখে, তাকে জবাব না দিলে সে আবার রাগ করবে।"

"তা করে করবে।"

"তার আবার যে অভিমান! কথায় কথায় অভিমান করে। কাল আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল; অবসর পাইনি ব'লে তার জবাব দিতে পারিনি; রোজ সন্ধ্যেবেলা ছাদে উঠি, দু'জনে দেখা হয়। কাল সন্ধ্যেবেলা আর সে ছাদে পর্য্যন্ত উঠল না। সকালবেলা আজ কাউকে না বলে কয়ে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে কথাই কইলে না, এত রাগ। আমি বললাম, 'ভাই কেন রাগ করিস—জানিস ত, অবসর পাইনে।' বললে, 'জানি গো জানি তোমার স্বামী এসেছেন। তাই তুমি অবসর পাও না। আমরা বিধবা মানুষ, আমাদের সদাই অবসর।'—কথাটা শুনতে আমার এমন খারাপ লাগল; আমি চলে এলাম। আমিও আজ ছাদে যাইনি, প্রতিশোধ নিচ্চি। কেন আমি কি রাগ করতে জানিনে ?"

ভোর রাত্রে এই দম্পতী সবেমাত্র জাগিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিযাছিল। প্রিয়তমার মা দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাকিলেন—"পিরি!"

প্রিয়তমা উঠিয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

মা বলিলেন, "শোন্ একটা কথা বলি।"

মার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গিতে প্রিয়তমা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা? কি হয়েছে ?"

মা তাহাকে বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "তরীর বড় ব্যামো। তাদের ঝি তোকে ডাকতে এসেছে।"

প্রিয়তমা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কি ব্যামো মা? কই ঝি ?"

"ওঘরে বসে রয়েছে। আয়, তোকে নিয়ে যেতে চাচ্চে।"

মাতা কন্যাতে একটি ঘরে প্রবেশ করিল। তরঙ্গিণীদের ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। প্রিয়তমাকে দেখিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদিমণি, মেঝবউ বুঝি আর বাঁচে না। তোমাকে দেখতে চাইচে। যখনি জ্ঞান হচ্চে, তখনি শুধু তোমার নাম করে ডাকচে। চল শীগগির।"

এ সংবাদ শ্রবণে প্রিয়তমার হস্ত পদ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জননীর অনুমতি লইয়া ঝির সহিত সে তরঙ্গিণীর কাছে চলিল।

যখন তরঙ্গিণীর বাটীর খিড়কী দরজায় পৌঁছিল, তখন ক্রন্দনের রোল তাহাদের কর্ণে গেল।

ঝি বলিল—"যাঃ সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো! হায় হায় হায়।"

প্রিয়তমা সেখান হইতেই ফিরিল। ঝির কাঁধে ভর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

॥ ৪ ॥

এক মাস পরে হৃদয়নাথ বাটীর সকলকে লইয়া মীরাট যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে রহিলেন কেবল তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তাঁহার শাশুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, মীরাটে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সূর্য্যদেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দিন অগ্নিবর্ষণ করেন। সহরের রাজপথে লোকচলাচল দশটা বাজিলেই কমিতে আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ; রাজপথ লোকশূন্য, নীরব শ্মশানের ন্যায় মনে হয়। অফিস আদালত ইত্যাদি সমস্তই প্রভাতে। সেই আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে মানুষ বাহির হয়।

একটি অন্ধকারপ্রায় ঘরে, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, হৃদয়নাথ শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই শীতল, তাই মধ্যাহ্নকালে পরিবারস্থ সকলেই এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে। দুয়ার ও জানালা খসখসের পরদা দিয়া রুদ্ধ। ঘরের ভিতরেই বসিয়া এক ছোঁড়া চাকর পাখা টানিতেছিল। দূরে ছোটবধূ ছেলেপিলেকে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছিলেন। বড়বধূ ধোয়া শাণের মেঝেতে একটি বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়া দেবরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। ক্রমে তরঙ্গিণীর কথা উঠিল। বড়বধূ দুঃখ করিয়া বলিলেন, "আহা বাছা যে এমন ক'রে দাগা দিয়ে যাবে তা আমি কখনও ভাবিনি।"

হৃদয়নাথ বলিলেন, "বড়বউ, তার জন্যে আর দুঃখ ক'রে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলেও সুখ হত না।"

বড়বধূ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন এ কথা বলছ ঠাকুরপো?"

"অনেক দিন থেকে একটা কথা বলব মনে করি, কিন্তু বলতে পারিনে বড়বউ। তিনি গিয়েচেন, সে ভালই হয়েচে।"

বড়বধূ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা ঠাকুরপো? কি হয়েছিল?"

হৃদয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আর কি বলব মাথামুণ্ডু। তাঁর স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া বড়বধূ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, "ও কি কথা ঠাকুরপো? অমন বোলো না। তিনি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন।"

হৃদয়নাথ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "বড়বউ—আমি স্বচক্ষে তাঁর হাতের চিঠি দেখেছি।"

"কি চিঠি?"

"সে আর কি বলব?"

"কাকে লেখা?"

"কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তা ঈশ্বরই জানেন।"

বড়বধূ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, ভুল করেছ। তা হতেই পারে না।"

হৃদয়নাথ পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "চিঠি যে আমার কাছে রয়েছে বড়বউ।"

"কই দেখি।"

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। বড়বধূ তাঁহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া জানালার কাছে গেলেন। খসখসের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া আলোকে চিঠিখানি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র দেখিলেন। তাহার পর শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া, চিঠিখানি হৃদয়নাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "তবু ভাল। দেহে প্রাণ এল।"

হৃদয়নাথ পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

বড়বউ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও তো তার সখী প্রিয়তমাকে লেখা, সেই ও

বাড়ীর চাটুয্যেদের পিরি, তার সঙ্গে ভারি ভাব ছিল কিনা। রোজ দুজনে চিঠি লেখালেখি করত। আহা পিরি ছুঁড়ি শ্বশুরবাড়ী যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ; কেঁদে আর বাঁচে না।”

হৃদয়নাথের কপাল ঘামিয়া উঠিল। নিশ্বাস জোরে বহিতে লাগিল। বলিলেন, “তবে চিঠির উপরে ‘প্রিয়তম’ লেখা রয়েছে কেন ?”

“ঐ বলেই ত সে ডাকত। পিরি ওকে বলত তরণী, সে পিরিকে বলত প্রিয়তম।”

হৃদয়নাথের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আলোকাভাবে কেহ তাঁহার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন আপনা-আপনি বলিলেন, “হায় রে, এ কথা যদি আগে জানতাম !”

বড়বধূ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আগে জানলে কি হত ঠাকুরপো ? তা হলে তাকে ধরে রাখতে পারতে ? তাই কি তার চিকিৎসায় তেমন মনোযোগ করনি ?”

হৃদয়নাথের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বড়বধূ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “তবে কি চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারতে ?”

হৃদযনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বড়বউ, যার নিয়তি উঠেচে, মানুষের চেষ্টায় কি তাকে বাঁচান যায় ? অদৃষ্টলিখন খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য ?”

বড়বধূর মন এ উত্তরে সন্তোষ মানিল না। তিনি আজিও নির্জ্জনে তরঙ্গিণীকে চিন্তা করিতে করিতে নানা কথা ভাবেন।

বন্য-শিশু

১ ॥

প্রচুর পরিমাণে শীতবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর কুমুদনাথ স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র সমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় যাত্রা করিলেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীকৃত পঞ্জিকায় সে দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভতম বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া অলখনিরঞ্জন মানুষের গণনায় কখন কি উলটপালট করিয়া দিলেন, গ্রহগণের অবস্থানের কোথায় কি বিপর্য্যয় ঘটাইলেন, কেহ জানে না। এই দম্পতীর পক্ষে এমন অশুভক্ষণে যাত্রা জীবনে আর ঘটে নাই।

বৎসরখানেক ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া কুমুদনাথের দেহখানি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি পশ্চিমে গিয়ে শীতঋতুটা যাপন ক'রে আসুন।"

কুমুদবাবুর স্ত্রীর নাম গিরিবালা। সিমলা পাহাড় তাঁহার জন্মস্থান। নয় দশ বৎসর বয়স অবধি তিনি সিমলায় ছিলেন—তাঁহার পিতা ৺কালীকান্ত মিত্র মহাশয় সিমলায় কর্ম্ম করিতেন। গিরিবালা স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "সিমলা চল।"

কুমুদনাথ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! এই শীতে সিমলা?"

"ওগো যত ভয় করছ তত কিছুই নয়। সিমলায় শীত ভারি সুন্দর। বরফ পড়া ত কখনো দেখনি, তাও দেখবে: সে অতি চমৎকার দৃশ্য।"

কুমুদবাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ক্ষতি নেই, সে বরং আরও ভাল। তবে যদি খুব সাবধানে থাকতে পারেন।"

ডাক্তারের উপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনপূর্ব্বক তাঁহারা যাত্রা করিলেন। তিন সপ্তাহকাল মহা আনন্দে সিমলায় কাটিল। সিমলা কালেক্টরী আফিসে কুমুদনাথের একটি সতীর্থ ছিলেন—যদুবাবু। তিনি একটি সুন্দর দ্বিতল বাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমুদনাথ প্রথম প্রথম বেশী চলাফেরা করিতে পারিতেন না। কখনও সোফায় শুইয়া সিমলা গাইডবুক হাতে সিমলার সর্ব্বত্র কল্পনায় পর্য্যটনের সুখ অনুভব করিতেন, কখনও বা বাতায়নের নিকট চৌকি পাতিয়া রাজপথে ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী, এক্কা, টোঙ্গা কিংবা ঝাপানের গতিবিধি

নিরীক্ষণ করিতেন। ভারি আনন্দ বোধ হইত—সবই নূতন। বিশেষতঃ একটা দুধে-আলতা বর্ণের পাহাড়ী মুখ দেখিলে কুমুদনাথের পরিতৃপ্তির সীমা থাকিত না। অদূরে কোনও খদের গায়ে সিঁড়ির মত থাক্ থাক্ কাটা শস্য-ক্ষেত্র, পাহাড়ীদের কুটীর, তাহাদের বেশভূষা, তাহাদের আকার প্রকার—এ সবেরই প্রতি কুমুদবাবু কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আর্কষণ অনুভব করিতেন।

আবার নূতন বিস্ময়। ২০শে ডিসেম্বর ভাল রকম একটা তুষারপাত হইয়া গেল। কুমুদবাবু তাঁহার শিশু পুত্রেরই মত আনন্দে অধীর। গিরিবালা প্রসন্ন হাস্যে স্বামীর আনন্দে আনন্দিত হইলেন।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন। প্রাতে আটটার সময় যদুবাবু আলষ্টার গায়ে দিয়া, বুটের উপর পট্টি বাঁধিয়া, সুদীর্ঘ 'বরফের লাঠি' হাতে করিয়া বালুগঞ্জে কুমুদবাবুর বাসায় আসিয়া দর্শন দিলেন। কুমুদনাথ তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র যদুবাবু হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? গায়ে একটু বল পেলেন?"

"হ্যাঁ, অনেকটা উন্নতি দেখতে পাচ্চি। দু' বেলায় আধসের তিনপোয়া মটন হজম করছি।"

যদুবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মোটে আধসের তিনপোয়া? তাও দুবেলায়?"

কুমুদবাবু হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের এখানে আপনার নেমন্তন্ন রইল।"

যদুবাবু লোকটি বড় ভালমানুষ। একটু ঘুরান কথা হঠাৎ বুঝিতে পারেন না। বালকের মত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—'কি? কি?' বলিয়া দিলে, তখন বালকেরই মত হা হা করিয়া হাসিয়া আকুল হন। নিমন্ত্রণ করায় বলিলেন, "কেন বলুন দেখি? হঠাৎ নেমন্তন্ন করে বসলেন যে?"

কুমুদবাবু বলিলেন, "আধসের তিনপোয়া মাংস খাই শুনে নিরাশ হলেন, আপনি কত খান সেইটে আমি দেখতে চাই।"

যদুবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই সময় ভৃত্য চা আনিল।

হাসি থামিলে যদুবাবু বলিলেন, "আমি একবেলায় একসের দেড়সের অনায়াসে পার করি। এখন আর বেশী পারিনে; পূর্ব্বে যখন নীচে রাবল-পিণ্ডিতে ছিলাম, একবার সখ হয়েছিল ভেড়ার মাথা খাবার। প্রত্যহ একটা

করে এত বড় ভেড়ার মাথা ক্রমাগত চল্লিশ দিন খেলাম। চল্লিশ দিনের পর, চর্ব্বিতে গা ফাটতে লাগল। একজন ডাক্তার ছিল, সে বারণ করলে। বললে গায়ে বেশী চর্ব্বি হলে হৃদ্‌রোগে মারা পড়বে।"

কুমুদনাথ শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। বলিলেন, "কাল আপনার জন্যে একটা ভেড়ার মাথাও প্রস্তুত থাকবে।"

দুইজনে আরাম করিয়া উষ্ণ চা পান করিতে লাগিলেন। যদুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব বেড়াচ্চেন ত?"

"হ্যাঁ—খুব নয়; তবে বেড়াচ্চি বইকি। কাল জ্যাকো প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি।"

"আর একটু সবল হোন, তারপর আমি আপনাকে নিয়ে বেড়াব। এখন আপনি পারবেন না আমার সঙ্গে, হাঁপিয়ে পড়বেন।"

প্রথম পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু দ্বিতীয় পাত্র চা গ্রহণ করিলেন। এতক্ষণ ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, বাহিরে আলো হইয়াছে দেখিয়া ভৃত্য সার্সির উপর হইতে পর্দ্দা সরাইয়া দিল, বাতি নিবাইল।

দ্বিতীয় পাত্র নিঃশেষ করিয়া যদুবাবু বিদায় চাহিলেন।

কুমুদবাবু বলিলেন, "বসুন না, অত তাড়াতাড়ি কি?"

"একটু কায আছে।"

"যোগ টোগ নাকি?"

যদুবাবু যে গোপনে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন, এ কথা সিমলার আবালবৃদ্ধ সকল বাঙ্গালীই অবগত আছে।

সলজ্জ হাসি হাসিয়া যদুবাবু বলিলেন, "সে সব হয়ে টয়ে গেছে।"

"তবে?"

"আজ একটু অন্য কায আছে। সকাল সকাল খেয়ে, একবার তারাদেবী যেতে হবে। মেয়েরা অনেক দিন থেকে ধরেছে।"

"তারাদেবী যাবেন? তা আমায় বলেননি কেন? আমার স্ত্রীও যে এসে অবধি একদিন যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। কতদূর বলুন দেখি?"

"এই, ছ সাত মাইল।"

"রিকৃশ যায়?"

"নীচে অবধি যায়, টিব্বেতে অবিশ্যি কি করে উঠবে?"

"কখন বেরুলে সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা যায়?"

"বারোটার সময় বেরুলেই যথেষ্ট।"

সমস্ত পরামর্শ ঠিক হইল। যদুবাবু বলিলেন—আরও সকালে—১১টার সময়—বাহির হওয়া ভাল। আজ সৌভাগ্যক্রমে আকাশটাও বেশ পরিষ্কার আছে। বিগত তুষারপাতের পর পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে—তুষার গলিয়া শুকাইয়া পথও বোধ হয় পরিষ্কার হইয়া গিয়া থাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন ১১টার সময় তাঁহাদের রিকৃশ এবং ইঁহাদের জন্য তিনখানি খালি রিকৃশ (একখানি খোকার চাকরের জন্য) আসিয়া উপস্থিত হইবে। বলিয়া তিনি বরফের লাঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে মস্ মস্ শব্দে অন্তর্হিত হইলেন।

কুমুদবাবু ভাবিতে লাগিলেন, "বাস্‌রে! একটা যেন অসুর বিশেষ! কি করলে অমন হওয়া যায়?"

কিয়ৎক্ষণ পরে এই কক্ষে গিরিবালা আসিলেন। তিনি কিন্তু তারাদেবী যাইবার প্রস্তাব শুনিয়া ততটা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "আবার সঙ্গী যোটালে কেন? আমরা দু'জনে যেতাম। তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পাব না কিছুই নয়।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "বিদেশে সঙ্গীহীন হয়ে কোথাও যাওয়া কিছু নয়—আর ওঁরা সব জানেন শোনেন; ভাল ক'রে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।"

গিরিবালা মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমিও এখানকার সব জানি, সব শুনি।"

তখন বেলা প্রায় ১০টা। ইঁহারা ক্রমশঃ স্নানাহার শেষ করিলেন। খোকাকে দুধ খাওয়ান হইল। তাহাকে কাজল পরান হইল। সাজসজ্জা হইল।

সাড়ে এগারোটার সময় যদুবাবুরা ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় গিরিবালার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হয় নাই, ভাবী অমঙ্গলের কোন সূচনাই তাঁহাকে চঞ্চল করে নাই। তথাপি কেমন বিষণ্ণ-মনা হইয়া রহিলেন। এখন যখনই এই তারাদেবী যাত্রা ঘটনা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হয়, সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠে।

সিমলার সীমা পার হইয়া কুমুদবাবু রিকৃশ হইতে অবতরণ করিয়া যদুবাবুর সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বধূদের সাধ হইল, তাঁহারাও হাঁটিয়া যাইবেন। নামিলেন; কিছুদূর যাইতে না যাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া, আবার রিকৃশয় উঠিলেন। যদুবাবু সহাস্য মন্তব্য করিলেন, "মেয়েদের

কোন ক্ষমতাই নেই, কেবল সকল কাযেই একটা আঁকুপাকু আছে। এই পাহাড়ের পথে চলা কি ওদের কায!"

গিরিবালা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্যালাপে আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে আর কোনও বিষণ্ণতা নাই।

দুইটার সময় তারাদেবীতে রিকৃশ পৌঁছিল। সে একটা পর্ব্বতচূড়া। স্বীয় পাদমূল হইতে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ। রিকৃশ ছাড়িয়া ইঁহারা চূড়ারোহণ আরম্ভ করিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে পাথরে সিন্দুর মাখান তারাদেবী বিগ্রহ। দেখিলে ভীতির সঞ্চার হয়। মেয়েরা পূজা আদি করিলেন। পুরুষ দুইজন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া স্বভাবের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে গভীর খদ, অন্যদিকে সমুচ্চ অরণ্য। অত্যন্ত নির্জ্জন, ভাবুক-জনপ্রিয় স্থান। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে অতি-ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

মন্দিরের পূজারী বাবাজী ইঁহাদের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। বাবাজীর বাড়ী জিলা হোসিয়ারপুর। কিরূপ আয় হয? সে অতি সামান্য। পাহাড়ীয়াগণ প্রায়ই পয়সাকড়ি দেয় না, কেহ বা গোধুম, কেহ বা আলু, কেহ বা মধু দিয়া যায়। বড়লোক, দলপতি, রাজা মহারাজ আসিলে একদমে অনেক লাভ হইয়া যায়। জলের বড় কষ্ট। নীচে বাউলিতে ঝরণার জল সঞ্চিত থাকে, সেইখান হইতে কলসী ভরিয়া লইয়া আসিতে হয়। এই সময়, অদূরে চিড়বৃক্ষের তলে, শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল। একটা পাহাড়িয়া শিশু রৌদ্রে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, সে উঠিয়া বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরোহিত বলিল, "বাবুজি, আজ দুইদিন উহাকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি।"

বন্ধুদ্বয় ধীরে ধীরে শিশুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার গায়ে কিসের চামড়ার একটা জামা। মাথায় স-লোম চামড়ায় একটা অদ্ভুত টুপী। গলায় কতকগুলি নানাকৃতি হাড়গাঁথা মালা। বৎসর দুই বয়স হইবে। বাবাজী বলিল, দুইদিন হইল ছেলেটিকে সে কুড়াইয়া পাইয়াছে। কোনও পাহাড়িয়া রমণী ইহাকে হারাইয়া গিয়াছে, আজিও খুঁজিতে আসিল না। কেই বা ইহাকে খাওয়ায়, কেই বা কি করে!

কুমুদনাথ যতুবাবুকে বলিলেন, "চলুন একে আমরা নিয়ে যাই।"

"পাগল হয়েছেন ? কি করবেন একে নিয়ে ?"

"মানুষ করব।"

"যদি এর মা এখানে খুঁজতে আসে ?"

"বাবজীকে ঠিকানা দিয়ে যাব ; মার ছেলে মাকে ফিরিয়ে দেবো।" —বলিয়া কুমুদনাথ স্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। তাঁহাকে বলিতে প্রথমে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। কুমুদনাথ অসহায় শিশুটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "দেখ, এরা অসভ্যজাতি, এদের কি ছেলে হারালে কোনও দুঃখ আছে ? তা'হলে মা আসত, নিয়ে যেত। এখানে থাকলে ছেলেটি দু' দিনে মারা পড়বে।"

এ কথায় গিরিবালার মাতৃহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি শিশুটিকে লইতে সম্মত হইলেন। বোতলে খোকার জন্য দুগ্ধ ছিল, তাহার কিয়দংশ তাহাকে পান করান হইল।

নামিবার সময় উপস্থিত। ৪টা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই। ৫টার সময় সূর্য্যাস্ত হইবে। খোকা স্বীয় পিতৃক্রোড় দখল করিল—তাহার চাকরের কোলে বন্য-শিশুকে দেওয়া হইল। রাত্রি ৭টার সময় ইঁহারা দলবলে সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন গিরিবালা বন্য-শিশুকে উষ্ণজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, গলার মালা খুলিয়া, ফ্ল্যানেলে মুড়িয়া, কাজল পরাইয়া, মানুষের মত করিয়া তুলিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন, ইহার নাম রহিল 'বুনো'।

খোকা এইবার তাহার সহিত ভাব করিল। এতক্ষণ তাহার কিম্ভূত-কিমাকার বেশ দেখিয়া ভয়ে তাহার কাছে ঘেঁসে নাই।

সন্ধ্যাবেলায় যতুবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বৃথা আস্ফালন করা তাঁহার অভ্যাস নহে। আহারান্তে বলিলেন, "কোত্থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে আনলেন, একদিন এর ফলভোগ করতে হবে।"

কুমুদনাথ হাসিলেন ; বলিলেন, "মশায়, এ ত আর বাঘের শিশু নয় যে বড় হয়েও জাতিধর্ম্ম ভুলবে না, একদিন ঘাড় শুষে রক্ত খাবে !"

যদুবাবুর কোনও উত্তর যোগাইল না। একটু থমকিয়া গিয়া, এক মিনিট পরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তা ঠিক, তা ঠিক। তা, দেখুন মানুষ করে, এ বুনো যদি পোষ মানে।"

বন্য-শিশু সারাদিন বেশ খেলা-ধুলা করিল ; কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, তাহার গা ভারি গরম হইয়াছে—জ্বর হইয়াছে।

সারাদিন ছেলেটা জ্বরঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। বৈকালে কুমুদনাথ ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া ফুস্‌ফুসে বিকৃতি ঘটিয়াছে। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হইল। রীতিমত চিকিৎসায় দুইদিন কাটিল। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাঁচিল না।

২৯শে ডিসেম্বর রাত্রি দুইটার সময় গিরিবালার কোলে তাহার মৃত্যু হইল।

গিরিবালা অনেক কাঁদিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আহা কার বাছা ? আমরা যদি না আনি ত ভালই করি। কেন এ কুবুদ্ধি হল ? মিছামিছি নিমিত্তের ভাগী হতে হল। এখন যদি তার মা আসে তবে কি হবে, কি জবাব দেবো ?"

সঙ্গীহারা হইয়া খোকা একটু বিমনা হইল। থাকে থাকে আর জিজ্ঞাসা করে, "বুনো কোথায় গেল ?"

সারাটা দিন এই দম্পতীর মনের অসুখে কাটিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা ; আহারাদির পর কুমুদবাবু শয়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় নিম্নে ডাকপিয়নের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ভৃত্যকে পত্র দিয়া সে ফিরিয়া গেল, তাহার পদশব্দও পাওয়া গেল। কুমুদনাথ প্রতিমুহূর্ত্তে পত্রহস্তে ভৃত্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সে আর আসে না। নাম করিয়া ডাকিবার জন্য জানালা খুলিলেন। অত্যন্ত শীতল বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কুমুদনাথ লণ্ঠন লইয়া নিম্নে অবতরণ করিয়া গেলেন। দেখিলেন, চাকর বিশুয়া একটি সুন্দরী যুবতী পাহাড়িয়া স্ত্রীলোককে ধরিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটা অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কুমুদনাথকে দেখিবামাত্র সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে কুকৃরী ছুরি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া

কুমুদনাথ পিছু সরিয়া আসিলেন, বিশুয়াও তাহাকে ত্যাগ করিল। তখন সে উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

বিশুয়া মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বাবু—চোর।"

কুমুদবাবু তাহার বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন, "ধরলি ধরলি, হাতছুটো যদি ধরতিস, তবে ছুরি বার করতে পারত না।"

বিশুয়া বলিল—উহাদের গায়ে ভারি জোর; জাপটাইয়া না ধরিলে রাখা যাইত না।

যাহা হউক, কুমুদনাথ বিবেচনা করিলেন, চোর চুরি করতে পারে নাই, পলাইয়াছে মাত্র, ইহাই ভাল। ধরিলে পুলিশে দিতে হইত এবং তাহা লইয়া অনেক হাঙ্গামা পোহাইতে হইত। ফিরিয়া, উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গিরিবালা সব শুনিয়া বলিলেন—"চোর নয়, তোমার চাকরের সখী। ধরা পড়বার ভয়ে উপস্থিত বুদ্ধির ব্যবহার করেছে।"

"তবে ছুরি কেন?"

"জান না বুঝি? ও পাহাড়ী মেয়েদের দস্তুর। সঙ্গে সর্ব্বদা ছুরি থাকে।"

পরদিন প্রভাতে কুমুদবাবু চাকরটাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই ঐ রমণীকে স্বীয় প্রণয়িনী বলিয়া স্বীকার করিল না।

॥ ৩ ॥

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। খোকাকে ঠেলাগাড়ীতে বসাইয়া তাহার চাকর তাহাকে বেড়াইতে লইয়া গেল। তখন বেলা দুইটা। গিরিবালা চাকরকে বারংবার করিয়া বলিয়া দিলেন, যেন এক ঘণ্টার বেশী বিলম্ব না হয়।

তিনটা বাজিল তবু খোকা ফিরিল না। সাড়ে তিনটার সময় স্বামী স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। খোকার অন্বেষণে চাকর পাঠাইবার পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় পুলিশ আফিস হইতে পত্র আসিল; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে দারোগা কুমুদবাবুকে এখনি থানায় আহ্বান করিতেছেন।

একে ছেলে ফিরিল না, তাহার উপর পুলিশ হইতে এই পত্র; একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে দুই জনেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কুমুদবাবু তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। গিরিবালা শূন্যগৃহে শরবিদ্ধ হরিণীর মত ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর, গিরিবালা ভৃত্য বিশুয়াকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন বাবুর যদি আসিবার বিলম্ব থাকে, তুই যত শীঘ্র পারিস সংবাদ আনিবি কি হইয়াছে।

কুমুদবাবু থানায় গিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত জনতা। বারান্দায় ঠেলাগাড়ীতে খোকা ক্রন্দন করিতেছে ; একজন কনষ্টেবল প্রহরায় নিযুক্ত। কুমুদবাবু গিয়া খোকাকে কোলে করিলেন। তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা তখন আশ্বস্ত হইয়া চুপ করিল।

দারোগা সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, আর একটু হইলে আজ আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। একটা লেপচা স্ত্রীলোক এই শিশুকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আপনার ভৃত্য বাধা দিতে, তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

"চাকর কোথা ?"

"তাহাকে রিপন হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছি।"

"বাঁচিবে ত ?"

"শঙ্কা নাই, বাঁচিবে। ছেলেও খুন করিত, কিন্তু খোদাবক্স সিপাহী গিয়া তাহাকে ধৃত করে।"

কুমুদবাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, কল্য রাত্রির সেই পাহাড়িয়া রমণী নহে ত ? দারোগাকে বলিলেন, "বন্দিনী কোথায় ?"

দারোগা কুমুদবাবুকে গারদ ঘরে লইয়া গেল। কুমুদনাথ দেখিলেন, সেই বটে, সেই পাহাড়িয়া সুন্দরী। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার মনের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। সে কেন তাঁহার প্রতি এমন শত্রুতাপন্ন ?

দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন আমার ছেলেকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিছু জানেন ? কিছু স্বীকার করিয়াছে ?"

দারোগা বলিল, "ও বলে, তারাদেবী পাহাড়ে ওর ছেলে হারাইয়া গিয়াছিল, আপনি আনিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ও প্রতিশোধ লইতে চাহে।"

কুমুদবাবু বলিলেন, "আমি মারিয়া ফেলিয়াছি !—আমি—"

দারোগা বলিল, "সে আমি আপনার ভৃত্যের এজেহারে সমস্ত জানিতে

পারিয়াছি। দেখুন বাবু, ইহারা অসভ্য জাতি, ইহারা কি বুঝিবে যে আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া, উহার শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্যই লইয়া আসিয়াছিলেন? উহাদের বিশ্বাস, আপনি মারিয়া ফেলিবার জন্যই আনিয়াছিলেন এবং মারিয়াই ফেলিয়াছেন।"

কুমুদনাথ পূর্ব্বেই বিশুয়ার কোলে খোকাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার নিজ এজেহার দিয়া, একটা কুলি ডাকিয়া খোকার ঠেলাগাড়ী সহ বাড়ী ফিরিলেন।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার বাছার পুনর্জ্জন্ম হল আজ। কি কুক্ষণেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। চল, ফিরে চল দেশে, এখানে আর একদণ্ডও আমার থাকতে ইচ্ছে নেই।"

পরদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টিপাতের পর তুষারপাত আরম্ভ হইল। খোকার যে আমোদ! জানালা দিয়ে হাত বাহির করিয়া তুষার স্পর্শ করিতে চায়।

ভারি অন্ধকার। চারিটা বাজিতে না বাজিতে ঘরে আলো জ্বালিতে হইল। কুমুদবাবু বলিলেন আজ সকাল সকাল আহার করিয়া লওয়া যাউক।

খোকা সারাদিন খেলা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছয়টার সময় কুমুদনাথ আহারে বসিলেন। গিরিবালা তাঁহার কাছে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

আহার শেষ হইলে কুমুদনাথ ঘেরা বারান্দায় বাহির হইলেন। দেখিলেন একটা স্ত্রীলোক বিদ্যুতের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া দ্রুত ছুটিয়া গেল। সে আর কেহ নয়; সেই সর্ব্বনাশী লেপচা-রমণী; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রক্ষীকে হত্যা করিয়া গারদ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশতঃ কুমুদনাথ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন; নিম্নে অবতরণ করিবামাত্র দেখিলেন, বিশুয়া চাকরের গলদেশ ছিন্ন, রক্তে ঘর প্লাবিত। দেখিয়া কুমুদনাথের গা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বুদ্ধি লোপ হইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গিরিবালা মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে; সেই রাক্ষসী খোকাকেও হত্যা করিয়া গিয়াছে!

বাহিরে শীত-রজনী অবিরাম তুষার বর্ষণ করিতে লাগিল।

কাশীবাসিনী

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর সহর পাঁচ মাইল দূরে, ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে, ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ী। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মত। তাহার পরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);—উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া ৩৷৹ টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া, সম্প্রতি বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—অর্থাৎ বিবাহ করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড় সড়;—বড় সড় দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রঙটি তত ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামীঘর করিতে আসিয়াছে। শ্বাশুড়ী নাই—ননদ নাই—দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই ভজুয়ার মা। দিনরাত্রি বাড়ীতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে—এইজন্য বেতন ১৲ টাকা বেশী। খগোলে অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙ্গালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্ম্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এবং বোধ হয় বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভালমানুষ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণ বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যথাস্থানে চট বিছাইয়া,

কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্ব্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—'আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল!'

এমন সময় বাহিরে একটা পুরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ—একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিল, একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ, হাতে একটা পুঁটুলি—দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া, দাইকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—'আগে ভজুয়াকে মা—ঈ' বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিল। দাই তখন উঠিল—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিল, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা ত ছিল না; প্রণাম করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ।"

"তুমি তাঁর বউ?"

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া, মাথা হেলাইয়া জানাইল যে তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যে চিনতে পারলাম না—কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিল তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ী। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ী খুঁজে এলাম।"

মালতী বলিল, "তা বেশ করেছেন। হাত পা ধুয়ে ফেলুন।"

দাই জল দিল। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণ একটি শতরঞ্চ আনিয়া বারান্দায় বিছাইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন গাড়ীতে উঠেছিলেন? খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ হয়?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কই আর হয়েছে !"

মালতী দাইকে বলিল, "শীঘ্র করে উনানটা জেলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।"

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "না মা, আলোচাল কিনতে দিতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা ?"

"আমার নাম মালতী।"

"বাপের বাড়ী ?"

"উত্তরপাড়া।"

"তোমার মা, বাপ সবাই আছেন ?"

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিল, "বাবা ত মারা গেছেন আমি যখন আঁতুড়ে—মা মারা গেছেন যখন আমি এক বছরের।"—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিল, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইল। সেইখানেই বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে ?"

"এই বোশেখ মাসে।"

"তবে ত অল্প দিনই হল। এখানে এসেছ কি মাসে ?"

"এই দু'মাস।"

"তোমার স্বামী কখন আপ্পিসে যান ?"

স্বামীর প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইল। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্চ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "ন'টার সময়।"

"কখন আসেন ?"

"কোনও দিন ছ'টার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।"

"কত মাইনে পান ?"

"ত্রিশ টাকা।"

"তা ছাড়া উপরি আছে ?"

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি জানি।"

কাশীবাসিনী একটু খুসী হইলেন।

॥ ২ ॥

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ভারি সকাল সকাল যে?"

গিরীন্দ্র একটু হাসিল। বলিল, "তুমি একলাটি থাক, তাই এলাম আজ সকাল সকাল।"

মালতী বলিল, "আজ আমি ত একলা নই। আজ বাড়ীতে কে এসেছে বল দেখি?"

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে?"

"একটি বিধবা; তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।"

"কাশী থেকে? সঙ্গে কেউ ছিল না? কত বয়স?"

"সঙ্গে কেউ ছিল না, বয়স ত্রিশ চল্লিশ।"

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ত্রিশ আর চল্লিশে কত তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।"

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "এত লোক থাকতে আমাদের বাড়ীই কেন এল?"

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন তাহা ত সে একবারও ভাবে নাই, সে ত খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল।

গিরীন্দ্র ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কাশী থেকে—একলা মেয়েমানুষ—কি রকম বিধবা তাই ভাবছি!"

মালতী বুঝিল। বলিল, "না না—যা ভাবছ তা নয়। ভাল লোক।"

গিরীন্দ্র বলিল, "ভারি ত জান! যেমন তোমার বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে?"

"তা ত কিছু বলেননি।"

"রাত একটার সময় আবার গাড়ী।"

"অত রাতে কি ক'রে একলা ষ্টেশনে যাবেন? কে পৌঁছে দেবে?"

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পৌঁছে দেবো। এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভাল। আমি যাব—সঙ্গে করে পৌঁছে দেবো।"

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিল। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিল।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিযা আছে। গিরীন্দ্র বলিল, "ব্যাপারখানা কি ?"

মালতী বলিল, "বাড়ীতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি করে ? উনি নিজে থেকে বলেননি, কি ক'রে বলবে যে তুমি যাও রাত একটার গাড়ীতে ?"

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওগো সে জন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি ? সে ভার আমার।"

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, একটা সোডা ভাঙ্গিয়া কয়েকবার পান করিল।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিল। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনার আসাতে বড়ই আনন্দিত হলাম।"—বলিয়া প্রণাম করিল। 'দিল্' তখন তার 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস ?"

"আপাততঃ কাশীবাস করছি বাবা।"

"কোথা যাওয়া হচ্ছিল ?"

"একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—"

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়ীতে যাবেন এখন।"

"আজ রাত একটার গাড়ীতে—"

"পাগল! অত শীতে, বুড়োমানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন ত নেই ?"

"তা নেই যদিচ।"

অতঃপর গিরীন্দ্র শাল গায়ে দিয়া ছড়ি লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইল।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিল। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকাডাকিতে সেই উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিল।

মালতী বলিল, "এত রাত!"

"একটা ভাল খবর আছে।"

"কি?"

"বদলি হল তাড়িঘাটে।"

"মাইনে বেড়েছে?"

"পাঁচ টাকা।"

"মোটে!"

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌঁছিল। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা দিক না দিক, সেখানে দু' পয়সা আছে।"

"কবে যেতে হবে?"

"তিন চার দিন পরে।"

গিরীন্দ্র বলিল বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিল, স্বামী নিদ্রিত।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিল। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিল। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগী কাল যায়নি?"

মালতী বলিল, "বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওঁকে যেতে! উনি ত একটার গাড়ীতে যেতে চেয়েছিলেন।"

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া রহিল। বলিল, "আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাপ বিদেয় ক'রে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেক, কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।"

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিল, "আসুন আমরা স্নান করে ফেলি।"

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইল। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপ-জলেই 'ইদং গঙ্গোদকং' বলিয়া সারিতে হইল।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিযা কিয়ৎক্ষণ চুল শুকান এবং বিশ্রাম করা হইলে, মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভাল করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিযা, অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিল। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "মা, একদিনেই তোমার উপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্চে।"

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিল। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইযা তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতে-ছিল। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহারও বড় কষ্ট হইতে লাগিল।

মালতী বলিল, "আজ নেই বা গেলেন! দু'দিন থাকুন না। এ দু'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি?"

মালতী মুখে বলিল, "ভাববেন আবার কি?"—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সত্যই ত, স্বামী যে ইঁহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী পাছে বেশী রাগ করেন?

তাহার পর ভাবিল—তা করেন, করিবেন। এমন কিছু গর্হিত কার্য্য

করা হইতেছে না। আমি এই একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না?—স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে, সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিল।

দুইটা বাজিল, কুলি আসিল না। তিনটা বাজিযা গেল, তথাপি কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—তখন আবার মনের সুখে কাশী-বাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিল।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিল, কাশীবাসিনী বলিলেন, "ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জান না?"

মালতী বলিল, "কে অত হাঙ্গামা করে বাপু!"

"হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্চি।"—বলিয়া তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিল, "ও কি কথা! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।" দাইকে বলিল, "টাকা ফিরিয়ে দে দাই।"

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল—তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমায় কত যত্ন আদর করছ।"

মালতী বলিল, "ভারি আদর ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কিনা! আদর যত্ন করতে জানি কিনা! নিন টাকাটা রাখুন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, তা হলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়ীতে চ'লে যাব।"

তখন মালতী ক্ষান্ত হইল। বলিল, "কর বাছা তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হল ব'লে রাখছি।"

দাই টাকা লইয়া বাজারে গেল।

॥ ৩ ॥

আজ গিরীন্দ্র বাড়ী আসিল অনেক বিলম্বে: রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে বলিল, "আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাযের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিল না। দু' দিন যখন কষ্ট পেলেন, আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো।"

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইল। বলিল, "তোমার গতিক ভাল নয়। ঝাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশী পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।"

গিরীন্দ্র বলিল, "আরে রামঃ, সে ছোট ষ্টেশন, অজ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেলনার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গাস্নান ক'রে, সব ছেড়ে দেব—ব্যাস একদম।"

"তুমি কাল আপিসে যাবে না?"

"না, আমার এখানকার সব কায শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড় যন্ত্র ক'রে রাখতে হবে।"

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর জলখাবার খাব না, কোথাও বেরুব না;—রুটি দাও একেবারে খাই।"

মালতী লুচি মোহনভোগ মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিল। গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বলিল, "দেখ, উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা কর দিকিন।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কিছু কিছু।"

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দুই এক দিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকেন না? তা হলে পরশু ভোজ পর্য্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা কর না।"

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি?"

মালতী বলিল, "আহা মরে যাই! আজ বাড়ী এসেই ওঁর সঙ্গে কথা

কইলে না?"—বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিল। তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ্দ করিল। কাশী-বাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্ত্তনাদি প্রস্তাব করিলেন, তাহা গিরীন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। আড়ালে মালতীকে বলিল, "দেখ ইনি একজন খলিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।"

মালতী রাগ করিয়া বলিল, "কি বল যাও! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।"

দুই ক্রোশ দূরে শুবগাঁও নামক পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগবলি পাঠান হইল।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্ব্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া গেল। রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিল। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিত, তবে সময়রে ধন্য ধন্য করিতে পারিত।

॥ ৪ ॥

আজ রবিবার। আজ রাত্রের গাড়ীতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে। কাশীবাসিনী বলিলেন, "আমি আর দেশে যাব না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।"

মালতী বলিল, "বেশ ত, আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার পাঁচটা ষ্টেশন বইত নয়।"

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিল, "গোটা ত্রিশ টাকা বের ক'রে দাও—বাজার দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।"

মালতী বলিল, "অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে নাকি?"

"কেন, সে দিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।"

"পরশু বাজারে যাবার সময় ত্রিশ নিয়ে গেলে, বাকী যা ছিল কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে সে সবই ত প্রায় দিলাম তিন চার বারে। আর টাকা কোথায়?"—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিল, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিল, "এখন উপায়? আমার কাছে ত কিছু নেই!"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, "আমি কি করব? মদেই তোমার সর্ব্বনাশ করলে। সে সময় ত জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল দাও টাকা দাও টাকা বল।"

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "দেখি কারু কাছ থেকে ধার নিই গে।"

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওকে বারণ কর মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার ত এখন দেশে যাওয়া হল না।"

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিল। গিরীন্দ্র বলিল, "সে কি কাযের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেব, আলাপ নেই পরিচয় নেই।"

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বস; আমি কিছু দিন পরে আবার আসবো এখন তোমাদের কাছে; দেখাশুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাব।"

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "তা হলে আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন আমাদের সঙ্গে। পাঁচ ছ' দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরে দিতে পারব।"

"আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। কত চাই? তিরিশ? যদি বেশী দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বল বাবা।"

গিরীন্দ্র বলিল, "না মা বেশী চাইনে, ত্রিশ দিলেই হবে।"

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেই দিন রাত্রি এগারটার গাড়ীতে গিরীন্দ্রনাথ, স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিল। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিল। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, "বাছা, বাবাকে বল যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরীন্দ্র ইঁহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিল, কিন্তু ফল হইল না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারগরে নামিয়া গেল :—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্ম্মস্থান তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। সরকারী বাসা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিল। জিনিষপত্রগুলা কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ খুলিল। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিত। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিল, নিশ্চয়ই অন্য কোন বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিল, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিষ আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিল, তথাপি পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিল। ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া 'বউ দেখিতে' আসিয়াছিল, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিল।

শেষে গিরীন্দ্র আসিল। সে দেখিয়া বলিল, "এ কি!"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল, "বেশ ক'রে সব খুঁজেছ?"

"কিছু বাকী রাখিনি।"

"শেষ তাকে কখন দেখেছ?"

"কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালুর টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।"

"গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কোন জিনিষপত্তর বের করতে?"

"খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগল, শালটা বের করেছিলাম।"

"সে সময় গহনার বাক্স বের ক'রে ফেলে রাখনি ত?"

মালতী বলিল, "কখখনো না। উপরে শালখানা ছিল—শুধু তয়ে তয়ে শাল তুলে নিয়েছি।"

"চাবি কোথা রেখেছিলে?"

"কোমরে ছিল।"

"তারপর ঘুমিয়েছিলে?"

"তা, ঘুমোলাম বইকি।"

গিরীন্দ্র নিশ্চিত স্বরে বলিল, "তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।"

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিল, "যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, গহনার বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম কি জান?"

"না। বুড়ো মাগীর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কখনও?"

"কাশীতে কোথায় থাকে জান?"

"কি একটা মঠে।"

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিল, "কাশীতে ত দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে—কোন্ মঠে—কোন্‌খানে সে মঠ কিছু শুনেছ?"

"না।"

"সেইকালেই বলেছিলাম, ও সব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা সর্ব্বনেশে লোক—কাশীর ঘাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথা সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেল!"

মালতী বলিল, "তিনি কখখনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমিই বোধ হয় খগোলের বাসায় ফেলে এসেছি।"

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। বলিল, "ও সব কথা রেখে দাও—জান না ত পৃথিবীর গতিক! আচ্ছা সে মাগী কোনও দিন তোমার গহনা দেখতে চেয়েছিল?"

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন! বললেন, মা তোমার কি কি গহনা আছে দেখি।—আমি বের ক'রে সব দেখালাম।"

গিরীন্দ্র বলিল, "তবে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমি চললাম পুলিশে টেলিগ্রাফ করতে।"—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ ৬ ॥

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতী গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বমত হাসে, গল্প করে, আমোদ করে। নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাতেই বোধ হয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

যে দিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনষ্টেবল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিসের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ী আসিল। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্ল্যাটফর্ম্মের নীচেই, দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম্ম, গাড়ী, লোকজন সব দেখা যায়। যতবার গাড়ী আসিত, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিত, প্রতি গাড়ীটি না দেখিলে যেন তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে! গাড়ীর শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে এঁটো মুখে গাড়ী দেখিতে গেল। বদ্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিষ নামাইতেছে; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিল। কম্পিত বক্ষে কাশীবাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কত কি যে তাহার মনে হইল! কত আহ্লাদ হইল, আর কতবার মনে মনে বলিল, হে ঠাকুর, স্বামী যে উঁহাকে গহনা চুরির অপবাদ দিয়াছেন, সে কথা যেন উঁহার কর্ণগোচর না হয় — তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিল। আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌঁছিলেন।

"মা এসেছেন?"—বলিয়া মালতী প্রণাম করিল। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মালতী বলিল, "আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

কাশীবাসিনী বলিলেন, "স্নান করেছি। ভাত চড়াতে হবে না—আজ একাদশী।"

মালতী লক্ষ্য করিল, কাশীবাসিনীর মুখখানি যেন বড় গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যে ছলছল করিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনটা এত ভার ভার কেন?"

তিনি বলিলেন, "জান না?"

মালতী ভয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গহনার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছ, জান না?"

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয়নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?"

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, "তোমার স্বামীর ত বিশ্বাস হয়েছিল

মালতী বলিল, "পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে তা উনি ভাবেন নি। উনি ত আজও বলছিলেন, কাশীতে কত লক্ষ লক্ষ মঠ, কোটি কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায়?"

"বের ত করেছিল আমায়। আমার উপর জুলুমটা কি করেছে কম? দুটিশো টাকা নগদ ঘুস গুণে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি পেয়েছি।"

মালতী বলিল, "আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হল।"

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরীন কখন আসবেন?"

"সন্ধ্যেবেলা।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আজই যাব।"

"আজই যাবেন?"

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভারি ছেলেমানুষ! তোমার স্বামী আমাকে চোর ব'লে সন্দেহ করেন, আর তোমার ইচ্ছে যে আমি থাকি! আমি আড়াইটের গাড়ীতে ফিরব। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হব।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনে ফিরবেন ?"

"কেন ? ফিরলে কি দেখা হবে ?"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "একটি কায করবে ?"

মালতী সাগ্রহে বলিল, "কি ?"

"আমার কতকগুলি গহনা আছে, সেগুলি তুমি পর দিকিন।"—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাতবাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভাল ভাল জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, "এইগুলি সব তুমি নাও।"

সোণা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী, পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত। তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সে আমি পারব না।"

"কেন ?"

"আপনার এই রাশিকৃত গহনা আমি কেন নেব ?"

"আমি দিচ্চি।"

"আপনি দিচ্চেন, কিন্তু আমি কোন অধিকারে নেব ? সে আমি পারব না।"

আকাশে মেঘ বাড়িয়া উঠিল। ঝড় উঠিল। দিবালোক অত্যন্ত কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধিকার যদি থাকে ?"

মালতী বলিল, "অধিকার ? কি অধিকার ?"

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন, "তা বলব, তা বলতেই আজ এসেছি।"

মালতীর বুক গুরুগুরু করিয়া উঠিল। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি সত্যি মরেছে ?"

মালতী থতমত খাইয়া বলিল, "কেন ?"

"তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"সবাই ত বলে।"

"তা হ'লে তুমি জান। আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।"—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্পদিনের ঘটনা সে ভাবিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিল, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিত, শুনিল তিনি বাস্তবিক জীবিতা, তাঁহার সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিল, যে মার স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পরম ভক্তিভরে আশৈশব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মার স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। তাহার সে রাত্রের কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবার সেই রাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।

মালতী শিহরিয়া উঠিল, অজ্ঞাতসারে একটু দূরে সরিয়া বসিল।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই জানেন?"

"না।"

"তুমি কতদিন হল শুনেছ?"

"বিয়ের পর।"

"মোক্ষদা পিসীর কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"মোক্ষদা পিসীর মুখেই শুনলাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কর্ম্ম করেন, পুজোর সময় তুমি দানাপুরে আসবে তাও ঠিক হয়েছে।"

মালতী বলিল, "তা হলে দানাপুরে তুমি হঠাৎ এসে পড়নি, জেনে শুনে এসেছিলে? কেন?"

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার সন্তানকে কেউ কি ভুলতে পারে?"

মালতীর একবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিল। আপনার মা না

জানিয়াও ইঁহার প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিল, তাই মনে পড়িল। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "কেন তুমি জানালে তুমি কে ?"

"কি জানি। থাকতে পারলাম না।"

মালতী আবেগভাবে একবার বলিতে যাইতেছিল—জানিয়েছ ভালই করেছ। নইলে মা ত কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, 'এ মা! নাই দেখতাম!'

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

গাড়ীর সময় হইল। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়েছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিল।

মালতী বলিল, "গহনা নিয়ে যাও। আমি পরব না।"

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "যা ভেবেছ তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চোদ্দ বচ্ছর ধ'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জ্জন নয়। আমি মস্ত বড়মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোননি ?"

মালতী বলিল, "তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারিনে।"

"তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলি দেবসেবায় দিও।"

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিল না। "মা আবার দেখা দিও"—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, প্রণাম করিল।

"সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও"—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কলির মেয়ে

॥ ১ ॥

চৈত্রের দিবা অবসিতপ্রায়। গোপাল সরকারের বৈঠকখানায় বসিয়া বিজয় মিত্র পাশা খেলিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "বাবা শীগ্‌গির বাড়ী এস, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া বৈঠকখানা-সুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম সর্ব্বদা আসে না—যাহা আসে, তাহা প্রায়ই দুঃসংবাদ, বিপদের সংবাদ।

বিজয় মিত্র খেলা ফেলিয়া ভিজা গামছায় কপালে ঘাম মুছিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ত্বরিদপদে বাড়ী আসিলেন। দূর ষ্টেশন হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর টেলিগ্রাফ পেয়াদা আসিয়াছে। সদর দরজার বারান্দায় বৃহৎ লাঠি লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। অসংখ্য কুতূহলী বালক-বালিকা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।

বিজয় মিত্র রসিদে নাম সহি করিয়া দিয়া কম্পিতহস্তে টেলিগ্রাম খুলিলেন। পাঠমাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বলিলেন, "ভাল খবর।"

"কি ?"

"বিনু বাড়ী আসছে!"

"বিনু? কোথা থেকে? কবে আসবে?"

"তা লেখেনি। মোকামা থেকে তার করেছে, কাল এসে পৌঁছবে বোধ করি।"

বিজয়হরি ও বিনোদবিহারী দুই ভাই—সহোদর। বিনোদ যখন ছোট, তখন ইহারা পিতৃমাতৃহীন হয়। বিজয়হরির স্ত্রীই বিনোদকে মানুষ করিয়াছিলেন।

বিনোদ বড় হইলে ভারি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। এই সূত্রে দাদার সঙ্গে প্রায়ই তাহার বচসা হইত। একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া বিজয়হরি বিনোদকে জুতার দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। সেইদিন বিনোদ পলায়ন করিল।

একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ গেল, বিনোদ ফিরিল না। তখন বিজয়হরি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। দশ টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলেন—তথাপি বিনোদের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে মাস কাটিল, বৎসর কাটিল, এইরূপে তিনটি বৎসর কাটিয়াছে। বিনোদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয়বন্ধুসমাজে বিজয়হরি লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারেন না—আজ সহসা সংবাদ আসিল, সেই ভাই বাড়ী আসিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উঠানের তুলসীগাছ সওয়া-পাঁচ আনার হরিল্লুট পাইয়া গেল। গ্রামময় এ সংবাদ রটিত হইল। বন্ধুবান্ধব উৎসুকচিত্তে বিনোদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে বিনোদের গাড়ী গ্রামে প্রবেশ করিল। বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল। হাতে একটি সবুজ বনাতের ঘেরাটোপযুক্ত ক্যাশবাক্স। গাড়োয়ান এবং বাটীর ভৃত্য মিলিয়া জিনিসপত্র নামাইল।

বিনোদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাদা ও বউদিদিকে প্রণাম করিল। ছেলেপিলেকে কোলে করিয়া, আদর করিয়া অনর্থ করিল। বউদিদিকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া, ক্যাশবাক্সটি তাঁহার হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল, "এটি খুব সাবধানে তোমার সিন্দুকে রেখে দাও বউদিদি।"

বউদিদি দেখিলেন বাক্সটি বিলক্ষণ ভারি।—খুসি হইযা সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—"এতদিন কোথা ছিলে ঠাকুরপো?"

"ছিলাম মোতিহারিতে।"

"এতদিনে মনে পড়ল?"

"চাকরি ফেলে কি ক'রে আসি বউদিদি?"

"কতটাকা মাইনে হয়েছে?"

"একশো কুড়ি টাকা।"

"বিয়ে করেছ?"

"বিয়ে? বিয়ে ক'রে কি হবে?"

বউদিদি হাসিয়া কি একটা ঠাট্টা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিজয়বাবু আসিয়া বলিলেন, "সারাদিন খাওয়া হয়নি, যাও ঝাঁ ক'রে রান্না চড়িয়ে দাওগে, গল্প পরে কোরো এখন।"

জলযোগাদি করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে লোকজন আসিয়া বৈঠকখানা

ছাইয়া ফেলিল। দুই ভ্রাতা গিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিলেন। গুরুসম্পর্কীয়গণকে প্রণাম করিতে করিতে বিনোদের স্কন্ধে বেদনা ধরিয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, 'এতদিন বাড়ী আসবার নাম নেই, আমরা ভাবি হল কি? ছোকরা গেল কোথায়? ছেলে বাহাদুর বটে। আজকাল-কার বাজারে, একশো কুড়ি টাকার চাকরি বাগানো সাধারণ কথা!'

গ্রামের অন্যান্য হতভাগ্য যুবক, যাহারা বি-এ পাস করিয়া কলিকাতা কন্‌ট্রোলর জেনারলের আপিসে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির জন্য উমেদারী করিতেছিল, এম-এ পাস করিয়া যাহারা পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারি জুটাইতে পারিতেছিল না, তাহাদের অনেকেরই কথা উঠিল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "সকলই অদৃষ্টে করে রে ভাই, ও বি-এ পাস করলেও হয় না, মহা বি-এ পাস করলেও হয় না।"

অনেকে বলিল, 'তা বটেই ত'—'তার আর ভুল কি।'—নব্য গোছের একজন বলিল, "অদৃষ্ট ত বটেই,—তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যমও চাই।"

অন্য একজন মন্তব্য করিল, "বিনোদ বুদ্ধিমান, আমরা বরাবরই ব'লে এসেছি।"

সরকার মহাশয় এ মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন, "ছেলেবেলায় একটু দুর্দ্দান্ত ছিল—তা অমন অনেকে থাকে,—একটু বয়স হলেই সেরে যায়। তা হোক, চাকরিটি এখন ভালয় ভালয় বজায় থাকুক—ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হোক, পদ বৃদ্ধি হোক, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"

বিজয় ভ্রাতার পানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ করুন সরকার মশায়।"

॥ ২ ॥

পরদিন প্রভাতে দাদার বালক-বালিকাগণকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বলিল, "তোদের জন্যে কি নিয়ে এসেছি তা এখনো দেখিসনি বুঝি?"

'কি কাকা?' 'কি এনেছ কাকা?'—ইত্যাকার প্রশ্নে বিনোদকে তাহারা ছাঁকিয়া ধরিল। বিনোদ উঠিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া, কাহাকেও একটা রবারের বানর, কাহাকেও একটা লাল বল, কাহাকেও একটা মেম পুতুল বিতরণ করিল। তাহা লইয়া বালক-বালিকাগণ মহা লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল।

হাস্যমুখী বউদিদির পানে চাহিয়া বিনোদ বলিল, "তোমার জন্য কি এনেছি জিজ্ঞাসা করলে না বউদিদি ?"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "কি এনেছ ভাই ?"

"কি বল দিকিন ?"

"কি জানি।"

"কি পেলে খুসী হও ?"

"কি পেলে খুসী হই ? দাঁড়াও, দেখি। বাঁদর নয়, সে ত ঘরেই রয়েছে—"

বিনোদ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিল, "অ্যাঁ! আমার দাদাকে বাঁদর বলছ বউদিদি ?"

বউদিদি বলিলেন, "এই দেখ, কারু নাম করেছি ? নিজেরা ধরা দিলে আমি আর কি করব ?"

বিনোদ বলিল, "মেম পুতুলও বোধ হয় চাও না, সেও ত নিজেই রয়েছ।"

বউদিদি বলিলেন, "না, মোমের মেম পুতুল চাইনে বটে। একটি সত্যি-কার জ্যান্ত মেম পুতুল যদি বিয়ে করে এনে দিতে ভাই, তা হলে খুব খুসী হতাম।"

"যা এনেছি তা দেখলে আরও খুসী হবে। এই জন্যেই ত এতদিন বাড়ী আসিনি—টাকা জমাচ্ছিলাম। আমার ক্যাশবাক্সটা বের কর দিকিন বউদিদি।"

বউদিদি সিন্দুক খুলিয়া, সবুজ বনাত ঢাকা ক্যাশবাক্সটি বাহির করিলেন। বিনোদ চাবি খুঁজিতে লাগিল। এ পকেট সে পকেট, এ জামা সে জামা—কোথাও চাবি পাওয়া গেল না। শেষে তোরঙ্গ দুইটা খুলিয়া উলট পালট করিল, কোথাও চাবি নাই।

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই চাবি গাড়ীতে ফেলে এসেছি।"—বলিয়া বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বউদিদি সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "চাবি হারিয়েছ তার আর ভাবনা কি ঠাকুরপো ? মাল ত আর হারাওনি—বাক্স ত ঘরেই আছে, চাবি হবে এখন। না হয় বাক্স ভাঙ্গতে হবে, এর বেশী আর কি হবে ?"

বিনোদ একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার যে হাতখরচের টাকা অবধি বাইরে নেই বউদিদি !"

বউদিদি বলিলেন, "তা তোমার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে নিও এখন !"

"কলকাতায় গিয়ে বাক্স না খোলালে আর উপায় নেই। এত সাধ ক'রে তোমার জন্যে গহনা গড়িয়ে নিয়ে এলাম, দেখাতে পেলাম না, এই দুঃখ।"

বউদিদি বলিলেন, "না, দুঃখ কোরো না। দুদিন পরেই না হয় দেখব। কি এনেছ বলই না—কাণে শুনি।"

"দশ ভরি দিয়ে তোমার জন্যে পুষ্পহার গড়িয়ে এনেছি।"

বউদিদি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। বিনোদ ক্রমে সুস্থ হইল। তখন বলিল, "বউদিদি, চা তৈরী করতে পার ? সকালে চা খাওয়াটা ভারি অভ্যাস হয়ে গেছে।"—শুনিয়া বউদিদির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঠাকুরপোর এতদূর সৌখীন চালচলন হইয়াছে !

কিন্তু কিছু অপ্রতিভও হইলেন। বলিলেন, "সে পাট ত আমাদের নেই ভাই।"

বিনোদ বলিল, "চা আমার কাছে আছে, শুধু গরম জল, দুধ আর চিনি পেলেই হয়।"

এই কথা শ্রবণমাত্র বালক-বালিকাগণ 'ও কাকা, আমি চা খাব' 'ও কাকা, আমায় চা দিও' বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

উপযুক্ত পাত্রাভাবে একটা ঘটি করিয়া চায়ের জল গরম হইয়া আসিল। তাহারই মধ্যে একমুঠা চা ফেলিয়া, মুখে পাথরবাটি চাপা দেওয়া হইল। বালকবালিকাগণ কেহ বাটি, কেহ গেলাস, কেহ বা পাণের ডিবার একটা খোল লইয়া বসিয়া গেল। চা সিদ্ধ হইলে, সেই ঘটিতেই দুধ ও চিনি ফেলিয়া দেওয়া হইল। ঘটির মুখে গামছা দিয়া ছাঁকিয়া, বউদিদি সকলকে চা পরিবেষণ করিলেন। চা বালকবালিকাগণের উদরস্থ যত হউক না হউক, ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিয়া গেল।

॥ ৩ ॥

নিকটস্থ গ্রামের জমিদার অতুল ঘোষ মহাশয়ের এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্বজাতীয়, সদ্বংশজাত, কৃতী, অবিবাহিত একটি

নব্য যুবক বিনোদবিহারী গ্রামে উপস্থিত। অতঃপর ঘটনাস্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা ?

সেই দিন অপরাহ্ণেই ঘোষজা মহাশয় বিজয় মিত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন।

মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন, "তা যদি হয়, তার বাড়া আর সুখ কি ? বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি, বিনোদ কি বলে দেখি।"

'বাড়ীতে' বলিলেন, "মেয়েটি চোখে দেখা—কিছু নিন্দের নয়। দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে যদি কৃপণতা না করে, আমাদের মান রাখে, তা হলে আর বাধা কি, এই বৈশাখ মাসেই হয়ে যাক।"

মেয়ে পূর্ব্বে হাজার বার দেখা থাকিলেও, বিবাহের সম্বন্ধ হইলে একবার ঘটা করিয়া মেয়ে দেখিতে যাইতে হয়। সুতরাং শুভক্ষণে বন্ধু বান্ধব লইয়া বিজয় মিত্র মেয়ে দেখিতে গেলেন। ঘোষজা মহাশয় অনেক বিনয় প্রকাশ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু টাকার বেলায় হাজারের বেশী আর উঠিতে চাহিলেন না।

বরপক্ষীয়েরা এ প্রকার অযৌক্তিকতায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, "এণ্ট্রান্স পাস করা ছেলে, এল-এ পড়ছে, তারই ত হাজার টাকা বাঁধা। তার কি ক্ষমতা বলুন ? যদি চাকরির চেষ্টা করে ত পনেরো টাকা মাইনে জুটলে খুব সৌভাগ্য।"

কন্যাপক্ষীয়গণ বলিল, "আহা সে যে আলাদা কথা ! সে যে পড়ছে। জলের মাছ—কত বড় হবে তার ত ঠিকানা নেই। চাই কি একদিন সে হাইকোর্টের জজও হতে পারে। আর যে কর্ম্মে ঢুকেছে, তার উন্নতি অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কিনা, এটা ত স্বীকার করেন ?"

ইত্যাদি প্রকার বাদপ্রতিবাদে ঘোষজা মহাশয় দুই হাজারে উঠিলেন। ইঁহারা বলিলেন, "হাজার নগদ, হাজার গহনা, দানসামগ্রী ও অন্যান্য বাবদ হাজার, এই তিন হাজার নইলে আমরা পেরে উঠব না।"

ঘোষজা মহাশয় বলিলেন, পরে বিবেচনা করিয়া যেরূপ হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

"উত্তম কথা।"—বলিয়া বরপক্ষীয়গণ শেষবার ধূমপান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন সংবাদ আসিল, অনেক কষ্টে মারিয়া কাটিয়া ঘোষজা মহাশয় আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উঠিবেন। ইহাতে যদি হয়, উত্তম—নচেৎ অগত্যা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

বিজয় মিত্র বলিয়া পাঠাইলেন—টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, কুটুম্বসুখই বেশী প্রার্থনীয়। ঘোষজা মহাশয়ের সহিত কুটুম্বিতার লোভে তিনি আড়াই হাজারেই সম্মত। এখন দিনস্থির হইতে পারে।

বিনোদকে রাজি করিতে কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু হাজার টাকার গহনা শুনিয়া সে ভারি খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। "হাজার টাকায় কি গহনা হবে বউদিদি? এই তোমার জন্যে পুষ্পহার গড়ালাম, দুশো পঁচাত্তর টাকা পৌনে তেরো আনা লাগল। হাজার টাকায় ক'খানা গহনা হবে?"

বউদিদি বলিলেন, "হাজার টাকায় কি আর গা সাজানো গহনা হয় ভাই? নইলে নয় খানকতক, তাই হবে। তারপরে, বেঁচে বর্ত্তে থাক, রোজগার কর, কত গহনা দেবে দিও না।"

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। বলিল—"দেখ বউদিদি, এক কায করলে হয় না? ওদের বল, যেন গহনা না দিয়ে গহনার ঐ হাজার টাকা নগদে দেয়। ওতে আর এক হাজার আমরা মিলিয়ে, দু'হাজার টাকার পছন্দ মত গহনা আমরা তৈরি করাই। কলকাতায় ত যেতেই হবে বাক্সটা খোলাবার জন্যে।"

বউদিদি কিয়ৎক্ষণ কপালে হাত দিয়া ভাবিয়া বলিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নয়। তাই বলা যাক, মেয়ে ফিরিয়ে পাঠাবার সময় আমরা গা সাজিয়ে ফিরে পাঠাব।"

"কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়িয়ে আনতে কতদিন লাগবে বল দিকিন বউদিদি?"

"কতদিন আর? নেবুতলায় কমলাদিদিদের বাড়ী যাবে, বাড়ীতে স্যাকরা ডাকিয়ে, ব'সে থেকে সাত দিনে গহনা তৈরি করিয়ে নেবে। ওরা ত যখন গহনা গড়ায় ঐ রকম করেই গড়ায়।"

বিনোদ বলিল, "ঘোষেরা রাজি হবে ত?"

বউদিদি বলিলেন, "ইঃ, রাজি হবে না ত কি?"

বউদিদি গিয়া স্বামীর সহিত এ বিষয়ে কথা কহিলেন। বিজয় মিত্র বলিলেন, "রাজি না হবার ত কোন কারণ দেখিনে।" কিন্তু সব দেখিয়া

শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ ভাবিলেন—'ভাযার আমার বড চাকরি হয়েছে কিনা, মেজাজটা ভারি বেড়ে গেছে।'

অতুল ঘোষ রাজি হইলেন। একেবারে স্বর্ণশূন্য করিয়া মেয়েকে বিবাহের আসরে নামাইতেও পারিলেন না, অত্যাবশ্য দুই চারিখানা গহনা দিতেই হইল। অথচ হাজার টাকাও দিতে হইল। শেষে সেই তিন হাজারেই দাঁড়াইল। সমারোহ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যার নাম শরৎকুমারী।

বিনোদের বউদিদি নববধুর মাতাকে বলিলেন, গহনা গড়াইতে একটু সময় লাগিবে, সুতরাং বধুকে দুই সপ্তাহের কম ফিরিযা দিতে পারিবেন না।

মাতা বলিলেন, "তা বেশ, এইত কাছেই, মাঝে দুই একদিন পাল্কী পাঠিয়ে দেবো, এক বেলার জন্যে পাঠিয়ে দিও এখন তা হলেই হবে।"

সমীপস্থ একজন নবীনা বলিল, "ওগো এখন আর আগেকার মত মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী এসে কাঁদেকাটে না। দু' দিনে স্বামী চিনে নেয়।"

বিবাহের পর সপ্তাহ অতীত হইল, তথাপি বিনোদ কলিকাতা যাইবার নাম করে না। ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল—বলিল 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।' বউদিদি আসিযা বলিলেন, "ঠাকুরপো, আর গহনা গড়াতে না দেওযা যে ভাল দেখাচ্ছে না ভাই। বউয়ের পিসির সঙ্গে কাল ও-পাড়ায দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলে শরতের গহনা গড়িয়ে এসেছে?"

বিনোদ বলিল, "আমায তাড়াতে চাও বউদিদি? খুব সুহৃদ্ ত!"

বউদিদি বলিলেন, "বুঝি ভাই, সব বুঝি। এক কায কর, যাতে দু'কুল বজায থাকে। ভোরের বেলা উঠে কলকাতায যাও। সারাদিন সেখানে থেকে, সোণা কিনে, স্যাকরা ডাকিয়ে, মাপ দিয়ে, কমলাদিদিদের উপর ভার দিয়ে এস। সন্ধ্যের গাড়ীতে চ'লে এস, রাত বারোটার সময পৌঁছবে এখন। আমি তোমার শোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো!"

বিনোদ বলিল, "তোমার কি বুদ্ধি বউদিদি!"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "এখনই আমরা বুড়োসুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদেরও একদিন ছিল তো ভাই! এখনও বেশ মনে পড়ে"—বউদিদি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, সামলাইয়া লইলেন।

বিনোদ বলিল, "বল বল, কি বলছিলে বউদিদি।"

বউদিদি, "না, এমন কিছু নয়।"—বলিয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিলেন।

বিনোদ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। না শুনিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। না বলিলে আড়ি করিবে।

বউদিদি তখন বলিলেন, "ঐ যে বললাম শোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখার কথা, ঐ থেকে একটা পুরাণো কথা মনে পড়ল। কারুকে না বল ত বলি।"

বিনোদ বলিল, "কারুকে বলব না।"

বউদিদি বলিলেন, "আমাদের তখন তখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। তোমার দাদা হুগলি গিয়েছিলেন সেখানে কি দরকার ছিল। অনেক রাতে ফেরবার কথা ছিল। শোবার ঘরে তাঁর খাবার ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার দাদা এসে, আমাকে উঠিয়ে, আমাকে সুদ্ধ সেই পাতে একসঙ্গে খেতে বাধ্য করলেন।"

বিনোদ শুনিয়া ভারি আমোদ অনুভব করিল। বলিল, "আমার দাদার এত বিদ্যে! আমি ভাবি উনি চিরকালই বুঝি চশমা চোখে দিয়ে ভাগবত পড়েন।"

স্থির হইল, আগামী কল্য ভোর রাত্রে বিনোদ কলিকাতা যাত্রা করিবে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল—আহারাদি হইল, শয়নের সময় উপস্থিত হইল। খোলা জানালার কাছে পালঙ্ক টানিয়া নববধূর সহিত বিনোদ শয়ন করিল। বাহিরে বাগান, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মিষ্ট বাতাস বহিতেছে।

বিনোদ অন্য দিনের অপেক্ষা আজ নীরব। শরৎকুমারী বলিল, "কি ভাবছ?"

বিনোদ বলিল, "অনেক দুঃখের কথা।"

কি দুঃখ, শুনিবার জন্য এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিনোদ বলিল, "আমি যদি বলি, তা হলে তুমি আর আমাকে ভক্তি করবে না।"

শরৎ বলিল, "স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে?"

বিনোদ বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারি গুচ্ছ স্খলিত কুন্তল তাহার ললাটে লুটাইতেছিল। তাহার চক্ষু দিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছিল

বিনোদ বলিল, "আমি মহা পাষণ্ড। আমি তোমাদের সবাইকে ঠকিয়েছি।"

বালিকা নীরবে বিনোদের পানে চাহিয়া রহিল। বিনোদ বলিতে লাগিল,

"আমি মোতিহারিতে চাকরিও করিনে, আমার একশো কুড়ি টাকা মাইনেও নয়।"

শরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে কোথায় চাকরি কর?"

"কোথাও করিনে। এলাহাবাদে রেল আফিসে চাকরি করতাম, সে চাকরি গেছে। আর কোনও উপায় না দেখে, বিয়ে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করব ব'লে এ ফন্দি করে এসেছি। জানতাম বড চাকরি শুনলে বিয়ে হতে এক দণ্ডও দেরী হবে না। তারপর টাকাকড়ি সব নিয়ে পালিয়ে যেতাম।"

কিছু পূর্ব্বে অগাধ সরলতায় ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে বালিকা বলিয়াছিল, 'স্বামীকে নাকি আবার কেউ কখনও ভক্তি না করে'—কিন্তু সন্ধ্যাগমে দিবালোক যেমন দেখিতে দেখিতে কোথায় দ্রুতপদে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, স্বামীর প্রকৃত পরিচয়ে তার স্বামিভক্তিও কোথাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল বালিকা ঠিকানা পাইল না। একটা দারুণ আঘাতের বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

বিনোদ বধূর স্কন্ধে হাত দিয়া আবার বলিল, "বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম, কলকাতায় গিয়ে গহনা গড়াতে দেবো, তখন এই মৎলবেই বলেছিলাম। গহনা গড়াতে যাবার নাম ক'রে এতদিন কোন্‌কালে পালিয়ে যেতাম। তুমিই সব মাটী করে দিয়েছ।"

শরৎ চট করিয়া স্বামীর হস্তস্পর্শ হইতে স্কন্ধ সরাইয়া লইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমি কি করেছি?"

"তুমি সোণার শিকল হয়ে আমায় বেঁধে ফেলেছ—তোমায় ফেলে যেতে পারছিনে। অথচ থাকিতেও পারিনে। থাকলে আজ বাদে কাল সব প্রকাশ হয়ে যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।"

ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় বালিকার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তবু জিজ্ঞাসা করিল, "পালিয়ে কোথা যেতে?"

"কয়লার খনিতে যেতাম, এখনও তাই যাব—সেখানে কন্‌ট্রাক্টের কায করব—খুব খাটুনি কিন্তু খুব লাভ।"

শরৎ সহসা বলিল, "আমি সঙ্গে যাব।"

বিনোদও শয্যায় উঠিয়া বসিল! আহ্লাদে বলিল, "তুমি যাবে শরৎ? পারবে?"

"পারব। তুমি কি ভেবেছ তুমি চ'লে গেলে আমি এখানে ব'সে লোকের

বাক্যযন্ত্রণা সইব ? দেশসুদ্ধ ঢী ঢী পড়ে যাবে—যার মুখে যা আসবে সে তাই বলবে, আর আমি ব'সে ব'সে শুনব ?"

বিনোদের আনন্দ ম্লান হইল। শরতের পলায়ন তবে আত্মসমর্পণ নহে—আত্মরক্ষা মাত্র।

একটু পরে বলিল, "তবে দুজনে পালাই এস।"

"কখন ?"

"পর্শু ভোরে আমার কলকাতা যাবার কথা। শোবার আগে হাতবাক্সে টাকা গুছিয়ে এই ঘরে এনে রেখে দেবো। রাত একটা কি দুটোর সময় উঠে আমরা পালাব। কয়লার খনির কাছে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে থাকব দুজনে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাস। জীবন নতুন করে আরম্ভ করব।"

বালিকা নববধূর মনে রাগের ও দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কি ভাব দ্বন্দ্ব করিতেছিল। মনের দুয়ারে একটা কথা বারবার ধাক্কা দিতেছিল—'তুমিই সব মাটী করে দিয়েছ।' ভাবিতে মিষ্ট লাগিতেছিল, তাহারই জন্য তাহার স্বামী পলায়ন করিতে পারে নাই—তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। কাঁটাবনের মধ্যে যেন এই একটি মিষ্ট ফল। সেই সুখটুকু মনের মধ্যে ওলটপালট করিতে করিতে সে রাত্রি সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন কাটিল। শয়নঘরে টাকার বাক্স লইয়া রাত্রে বিনোদ শয়ন করিল।

ভোরে বউদিদি তাহাকে জাগাইয়া আসিতে দেখেন—কেহ নাই। শয্যায় তাঁহার স্বামীর নামে এই পত্র পড়িয়া রহিয়াছে :—

"শ্রীচরণেষু—দাদা, আমি বউকে লইয়া পশ্চিম চলিলাম। আমি আপনাদের সকলকে ঠকাইয়াছি। আমি মোতিহারিতে চাকরি করি না। এলাহাবাদ রেল আপিসে একটি সামান্য চাকরি করিতাম, মদ খাইয়া সেটি খোয়াইয়াছি। তখন নিরুপায় হইয়া জুয়াচুরি করিয়া বিবাহ করাই স্থির করি। অনুসন্ধানে পাছে ধরা পড়ি তাই ডিরেক্টারি খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার নামের কেহ কোথাও ভাল চাকরি করে কিনা। দেখিলাম মোতিহারিতে একজন বিনোদবিহারী মিত্র ভাল চাকরি করে। তাহার বেতনের পরিমাণ মুখস্থ করিয়া বাড়ী আসিয়া বিবাহ করিলাম।

"আমার এক পয়সাও নাই, আমার ক্যাশবাক্সে শুধু ভাঙ্গা কাঁচ বোঝাই করা আছে। বউদিদির পুষ্পহারও এখনও তৈরি হয় নাই। আমার বিবাহে

যে হাজার টাকা পণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার জন্য পুষ্পহার গড়াইয়া দিবেন। গহনার হাজার টাকা সম্বল করিয়া, ব্যবসায় করা স্থির করিয়াছি। যদি কোনও দিন নিজের স্বভাব ও অবস্থা সংশোধন করিতে পারি তবে আবার দেখা দিব। আপাততঃ প্রণামান্তে বিদায়।

সেবকাধম

শ্রীবিনোদবিহারী মিত্র

পত্র পড়িয়া বউদিদি স্তম্ভিত হইলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ঠাকুরপোর উপর ততটা রাগ হইল না। কিন্তু নিরপরাধা বৌয়ের স্বামিসঙ্গ-গ্রহণেই যেন বেশী খট্‌কা লাগিল। মন আপনা হইতেই বলিতে লাগিল—কলি! ঘোর কলি।

ধর্ম্মের কল

॥ ১ ॥

হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমার মত কন্যা মনোরমা পনেরো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া গেল।

সেকালের কথা। পিতা বিক্রমপুর হইতে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান এক দিগ্‌গজ কুলীন আনিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। দুইবেলা মাছ ভাত খাওয়া এবং সিঁদুর পরিতে পাওয়া ছাড়া মনোরমা আর কোনও সধবাসুখের অধিকারিণী ছিল না; তথাপি তাহার এই তরুণ বৈধব্যে পিতা মাতা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িলেন। মনোরমাও তাঁহাদের দেখাদেখি দিনকতক একটু কাঁদিল, মুখটি ম্লান করিয়া রহিল। কিন্তু আসলে তাহার নিজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না তার কিবা ছিল, কিবা গেল। মেয়েটির বছর পনেরো বয়স যদিও, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রকৃতি শিশুবৎ। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের বৃদ্ধি এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

ঠিক এই সময় গ্রামে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র হীরালাল পিতা মাতাকে শোকে ভাসাইয়া চিতারোহণ করিল। ব্রজহরির স্ত্রী হৈমবতী অনেকগুলি সন্তানের মুখ দেখিয়াছিলেন। একে একে পাঁচটিকে যমের মুখে সমর্পণ করিলেন। একটি যখন বারো বৎসরের, তখন সন্ন্যাসীরা তাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—সে আজ দশ বৎসরের ঘটনা। এখন শুধু একটি রহিল—সেটি দুই বৎসরের। তা যে রকম অদৃষ্ট, উহার আশাই বা কি, ভরসাই বা কি!

শোকের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ব্রজহরি স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন, গৃহ সংসার আর কাহার জন্য, চল গিয়া তীর্থবাস করা যাউক। বাড়ী, বাগান, বিষয় সব বিক্রয় করিয়া, গোরু বাছুর বিলাইয়া দিয়া, বাস উঠাইয়া কাশীতে বসিয়া হরিনাম করা যাউক। এই গুঁড়াটুকু যদি বাঁচে, তখন আবার সব হইবে।

কিন্তু সংসারের মায়া বড় মায়া, গৃহত্যাগ করা বড় কঠিন। আরও কিছু দিন পরে স্থির হইল, বাস উঠাইয়া কাশী যাইবার কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, মাস দুই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসা যাউক।

মনোরমা এই সব শুনিয়া বাড়ী আসিয়া বলিল—"মা, আমিও যাব কাকীমার সঙ্গে।" ব্রজহরি হারাধনের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—উভয় পরিবারে বহুদিনের সম্প্রীতি।

তাহার পিতামাতা উভয়েই আপত্তি করিলেন। মনোরমা কাঁদাকাটা করিল। এক বেলার এক মুঠা অন্ন, তাহাও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মা তখন স্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়া মত করাইলেন।

কাশীর রেল তখন নূতন খুলিয়াছে ;—লোকের তখন কাশী যাইবার ভারি ধুম! নৌকাপথে যে কাশী যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত, সেই কাশী দুই দিনের পথ হইয়া পড়িল। ইঁহাদের কাশী যাইবার পরামর্শ শুনিয়া ও পাড়ার কলুগিন্নি আসিয়া বলিল—"বামুনদিদি, আমাকে যদি নিয়ে যাও সঙ্গে ক'রে তা হলে তোমাদের চরণ সেবা করি, দুটি দুটি পেসাদ পাই, আর বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু গঙ্গাজল দুটো বিল্লিপত্র দিয়ে আসি।"

কলুগিন্নির প্রার্থনা বিফল হইল না। যাত্রার দিন স্থির হইল ২৮শে ফাল্গুন।

যাইবার উৎসাহে মনোরমা ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। এমনভাবে চলিতে বলিতে লাগিল, যেন তাহার সর্ব্বনাশ হয় নাই, কপাল যেন পোড়ে নাই, সে যেন সেই মনোরমাই আছে! তাহার এই প্রফুল্লতায় তাহার পিতামাতাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

কাশীর বিশ্বনাথ অপেক্ষা মগরার রেল দেখিবার জন্যই মনোরমা শতগুণ অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িল। গ্রামের কত লোক কলিকাতা গিয়াছে, বর্দ্ধমান গিয়াছে—তাহারা যে ব্যাখ্যাটা করে! যাহারা কোথাও যায় নাই, তাহারা সাত ক্রোশ দূর ষ্টেশনে গিয়া শুধু রেলগাড়ী দেখিয়া চক্ষুসার্থক করিয়া আসিয়াছে। সেই রেলে মনোরমা চড়িবে! উঃ—ভাবিতে তাহার বুক গুরগুর করিতে লাগিল; শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল! শব্দে ভয় করিবে না ত? না জানি সে কী শব্দ! বর্ষাকালে জলে যখন সমস্ত মাঠ ডুবিয়া গিয়াছিল, তখন একদিন অনেক রাত্রে, মার কাছে শুইয়া মনোরমা রেলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। অতি ক্ষীণ, শুধু একটা অনেক—অনেক দূরের গুম্‌গুম্‌গুম্ শব্দ।—আঃ—২৮শে ফাল্গুন কবে আসিবে গো?

মনোরমার আরাধনায় ২৮শে ফাল্গুন আর না আসিয়া থাকিতে পারিল না।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে যাত্রা করিতে হইবে। যথাসময়ে দুইখানি গোরুর গাড়ী ভাঙ্গা লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া, চক্রশব্দে সুপ্ত গ্রামবাসীর কর্ণে বিদায়ের করুণ-গীতি গাহিতে গাহিতে বাহির হইযা গেল।

॥ ২ ॥

মগরায় যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা নয়টা। গাড়ী যখন বাজারে প্রবেশ করিতেছে, সেই সময় অদূরে একখানা এঞ্জিন বংশীধ্বনি করিতে করিতে ছুটিযা আসিল। তাহা দেখিয়া মনোরমার যে আমোদ! কাকীমার গলা জড়াইয়া—"ওগো কাকীমা, ওটা কী গো?"—বলিযা সে আকুল।

একটার সময পশ্চিমের গাড়ী। দোকানে নামিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি হইল।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। তখন সহসা সমস্ত উৎসাহ সমস্ত আনন্দ মনোরমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শব্দে, দোলানিতে, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভয়ে জানালার বাহিরে চাহিতেও পারিল না। শেষে হৈমবতীর কোলে মাথা দিযা ঘুমাইযা পড়িল;—তিনি তাহার কপালে হাত বুলাইয়া আঁচল দিযা মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন।

রাত্রি কাটিল। পরদিন মনোরমা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিল। জানালার কাছে বসিয়া মাঠ, ক্ষেত, নদী, পাহাড় দেখিতে ও দুই বৎসর বয়স্ক খোকাকে দেখাইতে লাগিল। পাহাড় দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত।

"কোন কোনও পাহাড় সবুজ গাছে পালায় ভরা, আর কোন কোনটা ওরকম শুকনো পোড়া মতন কেন কাকীমা?"

"সব পাহাড় কি আর সমান হয় বাছা?"

"সব মানুষ কেন তবে সমান?"

"সমান? কই সমান মা?"—বলিয়া হৈমবতী মুখ ফিরাইয়া, একবিন্দু জল চক্ষু হইতে আঁচলে লইলেন।—কাহার জন্য?

তাহার পরদিন প্রভাতে মোগলসরাইয়ে নামিতে হইল। সেখানে অনেক পাণ্ডা আসিয়া বসিয়া আছে। একজন ব্রজহরিকে দখল করিয়া ফেলিল।

মোগলসরাই হইতে অন্য গাড়ীতে রাজঘাট। রাজঘাট ষ্টেশন ঠিক গঙ্গার

উপর। ওপারে কাশীর সৌধমন্দিরমালা নবরৌদ্রালোকে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। পুণ্যময়ী জাহ্নবী সফেন তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া ট্রেণসুদ্ধ লোক—'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকি জয়' বলিয়া বারম্বার উন্মত্তবৎ চীৎকার করিতে লাগিল।

ইঁহারাও কাশীর পানে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া, গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া প্রণাম করিলেন।

হৈমবতী বলিলেন—"জয় বাবা বিশ্বনাথ—হে মা অন্নপূর্ণা—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো। এত সাধু সন্ন্যাসী এখানে তোমার সেবা করছে, আমার বাছাকে যেন দেখতে পাই। দেবাদিদেব মহাদেব, বাবা বিশ্বনাথ, দোহাই বাবা সাত দোহাই তোমার।"

॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ বিশ্বের অল্প লোকেরই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া থাকেন; হৈমবতী সেই অল্পের মধ্যে একজন পরিগণিত হইলেন। তিনি দশ বৎসরের হারানো পুত্রের দেখা পাইয়াছেন।

সেদিন তাঁহারা কালভৈরবের বাড়ী পূজা দিতে যাইতেছিলেন, পথে সাধনানন্দ স্বামীর মঠ। পাণ্ডা বলিল, "মাঈ—সাধ্‌নানন্দ্‌ সোয়ামিজিকো দেখবি না? বড়া ভারি মহাৎমা আছে।"

সকলে সাধনানন্দ স্বামীকে দর্শন করিলেন। স্বামী তখন অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কয়েকজন গৈরিকবসনধারী নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া তাহা শ্রবণ ও তৎসম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতেছেন। এই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হৈমবতী তাঁহার শশিভূষণকে চিনিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে ছিল দ্বাদশবর্ষীয় বালক, সে এখন পূর্ণাবয়ব দীর্ঘায়তন নবীন যুবাপুরুষ হইয়াছে। তপশ্চর্য্যার ফলেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত প্রভাসম্পন্ন। মস্তকের তাম্র জটাভার ললাটের ঊর্দ্ধ প্রান্তে বিচিত্র চিত্র রচনা করিয়াছে।

তাহাকে পাইয়া তাহার পিতামাতা যে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কিছুতেই সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিতে চাহিল না।

এমন কি মঠ ছাড়িয়া পিতা মাতার সহিত কেদারঘাটের বাসায়ও থাকিতে সম্মত হইল না। তবে প্রত্যহ আসিয়া সারাদিন ইঁহাদের সঙ্গে যাপন করিত।

সপ্তাহকাল এইভাবে কাটিলে, একটু গোলযোগ ঘটিল। যতদিন হইতে উপন্যাস লেখার সৃষ্টি হইযাছে—কোন কোনও পণ্ডিতের মতে আরও পূর্ব্ব হইতেই—অর্থাৎ যতদিন হইতে পৃথিবী নরনারীসম্পন্ন এবং নরনারী হৃদয়নয়ন-সম্পন্ন হইয়াছে, ততদিন হইতেই—এ গোলযোগ ঘটিয়া আসিতেছে। অন্যের—ও প্রথম প্রথম নিজেরও—অগোচরে এই সন্ন্যাসীবর মনোরমার প্রতি একটু বেশীরকম চাহিতে লাগিল। সে দেখে আর দেখে আর দেখে। মনোরমার বুকের মধ্যেও কেমন একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকে। কেমন একটা অশোয়াস্তি, একটা সুখ।

একদিন এই চোখের ও বুকের ভাষা, মুখের ভাষায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল।

সেদিন প্রাতঃকালে। শশী আসিয়া দেখিল, মনোরমা বসিয়া দুধ জ্বাল দিতেছে, খোকা ঘুমাইতেছে—গৃহে আর কেহ নাই। শুনিল তাহার পিতা-মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, কলুগিন্নি বাজারে গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ গঙ্গাস্নানে যাওনি?"

"আমার একটু অসুখ করেছে।"

শশী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "অসুখ করেছে? হাত দেখি?"

মনোরমা হাত বাড়াইয়া দিল, হাসিয়া বলিল, "তুমি বদ্দি নাকি?"

উত্তর না করিয়া শশিভূষণ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর কপালে হাত দিয়া বলিল, "ইস্! খুব গরম যে!"

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "খুব বদ্দি হয়েছ! আমার মোটেই জ্বর হয়নি।"

"হয়নি ত কি! তোমার কপাল ভারি গরম।"

"ও বোধ হয় আগুন-তাতে ব'সে থেকে।"

"আচ্ছা, আগুনের কাছে থেকে সরে এস, দেখি ভাল করে হাত"—বলিয়া শশিভূষণ মনোরমার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া, তাহার সুন্দর কোমল হাত নিজের একটি হাতে সতৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, অন্য হাতের অঙ্গুলি দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল। মনোরমার মনে কি রকম একটা

ভয় হইতেছিল। একটা যেন না—না—শব্দ উঠিতেছিল। তাহার পা স্পষ্টই কাঁপিতেছিল, আর বোধ হয় শরীরও।

শশী বলিল—"মনো।" এই প্রথম 'মনো' বলিল—পূর্ব্বে বরাবর মনোরমা বলিযাছে।

মনোরমা বলিল—"কি ?"

ভারি আশ্চর্য্য! চুপি চুপি 'কি' বলিবার এমন কি প্রযোজন ছিল ? বোধ হয় হৃদযযন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তটা একটু বিশেষভাবে সঞ্চালিত হইতে থাকিলে, কথার স্বরটা ভারি নামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ কাটিল, আর কোন কথা হইল না।

শেষে বাহিরে কলুগিন্নির স্বর শোনা গেল—"ওমা! এরা যে এখনো ফেরে না গো। ঠাকুর দেখে ফিরবে না কি ? আমি তবে যাব কার সঙ্গে ?"

শশী মনোরমার হাত ছাড়িযা বাহির হইল। বলিল, "কলুগিন্নি! কোথায় গিয়েছিলে ?"

কলুগিন্নি বলিল, "কে, দাদাঠাকুর ? পেরণাম হই। দেখ না! আধ পয়সার এই রক্তা থোড়! দেশে হলে কেউ ছোঁয়ও না। বল্লাম ত মাগী ক্যারোড় ব্যারোড় ক'রে কি সব বল্লে কিছুই বুঝতে পারলাম না। গাল দিচ্চে মনে ক'রে, আমিও যা নয় তাই ব'লে গাল দিযে চলে এলাম।"

শশিভূষণ এ নালিশে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া প্রস্থান করিল।

॥ ৪ ॥

সেদিন সারাদিন আর শশী আসিল না। মঠে গিয়া নিজের ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল যেন নেশা হইয়াছে। মাথাটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

মস্তিষ্ক একটু শীতল হইলে, মনে হইতে লাগিল, আজ সে মহা একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে।

নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয় সে অনবগত ছিল না। তাহার জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করিত। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পূর্ব্বে কখন-কখনও হইয়াছে—কিন্তু

মনের পাপ কর্ম্মে কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। এ চাঞ্চল্য রক্তমাংসের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম, উন্মূলন করিবার উপায় নাই। সহ্য করিতে হইবে, সংযত থাকিতে হইবে। ইহাই ধার্ম্মিকের, সজ্জনের কর্ত্তব্য। কিন্তু অদ্য প্রভাতে সে সংযম তাহার কোথায় গেল? আজ সে কি করিয়া বসিল! আর কখনও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোনও স্ত্রীজাতিকে সে স্পর্শ করে নাই; আজ কি হইল?

নিজের প্রতি ধিক্কারে, অনুশোচনায় শশিভূষণ অস্থির। উঃ এই তার সন্ন্যাসধর্ম্ম? এত গর্ব্ব--এত তেজ—সব মুহূর্ত্তের মধ্যে পথকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইল!

পুরাণ স্মরণ করিল—অপ্সরা পাঠাইয়া দেবতাগণ মুনিগণের তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেন—চিৎশক্তির পরীক্ষা লইতেন। সে কত কঠিন পরীক্ষা! তাহার তুলনায় এ কি? কিছুই নয়। পরীক্ষাই নয়। তবু ত তাহার এই লজ্জাকর পরাজয়!

ক্রমে মনে হইল—মুনিগণের শত শত বর্ষের সাধনা—সে ত পরশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র! আর, দশবৎসর সে যাহা করিয়াছে তাহা ত তপস্যাও নহে।—খানকতক ব্যাকরণ পড়িয়াছে—কাব্য পড়িয়াছে—দর্শনের সূত্র মুখস্থ করিয়াছে—শ্রুতির ভাষ্য নকল করিয়াছে মাত্র।

একটু একটু করিয়া তাহার মনে সান্ত্বনার আলোক ক্রমে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, আ মরি, মুনিগণই বা কি চিৎশক্তির পরিচয় দিয়াছেন! অধিকাংশই ত পরাজিত।

পুরাণের আরও অনেক কথা মনে পড়িল, তাহাতে আত্মসান্ত্বনার পথ আরও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

তখন চিন্তা করিল—এ ভ্রম মনে পোষণ করা কেন? সে ত সন্ন্যাসী নহে; বিদ্যাশিক্ষার জন্য এতদিন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছিল মাত্র।

তাহার পিতামাতার সপ্তাহব্যাপী করুণোক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল—'আমার আর কেউ নেই বাবা—বাড়ী চল। আমার ঘর অন্ধকার—আমার চক্ষের মণি তুমি—বিয়ে কর,—বিয়ে ক'রে সংসারী হও!'

ধর যদি সে বিবাহই করে, যদি সে সংসারী হয়—তাহা হইলে কি হয়?

কি ভয়ানক, তাহা কখনও হয়? গুরু সাধনানন্দ বলিবেন কি? সহাধ্যায়ীবৃন্দ—বালগোপাল, করুণানন্দ, মাধো উপাধ্যায়, সীতাপতি বলিবে কি?

তখন ভাবিল—কি আশ্চর্য্য! কে কি বলিবে না বলিবে তাহাই ভাবিয়া আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিব? কি বলিবে? যাহা ইচ্ছা বলুক, যত পারে হাসুক, যত ছিলিম খুসী গাঁজা ভস্ম করুক। আমার তাহাতে কি আসিয়া যাইবে?

নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। এ চুল নাই, গৈরিক বসন নাই, দেশে গিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে। ঘরে বধূ—দেখি কেমন বধূ? —মনোরমা। ছি! মনোরমা নহে—আর কেহ। কিন্তু মন মানিল না। বালকের হাত হইতে একটি খেলনা কাড়িয়া লইয়া সেটি লুকাইয়া, অন্য শত শত খেলনা তাহার হাতে দিলেও সে যেমন আছাড়িয়া ফেলে, শশিভূষণের প্রণয়শিশুও সেইরূপ মনোরমা ভিন্ন অন্য কোনও দেবী, নারী বা কিন্নরীকে বধূত্বে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

তখন হঠাৎ এক বৎসরের পুরাতন একটা ঘটনার কথা মনে হইল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক শিষ্য, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচার করিতে কাশী আসিয়াছিলেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজে সে কি উত্তেজনা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! লোকে সে পণ্ডিতকে কত না বিদ্রূপ করিয়াছিল—কত না কঠিন কথা বলিয়াছিল। একজন প্রস্তাব করিয়াছিল, ইহার টিকি কাটিয়া আঠা দিয়া পশ্চাদ্ভাগে জুড়িয়া লেজ বানাইয়া দাও।

সেই পণ্ডিতের যুক্তি-তর্ক শশী মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া ঘরে আলো আনিয়া, নিজের পুঁথিপত্র পাড়িল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন,—পাতা উল্টাইয়া বিসংবাদের শ্লোকগুলি, পড়িতে লাগিল, তাহার টীকা ভাষ্য পড়িল। স্বার্থের নূতন আলোকে, সকল শ্লোকের অনুকূল অর্থই উপলব্ধি করিল।

বিধবা-বিবাহের আইন লইয়া বঙ্গদেশে কি প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল সে জানিত না। সে ছিল কাশীতে। কাশীর পাণ্ডাগণ বিরোধ উত্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু দুই একজন মতও দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের উদ্যোগে আইন পাস হইল বলিয়া, কাশীর পণ্ডিতগণ তাবৎ বাঙ্গালীকে খৃষ্টান বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। সুতরাং শশিভূষণ সিদ্ধান্ত করিল, বাঙ্গালীর চক্ষে এটি আর নিন্দনীয় নহে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থির করিল, মনোরমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবে। এই সকল

শাস্ত্র দেখাইয়া যুক্তি দেখাইয়া উভয়ের পিতামাতাকেই স্বমতে আনয়ন করিবে। হায় বালক!

যখন বাহির হইল, তখন বিশ্বেশ্বরের আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে লোক মন্দিরাভিমুখে ছুটিয়াছে। কি সুন্দর সুগম্ভীর দৃশ্য! সহস্র কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রময় বন্দনা গান।

॥ ৫ ॥

আরতির পর শশিভূষণ কেদারঘাটের বাসায় আসিল। দেখিল, বাড়ীতে মনোরমা ছাড়া আর কেহ নাই। শশীকে দেখিয়া মনোরমা আহ্লাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"মনো—সবাই কোথা?"

"তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, এখনও ফেরেননি ত।"

"আমিও আরতি দেখতে গিয়েছিলাম, ভীড়ে বোধ হয় তাঁদের দেখতে পাইনি। তাঁরা অন্নপূর্ণার আরতি দেখে ফিরবেন হয়ত। কেমন আছ মনো?"

"ভাল আছি। সারাদিন আসনি কেন?"

"এই এবার যে এলাম, এখন আর শীগ্‌গির যাচ্চিনে—তা জান?"

"সত্যি? মঠে যাবে না?"

"না, মঠ ছেড়ে দিয়েছি। এবার সংসারী হব, বিয়ে করব মনো।"

"সত্যি?—কাকীমা তা হ'লে কত খুসী হবেন। কত ঠাকুরদেবতাকে মানত করেছেন।"—বলিয়া মনোরমা ঘামিতে লাগিল।

দুইজনে অনেক কথা হইল। যে কথা চোখে চোখে অনেক বার হইয়া গিয়াছিল,—সেই কথা মুখে মুখেও হইল। শশী বলিল—বিধবার বিবাহ এখন শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে। সে উভয়ের পিতমাতাকে বুঝাইয়া তাহাকে বিবাহ করিবে।

মূঢ় বালিকা সংসারের কিছুই জানিত না;—এই কথা ধ্রুব সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল। বিধবার বিবাহ হইবে এমন একটা কাণাঘুষা সেও শুনিয়াছিল কিনা। শশিভূষণকে মনে মনে স্বামী বলিয়াই গ্রহণ করিল।

শশী বলিল, "আজ রাত্রেই তবে মাকে বলি?"

মনোরমা বলিল, "না—দেশে গিয়ে বোলো।"

শশী মনোরমার হাতটি ধরিয়া বলিল, "কেন মনো?"

"তা হলে আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। এক বাড়ীতে যতদিন আছি, ততদিন বোলো না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শশী বলিল, "তবে দেশে গিয়েই বলব।"

পিতামাতা ফিরিলেন। শশীর মা যখন শুনিলেন, শশী আর মঠে যাইবে না, বাড়ীতেই থাকিবে—তিনি হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনের সুখে বেশী করিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এই দুটি যুবক যুবতীও বেশী করিয়া পরস্পরের নিরালা সঙ্গলাভ করিতে লাগিল।

শশীর পিতামাতা বড় অদূরদর্শী।—অবশ্য শশী বা মনোরমা যে পরস্পরকে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেও পারে, এ তাঁহাদের মস্তিষ্কেই প্রবেশ করে নাই। তথাপি এ দুইজনের প্রতি তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য ছিল—ইহাদের নিভৃত সাক্ষাতের অবসর দেওয়া অবশ্যই তাঁহাদের উচিত ছিল না। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহাদের এ ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল—প্রথম শশীর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধার্ম্মিকত্ব—দ্বিতীয়তঃ সন্তানস্নেহ, 'আমার ছেলে দেবতুল্য সে কখনও' ইত্যাদি।

॥ ৬ ॥

শেষে দেশে ফিরিবার সময় হইল।—শশীর মাতা ক্রমাগত মনোরমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, কাহার মেয়ের সঙ্গে শশীর বিবাহের সম্বন্ধ করা যাইবে।

একদিন নির্জ্জনে শশীর কাছে এই সব গল্প করিতে করিতে মনোরমা বলিল, "মাকে যখন তুমি বলবে যে আমাকেই বিয়ে করবে, আর শাস্ত্র থেকে সব দেখিয়ে দেবে যে হতে আছে—তখন মায় ভারি আহ্লাদ হবে—বোধ হচ্চে।"—

মনোরমা মনে করিত এই আমার শ্বশুর, এই আমার শাশুড়ী। ভাবিত, আমিই যে ইঁহাদের পুত্রবধূ হইব, তাহা এখন জানিতেও পারিতেছেন না—কি মজা!

সকলেই দেশে ফিরিলেন। শশিভূষণকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার বাঙ্গালা কেমন বাঁকা বাঁকা হিন্দী সুরের হইয়া গিয়াছে।

হৈমবতী দেশে আসিয়াই শশীর বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

শশী তাঁহাকে বলিল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথাটা বলিল—শুনিয়া মা আকাশ হইতে পড়িলেন।

শশী বলিল, "সে কি মা! শোননি? বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত হয়েছে—আইন হয়েছে।"

মা বলিলেন, "আইনের মুখে আগুন! ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ, ওরা আইন করবে না কেন?"

"ইংরাজেরা ম্লেচ্ছ—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই যে পরম পণ্ডিত, পরম হিন্দু। তিনি প্রমাণ করেছেন।"

মা বিদ্যাসাগরের প্রতি এমন একটা কটূক্তি করিলেন যাহা লেখনীর মুখে আনয়ন করা অসাধ্য।

শশিভূষণ ভারি হতাশ হইল। ভাবিল, মা নিরক্ষর, আমার পিতা শাস্ত্রদর্শী, তিনি বুঝিবেন।

পিতা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া কহিলেন, "ছি ছি ছি! এতদিন শাস্ত্রচর্চ্চার এই ফল তোমার?"

শশী শাস্ত্রের তর্ক পাড়িতে চাহিল। পিতা বলিলেন, "মহাভারত! এ কথার আলোচনাতেও পাপ আছে।"

শশী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিল। পিতা বলিলেন, "বিদ্যাসাগর হোটেলে খায়। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।" *

ইহার অপেক্ষা প্রবলতর বিরুদ্ধযুক্তি আর কি হইতে পারে? শশী যখন দেখিল পিতার কাছেও কূল পাইল না, তখন হতাশ হইয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

* একবার কোথাকার ষ্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এক পণ্ডিতের দেখা হয়। পণ্ডিত জানিত না যে ইনিই বিদ্যাসাগর। সে তর্কের মুখে বলিয়াছিল—"বিদ্যাসাগর, হ্যাট কোট পরে, হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"বিদ্যাসাগরকে চেন তা হলে?" সে উত্তর করিল—"চিনি না? বিলক্ষণ চিনি। কতবার দেখেছি।"—এ গল্প বিদ্যাসাগর জীবনীতে আছে।

ঠিক এই সময়, ও পাড়ায় একটি কুটীরে শশিভূষণের নাম উচ্চারিত হইতেছিল। কলুগিন্নি তাঁতিদিদির সহিত কাশীর গল্প করিতেছিল। তাঁতি-দিদি বলিল—"আহা, বামনীর ভাগ্যি ভাল। সে ছেলেটা যখন মরে গেল, আমরা মনে করলাম মাগী শোকে পাগল হয়ে যাবে। ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল আছে বইকি দিদি, এই দেখ ধর্ম্ম করতে কাশী গেল বলেই না হারা ছেলেটিকে পেলে! খাসা ছেলে রাজপুত্তুরের মত চেহারা, নিষ্ঠের শরীর কিনা।"

কলুগিন্নি মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "নিষ্ঠের কথা আর ব'লে কায কি! কলি-কালে আবার ধর্ম্ম আছে না নিষ্ঠে আছে!"

তাঁতিদিদি শুনিয়া অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম—কি রকম?"

"কি রকম আবার? আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

অতঃপর চুপি চুপি অনেক কথা হইল। তাঁতিনী শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—"অ্যাঁ! গলায় দড়ি গলায় দড়ি।"

কলুগিন্নি অবশ্যই সাবধান করিয়া দিল—"কাউকে বলিসনে দিদি—দরকার কি আমাদের কারু কথায় থাকবার? যে আগুনে হাত দেবে সে নিজেই পুড়ে মরবে।"

তাঁতিনী বলিল, "দরকার কি বোন, এ কথা কি আর কাউ'ক বলবার না কারু শোনবার? কাউকে বলতে হবে না। ধর্ম্মের কল আপনিই বাতাসে নড়ে যাবে।"

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে ঢীঢী পড়িয়া গেল।

মনোরমার পিতা হারাধন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শশীর পিতা ব্রজহরির বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া দুজনে অনেক পরামর্শ হইল। ঘণ্টাখানেক পরে ব্রজহরি বাহির হইয়াঁ শশিভূষণকে আনিয়া সেই ঘরে দুয়ার বন্ধ করিলেন।

ইহার পর হারাধন প্রচার করিলেন, তাঁহার কন্যা মনোরমার হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতায় যাইবেন। সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পরে গ্রামের লোক শুনিল, শশিভূষণ আবার কাশীর মঠে ফিরিয়া গিয়াছে।

আরও কয়েকদিন পরে শুনিল, মনোরমার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুপারিশের চিঠি দিয়া '—' কলেজে শশিভূষণকে সংস্কৃতের অধ্যাপক করিয়া পাঠাইলেন।

এখন শশিভূষণ পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। মাঝে মাঝে সুপক্ক টিকিটি নাড়িয়া, স্ত্রীর হাতখানি হাতে লইয়া সস্নেহে তাহাকে বলেন—"বলি ব্রাহ্মণী, তোমার হৃদ্‌রোগটা কেমন আছে?"

প্রণয়-পরিণাম

॥ ১ ॥

হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল, প্রতিবেশী বালিকা কুসুমলতার সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে।

কবি গাহিয়াছেন—'কে এমন প্রেমিক আছে, যে প্রথম দর্শনেই ভালবাসে নাই?'—কেন, আমাদের মাণিকলাল! কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে, গাছের মগডালে উঠিয়া তাহাকে ছানাসুদ্ধ পাখীর বাসা পাড়িয়া দিযাছে, ঘোড়া সাজিযা পৃষ্ঠে তাহাকে বহন করিয়াছে, কিন্তু তখন ত সে কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই। কে জানে, হয়ত সে মনের মনে, হৃদয়ের হৃদয়ে ভালবাসিত, অন্তরের সুগোপন অন্তরালে সে প্রচ্ছন্ন প্রবাহের অস্তিত্ব নিজেও অবগত ছিল না।

মাণিকলাল নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়াছে সংপ্রতি মাত্র। সেদিন মাণিক কুসুমদের বাগানে, পেয়ারা পাড়িতে গাছে উঠিয়াছিল। কুসুম মাতার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কুসুমের পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিযা, মাণিক হৃদয় হারাইল।

ইহারা চলিয়া গেলে পর, মাণিক তাহার অন্তরে যেন এক অপূর্ব্ব আলোকের রশ্মি প্রতিভাত দেখিল। সে আলোক তাহার মনোদেহের প্রতি পরমাণুটিকে যেন বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল। আলোক মন অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহার চক্ষুযুগলে আসিয়া উপনীত হইল এবং নিমেষের মধ্যে নিখিল বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নবীন আলোকে মাণিক আকাশের পানে চাহিল—আকাশ আশ্চর্য্য নীল—এমন কখনও দেখে নাই।—বসুন্ধরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, বসুন্ধরা আজ পরমা সুন্দরী। দূরে দীর্ঘিকাতীরে ঘুঘু ডাকিতেছে—উকু পাখা কলরব করিতেছে, বউ-কথা-কও মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে; পাখীর ভাষায় যেন আজ নূতন প্রাণ, নূতন সুর। মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া, গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোষো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।

সেদিন রবিবার ছিল—স্কুল যাইতে হইবে না। আহতবৎ মন্থরপদে বাড়ী আসিয়া মাণিক পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। পড়িবার জন্য? হায়, না, পুড়িবার জন্য, চিন্তার অনলে নিজের হৃদয়কে আহুতি দিবার জন্য। শতরঞ্চ বিছান মেঝেতে ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মাণিকের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এই বয়সেই সে বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছে রাশি রাশি। 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হইতে আরম্ভ করিয়া, বটতলার 'পারুলবালা', 'সোহাগিনী', 'বউরাণী' প্রভৃতি কিছুই আর বাকী নাই।

শুইয়া শুইয়া মাণিক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দুঃখ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে। 'কেন দেখিলাম! হরি হরি কি দেখিলাম! দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? আমার মনে এ আগুন—এ কুলকাঠের আঙার—কে জ্বালিল রে? নিবিবে কি? কতদিনে—হায় কতদিনে?'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিশ দিতে দিতে লম্ফ দিয়া মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ প্রবেশ করিল। বিপিন আসিয়া একেবারে মাণিকের চুল ধরিয়া বলিল, "কি রে ইষ্টুপিট্ ঘুমুচ্ছিস নাকি? মার্ব্বেল খেলবিনে?"

মাণিক উঠিয়া বিপিনের গালে হঠাৎ এক চড় কসাইয়া দিল।

বিপিন হতভম্ব। শরৎ বলিল, "তোর হয়েছে কি? মারামারি করতে চাস, আয়"—বলিয়া শরৎ আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

বিপিন বলিল, "আঃ শরতা কি করিস।" মাণিকের পানে ফিরিয়া বলিল, "লেগেছে ভাই, রাগ করেছিস?"

মাণিক বলিল, "মানুষ শুয়ে রয়েছে, চুল ধ'রে টানলি কি ব'লে?"

শরৎ মাণিকের চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল—"আহা এ রকম করে টানলে বুঝি আবার লাগে?"—তাহার আশা ছিল, তাহাকেও মাণিক চড় মরিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শরৎ তাহার সহিত ঘুঁসি লড়িতে আরম্ভ করিবে

কিন্তু শরতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। মাণিকের ক্রোধ নিরীহ বিপিনের উপরেই সবটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। মাণিক সটান আবার শুইয়া পড়িল।

শরৎ বলিল, "না খেলিস—না খেলবি। ভারি ত বয়েই গেল কিনা।" বলিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ রে বিপনে।"

বিপিন যাইবার সময় বলিয়া গেল, "মাণিক রাগ করিসনে ভাই—যদি লেগে থাকে তোর, বিলক্ষণ শোধ ত নিয়েছিস।"

॥ ২ ॥

মাণিক আর ফুটবল খেলে না—জিমন্যাষ্টিক্ করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে—দ্বিপ্রহরে ইস্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে! প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।

কুসুম মেয়েটি দেখিতে খুব সুন্দরী না হউক, মুখখানি বেশ ফুটফুটে। পিতামাতার শেষের সন্তান—ভারি আদরের মেয়ে। কুসুম এই কার্ত্তিক মাসে এগারো বছরে পড়িয়াছে। দুই এক স্থানে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু এখনও পাকাপাকি কোথাও স্থির হয় নাই।

মাণিক ক্রমাগত কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া, কথা কহিয়া, জিনিষ দিয়া তাহার সঙ্গে একটু বেশ ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল। মাণিকের প্রতি কুসুমেরও একটা টান যেন দেখা যাইতে লাগিল।

বৈশাখের শেষে, কলেজ বন্ধ হওয়াতে, মাণিকের এক পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিক অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে কতকটা গুরুজন বলিয়া গণ্য করিত এবং ভয় করিয়া চলিত। প্রভাস আসিলেই মাণিককে পড়া জিজ্ঞাসা করিত, আঁক কষিতে দিত, পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, অসৎসঙ্গের দোষ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশাদি দিত।

কিন্তু কলিকাতার বন্ধুগণের মধ্যে প্রভাস একজন নীরব কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।

সে আসিয়া মাণিকের ভাবগতি দেখিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি ?

মাণিক ত কিছুই স্বীকার করে না। সন্ধান করিয়া করিযা শেষে একদিন প্রভাস মাণিকের কবিতার খাতা হাতে পাইল। কবিতা পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। মাণিকের উপর তাহার ভারি ভক্তি ও সৌহার্দ্দ্য বোধ হইল।

সেদিন জলখাবার খাইযা প্রভাস মাণিককে বলিল, "গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক চল।"

মাণিক প্রথমে আপত্তি করিযাছিল—কিন্তু প্রভাস অনেক জিদ্ করিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইযা, তীরে উঠানো এক ভাঙ্গা নৌকার গায়ে দুইজনে উপবেশন করিল।

প্রভাস বলিল, "আমি সব জানতে পেরেছি।"

মাণিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি ?"

"তোমার গোপন কথা।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই সিগারেটের বিষয়। ডেস্কের মধ্যে লুকানো বার্ডসাই, কাগজ প্রভৃতি প্রভাসদাদা বোধ হয় দেখিতে পাইয়াছে, সুতরাং সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বেশী চালাকি কোরো না যাও।"

প্রভাস বলিল, "এ চালাকির কথা নয়—খুব গুরুতর কথা। জীবন মরণের সমস্যা।"

এবার মাণিক যথার্থ বিষয়টি সন্দেহ করিল। বলিল, "কি হয়েছে কি ? কি বিষয় বলই না।"

প্রভাস দূরস্থিত মৃদুগামী নৌকার পালে দৃষ্টি বদ্ধ করিযা বলিল, "তোমার ভালবাসার বিষয়।"

মাণিক ভাবিল—নিশ্চয়ই বাবাকে বলিয়া দিবে এবং মার খাওয়াইবে, সুতরাং শত্রুভাব ধারণ করিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "আহা যা বল্লে আর কি ! ইয়ার্কি ভাল লাগে না।"

প্রভাস বলিল, "ভাই—আমার কাছে আর লুকাও কেন ? আমি সব জেনেছি। তোমাদের দুঃখে আমি খুব দুঃখী। তোমাদের সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি।"

মাণিক কতকটা আশ্বস্ত হইল। একটু অপ্রতিভও হইল। বলিল, "কে বললে তোমায় ?"

নৌকার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে ঠুকিতে প্রভাস বলিল, "তোমার কবিতার খাতা দেখেছি। আমাদের অতুল বাঁড়ুয্যের মেয়ে কুসুম ত ?"

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—তাই বটে।

"তোমার কবিতা থেকে যেন বোঝা যাচ্চে, আকর্ষণটা উভয়তঃ প্রবল—তাই কি ?"

মাণিক বলিল, "মনে ত হয়।"

"স্পষ্ট কখনও বলেছে ?"

"না।"

"তুমি কখনও তাকে স্পষ্ট করে বলেছ ?"

"না।"

ইহার পর দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে প্রভাস বলিল—"দেখ ওরা আমাদের স্বঘর। মিলন হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু মা বাপকে জানানোর আগে, কুসুমের মন জানা দরকার। অনুমান ফনুমান নয়, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

মাণিক বলিল, "সে কখনও পারা যায় ?"

প্রভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে না পারলে চলবে কেন ? তুমি যদি সত্যই ওকে লাভ করতে চাও, তা হলে এ বিষয়ে যা কিছু কর্ত্তব্য, সব তোমায় সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে কি ক'রে হবে ? আর দেরী করলেও চলবে না। কুসুমের কত জায়গায় বিয়ের কথা হচ্চে, কোন্ দিন বিয়ে হয়ে যাবে। তখন চিরদিনটে তোমার আপশোষ করতে হবে।"

এ কথা শুনিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতদিন সে শুধু ভালই বাসিতেছিল। বিবাহ প্রভৃতির কল্পনা কখনও করে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল, বিবাহ হইলে ত ভারি মজাই হয় !

"দাদা ! কি ক'রে তার কাছে কথা পাড়ি বল দিকিন ?"

"তা আমি শিখিয়ে দিচ্চি। একটু অবসর খুঁজে, আড়ালে পেলে, তার হাতখানি এমনি করে ধরে, তাকে বলবে—'দেখ কুসুম—আমি তোমায় ভালবাসি। একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি, তুমি আমাকে ভালবাস কি ?'

যদি বলে 'বাসি'—তা হলে জিজ্ঞাসা করবে, "তুমি আমার হবে কি—আমায় বিয়ে করবে কি?' যদি সে অনুকূল উত্তর দেয়—তা হলে তার হাতটি এই রকম করে ঠোঁটে তুলে চুমো খাবে।"

মাণিক বলিল, "কিন্তু দাদা! সে যদি রাজি না হয়?"

প্রভাস বলিল, "তা প্রথমবারেই রাজি নাও হতে পারে। ও রকম অনেক কেতাবে পড়া গেছে। প্রথমবারে কেউ কেউ একেবারেই 'না' বলে। কেউ কেউ বা বলে—'ভারি সহসা বলেছ, সময়ে উত্তর পাবে।' যে রকম হয়—তখন আবার তোমাকে শিখিয়ে দেবো।"

চাঁদ উঠিয়াছিল। দুইজনে নানা জল্পনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

॥ ৩ ॥

পরদিন হইতে মাণিকলাল অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিন চেষ্টার পর তাহা লাভও করিল। একদিন সকলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, কুসুম রান্নাঘরের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে।

মাণিক বলিল, "কুসুম! বাগানে যাবে? তোমায় আম পেড়ে দিইগে চল।"

কাঁচা আমের নামে কুসুমের জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "চল না মাণিক দাদা!"

বাগানে প্রবেশ করিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া মাণিক বলিল, "আমি ভারি ফুল ভালবাসি।"

কুসুম বলিল, "খবদ্দার—খবদ্দার—ফুল তুলো না—ফুল তুললে দিদিমা যে বকে।"

মাণিক বলিল, "না তুলছিনে। শুধু ফুল ভালবাসি তাই বলছি। ফুলকে ভাল কথায় কি বলে জান?"

কুসুম মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, কে না জানে?—পুষ্প। আমাদের পদ্যপাদপে রয়েছে—

শাখীশাখে পুষ্পগুলি কিবা মনোহর।
পাখী ডাকে সুধা ঢালে শ্রবণ ভিতর॥

আচ্ছা মাণিক দা, তুমি ত ইংরেজী পড়, শাখী মানে কি বল দিকিনি ?"—কুসুমের চক্ষু দুইটি মাণিকের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

মাণিক বলিল, "পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয় ?"

"আহা! তুমি আগে আমার কথার উত্তর দাও না মশাই। শাখী মানে কি?"

"শাখী মানে বৃক্ষ।"

"জানে রে!"—বলিয়া কুসুম হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল।

মাণিক বলিল, "এখন বল, পুষ্প ছাড়া ফুলের আর কি নাম হয়।"

"আর কি নাম ? দাঁড়াও ভাবি।"—বলিয়া কুসুম ঠোঁট নাড়িয়া বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া কি বকিতে লগিল। বোধ হয় কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল।

মাণিক বলিল—"কু—"

কুসুম বলিল—"কু ? কু কি ?

কুহু কুহু রব করি ডাকিছে কোকিল।

কুসুম—

ওহো মনে পড়েছে। ফুলের আর একটা নাম কুসুম গো কুসুম।

কুসুম দুলাযে ধীরে বহিছে অনিল ॥

আচ্ছা, মাণিকদাদা, অনিল মানে যদি বলতে পার তবে ত বুঝি!"

মাণিক বলিল, "অনিল মানে বাতাস।"

বালিকার চক্ষে একটা আনন্দ ও প্রশংসার আলোক দেখা দিল।

মাণিক যথাশিক্ষা কুসুমের হাতখানি ধরিল। ধরিয়া বলিল, "বুঝতে পারলে না ? আমি ফুল ভালবাসি বলেছি, তার মানে, আমি কুসুম ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি, কুসুম। তুমি আমায় ভালবাস ?"

কুসুম দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, হ্যাঁ।"

মাণিক বলিল, "দেখ কুসুম, অনেক দিন থেকে একটা দুরাশা মনে স্থান দিয়েছি। তুমি আমায় বিয়ে করবে ?"

প্রথম কথাটার মানে কুসুম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথাটার মানে বুঝিল। কিন্তু ঐ কথাতেই সব মাটি হইয়া গেল।—"ধেৎ"—বলিয়া মাণিকের হাত ছাড়াইয়া, কুসুম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পায়ের মল ঝমঝম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মাণিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুসুম চক্ষুর অন্তরাল হইলে, মাণিক ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। বিবাহের নামে কুসুম অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহার অর্থ কি? তবে কি কুসুম সম্মত নয়?

অধীত উপন্যাসগুলি মাণিক একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে মনে একটা মীমাংসাও পাইল। লজ্জা প্রণয়ের চির-সহচর। কুসুমের পলায়নের কারণ যে লজ্জা, সে সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

॥ ৪ ॥

প্রভাস শুনিয়া বলিল—তবে আর কোনও চিন্তা নাই। ভালবাসে যখন স্বীকার করিয়াছে, তখন বিবাহে সম্মতি ধরিয়াই লওয়া যাইতে পারে। এখন উভয় পক্ষের পিতামাতার সম্মতি করাইতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি।

মাণিক বলিল, "বাবাকে তুমি বললে বাবা রাজী হবেন ত?"

প্রভাস বলিল, "দেখ, তার চেয়ে বরং তুমিই বল, আমার বলাটা তত ভাল দেখায় না। হাজার হোক তোমার বাবা—আমার মামা বই ত নয়! বাবায় মামায় ঢের তফাৎ।"

মাণিক বলিল, "সে আমি পারব না। তুমি গোড়া থেকেই বললে তুমিই প্রস্তাবটা করবে, এখন পিছুচ্চ কেন?"

প্রভাস প্রথমটা মাণিককে যে পরিমাণ উৎসাহ দিয়াছিল, কার্য্যকালে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। মাণিকের পিতা নন্দলালবাবু অত্যন্ত রাশভারি লোক। তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কথা পাড়ায় বিলক্ষণ সাহসের প্রয়োজন।

এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে সপ্তাহ খানেক কাটিল। মাণিক ও প্রভাস যখনই নির্জ্জনে থাকিত—তখন আর দুজনের অন্য কথা নাই। পূর্ব্বে দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্য গোছের যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক ছিল, এখন তাহা ঘুচিয়া সখ্যে দাঁড়াইয়াছে।

একদিন মাণিক কুসুমের নামে একটা মস্ত কবিতা লিখিল। প্রভাস তাহা পড়িয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল—স্বয়ং অনুভব করিয়া কবিতা না লিখিলে কি আর কবিতা! বলিল, ইহা কুসুমকে নিশ্চয়ই দেখান উচিত।

উত্তম চিঠির কাগজে লালকালীর বর্ডার টানিয়া, নীল কালী দিয়া মাণিক কবিতাটি নকল করিল। তাহার পর আবার অবসর খুঁজিয়া কুসুমের সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল।

কুসুম কবিতা লইয়া পড়িল। কি বুঝিল সে জানে! মাণিক বলিল, "কুসুম, তুমি এটি রাখবে?"

কুসুম বলিল, "রাখব বইকি।"

মাণিক কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "কারুকে দেখাবে না ত কুসুম?"

কুসুম প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কারুখকে নয়।"

"খুব লুকিয়ে নিয়ে যেও। কোথায় রাখবে?"

"কেন আমার বাক্সে।"

মাণিক নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিল।

ওদিকে পরম সত্যবাদিনী কুসুম বাড়ী গিয়াই বলিল, "দিদি একটা কথা বলি শোন্।"

তাহার দিদির নাম নলিনী। সে ষোল বৎসরের, বিবাহিতা; স্বামীর প্রেমে ভরপূর—মনের সুখে হাস্য কৌতুকময়ী।

দিদি আসিলে কুসুম বলিল, "মেজদি একটা মজা দেখবি?"

"কি?"

কুসুম খামখানি বাহির করিয়া বলিল, "কারুকে বলবিনে?"

"কার চিঠি লা?"—বলিয়া নলিনী ছোঁ মারিয়া খাম কাড়িয়া লইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল :—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।"

পড়িয়া নলিনী অবাক। পাতা উল্টাইয়া নাম খুঁজিল, কোনও নাম নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথা পেলি?"

"মাণিকদাদা দিয়েছে।"

"কে? ম্যান্কা?"

"হ্যাঁ।"

নলিনী গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা কি হবে! তোকে এ সব লিখেছে কেন?"

কুসুম ভীত হইয়া বলিল, "তা কি জানি!"

"এ যে ভালবাসার কবিতা! তোদের ভালবাসা হয়েছে নাকি লো?"

কুসুম বলিল, "ম্যানকা আমায় একদিন বলছিল যে আমি তোকে ভালবাসি।"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আহা তা বেশ! ছেলেটির পছন্দ ভাল"—বলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
দিবা রজনী
তব মুখখানি
মনে লই।"

পড়িয়া নলিনী হাসিয়া কুটিকুটি। বলিল—"দুনিয়ার আর মিল খুঁজে পেলে না, শেষে লিখলে কিনা 'মনে লই'। তার চেয়ে 'চিঁড়ে দই' লিখলে ঢের বেশী সরস হত। কি বলিস কুসুমি? শোন্ দিকিন—

কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি,
দিবা রজনী
চিঁড়ে দই।

অর্থাৎ কিনা চিঁড়ে দই দেখলে, কারু কারু যেমন খাবার লোভ হয়, তোমার মুখখানি দেখলে—আমারও সেই রকম—লোভ হয়।"—বলিয়া নলিনী খুব হাসিতে লাগিল।

হাসির শব্দে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "অত হাসছিস কেন? হয়েছে কি?"

নলিনী মার হাতে চিঠি দিয়া বলিল, "এই নাও মা, তোমার ছোট জামাই তোমার মেয়েকে কি লিখেছে দেখ।"

মা লেখার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ না! কি বলিস তার ঠিক নেই। কি এ?"

নলিনী মার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "ভালবাসার চিঠি। এত বড় মেয়ে হল, বিয়ে দিচ্চ না—তা মেয়ে নিজের বর নিজেই ঠিক ক'রে নিয়েছে।"

মা ত অবাক। বলিলেন, "কে লিখেছে এ সব?"

"সে পরে বলব। আগে শোনই না।"—বলিয়া মার হাত হইতে কবিতা লইয়া নলিনী পড়িতে আরম্ভ করিল—

"কুসুমলতা
মনের কথা
শুন সই।
তব মুখখানি
দিবা রজনী
মনে লই।
শয়নে স্বপনে
কিম্বা জাগরণে
সদা সর্ব্বদা
চিন্তা করি তোমা
রূপ নিরুপমা
ওগো প্রেমদা।
ভাবিয়া ভাবিয়া
নিদ্রা তেয়াগিয়া
ফেলি অশ্রুজল।
যথা শুষ্ক তরু
হয় এবে সরু
দেহ টলমল।—"

মা বাধা দিলেন। বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস, রঙ্গ ভাল লাগে না। কে লিখেছে বল্ না?"

"চৌধুরীদের ম্যান্‌কা লিখেছে।"

"ম্যান্‌কা? আরে গেল যা! কি দস্যি ছেলে গো! এ কি বিদ্যে?"—বলিয়া মা কুসুমকে খুঁজিতে লাগিলেন, "কুস্‌মি, কুস্‌মি, কুস্‌মি কোথা গেল?"

কুসুম গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই চম্পট দিয়াছিল।

ক্রুদ্ধা জননী বাহির হইয়া কুসুমকে গ্রেপ্তার করিলেন। বলিলেন, "এ কি রে শতেকখোয়ারী?"

কুসুম গোঁ হইয়া বলিল, "আমি কি জানি!"

"তুই জানিসনে ত কে জানে আবাগী?—খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন হাতী হচ্চেন—আর এই সব বিদ্যে হচ্চে! কি হয়েছে বল্‌।"

কুসুম বলিল, "হতভাগা নক্ষিছাড়া ম্যান্‌কা আমায় দিলে ত আমি কি করব?—আমার বুঝি দোষ, বা রে!"

"কি বলেছে দেবার সময় তোকে?"

"বলেছে মাকে কি কাউকে দেখাসনে—বাক্সতে লুকিয়ে রাখিস।"

মা তখন কুসুমকে অনেক জেরা করিলেন। জেরার শেষে কুসুম বলিল, "একদিন বাগানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ম্যান্‌কা আমায় বললে কি, তোকে আমি আম পেড়ে দেবো তুই আমায় বিয়ে করবি? 'দূর পোড়ারমুখো' বলে আমি পালিয়ে এলাম।"

এই কথা শুনিয়া, রাগের মধ্যেও মার ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। শেষে তিনি বলিলেন—"শোন্‌ বলছি। ফের যদি ম্যান্‌কার ত্রি-সীমানায় যাবি কি ওর সঙ্গে কথা ক'বি, কি খেলা করবি—তা হলে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলব। বুঝেছিস?"

কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বা রে! আমি কি করব? আমায় দিলে কেন?"

মা তখন সে কবিতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া উনানে ফেলিয়া দিলেন।

॥ ৫ ॥

অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন—যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনও মসৃণ হয় নাই। যে ভালবাসিয়াছে, সেই কাঁদিয়াছে। প্রেম যে 'কেবলি যাতনাময়', তাহাতে যে 'কেবলি চোখের জল' এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

কুসুম ত বকুনি খাইয়াই নিস্তার পাইল, কিন্তু মাণিকলালের অদৃষ্টে আরও দুর্গতি লেখা ছিল।

মাণিকের পিতা নন্দ চৌধুরী গ্রামের ডাক্তার—খুব পশার। প্রাতে রোগী দেখিতে বাহির হন, যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় বারোটা। স্নান আহার করিয়া নিদ্রা যান।

সুতরাং প্রভাস ও মাণিক পরামর্শ করিল, বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রভাস গিয়া কথাটা পাড়িবে।

দুইজনে বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তায় দুইজনের মুখই কালিমাময়।

শেষে চারিটা বাজিল শব্দ শোনা গেল, বিছানা হইতে নন্দ চৌধুরী হাঁকিলেন, "ওরে বুনো—তামাক নিয়ে আয়।"

আরও কয়েক মিনিট গেল। তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাস গিয়া মামাবাবুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

নন্দ চৌধুরী বিছানার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চৌকিতে গুড়গুড়ি রক্ষিত। ধূমপান করিতেছেন।

প্রভাস প্রবেশ করিয়া, বিছানার কাছে একটা চেয়ার ছিল তাহাতে বসিল।

নন্দ চৌধুরী বলিলেন, "কি প্রভাস!" তাঁহার স্বর বৈকালিক নিদ্রার শ্লেষ্মাজড়িত।

প্রভাস কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল, "আজ্ঞে একটা কথা আজ আপনাকে বলব মনে করেছি।"

নন্দ চৌধুরী উৎসুক হইয়া, গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে খুলিয়া প্রভাসের পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি?"

প্রভাসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল—কেন আসিলাম—কেন এ জালে নিজেকে জড়াইলাম?—কিন্তু আরম্ভ যখন করিয়াছে, আসরে নামিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। সুতরাং বাক্যস্ফুরণ করিতে বাধ্য হইল। বলিল, "আমাদের মাণিকের জন্যে ভারি চিন্তিত হতে হয়েছে।"

"কেন? কি হয়েছে? কোনও ব্যারাম-স্যারাম নাকি?" ডাক্তার মানুষ, ব্যাধির কথাটাই প্রথমে মনে হয়।

প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে শারীরিক ব্যারাম নয়, মানসিক বটে।"

চৌধুরী গুড়গুড়ির নল পুনরায় মুখে লইয়া বলিলেন—"কি রকম?"

"ও একটি মেয়ের সঙ্গে Love-এ পড়েছে।"

গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে একেবারে বিছানায় ফেলিয়া নন্দ চৌধুরী উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বললে?"

প্রভাস তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া বিপদ গণিল। বলিল, "আজ্ঞে, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে।"

"প্রণয় হয়েছে? সে আবার কি রকম? ব্যাপারখানা কি? কার সঙ্গে প্রণয় হয়েছে?"

"আজ্ঞে, অতুল বাঁড়ুয্যের যে কুসুমলতা ব'লে একটি মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ও 'লভে' পড়েছে। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, যদি ওর জীবনের সুখ চান, তবে কুসুমের সঙ্গে ওর বিবাহ দিন।"

নন্দ চৌধুরী শুনিয়া গম্ভীর হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'রে 'লবে' পড়ল?"

প্রভাস মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। ভাবিল, তবে সন্তানের দুঃখে পিতার মন গলিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞে, কি রকম করে পড়ল তা বলা বড় কঠিন—তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আর্কষণটা উভয়তঃ প্রবল।"

চৌধুরী বলিলেন, "উভয়তঃ প্রবল?—বটে!"—বলিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করতে চায়?"

মাথা নীচু করিয়া, ধীরে ধীরে প্রভাস বলিল, "আজ্ঞে এই ত একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম। মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।"

চৌধুরী বলিলেন, "মরুভূমি? ওঃ!"—বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

প্রভাস একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয় প্রায়ই ভারি গভীর হয়। তাকে বাধা দিতে যাওয়া অনেক সময় সর্ব্বনাশ।"

চৌধুরী বলিলেন, "ম্যানকাকে ডাক।"

প্রভাস উঠিয়া পড়িবার ঘরে গেল। দেখিল, হাতে মুখ ঢাকা দিয়া মাণিক শুইয়া আছে। একটু হাসিমুখে বলিল, "মাণিক যাও ভাই মামাবাবু ডাকছেন।"

মাণিক বলিল, "কি রকম বুঝলে?"

"এ পর্য্যন্ত ত খুবই আশাপ্রদ। খুব সহৃদয় ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।"

মাণিকের কিন্তু বিশ্বাস হইল না। সত্যই কি এত সৌভাগ্য তাহার হইবে? বলিল, "চল তবে।"

প্রভাস বলিল, "তুমি একা যাও। কারণ এ সময় কোনও তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা ঠিক নয়। বিষয়টা ভারি—কি বলে গিয়ে—ইয়ে কিনা।"

মাণিক বলিল, "না ভাই তুমি এস—নইলে আমার ভারি ভয় করবে।"

প্রভাস বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশ পরে আমি যাচ্চি"—বলিয়া মাণিককে ঠেলিয়া দিল।

মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁপ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।

নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এগ্‌জামিন কবে?"

মাণিক বলিল, "আর বারো দিন আছে।"

"কি রকম তৈরি হল?"

"আজ্ঞে, হয়েছে এক রকম।"

"পড়াশুনো করছিস বেশ মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?"

"আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।"

"তবে কি করিস? 'লবে' পড়েছিস নাকি শুনলাম?"

মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "উত্তর দিচ্ছিসনে যে?"

মাণিক কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহার পিতার রক্ত-চক্ষু দুইটা ঘুরিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল।

ঘূর্ণায়মান চক্ষু স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "ইষ্টুপিড্ শূয়োর! আজ বাদে কাল এগজামিন—লেখা গেল পড়া গেল, লব্ হচ্চে?"—বলিয়া ঠাস্ ঠাস্ করিয়া তাহার গণ্ডদেশে কয়েকটা চড় কষাইয়া দিলেন।

প্রভাস এই সময়ে দুয়ারের কাছ বরাবর আসিয়াছিল। চড়ের শব্দ শুনিয়া সে অবিলম্বে চম্পট দিল।

মাণিক দুই হাতে মুখ ও চক্ষু ঢাকিয়া অনুচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

নন্দ চৌধুরী তখন বালককে ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এ ক'দিন দিবেরাত্তির কেবল প্রভাসের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস্ হচ্চেই হচ্চেই—আমি ভাবি ব্যাপারটা কি—এরা কুইনের রাজ্য নেবারই মৎলব করছে—না কি করছে? হতভাগা পাজি নচ্ছার হনুমান! লবে পড়া হয়েছে! মরুভূমি হয়ে যাবে! এত কথা শিখলে কোথা তাই ভাবি। আমরা বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এত কথা ত জানিনে! পড়াশুনোর নাম নেই। খাবি কি এর পরে? আমি এই সারা দুপুর রোদ্দুরটা মাথায় ক'রে, রুগীর নাড়ী টিপে বেড়াচ্চি, দুটো পয়সার জন্য মুখে রক্ত উঠে মরছি—যতদিন বেঁচে আছি ততদিন মন দিয়ে পড়ে শুনে নিজের কায কিনে নে—তা নয় লবে পড়েছেন ছেলে আমার! আর প্রভাসটা যে কলেজে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছে তা ত জানতাম না! ওকালৎনামা নিয়ে এসেছ! আরে গেল যা!—ফের যদি ওসব পাগলামি শুনতে পাই ত জুতিয়ে পিঠ ছিঁড়ে দেবো।"

অতঃপর মাণিক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও অতি সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না বটে—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর। এত খাইল যে তাহার পরদিন অসুখ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে সপ্তাহখানেক স্কুলে গেল না। প্রভাস চলিয়া গিয়াছিল। প্রেমিকের আদর্শ খর্ব্বতার জন্য মাণিকের কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবারও রহিল না। তাই অসুখ দুই দিনেই ভাল হইলে—বাকী দিনগুলির অধিকাংশ সময় মাণিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া অতিবাহিত করিল।

ছদ্মনাম

॥ ১ ॥

প্রেসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়া ছুটির পূর্ব্বেই পূজার 'বঙ্গপ্রভা' বাহির করিয়া ফেলিমাম। ডেস্প্যাচ সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দিতেছি, হ্যাট-কোট পরিয়া সিগারেট মুখে করিয়া সতীশ আসিয়া উপস্থিত। বলিল, "দার্জ্জিলিঙ চল।"

সতীশ আমার বাল্যবন্ধু। আমরা এক ক্লাসে পড়িতাম, একত্র বসিতাম, একত্র বেড়াইতাম—পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে বলিতেন কানাই বলাই।

এণ্ট্রান্স পাস করিয়া দুইজনে কলিকাতায় কলেজে আসিলাম—তখন হইতে আমাদের দুইজনের জীবনের আদর্শ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল সতীশ সর্ব্ববিষয়ে সাহেব হইয়া উঠিতে লাগিল;—আমি আমার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশালী হইলাম। আমি বাঙ্গালা পড়ি, বাঙ্গালা লিখি বলিয়া সতীশ আমাকে বিদ্রূপ করিত; সতীশের সাহেবিয়ানাকে আমি সুযোগ পাইলেই গালি দিতাম।

তারপর সতীশ বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিল—সাহেবিয়ানার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিল।

আমরা বাল্যকালে যেরূপ এক-প্রাণ এক-আত্মা ছিলাম, এখন আর সেরূপ নাই। সতীশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সতীশ আমাকে হয় ত তাহার সকল মনের কথা আর বলে না। তথাপি আমরা পরস্পরের পরম বন্ধুই আছি।—সতীশ বলিল, "দার্জ্জিলিঙ চল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে যাচ্চ?"

সে বলিল, "আজ।"

আমি বলিলাম, "পাগল! আজ সময় কোথা?"

সতীশ ঘড়ি খুলিয়া, দন্তে চুরোটিকা দংশন করিয়া বলিল, "মোটে দশটা বেজেছে। চারটের সময় ট্রেণ। ছ ঘণ্টা। তিনশো ষাট মিনিট। রাশি রাশি সময়।"

আমি বলিলাম, "সাহেব! অনুগ্রহ ক'রে যদি বাংলাই বলছ, তবে খাঁটি

বাংলাটাই বল। ইংরেজি থেকে তর্জ্জমা করে বোলো না। 'রাশি রাশি সময়' কি রকম বাংলা হল?"

সতীশ অধীর হইয়া বলিল, "হ্যাং ইওর বাংলা। যাবে কিনা বল।"

আমি বলিলাম, "ভাই! তুমি সাহেব হয়েছ—তোমরা যত চট্‌পট্ কায করতে পার, আমরা কালা আদমি কি তা পারি? স্নান করতে খেতে বারোটা বেজে যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম—"

সতীশ বলিল, "ননসেন্স! ওসব ওজর রেখে দাও।"

আমি বলিলাম, "তা দার্জ্জিলিঙ যদি যাবারই ইচ্ছে, তবে দু'দিন আগে বললে না কেন?"

"আজ সকালে মাত্র দার্জ্জিলিঙ থেকে ডাক্তার সেনের নিমন্ত্রণ পেলাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি! ডাক্তার সেন দার্জ্জিলিঙে? সপরিবারে? সকন্যা?"

সতীশ বলিল, "অবশ্য।"—বলিয়া একটু একটু হাসিতে লাগিল।

ডাক্তার সেনের বিদুষী কন্যা নির্ম্মলা আমার বন্ধুরত্নের মনোহরণ করিয়াছেন, ইহা সত্য।

আমি বলিলাম, "কি ভয়ানক! চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে গাড়ী নেই?"

সতীশ অভিনেতার মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না।"

আমি গান ধরিলাম—

"এমনে কেমনে রব, না হেরে তাহায় রে,—
গণিয়ে নিমেষ পল, দিন না ফুরায় রে!"

যদিও নিজে কখনও রমণীর প্রেমে পড়ি নাই, তথাপি ব্যাপারটা জানা আছে। সতীশকে একদিন দেরী করিতে বলাও যা, আর ব্যাঘ্রকে অহিংসা-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টাও তাহাই। সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া চারিটার গাড়ীতে দুইজনে যাত্রা করা গেল।

॥ ২ ॥

দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশনে গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই কিছুদূর হইতে দেখা গেল, ডাক্তার সেন পুত্রকন্যা লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন। বাঙ্গালীর মেয়েকে জুতা মোজা পরিয়া প্রকাশ্যভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। ব্রাহ্মমহিলা আমি এ জীবনে অনেক দেখিয়াছি, দুই একজনের সঙ্গে পরিচয়ও আছে, এরূপ আচরণ কিছুই নূতন নহে, তথাপি সতীশের ভাবী বধূ, ভাবী শ্বশ্রূ বলিযাই নূতন করিয়া আঘাতটা লাগিল। আমি স্ত্রীশিক্ষার খুব পক্ষপাতী কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা জিনিষটা দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। আমার কাগজে সম্প্রতি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও লিখিবার উপকরণ তখনই মাথার ভিতর গজাইতে লাগিল। খুব কড়া-কড়া চোখা-চোখা বাক্যাবলী মস্তিষ্কের ভিতর শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণেই তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

গাড়ী হইতে নামিয়াই সতীশ আমাকে সকলের কাছে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস' করিয়া দিল। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত না জানা থাকায়, আমি থতমত খাইয়া কোনও কথা বলিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত দন্তবিকাশ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সতীশটার লজ্জা সরম কিছুই নাই, নির্ম্মলার ভাইকে লগেজের সন্ধানে প্রেরণ করিয়া, নির্ম্মলার সঙ্গ জোঁকের মত ধরিয়া রহিল।

নির্ম্মলা একটু পরেই আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, "মন্মথবাবু, আমি আপনার কাগজের একজন নিয়মিত পাঠিকা।"—আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, বলিল না।

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "পূজোর 'বঙ্গপ্রভা' কবে বেরুবে মন্মথবাবু?"

আমি বলিলাম, "পূজোর বঙ্গপ্রভা? সে ত বেরিয়ে গেছে।"

মিসেস সেন কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "পেয়েছিস?"

নির্ম্মলা বলিল, "কই না।"

আমি বলিলাম, "না না, মাফ করবেন। এখনও আপনাদের পাবার সময় হয়নি। এই কাল মোটে বেরিয়েছে। বিস্তর গ্রাহক, মফস্বলে সব ডেস্প্যাচ একদিনে হয়ে ওঠে না কিনা!"

নির্ম্মলা বলিল, "ওঃ—আমার বঙ্গপ্রভা প্রথমে ঢাকায় যাবে, তারপর

ঠিকানা কেটে এখানে আসবে, তবে আমি পাব! আপনার কাছে একখানা নেই মন্মথবাবু?"

বঙ্গপ্রভার প্রতি নির্ম্মলার টান দেখিয়া আমার সম্পাদক-প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আছে বইকি। আপনাকে কালই এক কপি পাঠিয়ে দেব।"

নির্ম্মলা বলিল, "বেশী কষ্ট করবেন না, সুবিধে মত পাঠিয়ে দেবেন।"

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "মন্মথবাবু, কাল বিকেলে আমাদের বাড়ী চায়ে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আসবেন।"—বলিযা সস্মিত অভিবাদনান্তর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি স্যানিটেরিয়ম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভাবিলাম, শিক্ষা ও সংসর্গের এমনই গুণ, বাঙ্গালীর মেযেও কথাবার্ত্তায এমন নিঃসঙ্কোচ হইতে পারে!

রাত্রে বিছানায় ক্লান্তদেহ রাখিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই যে নূতন শিক্ষার সঙ্গে নূতন আচার ব্যবহার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানি করিতেছি, ইহার ভাবী ফল কিরূপ দাঁড়াইবে?—চিন্তা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পুর্ব্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

॥ ৩ ॥

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চা পান করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিলাম। সমাজে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলামেশা আমি সামাজিক নীতির পক্ষে নিরাপদ মনে করি না। তাই ভাবিলাম চায়ের নিমন্ত্রণে যাইব না; নিজের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কায করিব কেন? 'বঙ্গপ্রভা'খানা চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিলেও চলিবে। আর হযত সতীশও এখনই আসিবে, তাহার হাতে পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

কিন্তু সতীশটা এমনই গর্দ্দভ—আসিল না। বোধ হয় নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল না। মনে মনে উহাদের প্রেমলীলা কল্পনা করিয়া কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম।

আহারাদির পর মনে হইল, চায়ের নিমন্ত্রণ যদি রক্ষা না করি, তাহা হইলে ঠিক ভদ্রতা হয় না। নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন রক্ষা করিতে আমি

বাধ্য। যদি বিশ্বাসবিরুদ্ধই হইল, তবে সেই সময়েই আমার উচিত ছিল—নিমন্ত্রণ কাটাইয়া দেওয়া। আজিকার মত যাই। ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া যাইবে—আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি না।

বৈকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বেশবিন্যাস একটু যত্নপূর্ব্বকই করিলাম। নিজেকে বুঝাইলাম, শুধু পুরুষ-সমাজে বিচরণ করিতে হইলে বেশভূষার তারতম্যে আসিয়া যায় না—কিন্তু রমণীসমাজে একটু পারিপাট্য অবশ্যকর্ত্তব্য।

দার্জ্জিলিঙ আমি বহুবার আসিয়াছি—পথঘাট আমার সর্ব্বত্র পরিচিত। যখন বাড়ীর কাছে পৌঁছিলাম, তখন চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে—নিমন্ত্রণ চারিটার সময়। ভাবিলাম, ইহারা ইংরাজি মেজাজের লোক, যথাসময়ের পূর্ব্বে যাইলে হয়ত বা বর্ব্বর মনে করিবে। তাই বাহিরে এদিক ওদিক একটু বেড়াইয়া, ঠিক চারিটার সময় কার্ড পাঠাইয়া দিলাম।

সকলে আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নির্ম্মলাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছিল। ষ্টেশনে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার গায়ে ইংরাজি কেপ, পায়ে ইংরাজি জুতা—দেখিতে আমার মোটে ভাল লাগে নাই। এখন দেখিলাম, পায়ে লাল মখমলের দেশী জুতা, নারাঙ্গি রঙের তাফ্‌তা শাড়ীখানি নব্য প্রথায় পরা, মাথায় মাথাভরা চুলের এলো খোঁপা এবং খোঁপায় একটি পীতবর্ণের পাহাড়ী গোলাপ। নির্ম্মলা বেশ সুন্দরী বটে!

সতীশকে প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে নির্ম্মলার লাল মখমলের জুতার প্রসঙ্গে 'রাঙা পা দুখানি' বলিয়া কেমন রসিকতা করিব, তাহা মনে মনে সাধিয়া রাখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আসিল। চা পান ও নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইলে পর সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাইবার পরামর্শ হইল।

ঘণ্টাখানেক ভ্রমণের পর যখন বিদায় লইলাম, তখন মিসেস সেন বলিলেন, "মন্মথবাবু, কাল যদি আবার চায়ের সময় আসেন, তবে একত্র বেড়াতে যাওয়া যায়।"

মনে হইল, এইবার সময় হইয়াছে, এই বেলা নিমন্ত্রণ স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করি। সেই সঙ্গে অস্বীকার করিবার প্রকৃত কারণটাও খুলিয়া বলিব কি? তাহার ভিতর সমাজনীতি-ঘটিত কত বড় একটা উচ্চতত্ত্ব ও আদর্শ নিহিত

রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার এই অবসর গ্রহণ করা উচিত নয় কি? কিন্তু আবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ কই? 'যদি আসেন'—ইহাকে কি নিমন্ত্রণ বলা যাইতে পারে? এইরূপ মানসিক তর্কে ব্যস্ত থাকায় কোনও উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলাম না; এদিকে ইঁহারাও নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে বেলা দশটার সময় সতীশ আসিয়া উপস্থিত। নির্ম্মলাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "তোমার সেই হতভাগা কাগজ বঙ্গদর্শন না বঙ্গপ্রভা কি দিয়ে এসেছ, সকাল থেকে তাই নিয়ে ব্যস্ত। আমি রাগ ক'রে চলে এলাম।"

শুনিয়া আমার মনটা ভারি খুসী হইল। সাহিত্যের প্রতি নির্ম্মলার এত অনুরাগ! নির্ম্মলা যদি বাঙ্গালা লেখেন তবে সংশোধন করিয়া বঙ্গপ্রভায় ছাপাই।

নির্ম্মলার অনেক গল্প সতীশ করিল। এই দুইটি নব-প্রণয়ীর সুখে আমারও মনটা তারুণ্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সতীশ বলিল, "এখন যাই। কেমন ঘর পেয়েছ দেখতে এসেছিলাম। চায়ের সময় দেখা হবে। আসছ ত?"

আমি বলিলাম, "চায়ে? আজ আর না। মিসেস সেন ত আমায় নিমন্ত্রণ করেন নি।"

সতীশ বলিল, "করেছেন বইকি! আমি নিজে শুনেছি।"

"কোথা করেছেন? শুধু বলেছেন 'আসেন যদি'।"

"বিলক্ষণ! ঐ ত নিমন্ত্রণ হল। তবে কি তোমার দরজায় এসে গলায় বস্ত্র দিয়ে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ করে যেতে হবে নাকি? আচ্ছা সেকেলে তুমি ত হে!"

আমি বলিলাম, "বল কি? কিন্তু আমি ত আজ যেতে পারছিনে। না গেলে কি ভয়ানক অভদ্রতা হবে? কি জানি, তোমাদের সব বিলিতি এটিকেট ফেটিকেট জানিনে ভাই।"

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ভয়ানক অভদ্রতা হবে।"

শুনিয়া আমি নিজের প্রতি ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সময় মিসেস

সেনকে অন্ততঃ এইটুকু বলিলেই হইত, 'না কাল আর আসতে পারব না, একটু কায আছে'—তা না করিয়া, এটা রীতিমত নিমন্ত্রণ হইল কিনা সেই মানসিক তর্কে ব্যস্ত রহিলাম ; এখন এই অবস্থা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, "না না, 'ভয়ানক অভদ্রতা' হবে না, অত চিন্তিত হয়ো না। শুধু আবার দেখা হলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেই চলবে। কিন্তু আসবে না কেন? না না—এস।"

প্রকৃত কারণ সতীশকে একা বলিতে ততদূর উৎসাহ হইল না। আমি বলিলাম, "ওহে আজ একটু বিশেষ—"

সতীশ বলিল, "বিশেষ কায কাল হবে, আজ ত এস। অন্ততঃ আসতে চেষ্টা কোরো।"—বলিয়া সে অন্তর্দ্ধান করিল।

আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "যাই বল যাই কও, আর আমি যাচ্চিনে।"

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বড় একা অনুভব করিতে লাগিলাম। পূজার 'বঙ্গপ্রভা'খানা নির্ম্মলার কেমন লাগিল জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্যও জন্মিল। বিশেষতঃ আমার স্বলিখিত সেই 'নারী-জীবনের আদর্শ' প্রবন্ধটা সম্বন্ধে।—নির্ম্মলার শ্রেণীর আজি কালিকার আলোক-প্রাপ্তা নারীগণের জন্যই সে প্রবন্ধটা লিখিয়াছি কিনা। সে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নির্ম্মলার মতামত কিরূপ হইল তাহা জানা আবশ্যক।—সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলাম।

॥ ৫ ॥

গিয়া দেখিলাম, ড্রইং রুমে কেহ নাই। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া আছি, নির্ম্মলা আসিলেন, হাস্যমুখে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! আপনার আশা ত আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। বাবা, মা, সতীশবাবু বাগান দেখতে গিয়েছেন। সতীশবাবু বললেন আপনি আজ আর আসবেন না—ভারি ব্যস্ত আছেন। কোনও নূতন লেখায় বুঝি?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, না—একটু কায ছিল, তাই ভাবলাম—"

নির্ম্মলা বলিল, "আচ্ছা, বঙ্গপ্রভায় রোজ ক'ঘণ্টা ক'রে আপনার সময় যায়?"

"আমার সমস্ত সময়ই প্রায় বঙ্গপ্রভায় যায়। আমি ত বঙ্গপ্রভা নিয়েই আছি।"

"বেশ আছেন। আমারও ইচ্ছে করে, আমিও ঐ রকম সাহিত্যচর্চ্চা নিয়ে দিনরাত থাকি। কিন্তু আপনার কাছে এ মত ব্যক্ত করা বোধ হয় খুব দুঃসাহসের কায ?"

"কেন ?"

"আপনি নারীজীবনের আদর্শ প্রবন্ধে যে সব কথা লিখেছেন—আপনার মতে, স্ত্রীলোকের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পরসেবায় আত্মনিয়োগই যথার্থ নারীধর্ম্ম।"

"আপনি তা হলে প্রবন্ধটা পড়েছেন ?"

"পড়েছি বইকি ; সব পড়ে ফেলেছি। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখি—মোমবাতিটা শেষ অবধি পুড়ে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, ঘরে ভয়ানক আলো হয়েছে, দেখে প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল !"

আমি বললাম, "ওঃ—ভাগ্যে কিছু ধ'রে ট'রে যায়নি।"

স্মিতমুখে নির্ম্মলা বলিলেন, "আপনার বঙ্গপ্রভা পড়তে গিয়ে যদি আমার মশারিতে আগুন ধ'রে যেত, আমি পুড়ে যেতাম, তবে এই দুর্ঘটনা কাগজে কাগজে ছাপা হ'লে আপনার বঙ্গপ্রভার খুব একচোট বিজ্ঞাপন হয়ে যেত।"

ইহার উত্তরে প্রথমটা আমার কথা যোগাইল না—শুধু একটা উপমা মাথার ভিতর ঘুরিতে লাগিল। যে মোমবাতি জ্বলার কথা বলিতেছেন, এই সুশিক্ষিতা নারীটি তাহারই মত কি সুকোমল, অথচ তাহারই শিখার মত কি দীপ্তিমতী ? আমি একটু অর্দ্ধশূন্য হাসি হাসিলাম, শেষে বলিলাম, "বাঙ্গলা সাহিত্যে আপনার এত ভক্তি, বাঙ্গলা লেখেন না কেন ?"

"আমি লিখলে কে পড়বে ? প্রথমতঃ, কে ছাপবে ?"

আমার খুব সন্দেহ হইল, নির্ম্মলা গোপনে গোপনে লিখিয়া থাকেন। কিন্তু স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না।

সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে ছোট গল্পের কথা উঠিল। আমি বলিলাম—প্রতিমাসে একটা করিয়া ছোট গল্প দেওয়ার যে রীতি হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে ভাল গল্পাভাবে সম্পাদককে মুস্কিলে পড়িতে হয়।

নির্ম্মলা বলিলেন, "আমার একটি বন্ধু ছোট গল্প লেখেন। আমার কাছে একটা রয়েছে। আপনি দেখবেন ?"

এ বিপদের সম্ভাবনা জানিলে ছোট গল্পের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিতাম না। সম্পাদকীয় ঘানি টানিতে টানিতে শিক্ষানবীসের অনেক গল্প আমাদিগকে পড়িতে হয়। কিন্তু এ একমাস আমি ছুটি লইয়া পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছি। —তথাপি নিরুপায়। সুতরাং নির্ম্মলাকে বলিলাম, "তা দেবেন, দেখব।"

"দেখে আপনার যথার্থ মতামত আমায় বলতে হবে।"

"তা বলব।"

"আমার বন্ধু বলে কিছু রেখে ঢেকে বলবেন না ?"

"আপনি যদি যথার্থ মতই শোনবার জন্যে উৎসুক হন, তা হলে আমি যথার্থ মতই বলব।"

নির্ম্মলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরে, রুল টানা ফুল্‌স্ক্যাপে হাফ মার্জ্জিনে সুন্দর সাবধান হস্তাক্ষরে লেখা, লাল রেশমে কোণ গাঁথা একটি পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া আমি বলিলাম, "নূতন লেখক ?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ, কি ক'রে জানলেন ?"

"নূতন লেখকেরা প্রায়ই বেশ ধরে ধরে যত্ন করে পাণ্ডুলিপি লিখে থাকেন। পুরোনো লেখকদের হস্তাক্ষর প্রায়ই অস্পষ্ট হয়।"

এই কথা বলিয়া, সম্পাদকীয় অভ্যাসবশতঃ শেষ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নাম খুঁজিলাম। নাম নাই। শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইয়া দেখিলাম, নায়ক বা নায়িকা বিষপান করিয়াছে কিনা। নূতন লেখকের নায়ক নায়িকা শেষটায় প্রায়ই বাঁচে না। দেখিলাম নায়ক নায়িকা বাঁচিয়াই আছে—অনেকটা ভরসা হইল।

সন্দেহ হইল, এ লেখা হয়ত বা নির্ম্মলার নিজেরই। অনেক লাজুক লেখক, প্রথম প্রথম অন্যকে নিজের লেখা দেখাইবার সময়, বন্ধুর লেখা বলিয়া থাকেন।

নির্ম্মলাকে বলিলাম, "আজ আমি বাসায় গিয়ে এ লেখা পড়ব, কাল এসে আপনাকে মতামত বলব।"

লেখা নির্ম্মলার হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। মতামত কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা আগে হইতেই জানা আছে। বন্ধুত্বের স্থলে নূতন লেখকের লেখার সমালোচনা শতসহস্রবার করিতে হইয়াছে। বাঁধি গৎ আছে—সেইগুলি

গুছাইয়া বলা মাত্র। 'স্থানে স্থানে বেশ হৃদয়গ্রাহী'—'চর্চ্চা রাখিলে ক্রমে একজন ভাল লেখক হইতে পারেন'—ইত্যাদি।

ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। চা পানাদির পর বাড়ীতে বসিয়াই গল্প চলিল—বেড়াইতে যাওয়া আর হইল না।

॥ ৬ ॥

বাড়ী গিয়া গল্প পড়িলাম। দেখিলাম, খুব ভুল করিয়াছি। প্রথমতঃ নূতন লেখকের রচনা নহে। হাত বেশ পাকা—ভাষা তেজস্বী অথচ সংযত। দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মলার লেখা নহে। এতকাল বৃথাই সম্পাদকতা করিতেছি না। কাহার লেখা তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরীকান্ত রায়ের লেখা। সাক্ষাৎ আলাপ নাই—শুনিয়াছি ঢাকার ঐ দিকেই কোথায় থাকেন। লেখা তাঁহার অনেক পড়িয়াছি। তিনি নব্য লেখকগণের মধ্যে একজন প্রধান। তবে লেখায় অনেক দোষও আছে—সে সব অল্প বয়সের দোষ। ক্রমে শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন নির্ম্মলার কাছে গিয়া, লেখাটির সুখ্যাতি করিলাম। দুই এক স্থলে দোষও দেখাইলাম—কিন্তু প্রশংসার ভাগই বেশী দিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেখকের বয়স কি অল্প ?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "হ্যাঁ—আমার চেয়ে কিছু বড়।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

কথাটা শুনিতে আমার ভাল লাগিল না। একজন যুবতী কন্যার একজন যুবক 'বিশেষ বন্ধু' থাকিবে কেন ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এঁর লেখা দুই একটা আমরা পেতে পারিনে ?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "কেন, আপনার খুব লোভ হচ্চে নাকি ?"

"তা হচ্চে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আপনাকে একটা দেওয়াতে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা নয়।"

"আপনার কাছে কি তাঁর অনেক লেখা আছে ?"

"তাঁর অনেক লেখাই আমার কাছে আছে। তিনি নূতন লেখা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে পাঠিয়ে দেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, গতিক ভাল নয়। এত অন্তরঙ্গতা! বলিলাম, "আপনিই তাহলে তাঁর প্রধানা পাঠিকা?"

"অন্ততঃ প্রথমা বটি। আমিই বোধ তাঁর লেখার সবচেয়ে বেশী ভক্ত।"

আমি বলিলাম, "তাঁর নামটা শুনতে পাইনে?"

নির্ম্মলা একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "গৌরীকান্ত রায়।" বলিতে তাঁহার কপোলদেশ কিঞ্চিৎ রক্তাভ হইল।

সতীশের জন্য আমার দুঃখ হইল।

তারপর, গৌরীকান্তের প্রকাশিত লেখার সম্বন্ধে আমরা কথা কহিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম তাঁহার নব প্রকাশিত 'নন্দরাণী' উপন্যাস আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

ইহার পর দুই তিন দিন নির্ম্মলার সঙ্গে গৌরীকান্ত রায়ের লেখার বিষয় অনেক আলোচনা করিলাম। নির্ম্মলা গৌরীকান্তকে একেবারে পূজা করেন বলিলেই হয়। লোকটার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিতে লাগিল।

॥ ৭ ॥

সতীশ এখনও সেন-দম্পতীর নিকট নির্ম্মলার পাণিপ্রার্থনা করে নাই। করিলে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ যেরূপ ডাক্তার সেনের জামাতৃপদাকাঙ্ক্ষী, ডাক্তার সেনও সেইরূপ সতীশের শ্বশুরত্বের জন্য সমুৎসুক। এ কয়দিনের ভাব-গতি দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয়।

কিন্তু ঐ গৌরীকান্ত বিভ্রাট আমায় দুশ্চিন্তান্বিত করিয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে 'পরম বন্ধুত্ব' আমি মোটেই বুঝিতে পারি না।

এখন ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। সতীশ ও নির্ম্মলার বিবাহ হইল। নির্ম্মলা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগশালিনী। সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের নামে জ্বলিয়া যায়। এদিকে গৌরীকান্ত একজন প্রতিভাশালী লেখক, সে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মধ্যে বাছিয়া নির্ম্মলাকেই তাহার

সাহিত্য-সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে। আর, নির্ম্মলার মনও গৌরীকান্তের প্রতি একটা ভাবাবেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা অজ্ঞাত বীজস্বরূপ ;— ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি জাতীয় তরু উদ্গত হইতে পারে তাহা কে জানে ?

আমি ইহা হইতে দিব না। আমি আমার বন্ধুর দাম্পত্যজীবন নিষ্কণ্টক করিব। নির্ম্মলা গৌরীকান্তের পূজার জন্য নিজের মনের মধ্যে যে ভক্তিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সে মন্দির আমি সমালোচনার বজ্র দিয়া ভস্মীভূত করিব। দেখাইব, গৌরীকান্ত অপেক্ষাও প্রতিভাবান লেখক নব্যবঙ্গে আছে। আমি গৌরীকান্তের ভাষার ভুল ধরিব, ব্যাকরণের ভুল ধরিব, নূতন পুরাতন পাশ্চাত্য সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া কোথায় গৌরীকান্তের কোন্ ভাবের সাদৃশ্য আছে আবিষ্কার করিব ; পাশাপাশি দুই স্থান উদ্ধৃত করিয়া গৌরীকান্তকে চোর বলিয়া জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিব। এইরূপ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ে নির্ম্মলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিব যে তাহার পূজার দেবতা মাটীর পুতুল মাত্র, ভিতরে শুধু খড়। সতীশকে, নির্ম্মলাকে রক্ষা করিব, সে আত্মরক্ষারই সমান। ঘরের টাকা দিয়া এতদিন বঙ্গপ্রভা চালাইয়া আসিয়াছি। আমার সমালোচনার রাজদণ্ড ছোট বড় সমস্ত লেখকেরই বিভীষিকা। এবার সে দণ্ডের সাহায্যে বন্ধুকৃত্য সাধন করিয়া লইব। একবার মনে সন্দেহ হইল, তাহাতে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের হানি হইবে না ত ? কিন্তু অনুকূল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া মনকে সহজেই আঁখি ঠারিলাম।

এইরূপ স্থির করিয়া, প্রথমতঃ 'নন্দরাণী'খানার একটা ভয়ঙ্কর তীব্র সমালোচনা লিখিলাম। কার্ত্তিক মাসের কাগজের জন্য সমালোচনা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। যথাসময়ে অর্ডার প্রুফ আসিল। অর্ডারে স্থানে স্থানে সমালোচনা আর তীব্র করিয়া দিলাম।

সেদিন বৈকালে সতীশ আসিল। আমার টেবিলে 'নন্দরাণী' দেখিয়া বহিখানা উঠাইয়া লইল। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "উঁহু উঁহু ছুঁয়ো না, এটা বাঙ্গালা বই।"

সতীশ বলিল, "এই বইখানা নিয়ে ক'দিন থেকে এমনই মেতে আছ যে একহপ্তা আমাদের ওদিকে যাওনি। যখনই আসি তখনই দেখি এই বইখানা নিয়ে লিখছ, তাই এটা কেড়ে নিতে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "বইখানা সমালোচনা করছিলাম। এখন কেড়ে নিতে পার, শেষ হয়ে গেছে।"

"সমালোচনা শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ—এই কতক্ষণ অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়েছি।"

সতীশ বাঙ্গালা সাহিত্যের খবর লইতেছে দেখিয়া ভাবিলাম, হইল কি?

সতীশ আমার মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম, "ব্যাপার কি হে?"

সতীশ বলিল, "এবার আমার জীবনের একটা গোপন কথা তোমায় বলি। শুধু 'নন্দরাণী'র সমালোচনা তোমার কাগজে বেরুবার অপেক্ষায় ছিলাম।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "নন্দরাণীর সমালোচনা! নন্দরাণীর সমালোচনার সঙ্গে তোমার জীবনের গোপন কথার যোগ কোথায়?"

বলিল, "বিশেষ যোগ আছে। আমিই গৌরীকান্ত রায়।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, "তুমি?"

"আমি। দেখছ না—সতী মানে গৌরী, আর ইশ মানে কান্ত।"

আমি বলিলাম, "তুমি?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইলাম। চাকর আসিলে টেলিগ্রাম করিবার কাগজ আনিতে বলিয়া দিলাম।

সতীশ বলিল—বিলাতে থাকিতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে বসিয়া সমস্ত ভাল বাঙ্গালা বহি মনোযোগের সহিত সে পাঠ করিয়াছিল। পরে লেখা অভ্যাস করিয়াছে। তাহার প্রথম উপন্যাস 'নন্দরাণী'র সমালোচনা বঙ্গপ্রভায় বাহির হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার কারণ, আগে জানিলে পাছে আমি তাহাকে অন্যায় প্রশংসায় বাড়াইয়া তুলি।

চাকর টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনিল। ম্যানেজারকে সংবাদ পাঠাইলাম—নন্দরাণী সমালোচনার অর্ডার প্রুফ ডাকে দিয়াছি—কিন্তু উহা যেন ছাপা না হয়। তাহার স্থানে অন্য একটা প্রবন্ধ দিতে বলিয়া দিলাম।

বাস্তুসাপ

বৈঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবামাত্র দিদিমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা দুর্গা।" পাশে বিধবা নাতিনী সুরবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে ডাকিলেন, "সুরি ও সুরি, ওঠ্, আজ যে অমাবস্যে।"

জ্যৈষ্ঠমাস সারারাত্রি খুব গ্রীষ্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। সুরবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না; সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে আর গঙ্গাস্নানের পূর্ণফল হইবে না। তাই আবার ডাকিলেন, "সুরি, ও সুরি!"

সুরবালা উঠিয়া বলিল, "ওমা তাই ত, ভোর হয়ে গেছে যে!"

দিদিমা বলিলেন, "সব জিনিস পত্তর গোছান আছে, চল্ শীগগির বেরিয়ে পড়ি।"

কাপড়, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়া দুইজনে বাহির হইলেন। তখন অল্প আলো হইয়াছে। উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; সুরবালা তাঁহার পশ্চাতে চলিল।

খিড়কী দরজার কাছে যে আতাগাছ আছে, তাহার নিকট আসিয়াই দিদিমা 'ওগো মাগো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সুরবালা সভয়ে বলিল, "কি দিদিমা?"

দিদিমা বলিলেন, "হায় হায় হায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

সুরবালা বলিল, "কি? কি হয়েছে দিদিমা?"

দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভয়ে ভয়ে নিকটে গিয়া সুরবালা দেখিল, একটি ছোট মোটা কালো সাপ, রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সুরবালা বলিল, "হ্যাঁ দিদিমা, বাস্তু?"

দিদিমা বলিলেন, "বাস্তু বইকি! দেখছিস নে? আহাহা! এমন মহাপাপ কে করলে? বাবা, কে তোমায় এমন করে হত্যে করলে?"

দিদিমার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নানে যাওয়া আর হইল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া, হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাত ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাতের মালা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দিদিমার ভাবগতি দেখিয়া সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "কি হবে দিদিমা?"

দিদিমা বলিল, "হবে আর কি—আমার মাথা হবে! ভিটেয় ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে? নিৰ্ব্বংশ হয়ে যাবে! লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হায় হায় হায়!"

একটা ঘোর আশঙ্কায় সুরবালার মন বিপৰ্য্যস্ত হইল। সে চলৎশক্তি রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা একটি নারীমূৰ্ত্তি দেখা গেল।

দিদিমা বলিলেন, "কেও, বউমা?"

"হ্যাঁ, কেন মা?"

"এদিকে এস।"

সুরবালার মা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীতা হইলেন। কাছে আসিয়া বলিলেন, "এখনো গঙ্গাস্নানে যাওনি মা?"

"আর মা, গঙ্গাস্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শীগগির নিলে বুঝতে পারি। সৰ্ব্বনাশ হয়েছে।"

"কি? কি হয়েছে মা?"

দিদিমা সর্ব খুলিয়া বলিলেন।

বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বেশ করে দেখেছ, বাস্তবাবাই বটে?"

"বাস্তবাবা বইকি! ঐ দেখ না, আতা-তলায় পড়ে রয়েছেন। আজ তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করে রয়েছেন, বাবার কৃপায় কোনও বিপদ আপদ হয়নি! এইবার সংসার ছারখার হয়ে যাবে।"

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কৰ্ত্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া রাগে

ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কে এ কায করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেবো।"

এ কথা শুনিয়া সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বলিল, "ঐ দেখ, আতাগাছের তলায় রক্তমাখা লাঠি প'ড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয়, সেই বেটার কায।"

সকলে বলিল, "নিশ্চয় ওরই কায।"

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একজন খোট্টা—কযদিন হইল এ বাটীতে চাকর নিযুক্ত হইযাছে। দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো। মাথার অগ্রভাগ কামানো। বয়স আন্দাজ কুড়ি বৎসর। এই নূতন বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিতে আসিযাছে।

কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন, "ভোজুয়া ইধার আও।"

ভোজুয়া তাঁহার কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, "তোম্‌ সাপ মারা হ্যায়?"

ভোজুয়া সগর্ব্বে বলিল, "হাঁ, হাম্‌ মারা হ্যায়।"

"কাহে মারা?"

"সাঁপ আদ্‌মিকা দুষমণ হ্যায়, মারেগা নেহি? মারা ত ক্যা হুয়া?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ক্যা হুয়া রে শালা? তোর বাবার সাপ?"

ভোজুয়া পিছু হটিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, "মু সামালকে বাত করনা বাবু।"

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইযা, পাগলের মত ভোজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। গলা ধরিয়া 'নিকাল যাও শালা, নিকাল যাও' বলিতে বলিতে দরজার বাহির করিযা দিলেন।

২ ॥

ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া পুরোহিত আসিলেন। দিদিমা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, "বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে বাবা তাই কর।"

পুরোহিত বলিলেন, "ভয় কি মা, কোনও ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি—তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে ভিটেয় ব্রহ্মরক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

একজন প্রতিবেশী বলিলেন, "পুরুত মশায, এখন কর্ত্তব্য কি ?"

"কর্ত্তব্য এখন—প্রথম কর্ত্তব্য সৎকার করা—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে একটা তাম্রখণ্ড দিয়ে, গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।"

পাড়ার ছেলেরা যাই শুনিল গঙ্গাতীরে লইযা গিয়া মৃত সর্পকে দাহ করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্থির করিল সেদিন আর ইস্কুলে যাইবে না।

সর্পকে বহন করিবার জন্য খাটুলী প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তোমরা কোন চিন্তা কোরো না! সর্পযোনিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেলো, তা হলেই সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্ছেন কুলদেবতা কিনা। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে—

সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ
পৃথ্বীধরস্থ বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে।"

এদিকে খাটুলি তৈয়ারী হইল। সর্পের মুখে তাম্রখণ্ড দিয়া খাটুলীতে তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে রাজি হইল না। সকলেই বলিল, 'সাপকে বিশ্বাস নেই, ম'রে আবার বেঁচে ওঠে শুনেছি। ছেলেরা বলিল, "কুছ পরোয়া নেই, আমরা যাব।"

ক্ষুদ্র খাটুলিখানি দুইদিকে দুইজনে ধরিয়া লইয়া চলিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যখন শ্মশানঘাটে পৌঁছিল, তখন এত লোক জমিয়াছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ।

যথারীতি শবদাহ হইল। চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

॥ ৩ ॥

এই অস্বাভাবিক শোকের মধ্যে সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় বড়ঘরের বারান্দায় বসিয়া কর্ত্তা ধূমপান করিতেছেন। দেওয়ালে একটি বাতি জ্বলিতেছে। সদর দরজা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ভোজুয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাঁড়ি, মুখে ময়দা দিয়া সরা আঁটা।

ক্রমে সে আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলিলেন, 'কেরে, ভোজুয়া নাকি ?' সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া বলিল—"বাবু হাম্ তুমহারা একঠো সাঁপ মার ডালা—উস্‌কা বদ্‌লা দোঠো সাঁপ লাযা, ইয়ে লেও।"—বলিয়া হাঁড়িটা দড়াম করিয়া কর্ত্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাঁড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সাপ বাহির হইযা পড়িল।

কর্ত্তা মহাভীত হইয়া 'ওরে বাপ রে' বলিয়া লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্তু সাপ দুইটা তাঁহার পায়ে দুই তিন ছোবল বসাইয়া দিয়া, দ্রুতবেগে কোথায় অদৃশ্য হইল। কর্ত্তার চীৎকারে বাড়ীশুদ্ধ লোক আসিয়া জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কেবল বলিতেছেন—'হরে নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।'

দিদিমা আকুল হইয়া তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, দূর হইতে তিনি তাহা সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন, বাস্তুহত্যার প্রতিফল হাতে হাতেই আরম্ভ হইল। সুরবালা ও সুরবালার মা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লগিলেন। কেহ কেহ বলিল, পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্তুবাবা তুষ্ট হইলেন না কেন ?

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের কথা অনুসারে সে রোঝা ডাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারি পাশের বহু গ্রামের সর্প-বৈদ্য। বেদিয়া আসিলে তাহার কথায় প্রকাশ হইল, তাহারই নিকট হইতে একটা খোট্টা পাঁচ টাকা দিয়া এক যোড়া সাপ কিনিয়াছিল।

বেদিয়া বলিল, "সেই খোট্টা শালারই এই কায ? এমন জানলে কি আমি তাকে সাপ বেচি মশাই ? পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা

দিলেও দিতাম না। সে বললে আমি সাপ মেরে ওষুধ তৈরি করব। হায় হায় হায়।"

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্তু ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "কোন ভয় নেই, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুণ্যির জোরে, তাকে দু'টো বিষদাঁত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোনও লক্ষণই নেই—শুধু একটু রক্তপাত হয়েছে, আর ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। কোনও চিন্তা নেই।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "জয় মা দুর্গা।"

কর্ত্তা বলিলেন, "নিশ্চয়ই জান, বিষ ছিল না?"

বেদিয়া রাগিয়া বলিল, "আমি আর জানিনে মশাই? আমি হলাম গিয়ে সাপের রোঝা!"

সে যাত্রা কর্ত্তা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, খোট্টা চাকর আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই।

সচ্চরিত্র

॥ ১ ॥

যে বুধবারে গেজেটে খবর বাহির হইল সুরেন্দ্রনাথ সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযাছে, তাহার পরের বুধবারেই ভাগলপুর হইতে তাহার কাকার মৃত্যুসংবাদ আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়। তাহাকে ও তাহার দুই দাদাকে এই কাকাই ভাগলপুরে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন ;—সুতরাং কাকার মৃত্যুতে সুরেন্দ্র দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইল।

কাকা ভাগলপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। সুরেনের দাদারা ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখে নাই—তাহাদের তিনি সামান্য চাকুরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আইন পাস করিয়া সুরেন ওকালতী করে ;—সুরেনও নিজের জীবনের গতি ঐ পথেই আঁকিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ দেখিল, আইন পড়ার খরচা যোগাইবার আর কেহ নাই।

সুরেনের মাকে সকলে পরামর্শ দিলেন, 'ছেলের বিয়ে দাও—শ্বশুর পড়ার খরচ যোগাবে।' কিন্তু সুরেন বলিল, "কৃতী না হয়ে বিয়ে করব না।"

আইন পড়িয়া উকীল হইবার মৎলবও সুরেন ছাড়িতে পারিল না! মাকে বলিল, "কলকাতায় যাই, ছেলে পড়িয়ে কিছু উপার্জ্জন করব, তাইতে আমার বাসা-খরচ চ'লে যাবে।"

বিধবা মাতার সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়া কয়েকটি টাকা লইয়া সুরেন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইল। আইন ক্লাসে নাম লেখাইল। কয়েক দিনের চেষ্টায়, দশটাকা বেতনের একটি প্রাইভেট টিউসনও জুটিল ; আর দশটি টাকা জুটিলেই কোনও রকমে বাসা খরচের সংস্থানটা হইয়া যায়।

কিন্তু এই দশটি টাকা জুটিতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে টাকা যাহা আনিয়াছিল, তাহা ফুরাইল। সুরেন্দ্র মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ মাস, কয়েকদিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আহারান্তে সুরেন তাহাদের বাসার ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল,

দশটা বাজিয়া গেল। ছাদের অন্যত্র বাসার অন্যান্য যুবকেরাও পদচারণা করিতেছে। কেহ সিগারেট খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বা গুন্‌গুন্‌ করিয়া থিয়েটারের গান গাহিতেছে।

হঠাৎ নিম্নে একটা কণ্ঠ শুনিতে পাইল—"সুরেনবাবু হ্যায় ?"

সরমন্‌ চাকর বাসন মাজিতেছিল, সে উত্তর দিল, "বাবু ছাদমে আছে দেখা হোবে।" বঙ্গভাষায় আলাপ করা সরমনের উচ্চাভিলাষ; কেহ তাহাকে হিন্দীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও সে বাঙ্গালাতেই উত্তর দিত।

আগন্তুক তখন খট্‌ খট্‌ করিয়া সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষায় রহিল।

"কে ও—রজনীদাদা যে !"

"সুরেন, ভাল আছিস ?"

রজনীদাদা সুরেনেরই গ্রামের লোক। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর। কন্‌ট্র্যাক্‌টারী ব্যবসায় করেন। অনেক টাকা উপার্জ্জন।

হ্যারিসন রোড হইতে বিদ্যুতের আলোক আসিতেছিল—সে আলোকে সুরেন্দ্র দেখিল, রজনীর পায়ে রেশমী মোজা চিক্‌চিক্‌ করিতেছে—তদুপরি পম্প্‌শু। গায়ে রেশমী পাঞ্জাবীর উপর জরির পাড় দেওয়া কোঁচান চাদর। চুল হইতে সেণ্টের ও মুখ হইতে মদের গন্ধ আসিতেছে।

"সুরেন ভাল আছিস ?"

"ভাল আছি। হঠাৎ যে রজনীদাদা ? খবর কি ?"

রজনী বলিল, "একটা কথা আছে, এখানে বলব ? তোর ঘরে চল্‌ না !"

সুরেন স্বর নামাইয়া বলিল, "ঘরেও ত লোক আছে।"

রজনী বলিল, "তবে আয়, আমার সঙ্গে আয়। পথে বলব। নে চট্‌ করে জামা প'রে একটা চাদর নে।"

এই বলিয়া রজনী চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল। সুরেন নামিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে দুইজনে রাস্তায় নামিল। দরজার কাছে একখানা ঠিকা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, উঠিয়া রজনী বলিল, "আয়।"

সুরেন উৎসুক হইয়া বলিল, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায় ? কি বলবে এইখানেই বল না।"

গ্রামে রজনীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি নাই। সুরেনের মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন রোজোটার সঙ্গে মিশিয়া বিগড়াইয়া না যায়। সেই কথা সুরেনের মনে পড়িতে লাগিল।

রজনী বলিল, "আমি যাচ্চি থিয়েটারে। এখানে দাঁড়িয়ে বললে আমার দেরী হয়ে যাবে। পথে বলব। এইটুকু আর হেঁটে আসতে পারবিনে? ভারি নবাব হয়েছিস যে দেখছি! আয় আয়।"

সুরেন্দ্র উঠিল। রজনী গাড়োযানকে হুকুম দিল, "বিডিন ইষ্টিট্।"

॥ ২ ॥

গাড়ী চলিলে সুরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কি?"

"তোর জন্যে একটা প্রাইভেট টিউশন ঠিক করেছি।"

সুরেন খুসী হইয়া বলিল, "কোথায়? কত?"

"মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে। পঁচিশ টাকা।"

সুরেন শুনিয়া মহা খুসী। বলিল, "পঁচিশ টাকা? বল কি রজনীদাদা? কখন?"

"বিকেলে দু'ঘণ্টা।"

"কি পড়াতে হবে?"

"এক ঘণ্টা বাংলা, এক ঘণ্টা ইংরেজী।"

হঠাৎ সুরেনের মনে হইল, যখন অত টাকা, তখন বোধ হয় একাধিক ছাত্র; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টি ছেলে?"

রজনী বলিল, "একটিও না।" বলিয়া জোরে জোরে চুরুট টানিতে লাগিল।

সুরেন বলিল, "একটিও না! তার মানে কি?"

"ছেলে একটিও না। মেয়ে একটি।"

"মেয়ে? কত বড় মেয়ে?"

রজনী হাসিয়া বলিল, "তোর সে খোঁজে কায কি? তুই যাবি, পড়াবি। বয়স যতই হোক না।"

সুরেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

রজনী তখন উদার ভাবে বলিল, "বয়স পনেরো ষোলো।"

সুরেন বয়স শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্ম?"

"না।"

"ক্রিশ্চান্?"

"না।"

"তবে কি? হিন্দু নাকি?"

"তাই।"

"হিন্দু! অত বড় মেয়ে, পড়বে? কার মেয়ে, বাপের নাম কি?"

রজনী হাসিয়া বলিল, "খোদা জানে। মার নাম জিজ্ঞাসা করিস ত বলতে পারি।"

সুরেন উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"মার নাম আমোদিনী। বেঙ্গল থিয়েটারের আমোদিনী। নাম শুনেছিস?"

কিন্তু এ সংবাদে সুরেনের সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শুনেছি।"

রজনী বলিল, "কি বলিস?"

সুরেন্দ্র দৃঢ় ভাবে বলিল, "আমার দ্বারা হবে না।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুরেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিল, "বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? কখনই না।"

রজনী বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! কেন, আপত্তিটা কি শুনি?"

সুরেন বলিল, "আপত্তি অনেক।"

"কি? এ উপার্জ্জন অনেষ্ট্ নয়?"

"অনেষ্ট্ হবে না কেন?"

"তবে? নিজে পাছে প্রলোভনে পড়ে যাস?"

সুরেন গর্ব্বিতভাবে বলিল, "সে ভয় করিনে।"

"তবে? তবে কি আপত্তি বল্।"

"বেশ্যার মেয়েকে পড়াব? লোকে শুনলে বলবে কি?"

রজনী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল। বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বি-এ পাস ক'রে এমন কথাটা বললি? লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়েই জড়সড়?"

সুরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

রজনী বলিল—"শোন্। ও আপত্তি কোনও কাযের নয়। আর, লোকের জানবার দরকারই বা কি? পড়াতে যাচ্চিস না পড়াতে যাচ্চিস। কাকে পড়াতে যাচ্চিস, কোথায় পড়াতে যাচ্চিস, এত খবর তোর লোকের কাছে দেবার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, যদি বুঝিস নিজের মনে যথেষ্ট বল নেই, চরিত্র ঠিক রাখতে পারবিনে, তাহলে অবিশ্যি নেওয়া উচিত নয়। সেইটে বেশ ক'রে বুঝে দেখ্ নিজের মনে।"

নিজের চরিত্রের বলের প্রতি সুরেনের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কথায় তাহার আত্মাভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হইল। সগর্ব্বে বলিল, "সে জন্যে ভেব না।"

রজনী বলিল, "তবে নে। টাকা নিবে কথা রে ভাই! যে টাকা দেবে তার কায করব। অমনি ত আর টাকা নিচ্চিনে।"

সুরেন ভাবিয়া বলিল, "বাড়ীর লোক যদি শোনে ত কি বলবে?"

রজনী বলিল, "অতি গর্দ্দভ তুই! বাড়ীর লোক জানবে কি ক'রে? এ কলকাতা সহর সমুদ্দুর! কে কার খবর রাখে—তুইও যেমন!"

গাড়ী এই সময় থিয়েটারে পৌঁছিল। রজনী বলিল, "তা হলে কি বলিস? আজ আমোদিনীর সঙ্গে দেখা হবে আমার—কি বলব?"

সুরেন একবার মনে করিল বলি—'না।' আবার ভাবিল, 'এত তাড়াতাড়ি কি—না হয় দু'দিন পরে বলব।' বলিল, "রজনীদা, ভেবে তোমায় দুই একদিন পরে বলব।" বলিয়া বিদায় চাহিল।

রজনী বলিল, "আচ্ছা, তা যে রকম হয় আমায় লিখিস; কিন্তু ঐ কথা রে ভাই। যদি বুঝিস নিজে ঠিক থাকতে পারবি, নিজের মনে এক চুল এদিক ওদিক হবে না—তবেই নিস। আমরা ত বয়ে গেছিই। তোরা এখন ছেলেমানুষ আছিস—গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"—বলিয়া রজনী থিয়েটারে প্রবেশ করিল।

সুরেনও ধীরপদে ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিল।

॥ ৩ ॥

সে রাত্রি সুরেনের ভাল নিদ্রা হইল না। অনেক ভাবিল। পরদিনও সারাদিন ভাবিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাযটা অস্বীকার করি তবে রজনীদাদা ভাবিবে, নিজের চরিত্রবলের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নাই বলিয়াই অগ্রসর হইল না। এই ভাবের সহিত—অর্থকৃচ্ছ্র তাও মনে প্রবলরূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পঁচিশ টাকা। দশ টাকা আর পঁচিশ টাকা—পঁয়ত্রিশ টাকা। যদি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া খরচ করি, তাহা হইলে পনেরো টাকা করিয়া জমিবে। তিন বৎসর যদি মাসে পনেরো টাকা করিয়া জমে, তাহা হইলে পাঁচশত টাকারও উপর হাতে হইবে; ওকালতী পাস করিয়া, তাহা লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিব।

আবার ভাবিল, তিন বৎসর ধরিয়া যদি আমি ঐ বেশ্যার মেয়েটাকে পড়াই, তাহা হইলে কি জানাজানি হইতে বাকী থাকিবে? ছি ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি হইবে।

অবশেষে স্থির করিল, এক কায করা যাউক। এখন কাযটা লই। এ দিকে অন্য প্রাইভেট টিউসন জুটাইবার জন্য চেষ্টাও করিতে থাকি। আর একটা সুবিধামত জুটিলেই ওটা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। রজনীদাদা যাহা বলিয়াছে ঠিকই বটে—পরিশ্রম করিব, টাকা লইব—কিরূপ লোকের টাকা অত আমার হিসাব করিবার দরকার কি?

জানাজানির ভয়টা যখনই মনে উদিত হইতে লাগিল, তখনই কিন্তু তাহার উৎসাহ ভারি কমিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহারও ঔষধ রজনী দিয়া গিয়াছে। 'কলকাতা সহর সমুদ্দুর—কে কার খবর রাখে!'

ভাবিয়া চিন্তিয়া রজনীদাদাকে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি শেষ করিয়া, খামে ভরিয়া, সতর্ক সুরেন্দ্রনাথ ভাবিল—কাগজে কলমে এর সাক্ষী সাবুদ রাখি কেন? যাই, মুখেই গিয়া রজনীদাদাকে বলিয়া আসি।

চিঠি ছিঁড়িয়া, আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিল। বাহির হইয়া বউবাজারে রজনীদাদার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে রজনী পাশা খেলিতেছে ও মদ খাইতেছে।

সুরেন খানিক বসিয়া খেলা দেখিল। একটা বাজি শেষ হইলে রজনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, খবর কি?"

সুরেন বলিল, "খবর ভাল। একটা কথা বলতে এসেছিলাম।"

রজনী বলিল, "ওঃ, আচ্ছা দাঁড়া।"—বলিয়া তাহার গেলাসের মদটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিল, "আয়।"

দুইজনে একাকী হইলে রজনী বলিল, "কি ঠিক করলি ?"

সুরেন বলিল, "নেওয়াই ঠিক করলাম।"

রজনী বলিল, "তা বেশ ; কিন্তু খুব সাবধান রে ভাই ! ধরি মাছ না ছুঁই পানি, বুঝেছিস ত ! তোকে জানি ছেলেবেলা থেকে তুই অতি সৎ ছোকরা, তাই সাহস ক'রে তোকে এ কাযে যেতে দিচ্চি। আমি আমোদিনীকে গর্ব্ব করে বলেছি যে তুই অতি সচ্চরিত্র, কোনও রকম খেলাপ হবে না।"

সুরেন বলিল, "কেন রজনীদাদা, সচ্চরিত্রতা নিয়ে এত মারামারি কেন এসব লোকের ?"

রজনী বলিল, "আঃ—এইটুকু বুঝতে পারলিনে, বি-এ পাস করেছিস ! অতি গর্দ্দভ তুই। কেন, বলি শোন্। আমোদিনী একজন মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস্। ওর ইচ্ছে, ওর মেয়েও একদিন একটা মস্ত অ্যাক্‌ট্রেস্ হয়। সেইজন্যে ভাল রকম লেখাপড়া শেখাচ্চে। ওরা প্রথম প্রথম মেয়ে পড়াবার জন্যে বুড়োগোছ পণ্ডিত-টণ্ডিত রাখত ; কিন্তু বুড়ো হলে হবে কি—বুড়োদের প্রাণে আবার বেশী সখ ! পড়ায় না—খালি ইয়ার্কি দেয়। কেউ কেউ মেয়ে নিয়ে চম্পটও দিয়েছে। তাই ওরা এখন ভাল লোক চায়। কলেজের সচ্চরিত্র দেখে লোক রাখলে কোনও ভয় থাকে না—এই জন্যে আর কি—বুঝেছিস ?"

সুরেন বলিল, "ওঃ—তা বটে।" ভাবিতে তাহার মনে বেশ একটু গর্ব্ব হইতে লাগিল যে, সে একজন কলেজের ভাল সচ্চরিত্র শ্রেণীর লোক—নিজে যাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, তাহারাও এ বিশুদ্ধতার মূল্য বুঝে।

রজনী বলিল, "তবে ঠিকানা দিচ্চি। কাল কি পর্শু একদিন যাস—গিয়ে সব ঠিকঠাক করে নিস।"

সুরেন বলিল, "না রজনীদাদা, আমি একলা যেতে পারব না।"

"কেন ? মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট চিনিসনে ?"

"তা চিনি, কিন্তু একলা যেতে পারব না রজনীদাদা।"

"অতি গর্দ্দভ তুই ! আচ্ছা আসিস কাল বিকেলে, নিয়ে যাব এখন সঙ্গে করে।"

পরদিন রজনী সুরেনকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিল।

॥ ৪ ॥

সুরেনের ছাত্রীর নাম নলিনী। পড়ে মেঘনাদবধ, সীতার বনবাস, আর রয়্যাল রীডার থ্রী। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। আর এমন শান্ত ও শিষ্ট—যেন গৃহস্থঘরের মেয়ে। ইংরাজী কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে নলিনী বলিয়াছিল, 'রয়্যাল রীডার নম্বর থার্ড।' সুরেন সংশোধন করিয়া দিল, 'নম্বর থ্রী বলিবে, থার্ড হয় না।' তখনই বিনীতভাবে 'নম্বর থ্রী' বলিয়া নিজেকে বালিকা সংশোধন করিল।

শনিবার অবধি নিয়মিতভাবে সুরেন তাহাকে পড়াইল। তাহার মা আসিয়া মাঝে মাঝে পড়া শুনিয়া যাইত।

রবিবার ছুটি—রবিবারে আর পড়াইতে যাইতে হইবে না। সুরেন মনে মনে বলিল, 'আঃ বাঁচা গেল, আজ আর বেরুতে হবে না।' যতটা খুসি হইবার কথা, মন কিন্তু ততটা খুসি হইতে রাজি হইল না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মেয়েটি পরমা সুন্দরী।

পরের সপ্তাহে—পাঠের মাঝে মাঝে সুরেন একটু আধটু গল্প করিল। ভাগলপুরের গল্প, আরও নানাদেশের গল্প, নানা বিষয়ের গল্প। গল্পের আধিক্য বশতঃ এক একদিন পড়ার কামাই হইয়া যাইত; সে অপব্যয়টুকু পুরাইয়া দিবার জন্য সেদিন সুরেন দুই ঘণ্টার একটু অতিরিক্তও থাকিত।

দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যে রবিবার আসিল, সেটা নিতান্তই নীরস মনে হইতে লাগিল। সেদিন নলিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনে করিল—আহা! মেয়েটির অদৃষ্টে কি আছে? এখনও অনাঘ্রাত কুসুমের মত নির্ম্মল, বিধাতার স্বহস্তনির্ম্মিত একটি শুভ্র আত্মা। এও কি পাপে পঙ্কিল হইবে—ইহাই ধ্রুব বিধান? ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন উপায় কি নাই?

সে রাত্রে সুরেন স্বপ্ন দেখিল, যেন নদীর ধারে একটা শালবন, সেই শালবনে যেন নলিনীর সঙ্গে সে বেড়াইতেছে।

পরদিন পড়াইতে পড়াইতে স্বপ্নের গল্পটা নলিনীকে সুরেন বলিল।

নলিনী বলিল, "কি করে স্বপ্ন দেখে বলুন দেখি?"

সুরেন বলিল, "এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন দিনের বেলা আমরা যা চিন্তা করি রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখি।"

নলিনী বলিল, "না তা নয়। আমাদের আত্মা আছে কিনা। একজনকার

আত্মা, যদি আর একজনকার আত্মার কাছে যায়, তাহলে দু'জনেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে শুধু একজনকার মনে থাকে, একজন ভুলে যায়।"

সুরেন বলিল, "বাঃ বেশ ত!"

মাষ্টারবাবু আসিলে ঝি রোজ টেবিলের উপর কয়েক খিলি পাণ রাখিয়া যাইত। একদিন সুরেন বলিল, "আজকের পাণটা খুব ভাল হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

নলিনী বালিকাসুলভ গর্ব্বে বলিল, "ভাল হয়েছে আজ?—আমি সেজেছি আজ মাষ্টার মশায়!"

সুরেন বলিল, "বটে! তুমি এমন পাণ সাজতে পার? আমাদের বাসায় যে পাণ সাজে, রাম রাম।"

পরদিন পাঠান্তে বিদায় লইবার সময় নলিনী সুরেনকে বলিল, "আপনাদের বাসায় পাণ ভাল হয় না বলছিলেন, গোটাকতক পাণ তৈরি করেছি নিয়ে যাবেন?"

সুরেন পাণ লইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ভারি লক্ষ্মী তুমি।"

নলিনীকে তাহার মাতা একটু স্বতন্ত্র রকমে পালন করিয়াছিল। তথাপি সুরেনের কাছে নলিনী যে জগতের সংবাদ পাইত, সে জগৎ নলিনীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন; তাহার জগৎ, যে জগৎ আবাল্য তাহাকে ঘিরিয়া আছে সে জগতে এ জগতে কত প্রভেদ! সুরেন তাহার মার গল্প, কাকীমার গল্প, কাকার মেয়েদের বিবাহের গল্প যখন করিত, কি একটা অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় নলিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সুরেনের জগতের সংবাদ নলিনীর কাছে পিপাসার শীতল জলের মত লাগিত। সুরেনের প্রতি নলিনী একটা অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর কণ্ঠস্বরের মধুরতায়, যৌবনের নবীনতায় ও অন্তরের সরসতায় সুরেনও যেন একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিল। কিছু দিনে সে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; কিন্তু কোনও প্রতিকার চেষ্টা করিল না। বুঝিল, মন তাহার বশের অতীত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে সুরেনের মনের অবস্থা এমন হইল যে নলিনীকে তাহার মন্দ-সংসর্গ হইতে উদ্ধার করাই সে তাহার একমাত্র পুরুষার্থ স্থির করিল। ইহাতেই তাহার মানব জন্মের সফলতা জ্ঞান করিল। প্রেমের নির্দ্দেশে

কর্ত্তব্যের পথ অতি সরল বোধ হইল। নলিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেও বিলম্ব হইল না। তাহাকে শ্রদ্ধায়, আশায় ও সুখে পুলককম্পিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিল—"আমি তোমার স্বামী, তোমায় না পেলে আমি সুখী হব না; আমায় না পেলে তুমিও সুখী হবে না। তোমাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করব, লোকের কথার জন্যে ভয় করব না। পৃথিবী কি যথেষ্ট বৃহৎ নয়? আমরা এমন কোথাও যাব যেখানে লোকগঞ্জনা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। কি খাব? পরিশ্রম করব;—আবশ্যক হয় দু'জনে পরিশ্রম করব। দু'বেলা না জোটে, একবেলা খেয়ে থাকব। তাতেও আমরা সুখে থাকব।—"

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ঝি আলো আনিল। সুরেনের সম্মুখে নলিনীর অনুবাদের খাতা ছিল, তাহা সংশোধনের জন্য দক্ষিণ হস্তে সে কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাম হস্ত নলিনীর হস্তে সংযুক্ত ছিল। যখন ঝির পদধ্বনি শুনা গেল, তখন দুইজনেই ত্রস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

॥ ৫ ॥

ইহার পর চারিটি সপ্তাহ সুরেন ও নলিনী পরস্পরের নেশায় ভরপুর মাতিয়া রহিল।

সোমবার বৈকালে পড়াইতে গিয়া সুরেন শুনিল, নলিনী নাই—সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়াছে। আমোদিনী আসিয়া বলিল—নলিনী এখন মাসকতক সেখানে থাকিবে, কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহ্য হইতেছিল না। আবার যখন আসিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে আবার আমোদিনী সুরেন্দ্রকে সংবাদ পাঠাইবে। এই বলিয়া সুরেনের প্রাপ্য আমোদিনী চুকাইয়া দিল।

সুরেন চলিয়া গেল, কিন্তু বাসায় গেল না। গড়ের মাঠে গিয়া একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়া, ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল? বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন? শনিবারে যখন নলিনীর কাছে বিদায় লইয়াছে, তখন নলিনী কিছুই জানিত না, জানিলে অবশ্যই সুরেনকে বলিত। সহসা এ কি হইল?

গিয়াছে, তাহাও দুই চারি দিনের জন্য নয়। কয়মাস থাকিবে তাহারও অবধি স্থিরতা নাই। কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইতেছিল না! বাজে কথা।

আজ দুইমাস প্রতিদিন তাহাকে দেখিতেছে, একদিনও ত সেরূপ মনে হয় নাই।

অন্ধকার হইল ; আকাশে নক্ষত্র, অদূরে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল।

নলিনী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অনেক বিপদ। সুরেনের এখন মনে হইতে লাগিল, সেই কথার সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও সংযোগ আছে। হয়ত তাহার মাতা তাহার উপর কোনও জুলুম করিতেছে। নলিনী এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে, মনে করিতে সুরেনের চক্ষু দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এই একমাসে কত ঘটনা, কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্ট কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত স্বপ্ন দেখা—সেই স্বপ্নের জাগ্রৎ অনুকরণ, কত মানাভিমান মনে পড়িতে লাগিল। যত মনে পড়ে, তত যেন বুক ফাটিয়া যায়।

আর দেখা হইবে না।

ক্রমে ঘাসের উপর সুরেন শয়ন করিল। রাত্রি দশটা অবধি বালকের মত কাঁদিল। দশটা বাজিলে, উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় আসিল।

সপ্তাহ কাটিল ; সপ্তাহ পরে শোক অনেকটা লঘু হইল। তখন মনে হইল—উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি! কোথায় ভাসিয়া যাইতেছিলাম? কি সর্ব্বনাশটাই হইতে বসিয়াছিল! কি মোহেই পড়িয়াছিলাম! ভগবান এ জাল কাটিয়া দিলেন—এ পরম সৌভাগ্য। নিজে কাটিতে পারিতাম না। কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! যদি শুনিতাম তাহার মাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে হয়ত তাহাকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইতাম। তাহা হইলে জন্মের মত যাইতাম আর কি! এ জীবনে সে ভাঙ্গা আর যোড়া লাগিত না।

দুই সপ্তাহ পরে সুরেন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

পূজার ছুটির আর দুই সপ্তাহ বাকী। বিকালবেলা সুরেন বাসার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পড়িতেছিল, ঝি আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। শিরোনামা দেখিয়া সুরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল—নলিনীর হস্তাক্ষর।

চিঠির ছাপ দেখিল—ভবানীপুর।

চিঠি খুলিল। তাহা এইরূপ।

৪৪।১নং নীলমণি বসুর গলি,
ভবানীপুর।

প্রিয়তম,

আজ একমাস তোমায় দেখি নাই, কিন্তু বাঁচিয়া আছি। বড় কষ্টে আছি। বেশী লিখিবার সময় নাই। এখানে আমি অত্যন্ত কড়া পাহারায় আছি। যে বৃদ্ধা আমার রক্ষয়িত্রী তাহার কন্যা আসিয়াছে। আমি তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহারই সাহায্যে এ পত্র ডাকে দিবার আয়োজন করিয়াছি।

যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সেদিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার প্রতি ভারি অত্যাচার করে। আমি অনেক কাঁদি। মা আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে—আমি স্বীকার করি যে আমি তোমায ভালবাসি। মা বলিল—তুমি ভিক্ষুক, নিজে খাইতে পাও না ইত্যাদি। যদিও বা আমায় বিবাহ কর, লোকগঞ্জনায় অপমানে অস্থির হইয়া দুইদিন বাদেই আমাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও বলিল, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না, তোমায় ভুলিতে হইবে। পরদিন প্রাতে আমায় এইখানে আনিয়া রাখিয়া গেল।

আমি এ একমাস অনেক ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবিচ্ছেদ হইল এ কথা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে স্থান পায় নাই। একদিন আমাদের মিলন হইবে এ আশা এক মুহূর্তের তরেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

আমাদের মিলন হইলে তোমার অবস্থা কি হইবে তাহাও আমি ভাবিয়াছি। লোকে তোমায় কি বলিবে তাহা মনে করিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার একার সুখের জন্য হইলে আমি তোমার জীবনের পথ হইতে সরিয়া যাইতাম; কিন্তু হে আমার স্বামী, আমায় না পাইলে তুমিও সুখী হইবে না এ বিশ্বাস তুমি আমার মনে জন্মাইয়াছ। তোমার সুখের ও আমার সুখের জন্য, আমাদের মিলনই আমি আকাঙ্ক্ষা করি।

আমার এ পত্রের উত্তর তুমি ডাকে দিও না। কাল সন্ধ্যাবেলা চিঠি হাতে করিয়া আসিও। ভবানীপুরে যে পদ্মপুকুর আছে, তাহার উত্তরপশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া থাকিও। একজন স্ত্রীলোক তোমার নাম করিয়া ডাকিবে, তাহার হাতে পত্র দিও, তাহা হইলে আমি পাইব।

তোমারই নলিনী

পুঃ। ঠিক সাতটার সময় আসিও।



পত্র পড়িয়া স্থরেন তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। ঝিকে ডাকিয়া দুই আনার জলখাবার আনিতে দিল। নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিল। বাসার লোককে বলিল, "বাড়ী হতে এইমাত্র চিঠি পেলাম, মার ভারি ব্যারাম, এখনি আমায় রওনা হতে হবে।"

জলখাবার আসিলে চাকরকে বলিল, "সরমন্ একখানা গাড়ী ডাক, জল্‌দি।"

গাড়ী আসিলে জিনিসপত্র লইয়া হাওড়ায় গেল। রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী পৌঁছিল।

মাকে বলিল, "কলকাতায় ভয়ানক কলেরা হচ্ছিল তাই পালিয়ে এলাম।"

ভুলশিক্ষার বিপদ

বড়দিনের ছুটিটা মধুপুরে গিয়া যাপন করিবার জন্য তাগাদার উপর তাগাদা পাইতেছি ; না গেলে আর চলে না। মধুপুরে আমাদের একটি ছোট বাঙ্গালা আছে। শীতকালে প্রায়ই আমাদের বাড়ীর কয়েকজন করিয়া সেখানে গিয়া অবস্থান করেন। এবার বড়দিদি নিজের পুত্র কন্যাদের লইয়া সেখানে অবতীর্ণ ; সুরেন ভায়া এবার বি-এ পরীক্ষা দিবেন—তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। দিদির মেয়ে মিনি বা মেনকারাণী আমায় মারাত্মক রকম শাসাইয়াছে। লিখিয়াছে—'এবার যদি তুমি না আসবে তবে আর তোমার মাথায় একটিও পাকা চুল তুলে দেবো না—যাও।' আর কি করিয়া থাকি ? সুতরাং জিনিষপত্র গুছাইয়া অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

উঃ—সেদিন কি ভীড়।—কিন্তু একটা এই শুভগ্রহ, শুধু ভদ্রলোকের ভীড়। অধিকাংশই নব্যযুবক—উত্তম পরিচ্ছদে আবৃত ; সুগন্ধময়। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্য পরিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন কলিকাতার অধিকাংশ তরুণবিরহী যুক্তি করিয়া এই ট্রেণেই শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে—বরং তাহার বিপরীত।

গাড়ী ছাড়িল। যুবকগণ উচ্চহাস্যে ও সিগারেটের ধূমে কক্ষবায়ু ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। ব্যাণ্ডেল অবধি খুব ভীড় রহিল—তাহার পর হইতে একটু কমিতে আরম্ভ করিল।

পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথায় একটি কালো কম্ফর্টার পাগড়ীর আকারে জড়ান—চোখে রূপার ফ্রেমযুক্ত চশমা, দেহটি একযোড়া সেকালের দৌড়দার হাসিয়াযুক্ত গঙ্গাজলী শালে আবৃত ; পায়ে ফুলমোজার উপর ইংরাজি জুতা। বয়স বোধ করি ষাটের কাছাকাছি হইবে।

বাবুটির সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিসপত্রও বিস্তর। জিনিসপত্রে কামরা বোঝাই হইয়া গেল। নীচে হইতে একজন বলিল,—'সব উঠেছে ত—

একবার গুণে নিন।' শ্রবণমাত্র বাবুটি 'এক' 'দুই' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিনিস গণনা আরম্ভ করিলেন, গাড়ী ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

দুইবার গণনা করিয়া বাবুটি বলিলেন, "ওরে ছ'টা কেন রে—কি ওঠেনি রে ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌।"

তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবুটি হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁড়িটা—হাঁড়িটা—"

একজন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাঁহার হাতে হাঁড়িটা দিতে গেল। কিন্তু তিনি তাহা ধরিতে পারিলেন না; হাঁড়িটা পড়িয়া গেল। আমরা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম।

ভদ্রলোকটি তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই একটু 'মুরুব্বি' গোছ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখলেন মশাই? একবার কাণ্ডখানা দেখলেন? দিলে হাঁড়িটে ফেলে!"

আমি লোকটার এই নালিসে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলাম। কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম, "কি ছিল হাঁড়িতে?"

"মশাই—খাবার ছিল। এক হাঁড়ি খাবার ছিল—দু'টাকার মাল। গেল প্ল্যাটফর্মে প'ড়ে ধূলো মাখামাখি হয়ে। ভোগে হল না। সেই বাড়ী থেকে পৈপৈ করে বলতে বলতে আসছি—ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাসনে—ওরে দেখিস, যেন খাবারের হাঁড়িটে ভুলে যাসনে।—তা সেই খাবারের হাঁড়িটেই ভুলে গেল? এক হাঁড়ি খাবার মশাই! ভোগে হ'ল না। আমি আবার বাজারের খাবারগুলো খাইনে কিনা। ও আমার আদৌ সহ্য হয় না। আমি যেখানে যাই, নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার পিসিমা আজ ভোর পাঁচটার সময় উঠে লুচি ভাজতে বসেছেন। (এখানে বাবুটি আঙুল গণিতে আরম্ভ করিলেন) লুচি ছিল, কচুরি ছিল, আলুভাজা ছিল, বেগুনভাজা ছিল, মোহনভোগ ছিল, মোল্‌নাইয়ের গোল্লা ছিল আধসের—মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খেয়েছ কখনও?"

বক্তৃতার আরম্ভ হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এই প্রশ্নে হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আমি যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলাম, "কই মনে ত পড়ে না।"

বাবুটি বলিলেন, "তা হলে খাওনি। খেলে মনে থাকত। সে ভোলবার জিনিস নয়।"

আমি বলিলাম, "খুব সম্ভব।"

"মোল্‌নাইয়ের গোল্লার নামডাক শোননি?"

"না—ও বিষয়ে বড় চর্চ্চা রাখিনে।"

"কোথা থেকে আসছ?"

"কলকাতা।"

"নিবাস?"

"কলকাতা।"

"আঃ—নিতান্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান্ তুমি! আচ্ছা মোল্‌নাইয়ের গোল্লার একটা গল্প বলি শোন। দাঁড়াও তামাক একছিলিম সেজে নিই!" এই বলিয়া তিনি তামাক সাজিতে লাগিলেন।

এতকাল রেলপথে যাতায়াত করিতেছি, এমন অদ্ভুত মনুষ্যের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। হায় হায়, এমন বক্তা বঙ্গীয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্থান পাইল না! মনে করিলাম, একটা বড় সুবিধা হইয়াছে। মধুপুরে ট্রেণটা পৌঁছে অতি বিশ্রী সময়ে—ঠিক ঘুমের সময়। ঘুমাইয়া পড়িলে মধুপুর ছাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা। এই বাগ্মীবরের কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পারিব; নিদ্রাদেবী দূরে থাকিয়া নিজ মান রক্ষা করিবেন।

তামাক সাজিতে সাজিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "বাবুর নাম?"

"মহানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

"আমার নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। নিবাস মোল্‌নাইয়ের নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দ্ধমান। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান আমরা, নৈকষ্য কুলীন। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সাত পুত্র ছিলেন—

যজ্ঞেশ্বরের সুত সাত
শঙ্কর জানকীনাথ।

আমরা সেই শঙ্কর জানকীনাথের সন্তান।"

এ বক্তৃতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল, তাহার কারণ মদনগোপালবাবু কলিকায় ফুঁ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে করুণভাবাপন্ন ছিল—তাহার কারণ বোধ হয় সদ্যপ্রাপ্ত সন্দেশের শোক। এখন বরং একটু

গর্ব্বিত দেখাইতে লাগিল ; তাহা বোধ হয় কুলগৌরবের স্মৃতিজনিত। যাহা হউক, আমি পরম কৌতুকের সহিত লোকটির পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়ীও বর্দ্ধমানে পৌঁছিল।

আমার চুরট ফুরাইয়াছিল, নামিয়া কেলনারে গেলাম চুরট কিনিতে। যতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা না হইল, ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গাড়ী ছাড়িলে দেখিলাম, আর সকলে নামিয়া গিয়াছে, শুধু আমরা দুইজনে আছি।

মদনগোপালবাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "তারপর—সদানন্দ বাবু—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম মহানন্দ।"

"ওহো ঠিক ঠিক। মহানন্দ বাবু, কতদূর যাওয়া হবে ?"

"মধুপুর।"

"আমি যাব কাশী। তুমি ত এখনি পৌঁছে যাবে হে! দু ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা জোর! আমায় যেতে হবে আজ সমস্ত রাত, কাল সমস্ত দিন। তাই ত বলছি কিনা, এই সমস্ত রাত সমস্ত দিন যে গাড়ীতে কাটবে, কি খেয়ে প্রাণধারণ করি ? কাল সন্ধ্যাবেলা কাশী পৌঁছে যাব এখন! কাশীতে আমার মা ঠাকরুণ রয়েছেন কিনা। আজ তিন বৎসর তিনি কাশীবাসী। বৃদ্ধ হয়েছেন—বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয়েছে। এখনও প্রত্যহ ভোরে উঠে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসেন—কি শীত—কি গ্রীষ্ম—কি বর্ষা—কি বাদল। গত ভাদ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুস্‌ঘুস্‌ ক'রে জ্বর হচ্চে শুনেছি। তাই একবার ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জায়গাতেই—কোন চিন্তার কারণ নেই। তবে কিনা কাণে শুনে, সন্তান হয়ে, কি ক'রে চুপ করে থাকি বলুন। আমার গুরুদেবের মধ্যম পুত্রটি কাশীর কলেজে অধ্যাপক, সপরিবারে থাকেন সেখানে, সেইখানেই আমার মা ঠাকরুণকে রেখে দিয়েছি। গুরুপুত্রটি অতি উপযুক্ত লোক। ন্যায়ে তাঁর সমকক্ষ কাশীতে নেই বল্লেই হয়। আমারই বয়স, একত্র খেলা করতাম সেই অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দেখা গিয়েছিল—"

আমি বলিলাম, "মশাই চুরট খান কি ?"

"চুরট ? খাই কখনও কখনও। ছেলেবেলায় যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরেজি পড়তাম, তখন খুবই খেতাম। তখন তোমাদের ও বাডসাই ফাডসাই ওঠেনি।—ভাল চুরট ?"

আমি বলিলাম, "মন্দ নয়, দেখুন না !"—বলিয়া আমার সিগার-কেস খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। তিনি একটি চুরট লইয়া ধরাইয়া লইলেন ; আমিও একটি ধরাইলাম।

গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ পার হইয়াছে। দুইধারে অনেক কয়লার খনি। স্থানে স্থানে স্তূপাকার কয়লায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে—খুব আলো হইযাছে। কাছে খোলা ইঁট সাজাইয়া অস্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কুলীরা বসিয়া আছে—কেহ বা খাদ্য পাক করিতেছে।

আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাইয়া লই। সঙ্গে আমার টিফিন বাস্কেট ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবার আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুর জিনিস পত্র সরাইয়া কষ্টে টিফিন বাস্কেট বাহির করিলাম। ভাবিলাম, আমি আহার করিব, আর আমার এই সহযাত্রীটি অভুক্ত থাকিবেন ? অথচ যদি আহ্বান করি, তবে খাইবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ আমার এ জিনিসগুলি ঠিক হিন্দুধর্ম্ম-সঙ্গত নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম. বলিয়াই দেখি, খান উত্তম—না খান কি করা যাইবে ?

টিফিন বাস্কেটটি বেঞ্চের উপর তুলিয়া, খুলিয়া বলিলাম, "মদনবাবু—আপনি খাবার যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমার সঙ্গে কিছু খাবার রয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনার, তবে দু'জনে খাওয়া যায় !"

মদনবাবু আমার বাস্কেটের প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "কি আছে তোমার ওতে ?"

আমি (আঙ্গুল না গণিয়া) বলিলাম, "রুটি আছে, ডিম আছে, দু'তিন রকম মাংস আছে, মাখন টাখন আছে।"

"হিন্দু মাংস ? হোটেলের নয় ত ?"

"মাংস হিন্দু। আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণের পাক করা, শুধু রুটিটি হোটেলের—নইলে আর সব জিনিস বিশুদ্ধ হিন্দুমতে তৈরী।"

মদনবাবু বলিলেন, "তা হোক, হোটেলের রুটিতে আপত্তি নেই। যখন কলকাতায় ছিলাম, ইংরেজি পড়তাম, তখন হোটেলের রুটি ঢের খেয়েছি।

কত কি খেয়েছি! সে সব দিনে ছাত্রসমাজ ভারি উচ্ছৃঙ্খল ছিল।"—বলিয়া তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া, মাংসাদি বাহির করিয়া প্লেট সাজাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছুরী কাঁটা ব্যবহার করেন কি?"

"না ভাই ওসব পোষাবে না। দাও হাতে করেই খাই।"

খাইতে খাইতে মদনগোপালবাবু হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাহার সার মত এই যে, মুসলমানের হাতে খাইতে নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না; কারণ শাস্ত্র যখন তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তখনই আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এ প্রকার লোকাচারের প্রবর্ত্তনা করিলাম।

মাংস ফুরাইলে মদনবাবুকে বলিলাম, "রুটি আরও রয়েছে। মাখন আছে, জ্যাম্ আছে, মার্ম্মালেড আছে, কি নেবেন?"

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মার্ম্মালেড? মার্ম্মালেড?—মার্ম্মালেড দাও একটু খেয়ে দেখি—কখনও খাইনি।"

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইয়া জানালার বাহিরে তিনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহাকে আর একটা চুরট দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন—"নাঃ—তামাক সাজি। হুঁকো কল্কের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা!"

তামাক সাজা হইলে আমি বলিলাম, "কই মদনবাবু! সে মোলনাইয়ের গোল্লার গল্পটা বললেন না?"

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিলাম। আমাদের আমলের কথা নয় এ—আমরা গল্প শুনেছি।—গল্পটা এই। বর্দ্ধমানের মহারাজ মোলনাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী। তাই মহারাজ হুকুম করলেন—'মোলনাইয়ের যে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বর্দ্ধমানে ব'সে সে গোল্লা তৈরি করুক।' রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু খুন্তী নিয়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হ'ল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম স্বাদটি হল না। রাজা বললেন—'মোদকের পো! কই সে রকম ত হল না!' মোদক যোড়হস্ত করে বললে

(এই স্থানে মদনগোপালবাবু স্বয়ং যোড়হাত করিলেন)—'মহারাজ ভয় ক'ব না নির্ভয় ক'ব ?' মহারাজ বললেন—'ভয় ছেড়ে নির্ভয় কও।' মোদক বললে—'মহারাজ ! মোল্‌নাই থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্‌নাইয়ের মাটিও আনতে পারেন নি, মোল্‌নাইয়ের জলও আনতে পারেন নি।'—বলিয়া মদনবাবু অত্যন্ত হাসিতে ও কাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসি ও কাসি থামিলেই বলিলেন, "মোল্‌নাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে না। আচ্ছা আমি কাশী থেকে ফিরে আসি দাঁড়াও। একটা রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না ?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাব—এস ! ষ্টেশনে গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব—তোমায় নিয়ে যাবে। পাণ্ডুয়া থেকে ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোল্‌নাইয়ের গোল্লা খাইয়ে দেব—আর আমাদের দেশী মার্ম্মালেডও খাইয়ে দেব।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "দেশী মার্ম্মালেড হয় নাকি ? তা ত জানিনে।"

মদনগোপালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "অ্যাঃ, তুমি নিতান্ত একবারে ক্যাল্‌কেশিয়ান্ ! খালের বাইরের আর কোন খবর রাখ না ! ধানের গাছ দেখনি বোধ হয় ? ধানের গাছের লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে বড় বড় তক্তা হয়।"—বলিয়া তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাসিতে আরম্ভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, "মার্ম্মালেড—বেলের মোরব্বা গো। কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায়।"

আমি চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়া বলিলাম, "মাফ করবেন, মার্ম্মালেডের বেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

"কি ?"

"মার্ম্মালেডের সঙ্গে বেলের কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন ? মার্ম্মালেড মানে কি ? বেলের মোরব্বা নয় ?"

"না।"

"বিলক্ষণ ! তুমি বললেই শুনব ? আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি মার্ম্মালেড মানে বেলের মোরব্বা।"

"মাষ্টার আপনাকে ভুল শিক্ষা দিয়েছিল।"

"বেলের মোরব্বা নয় ত কিসের মোরব্বা ?"

"যদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা।"

এই কথা শুনিয়া মদনগোপালবাবু চমকিয়া উঠিলেন। ভীতস্বরে বলিলেন, "কমলানেবুর মোরব্বা ?"

আমি ভাবিলাম ব্যাপারখানা কি ? বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কমলা-নেবুর বইকি !"

"কমলানেবুর হলে একেবারে মিষ্টি হত। কমলানেবুর যদি, ত স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কষা কষা কেন ?"

"আমাদের এ রকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। স্পেনে সেভিলদেশে একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেড হয।"

মদনগোপালবাবুর মুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বলিলেন, "ঠিক জান তুমি ?" স্বরটি কিছু রুক্ষ।

"ঠিক জানি।"

মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন, "ঠিক জানি !"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম, "মশাই ! মুখ ভেঙ্গানটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ মনে করে না।" এই বলিয়া আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া বেঞ্চের উপর পা রাখিয়া কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মদনগোপালবাবু বলিলেন, "মনে করে না ত রাজা করে ! তোমার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা ছিল ? আমি আজ বিশ বচ্ছর কমলানেবু খাইনি—তুমি কি জন্যে আমায় কমলানেবু খাইয়ে দিলে ?"

আমি বলিলাম, "কেন ? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিস নয়।"

"তোমার পক্ষে বিষাক্ত জিনিস না হতে পারে। আমার পক্ষে বিষাক্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে, তখন তুমি কি জন্যে আমায় খাওয়ালে ?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "মশাই কি আমায় সে কথা বলেছিলেন ?"

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিলন, "মশাই কি আগে আমাব সে কথা বলেছিলেন! তুমি কেন সেই সময়ে বল্লে না যে ওতে কমলানেবু আছে ?"

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন।"

"যাও যাও ঢের দেখেছি তোমার মত কলকাতার বাবু! 'সীমা লঙ্ঘন করছেন!' ভদ্রতা শিক্ষা দিতে এসেছেন! ছুরী কাঁটা দিয়ে মাংস খেতে জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন নিরীহ ব্যক্তি যা খায় না, তাকে তাই খাইয়ে দেওয়া খুব ভদ্রতা!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিধেয় মরছিলেন—নিজের খাবার থেকে খেতে দিলাম, বেশ প্রতিফল তার!"

"ক্ষিধেয় মরছিলেন বইকি! তোমার কাছে কেঁদে পড়েছিলাম খাবার জন্যে।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "যা ইচ্ছে হয় বলুন।"—বলিয়া আমি কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম।

বাবুটি অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর নরম হইয়া আসিতে লাগিল। পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে খাবারের হাঁড়ি লোকসানের শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন, 'খাবারের হাঁড়িটে যদি সঙ্গে থাকত, তা হলে ত আর এ বিপত্তি হত না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল। অনেক বকিয়া বকিয়া বোধ হয় শ্রান্তি বোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে বসিলেন, শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি কম্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া আসানসোলে থামিল। মদনবাবু জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া বলিলেন, "চাপরাশি—ও চাপরাশি।"

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, ক'টা বেজেছে বলতে পার?"

সে বলিল, "সাড়ে এগারোটা বেজেছে।"

"মধুপুরে কখন গাড়ী পৌঁছবে?"

"বারোটা।"

ভাবিলাম আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি না নামিয়া গেলে—পাপ না বিদায় হইলে—আর সুস্থির হইতে পারিতেছেন না।

গাড়ী ছাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কম্বলের উপর হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম।

"সদানন্দ বাবু—ওঠ।"

আমার নাম সদানন্দ নয় সুতরাং আমি উত্তর করিলাম না।

"ভায়া—ওঠ। মধুপুর এল ব'লে। ওঠ।"

আমি মুখ হইতে কম্বল খুলিলাম।

"ভায়া, রাগ করেছ ?"

আমি উঠিয়া বসিলাম। শুষ্কভাবে বলিলাম, "কেন, সব রাগ কি আপনারই একচেটে নাকি ?"

ধীরে ধীরে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "না না রাগ কোরো না। বুড়ো মানুষ, যদি ছুটো কথা বলেই থাকি, তাতে কি আর রাগ করতে হয় ? হঠাৎ মেজাজটা গরম হযে উঠেছিল। সব দোষটাই তোমার ব'লে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ কর।"

ভাবিলাম মনুষ্যচরিত্র এই রকমই বটে ! এখনও বলিতেছেন, 'সব দোষটাই তোমার ব'লে মনে হয়েছিল।' অর্থাৎ এখন মনে এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সবটা না হোক, অন্ততঃ কিছুটা দোষ আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব বিরাগ তখন আমি মন হইতে বিদূরিত করিয়া ফেলিলাম। ক্ষমাসূচক একটু হাস্য করিলাম।

মদনবাবু বলিলেন, "কমলানেবু আমি কেন খাইনে, তা যদি তোমায় খুলে বলি, ত তুমি বুঝতে পারবে।"

মদনবাবুর মুখ চক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন, "শুনবে ?"—তাঁহার স্বর অত্যন্ত নীচু।

তিনি আরম্ভ করিলেন, "সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা মানুষ খুন করেছিলাম।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "মানুষ খুন ?"

"খুন বইকি ! সে খুনই বলতে হবে। শোন। দোসরা মাঘ আমার বড় মেয়ের বিয়ে দেবো ব'লে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম বাজার করতে। একটা মেসের বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে সব কলেজের ছেলেরা থাকত। কোনও ঘরে জায়গা ছিল না, শুধু একটি ঘরে একটু জায়গা ছিল, সে ঘরে

একজন জ্বররোগী প'ড়ে ছিল, আর তার শালাও সেই ঘরে থাকত। ভগ্নীপতির নাম কেদার, শালার নাম প্রবোধ। ভগ্নীপতিটি বাঙ্গাল—বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ তার চেয়ে দু' তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোধ কলেজ কামাই ক'রে ভগ্নীপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওযান, তাপ নেওয়া, মাথায় হাত বুলানো, পায়ে হাত বুলানো, রাত্রে দু'বার তিনবার করে উঠত। ক'দিন ছোকরা খুব লুটোপুটি খেয়ে, একদিন কতকটা সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী যাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে একশোটা কমলানেবু কিনে আনলাম। প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রুগী মানুষ—এ ঘরে নেবুগুলো—।' প্রবোধ বললে—'পাগল হয়েছেন! তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছন্দে রাখুন।' রেখে আমি আবার বাজার করতে বেরুলাম, প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে ক'দিনের পর কলেজে গেল। সন্ধ্যেবেলা বাসায় এসে দেখি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আর কি! একা ঘরে লোভ না সামলাতে পেরে কেদার সতেরোটা নেবু খেয়ে ফেলেছে, জ্বর একেবারে বিকারে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া ঘুরে গেল; রোগীর সেবা করতে বসলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে ভাল ভাল ডাক্তার আনালাম; কলকাতা সহরে যতদূর যা হতে পারে কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায় ব'সে তিনদিন শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না।" বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে মহা অন্ধকার; গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লণ্ঠনটির আলো ম্রিয়মাণ, পলিতায় গুল জমিয়াছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমরা দুইটি প্রাণী বসিয়া। আমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"তাতে আপনার অপরাধ কি? আপনি ত আর জেনে শুনে করেন নি। বিশেষতঃ তার শালা যখন ঐ কথা বললে।"

"শালা ছেলেমানুষ। আমি তার বাপের বয়সী। সে যে ভুল করলে, আমার সে ভুল করবার কি অধিকার ছিল?"

আমি বলিলাম, "ব্যাপারটা খুব শোচনীয় সন্দেহ নেই। তবু আপনি নিজেকে এর জন্যে যতটা দোষী স্থির করেছেন, সেটা নিতান্ত অনুচিত। পাপের পরিমাণ ত কার্য্যের ফলে নয়, কার্য্য-প্রণোদক ইচ্ছায়।"

মদনগোপালবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "সে কথা বললে মন বোঝে না। আমিই এর জন্যে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে! সে বললে তারা পাঁচ ভাই এক বোন—ঐ একমাত্র বোন—কত আদরের বোন—তেরো বছর মোটে বয়স—তার এই সর্ব্বনাশ হল!—আমারও মেয়ে তখন তেরো বছরের। বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি আমার মেয়ের পানে চাইতে পারিনে। মেয়েকে দেখলে, সেই যে মেয়েকে দেখিনি যার সর্ব্বনাশ করেছি—তারই কথা খালি মনে হয়।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর। বৃদ্ধকে কি সান্ত্বনা দিব? বলিলাম, "মদনগোপালবাবু!—আপনি বৃথা নিজেকে দোষী করেন। জন্ম, মৃত্যু—এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মনুষ্যের অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না?"

মদনগোপালবাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল।

গাড়ী থামিল। নিদ্রাতুর খালাসীরা ক্ষীণ জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'মধুপুর—মধুপুর।' আমি মদনগোপালবাবুকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেলাম।

অযোধ্যার উপহার

॥ ১ ॥

অখিলবাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবামাত্র গৃহিণী তাঁহাকে ভৃত্য অযোধ্যার সকল গুণের কথা বলিয়া দিলেন।

অখিলবাবু সেদিন একটা মোকর্দ্দমা হারিয়া আসিয়াছিলেন। বিপক্ষ উকীল তাঁহাকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিঁধিয়া দিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মেজাজটা অত্যন্ত বিগড়াইয়া ছিল। তাহার উপর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার! গৃহিণী চক্ষুযুগল জবাবর্ণ ও পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। অখিলবাবু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। অদূরে একজন ঝি যাইতেছিল, অযোধ্যাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক মিনিট পরে অযোধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার চক্ষু অন্য-দিনের মত আনত নহে। গোঁফযোড়াটা সে উত্তমরূপে পাকাইয়া, জর্ম্মণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দিয়াছে। তাহার মস্তকে পাগড়ী। বাড়ীতে সচরাচর অযোধ্যা পাগড়ী পরে না—কিন্তু কোনও কারণে তাহার মেজাজটা যখন অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে, তখনি সে তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া লয়। মনে বীরত্বের ভাব জাগিয়া উঠিলে বাহিরে তাহার চিহ্ন-প্রকাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

অযোধ্যার আকার প্রকার দেখিয়া অখিলবাবুর ক্রোধবহ্নি আরও প্রখরতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি আত্মস্থ হইয়া শান্তভাবে অথচ কঠোরস্বরে জজের রায় পড়ার মত ধীরে ধীরে বলিলেন—

"অযোধ্যা, তুই অনেক কালের চাকর। কিন্তু পুরোনো হয়ে কোথায় ভাল হবি, না যতই বুড়ো হচ্ছিস, 'ততই তোর বজ্জাতি বাড়ছে। মনিব বলে যে একটা সমীহ কি ভয় ডর তা তোর নেই। হাড় জ্বালাতন ক'রে তুলেছিস। তুই পুরোনো চাকর ব'লে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। তুই যা। এই পয়লা তারিখ থেকে তোকে জবাব দিলাম।"

অযোধ্যা মাথা নাড়িয়া, উদ্ধতভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "যো হুকুম মহারাজ, হম্ রাজিকা সাথ চলা যায়েঙ্গে। আপ জবাব নেহি দেতেঁ তো

খুদ্ হম্ আজ ইস্তাফা দেনেকো তৈয়ার হুয়া থা।" অযোধ্যার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

কেহ না মনে করেন যে অযোধ্যা বাঙ্গালা কহিতে জানে না। সে এ বাড়ীতে আঠারো বৎসর চাকরি করিয়াছে—প্রায় বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গালা কহিতে পারে! কিন্তু রাগিলে সে আর বাঙ্গালা কহিত না। বাঙ্গলাভাষাটা ভালমানুষীর ভাষা; তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু জাতির ভাষা। অযোধ্যা কেন—অনেক বাঙ্গালীও প্রবল ক্রোধের সময় বাঙ্গালা কহিতে পারেন না—হিন্দী বা ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

অযোধ্যার এ দুর্ব্বিনীত উক্তিতেও অখিলবাবু আত্মহারা হইলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরভাবে বলিলেন, "বেশ। কিন্তু খবরদার আর যেন এসে জুটিসনে। বার বার তিনবার কসুর মাফ করেছি—আর করব না। এবার এলে আর কিছুতেই রাখব না। এই শেষ।"

অযোধ্যা বলিল, "নেহি গরীব পরবর, আওর নেহি আওয়েঙ্গে। হম্‌ভি দিকদারী হো গিয়া—"

তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া, দুয়ারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঘূর্ণিত-চক্ষে বাবু বলিলেন, "যাও।"

অযোধ্যা যাইতে যাইতে তাহার বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করিয়া লইল, "থক্ গিয়া। নোক্‌রী আওর নেহি করেঙ্গে: যো কিয়া সো কিয়া—বস্ অব্ হদ্ হো চুকা।"

অখিলবাবু চেয়ারের উপর উপবেশন করিয়া ঝিকে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা করিলেন। অন্যদিন অযোধ্যাই তাঁহার তামাক সাজিত।

॥ ২ ॥

বেলা দ্বিপ্রহর, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অখিলবাবু কাছারি গিয়াছেন, ছেলেরা কলেজে, গৃহিণী পালঙ্কে নিদ্রামগ্না।

আজ শীতটা কিছু বেশী। অযোধ্যা বারান্দায় রৌদ্রে বিছানা টানিয়া একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নিদ্রা কিছুতেই আসিতেছে না। খুকী তাহার মাথার কাছে বসিয়া পাকাচুল তুলিয়া দিতেছে।

খুকী বলিল, "অযুধ্যা তুই কেন যাবি ভাই ?"

অযোধ্যা বলিল, "তোর বাবা যে হামায় ছোড়ায় দিয়েছে ভাই।"

কাল পয়লা তারিখ, অযোধ্যা কাল যাইবে। খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবি অযুধ্যা ?"

অযোধ্যা বলিল, "আর কেন আসব দিদি ? এবার যাব আর আসব না।"

খুকী অযোধ্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না অযুধ্যা তোকে আসতে হবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোর যখন সাদি হবে, তখন তুই হামায় খৎ লিখিস হামি আসব।"

খুকী দুঃখিত স্বরে বলিল, "আমি কি লিখতে জানি ?"

"দাদাবাবুকে বলবি—দাদাবাবু লিখে দেবে তোর খৎ।"

অযোধ্যা কিয়ৎক্ষণ ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল, "তুই হামার সাদিতে যাবিনে ভাই ?"

খুকী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "দূর পোড়ারমুখো—তোকে আবার সাদি করবে কে ? তুই যে বুড়ো হয়ে গেছিস।"

অযোধ্যা বলিল, "দূর পোড়ারমুখী, হামি বুঢ়া হব কেন ?"

অযোধ্যার মাথায় চুল পাকাইতে পাকাইতে খুকী বলিল, "না তুই বুড়ো নস্! আমি যেন আর কিছু জানিনে! সেদিন দিদি, মা, সবাই বলছিল।"

"কি বলছিল ?"

"বলছিল অযুধ্যা ড্যাকরার বুড়োবয়সে ভীমরতি হয়েছে, বলে কিনা বিয়ে করব। ওকে কেউ বিয়ে করলে ত ও বিয়ে করবে।"

অযোধ্যা বলিল, "আরে দেখিস দেখিস, যখন সাদি হবে তখন সবাই কি বলে দেখিস।"

খুকী বলিল, "অযুধ্যা, তুই কেন সাদি করবি ভাই ?"

"নইলে হামার কে ভাত রেঁধে দেবে দিদি ?"

এই উত্তরে অযোধ্যার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। যে তিনবার কর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশে গিয়াছিল, পুনরায় যখনি হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—আসিয়া বলিয়াছিল, 'হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয় মা, তাই চ'লে এলাম।' বাল্যকালে অযোধ্যার একবার বিবাহ হইয়াছিল। অযোধ্যা যখন অখিলবাবুর

কর্ম্মে প্রথম নিযুক্ত হয—তখন তাহার স্ত্রী জীবিত ছিল। এখন সে বহু বৎসর ধরিযা বিপত্নীক।

খুকী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি এবার বিয়ে করবি অযুধা ?"

"সত্যি না ত কি ঝুট্ বলছি ?"

"ক' হাজার টাকা পাবি ?"

অযোধ্যা হা হা করিযা হাসিযা উঠিল। বলিল, "টাকা মিলবে কি আউর দেনে পড়ি রাক্কুসি ! এ কি বাঙ্গালীর সাদি ?"

"গহনাও দিতে হবে ?"

"গহনাভি দেনে পড়ি না ত কি ! বহুৎ রুপিযা খরচ রে দিদি—বহুৎ রুপিযা খরচ।" বলিয়া অযোধ্যা পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুকী কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তাহার পর আগ্রহের স্বরে বলিল, "অযুধা তোর বউকে আমি একটা গহনা দেবো।"

অযোধ্যা হাই তুলিয়া বলিল, "কি গহনা দিবি ভাই ?"

খুকী বলিল, "কেন ? আমার পুরানো বালা রযেছে সাড়ে তিন ভরির, সে ত আর আমার হাতে হয় না, সেই বালা তোর বউয়ের জন্যে দেবো এখন নিয়ে যাস।"

অযোধ্যা হাসিল। বলিল, "আগে কনিয়া ঠিক হোক—তখন বালা দিস, তাবিজ দিস, মল দিস—সব দিস !"

খুকী বলিল, "না তুই বালাযোড়াটি আমার নিয়ে যা।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি খুকী উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বালা দুইটি আনিয়া বলিল, "রেখে দে এই বেলা। মা উঠলে জানতে পারলে হয়ত দিতে দেবে না।"

অযোধ্যা বলিল, "বালা কোথা থেকে নিয়ে এলি রাক্কুসি ?"

"কেন, বালা কোথায় থাকে আমি জানিনে বুঝি ?"

"যা যা বালা যেখানে ছিল রেখে আয়।"—বলিয়া অযোধ্যা হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল।

খুকী বালা দুইটি বাজাইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিল। অযোধ্যা বলিল, "যা রেখে আয় বলছি, হারিয়ে ফেলবি ত মুস্কিল হবে।"

খুকী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। অযোধ্যা শেষবার একবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিল।

॥ ৩ ॥

খুকী তাহার মার ঘরে গিয়া দেখিল, মা তখনও নিদ্রিত। পালঙ্কের উপর হইতে তাঁহার রাশিকৃত চুল মেঝেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকী তাহার পর পূজার ঘরে গিয়া, কোশা হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া, ঘাড়টি বাঁকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিল—"আঃ।" ঘরের কোণে বিড়ালটা বসিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। খুকী পূজার ফুল এক মুঠা লইয়া আস্তে আস্তে বিড়ালটার কাছে গিয়া 'নমো নমো' বলিয়া তাহার মাথায় একটি একটি করিয়া ফুল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিড়াল মস্তকে শীতলস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। কাতরতাসূচক একটি 'মেও' শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পূজা ভঙ্গ হইল দেখিয়া ভক্ত খুকী বিড়ালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ ধাবিত হইল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, কবাটে শিকল দেওয়া রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা টুল বুকে করিয়া আনিয়া, দুয়ারের কাছে রাখিল। টুলের উপর উঠিয়া শিকল টানাটানি করিল কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল না। তখন নামিয়া ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক টুকরা কয়লা কুড়াইয়া পাইবামাত্র, তাহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা দিল। কয়লাটি লইয়া খুকী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। স্নানের স্থানে অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই—বেশ শুকাইয়া ছিল। সেই শুষ্ক স্থানে কয়লাটি দিয়া খুকী কয়েকটা ঘর আঁকিল এবং প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া 'ক' লিখিয়া দিল। তাহার পর টব হইতে ঘটি করিয়া জল লইয়া, ধীরে ধীর স্বরচিত চিত্রের উপর ঢালিতে লাগিল। অন্ততঃ বিশ ঘটি জল ঢালিবার পর নিরস্ত হইল। একটু শীতও করিতে লাগিল। তখন খুকী বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। গিয়া দেখিল অযোধ্যা দিব্য নাসিকাধ্বনি করিতেছে।

খুকী আস্তে আস্তে অযোধ্যার বিছানায় বসিল। তাহার কোমরে একটি চাবি বাঁধা ছিল, সাবধানে সেটি খুলিয়া লইল। অযোধ্যার দেবদারু কাঠের বাক্সটি কোথায় থাকিত, তাহা খুকী জানিত। বাক্সটি খুলিয়া বালা দুইটি আস্তে আস্তে সব জিনিসের নীচে লুকাইয়া রাখিল। অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে সে বাক্সে টিনে বাঁধানো—পৃষ্ঠদেশে গণেশের মূর্ত্তি অঙ্কিত একখানি আর্সি ও একটি কাঠের চিরুণী ছিল। খুকী নিজের চুলটা একটু আঁচড়াইয়া লইল।

শেষে বাক্স বন্ধ করিয়া চাবিটি আবার পূর্ব্বমত অযোধ্যার কোমরে বাঁধিয়া রাখিল।

॥ ৪ ॥

পরদিন প্রভাতে সকাল সকাল আহার করিয়া, গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, বাবুকে প্রণাম করিয়া, দাদাবাবু ও খুকীর নিকট সাশ্রুনেত্রে বিদায় লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিল। খুকী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—গৃহিণীও বারম্বার বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুজল মুছিলেন।

অযোধ্যার গ্রাম মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পথ। মুঙ্গের হইতে একখানি গোরুর গাড়ী করিয়া অযোধ্যা বাড়ী গেল।

এই মুঙ্গেরে সে প্রথম অখিলবাবুর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। সে কি আজিকার কথা? অখিলবাবু তখন নূতন আইন পাস করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরে তাঁহার উত্তমরূপ পশার জমিলে তিনি হাইকোর্টে আসিলেন। যাত্রার দিন এই মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী চড়িবার গোলমালে অখিলবাবুর পুত্র সতীশ হারাইয়া যায়। কেল্লার ফটকের নিকট অশ্বত্থ গাছের নিম্নে দাঁড়াইয়া সতীশ কাঁদিতেছিল, অযোধ্যাই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। বাবু খুসি হইয়া তাহাকে নিজের নূতন বিলাতী জুতাযোড়াটা বখশিশ দিয়াছিলেন। সে সকল কথা মনে পড়িল। তাহার পর সেই সতীশ কলিকাতায় জরবিকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমানে রাত্রি জাগিয়া একুশ দিন অযোধ্যা সতীশের শুশ্রূষা করিয়াছিল। শবদাহ করিয়া আসিয়া অখিলবাবু অযোধ্যার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—'অযুধ্যা—একবার তুই আমার হারা ছেলে খুঁজে দিয়েছিলি—এবার খুঁজে নিয়ে আয়।'—সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে অষ্টাদশ বৎসর যাহাদের সহিত কাটিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধন এবার চিরদিনের তরে ছিন্ন হইল। অযোধ্যার গাড়ী অনেক দূর অবধি গঙ্গার ধার দিয়া গেল। পথ যখন বাঁকিল, গঙ্গা দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইলেন—তখন অযোধ্যা যোড়হস্তে গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনের একটা কামনা নিবেদন করিল।

বাড়ী হইতে অনেক মাস অযোধ্যা কোনও পত্রাদি পায় নাই। বাড়ীতে তার এক বৃদ্ধ চাচী ছিল, আর কেহ ছিল না। এতদিন সে চাচী বাঁচিয়া আছে

কি মরিয়াই গিয়াছে, মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, দরজায় তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগৃহে সন্ধান করিতে গেল। শুনিল তাহার চাচী ছয়মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। পাড়ার বিজ্ঞলোকেরা পরামর্শ করিয়া, 'অযোধ্যা মাহতো, মোকাম কলকত্তা" এই ঠিকানা দিয়া, দামড়িলালের দ্বারা তাহাকে (বেয়ারিং) পত্রও লেখাইয়াছিল—কিন্তু সে পত্র মাস দুই পরে ফিরিয়া আসে এবং বেচারা দামড়িলালের এক আনা পয়সা জরিমানা দিতে হয়। অযোধ্যাকে তাহারা পরামর্শ দিল, দামড়িলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যা যেন তাহার এক আনা পয়সার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

চাবি লইয়া অযোধ্যা বাড়ী আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট বড় নানাজাতীয় আগাছা জন্মিয়াছে। ঘর খুলিল—বহুকাল বন্ধ থাকায় ঘরের মেঝে অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হইয়া গিযাছে। খাটিয়ার একটা পায়ার আধখানা উইপোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। গোটাকতক ইন্দুর ও আরসুলা হঠাৎ আলো দেখিয়া খড়খড় শব্দে পলাইয়া গেল।

অযোধ্যা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চাবি আবার বন্ধ করিয়া, একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। কর্ম্ম গিয়াছে, এ কথা তাহাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারিল না ;—বলিল ছুটি লইয়া আসিয়াছি।

তাহারা অযোধ্যাকে অভ্যর্থনা করিয়া তামাক দিল। সে তামাক দুই টান টানিয়াই, খক্‌খক্ করিয়া কাসিয়া, অযোধ্যা হুঁকা নামাইয়া রাখিল। বাবুর বাড়ী অম্বুরী তামাক খাইয়া খাইয়া তাহার পরকাল গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অযোধ্যা মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার করাইল। লোকে বলিল অযোধ্যা চাকরি করিয়া আমীর হইয়া আসিয়াছে। নহিলে, যাহার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরা মজুরী করিয়া দেহপাত করিয়াছিল, সে কখনও দিনে দুই আনা হিসাবে মজুর নিযুক্ত করে!

নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসিয়া অযোধ্যা অন্নপাক করিল। আহারান্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া, রেড়ীর তেলে প্রদীপ জ্বালাইল। সে ম্লান আলোক দেখিয়া, কেবলই তাহার প্রভু-গৃহের বিদ্যুৎ-আলোক মনে পড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল—মাস কাটিল। পাড়ার লোকে ক্রমাগত তাহাকে

জিজ্ঞাসা করে, কতদিনের ছুটি, আবার কবে কলিকাতা যাইতে হইবে ? সে বলে, এই যাইব এবার দিনকতক পরে। অযোধ্যা একাকী থাকে—কাহারও সঙ্গে মেশে না। তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রতিবেশিগণকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সহিত হাস্যামোদ করিতে অযোধ্যার প্রবৃত্তিই হয় না। সে নিজের ঘরে নীরবে বসিয়া থাকে—আর কেবল ভাবে। অখিলবাবুর ছেলেমেয়ে-গুলিকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছিল—তাহার মনটি অষ্ট প্রহর কলিকাতার সেই প্রিয় গৃহখানিতে পড়িয়া থাকে।

এইরূপে দুই মাস কাটিলে অযোধ্যা স্থির করিল—দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখিয়া সকলের সংবাদ আনাইতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠি লেখাইতে হইবে। গ্রামে কেহ ইংরাজি জানিত না। এ অঞ্চলে ইংরাজি জানিত কেবল খড়কপুরের পোষ্টমাষ্টার। গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া, দুই ক্রোশ দূরে খড়কপুরে গিযা, পোষ্টমাষ্টারকে উহা উপঢৌকন দিয়া, অযোধ্যা কলিকাতায় চিঠি লেখাইয়া আসিল।

সপ্তাহ পরে দাদাবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। যে পেয়াদা এ চিঠি আনিয়া অযোধ্যাকে দিল, অযোধ্যা তাহাকে মাচা হইতে একটা বিলাতী কুমড়া পাড়িয়া বখশিস্ করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ পাগড়ী বাঁধিয়া, খড়কপুরে গিয়া পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা চিঠি পড়াইল।

দাদাবাবু তাহার পত্র পড়িয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। বাড়ীর সকলে খুসী হইয়াছেন। ৫ই বৈশাখ খুকীর বিবাহ। অযোধ্যার জন্য খুকীর ভারি মন কেমন করে।

চক্ষের জল মুছিয়া অযোধ্যা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল, দশটা টাকা মনিঅর্ডার করিয়া সে দাদাবাবুকে পাঠাইবে—দাদাবাবু যেন অযোধ্যার হইয়া খুকীর বিবাহে তাহাকে একখানি রঙীন-শাড়ী কিনিয়া দেন।

টাকা বাহির করিবার জন্য অযোধ্যা বাক্স খুলিল। এ বাক্স সে বাড়ী আসিয়া অবধি একদিনও খুলে নাই। বাক্স খুলিয়া দেখিল, সোণার বালা!

দেখিয়া প্রথমটা সে অবাক হইয়া গেল। চিরুণীখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, তাহাতে খুকীর দুইগাছি লম্বা চুল লাগিয়া রহিয়াছে। তখন সমস্ত বুঝিতে পারিল।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার পাঁচ মিনিটের অধিক বিলম্ব হইল না। পরদিন সে ঘরে-দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত মহাজন ছিল। তাহার আড়তে গিয়া অযোধ্যা কয়েক দিবস রহিল। কিছু সোণা কিনিয়া, খুকীর বালাযোড়াটা ভাঙ্গিয়া ভাল করিয়া বড় করিয়া গড়াইয়া লইল।

নিজের জন্যও বস্ত্রাদি খরিদ করিল। একখানি ধুতি হরিদ্রায় রঞ্জিত করিল। গোলাপী রঙের একটি পাগড়ী তৈয়ারী করিল। উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া, পাতলা নীল কাগজে মুড়িয়া বালা দু'গাছি লইয়া, অযোধ্যা ৫ই বৈশাখ অপরাহ্ণ সময়ে অখিলবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল।

বাটীর সকলেই তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। খুকী বালা পরিয়া আমোদে আটখানা। অখিলবাবু আসিয়া বলিলেন, "অযুধা তুই আমার চিঠি পেয়েছিস !"

অযোধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "দাদাবাবুর চিঠি ?"

"দাদাবাবুর কেন ? আমার চিঠি। খুকীর বিয়েতে আমি তোকে এক সপ্তাহ হল নেমন্তন্ন ক'রে রেজেষ্টারি চিঠি লিখেছি—গাড়ীভাড়ার জন্যে দশ টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়েছি—তুই পাসনি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি দেশে ছিল নাকি ? ও এই কলকাতায় ছিল, খুকীর জন্যে বালা গড়াচ্ছিল।"

বালার কথা শুনিয়া বাবু রাগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুই গরীব মানুষ খেতে পাসনে, অত টাকা খরচ করতে গেলি কেন ? এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তোর ?"

অযোধ্যা তখন হাসিয়া হাসিয়া বালার ইতিহাস বলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তাই বলি খুকীর পুরাণো বালাযোড়াটা গেল কোথা ? আলমারিতেই রেখেছিলাম, না সিন্দুকেই ছিল ঠিক করতে পারিনে।"

অখিলবাবু বলিলেন, "তা বেশ। খুকীরই জিৎ।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অযোধ্যা নিজের রঙীন পাগড়ীটি খুলিয়া সন্তর্পণে উঠাইয়া রাখিয়া বিবাহ-বাড়ীর কার্য্যে মাতিয়া গেল।

বলবান জামাতা

॥ ১ ॥

নলিনীবাবু আলিপুরের পোষ্টমাষ্টার। বেলা অবসান প্রায়; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস—সম্মুখে পূজা—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবেন। জিনিসপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes."

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কি গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকীটাকী কার্য্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্ব্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখীর ছবি)

নিম্নে সোণার জলে মুদ্রিত—

"যাও পাখী যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্যে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে

মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ ভুল না।

তোমারই

সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকী আছে, তখন আবার টেলিফোনের কলঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes"।

॥ ২ ॥

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইয়াছেন। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীর পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন। ইঁহার আসিবার কথা পূর্ব্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেইজন্যই বিশেষতঃ, এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব লোক—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করিলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন।

শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্ত্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশতঃ ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজিতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ব্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিস ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে;—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্ত্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরণের ছিল। গাল দুইটি টেবো টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন:—

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ

হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোষ্ট আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ঈজিচেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটা মৎলবের উদয় হইল—কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন—শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যাণ্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়ীতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তত্তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না—ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্ত্তি আরও অধিক মাত্রায় পরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশূকরাদি শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ বসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইযাছে; ফলতঃ তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায় নামটাও যদি পরিবর্ত্তন করিবার উপায় থাকিত। নলিনীবাবু মনে করিয়াছন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কি নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

॥ ৩ ॥

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী কোট, মস্তকে পাগড়ী। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনে নামিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কই, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি যে শ্বশুর মহাশয়ের নামে চারি আনার টেলিগ্রাম* একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি?

কুলি ডাকিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, নলিনীবাবু ষ্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকীলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশে বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের সহরের নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী একটি বৃহৎ কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্ব্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদারবাবু উকীলের বাড়ী পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া

*দিনকতক এইরূপ টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু এগুলি ছিল চিঠির অধম।

বাড়ীর মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে! জামাইবাবু?"—বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে একটি দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশরণ জিনিসপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ীর ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল, "হ্যাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল ছিলেন ত?"

"হ্যাঁ ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন। আজ ছ'মাস আমি এ বাড়ীতে চাকরী করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—দিদিমণি বলেন, এই ছুটি হলেই আসবেন। তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে?"

নলিনী মোগলসরাই ষ্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না;—জলটল খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে স্নান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের জন্যে কি গহনা টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।"—বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, "তুই বখশিস্ লিবি, হামি বুঝি বখশিস্ লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব্ব কথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্প বয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এই মাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোণার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত!"—বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা ওমা ওকি? লোকে বলবে কি গো? রূপো দিয়ে সোণার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, নলিনী বলিল, "সোণা ত আনিনি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল, "সে কথা শোনে কে? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোণার গহনার ফরমাস দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। 'ছেলের বাপ হলেই হয় না' ইহার অর্থ কি? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ নাকি?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া, সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্ব্বার গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা অপসৃত করিয়া রামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জলখাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে রূপার রেকাবী বাটী গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জী এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন!

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই-তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল:—

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক।"

"অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হবে কেন?"

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জুয়াচোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"আঁ্যা—ওমা কি সর্ব্বনাশ হল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি? যা, শীগগির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট; প্রত্যেকখানির নিম্নে সোণার জলে নাম লেখা—এম. এন. ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

॥ ৪ ॥

এদিকে রামশরণ ভৃত্য উর্দ্ধশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদারবাবু উকীলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়া থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকীল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ করিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, "বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ী আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "কেন রে—কারু অসুখ বিসুখ ?"

"বাড়ীমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষ বলিলন, "ডাকু ? দিনের বেলায় ডাকু ?"

রামশরণ বলিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদ্‌মি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল ? কি করছে ?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোগ্‌কো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে ? লাঠি এনেছে ?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ী ছেড়ে এলি কার জিম্মায় ?" বলিযা ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া হাঁকিলেন, "জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয় পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না, পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধ'রে পুলিসে হ্যাণ্ডোভার করে দিও।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল—বাড়ীতে পৌঁছিলে, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কই ? কোথায় ?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারন্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনিই মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়ী গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চ'লে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন। শেষে বলিলেন, "মহিনের জামাই তুমি? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দু'জন মহেন্দ্রবাবু উকীল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফঃস্বল থেকে কোনও উকীল, আমার কাছে এক মোকর্দ্দমা পাঠিয়ে দিলে, মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়ীতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম!"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প গুজবের পর, নলিনীর জন্য একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

॥ ৫ ॥

এদিকে কেদারবাবু উকীলের বাড়ীতে, সে অপরাহ্ণে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সেই সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকীলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ী ফিরিয়া, চা ও

তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ঈজিচেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকীলের বাড়ী, কত লোক আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া রহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী?"

"হাঁ বাবু!"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই 'জামাই' শুনিয়াই মহেন্দ্রবাবু কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে যণ্ডামার্ক আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ীর ভিতর হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিয়াই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে?"—বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়ীতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আর লোক পেলে না? বেটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দেও। গর্দ্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ যো হাম্‌কো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুরচুর কর ডালেঙ্গে!"

নলিনীর মূর্ত্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

এ কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো ষ্টেশন।"

॥ ৬ ॥

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ নাকি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর!"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দু'জনেরই এক নাম—বাড়ী ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য্য নয়?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—এ সকল কথার ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে যদি হ'ত—তা হলে খবর দিয়ে আসত—আমরা ষ্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ কখনও জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী এসে উপস্থিত হয়? সে জুয়াচোর—জুয়াচোর!"

"কেন আসবার কথা থাকবে না? আসবার কথা ত রয়েছে। পূজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুই দেখিছিস নাকি? বল্ ত!—বল্ ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ঐ গোলমালটা হ'ল, আমি দোতালায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদের ননীর পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপরেই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন মিরজাপুরী গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা ব'লে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খবর কি?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন ফেরাবার কি উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল 'ষ্টেশনে চল'। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ী নেই। বোধ হয় ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে আছে। যাই, গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

বাড়ীর লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকীলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়ীতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়ীতে পায় না।"

খুড়া মহাশয়

॥ ১ ॥

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকটে চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা; কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটিমাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়নকক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদাই সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগলাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তারবাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশাই। খবর কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু? এস, খবর ভাল! এখনও বেহুঁস রয়েছেন—বড্ড জ্বরটা রয়েছে কিনা। কিন্তু নাড়ী বেশ চলছে এখনও! উঠে এস—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর একটি মাটির প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোমটা টানিয়া দিল। গগন

চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—থার্ম্মমিটার দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরীক্ষান্তে বলিলেন, "এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার্ মিক্‌চারটা খাওয়ান হচ্চে?"

সাবিত্রী ঘোমটাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবুকে খবর দিয়েছেন?"

"না, দিইনি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হয়ে উঠবেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে বাড়ী আসবে—তাই খবর দিইনি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জ্বরটা ছাড়ল না—ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়বার সময় সামলাতে পারলে হয়!"

গগন বলিলেন, "আরে না না। আমি এতকাল দেখছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক। অনেক বয়সটা হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল—ভোরবেলায় প্রাণপাখী বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই এক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, "নবু—নবু এসেছে?"

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইটি একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সকলেই বলিল, "তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল—তোমাদের সব রেখে গেছেন—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাকলেই ভাল হত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে

একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিল, সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বাবা গিয়ে, নবুকে একখানি টেলিগ্রাম ক'রে দাও; আমার আর হাত-পা সরছে না।"

সত্যচরণ বলিল, "আচ্ছা, আমি আপিস যাবার সময় ষ্টেশন থেকে টেলিগ্রাম ক'রে দেবো এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস যায়।

॥ ২ ॥

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রি হইল—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন। শোকটা যেন ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি? ইহা শোক, না আতঙ্ক?—দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়—তাহার মনে হয়, এইবার ত আমার পালা আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে, নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার—তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে—সে ঘরটি আজ তালাবন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃস্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া দিয়া, একটি দিয়াশালাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্দুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্দুকটির উপর হইতে একটি ভাঙ্গা কাঠের

হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহাভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামাইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা নামাইবার পর, নীচের দিক হইতে পুরাতন লাল চেলী বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়াবন্দী অনেক নোট রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্তপংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে অন্য পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃসন্নিবিষ্ট করিয়া গগনচন্দ্র সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙ্গা বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশমার খোলটি ছিল। চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশ টাকার নোট—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোটগুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন;—একশতখানি আছে—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন—প্রত্যেকটিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশ হাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না—গগনচন্দ্র নোটগুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুই একটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রথমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্দুকের চাবিটি ছুঁড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

॥ ৩ ॥

এই দিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সদ্যপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌঁছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া, কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ মা কি আর কারু চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়োমশায় রয়েছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা—গগন চক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হয়ে গেছে দেখেছ, একদিনে? চোখ-টোক সব একেবারে ব'সে গেছে।"

একজন বলিল, "আহা, ভাইয়ের শোকটা বড্ড লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু বসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল।

ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামহাশয় বলিলেন, "শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এই বেলা থেকে করতে হবে! টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল, "টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্দুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ—যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায় তা ত বলতে পারিনে। হয়ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল, "আমাকে ত দিয়ে যাননি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুন্‌সিতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয়ত খুলে নিয়ে থাকবেন।"

"না—উনি ত বললেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "তাঁর কোমরে ছিল? তা ত লক্ষ্য করিনি। তবে হয়ত তাঁর চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল, "ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?"

খুড়ামহাশয় হুঁকা নামাইয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিলেন, "আরে বাবা, সে সময় কি আমার চাবি সিন্দুক টাকাকড়ি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা পার।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল, "তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্দুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্দুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটি ত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোণা রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে ধারণা ছিল যে, তাহার পিতার সিন্দুকে নগদ দশ হাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষিসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্দুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পেলে?"

সিন্দুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দশ হাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কত টাকা?"

"দশ হাজার।"

খুড়ামহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "দশ হাজার টাকা? পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল, "কেন, সকলেই ত বলত এই সিন্দুকে তাঁর দশ হাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বলতেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে মাঝে মাঝে, তাই খরচপত্র

করতেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হ্যাঁঃ—দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা কি সোজা কথা রে বাবা?"

নবকুমার আর কি করিবে? নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাসা ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে।

॥ ৪ ॥

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড় চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজারে ও বড়বাজারে ঘুরিয়া, আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেটবুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেটবুক বাহির করিতে গিয়া দেখে, পকেটবুক নাই—গাঁটকাটায় কখন চুরি করিয়াছে জানিতে পারে নাই!

বিপদের উপর বিপদ! সেই পকেটবুকে তাহার রিটার্ণ টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল, আড়াইশত টাকার নোট ছিল—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল।

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পাঞ্জাব মেলে সে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল—এমন টাকা নাই যে নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোনও রকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই—বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন, "নবকুমারবাবু, দেখুন

ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেটবুক চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বলতে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, ব্যাপারটা কি ?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পাঞ্জাবমেল আসানসোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মালগাড়ীর সঙ্গে ভীষণ কলিশন হইয়া যায়। দুই তিনখানি যাত্রিগাড়ী চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার অত্যন্ত আহত হইয়া হাঁসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিক রকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে 'নবকুমার চক্রবর্ত্তী'র নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন, "কি রকম ? আপনিও মরেছেন নাকি ?"

নবকুমার বলিল, "বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ ?"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি নবকুমারের ভূত ন'ন ত ? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।"—বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল।—সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া আসানসোলে চলিযা গেল।

সেখানে গিয়া পুলিশ আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী ব'লে যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জানলেন কি করে ?"

দারোগা বলিল, "তার পকেট থেকে এই পকেটবুকটি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেটবুক—তাহাতে তাহার নোট, চিঠি, রিটার্ণ টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই—সেই গাঁটকাটাই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?"

"আমি নবকুমারের একজন বন্ধু।"

"লাসের কি হবে ? অ্যাকৃসিডেন্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাসের আত্মীয়েরা এসে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত করবে নইলে আমরা পুঁতে ফেলবে।"

নবকুমার একবার ভাবিল, পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে

একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাস দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাস জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল, "আর এ টাকাকড়ি? লাসের ওয়ারিশান কে?"

"লাসের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে এসে টাকা নিয়ে যাবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানা নোট করিয়া লইল।

লাস জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্কুলবাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "গিয়ে দেখলাম—আমি নই—আর একজনই মরেছে বটে!

বাবুটি বলিলেন, "তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লীগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

॥ ৫ ॥

সন্ধ্যাকাল—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আসানসোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট আনিয়াছিলেন, তাহারই মধ্য হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল— সংপ্রতি তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেই দিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ

করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে দেখা যায় না!

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—'সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!' কেহ বলিতেছেন—'আহা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল—আজকালকার দিনে ও রকম প্রায় দেখা যায় না।'

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা! কত্তা!" তাহার মুখে আর কোনও বাক্যনিঃসরণ হইল না—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া ক্রমে তাহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে চিনিবাস, অমন করলি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল, "রাম রাম রাম! ভূত গো কত্তা!"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধ বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দূর বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ভূত নাই? ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর।"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা-কাপড়ে ঢাকা একটা কি বেড়াইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল—ঠিক ৺নবকুমারের মত চেহারা—আর বলিল—'ওঁরে চিঁনে—এঁকবার খুড়োমশায়কেঁ ডেঁকে দিঁতে পাঁরিস?'—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে আছাড়িয়া ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠিক দেখেছিস ?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কত্তা ? ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধ্যাবেলায় বাসন মাজতে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-প্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন ? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে, তাই এসে ঐ কথাটা ওজর করচে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুরুদুরু করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিনচারি দিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগন চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙ্গা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও, নবকুমারকে দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগন চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়। অপঘাতমৃত্যুটো হল কিনা—ও রকম ত হবারই কথা। বছরটা পুরুক, গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও, উদ্ধার হয়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় পুষ্করিণীর তীরে হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্রপরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র সে বলিল, "খুঁড়োমশায়,—সেঁ দঁশ হাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেইখানে গাড়ু আছাড়িয়া ফেলিয়া 'রাম রাম' শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা—সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রির নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন, "কে—ও ?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল, "আমি নবঁকুঁমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ করিয়া ছাড়িয়া গেল।

ভূত বলিল, "সেঁ দঁশ হাঁজার টাকা আমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ, তঁতদিন রোঁজ আঁসব তাঁগাদা কঁরতে—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব—রোঁজ আঁসব।" বলিয়া নবকুমার চুপ করিল।

খুড়ামহাশয়ের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন মেঝের উপর হইতে বরফ বাঁধা পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া, খোলা জানালার কাছে গিয়া একটি গরাদে সরাইয়া, বাহির হইল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারই গৃহে লুকাইত নবকুমারকে সংবাদ দিল—খুড়ামহাশয় তাহার সহিত এক ট্রেণেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এ টাকা কোথা থেকে এল?' গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বলত, তাঁর দশহাজার টাকা আছে—তা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্দুক থেকে বেরোয়নি। কালকে রাত্রে হঠাৎ তাঁর পুরাণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, এক টুকরো লাল-চেলীতে মোড়া দশ হাজার টাকার নোট। দেখে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল আর কি। আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাকত! পিতৃধন!—যা হোক, বিধবাটার উপায় হল।'

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া, খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ীতে আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়ামহাশয় কি একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

গুরুজনের কথা

॥ ১ ॥

ডাক্তার চৌধুরী হুগলির সিভিল সার্জ্জন স্বরূপ বদলি হইয়া আসিবার মাস দুই পরেই শুনা গেল, কলেজের অধ্যাপক রজনীবাবুর সহিত তাঁহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে দেখা গেল, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন প্রভাতে এই দুইটি নবীন প্রণয়ী দুইখানি বাইসিক্লে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়।

প্রভা ও রজনী হুগলির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের ভিতর দিয়া চক্রচালনা করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর মেয়েকে বাইসিক্লে দেখিয়া বৃদ্ধেরা মন্তব্য করিলেন ঠিক এতদিনে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে ;—নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা পরামর্শ করিয়া, ঘটনাটির উপর বিলক্ষণ রঙ দিয়া—সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠাইল ;—আর যুবতীরা ঘোমটার আড়াল হইতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, পরস্পরকে বলিতে লাগিল—'ধন্যি মেয়ে বটে।'—কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্যাদি প্রভা ও রজনীর কর্ণগোচর হইবার কোনই সুযোগ ছিল না ;—তাহার কেবল পরস্পরের বিরল সঙ্গসুখ উপভোগ করিতেই ব্যস্ত রহিয়া গেল।

এইরূপ করিয়া আরও মাস দুই কাটিয়াছে। বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ইংরাজি নববর্ষের দিন—১লা জানুয়ারী। ডাক্তার চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বিবাহ হুগলিতেই সম্পন্ন হয়—কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছা তাহা নহে। তাঁহার ইচ্ছা কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ হয় ; নহিলে আমোদ উৎসবের সুযোগ পাওয়া যাইবে না। ডাক্তার চৌধুরী প্রথমে ক্ষীণভাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন—বলিলেন কলিকাতায় গেলে খরচপত্র বেশী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। কিন্তু গৃহিণী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সর্ব্বত্র যাহা হয়—গৃহিণীর মতই বজায় রহিয়া গেল—কর্ত্তাকে পরাস্ত মানিতে হইল।

কলিকাতায় গিয়া বিবাহ হইবে শুনিয়া কিন্তু প্রভা ও রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনই বিপজ্জনক। তাহারা পরামর্শ করিয়াছে ঐ দিন প্রভাতে অন্যান্য সকলের সঙ্গে রেলে কলিকাতায় না

গিয়া—দুইজনে একাকী বাইসিক্লে যাত্রা করিবে। কিন্তু অভিভাবকেরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। প্রভা ও রজনীর উপস্থিতিকালে পারিবারিক সভায় এ বিষয়ের একদিন আলোচনা হইল। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রভার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন সকলে রজনীকে বলিল, "আচ্ছা প্রভা না হয় ছেলেমানুষ, তুমি কি বল ?"

হায়, প্রেমটা এমনি জিনিস—তাহাতে পড়িলে কলেজের অধ্যাপকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়। রজনী একটু হাসিয়া বলিল, "আপনারা যে রকম বিপদ আশঙ্কা করছেন, তার কোনও কারণ নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর ভাল রাস্তা আছে। শীতের সকালবেলা রোদ্দুরের প্রভাবে কোনও কষ্ট হবার ভয় নেই।"

প্রভার মা বলিলেন, "আচ্ছা কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই যেন, কিন্তু তোমরা কি ঠিক সময় পৌঁছতে পারবে ? কখখনো পারবে না। এখান থেকে দধিমঙ্গল ক'রে বেরুতে হবে। কলকাতায় গিয়ে গায়ে-হলুদের বন্দোবস্ত। ন'টা দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারবে ? কখখনো পারবে না। ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

বলিয়া রাখি, যদিও ইঁহারা নব্যতন্ত্রের লোক তথাপি বিবাহের আপত্তিবিহীন সনাতন আচারগুলি রক্ষা করিতে সমুৎসুক। দধিমঙ্গলে শাঁখ বাজাইবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রভার দিদি নলিনী সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন।

রজনী বলিল, "কলিকাতা এখান থেকে চব্বিশ মাইল বই ত নয়—ন'টা দশটার অনেক আগে আমরা পৌঁছতে পারব।"

নলিনী বলিলেন, "গুরুজনের কথা না শোন কাণে—শেষকালে অনুতাপ করতে হবে দেখো।"

ইহা শুনিয়া প্রভা তাহার দিদির উপর কটমট করিয়া সরোষ নেত্রপাত করিল। তাহার চক্ষে যদি সংপ্রতি জলের পরিবর্ত্তে অগ্নি থাকিত তবে দিদি অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ক্রমে সকলের মত হইয়া গেল। প্রভারও সজলচক্ষে আবার হাসি দেখা দিল।

॥ ২ ॥

আজ নববর্ষ—আজ প্রভা ও রজনীর বিবাহ। ভোরবেলা চৌধুরী পরিবারের সকলে জাগিয়া উঠিয়াছেন। এখনি দধিমঙ্গল হইবে। প্রথমে অনেক আপত্তিসত্ত্বেও, রজনীও আসিয়া এইখানে প্রভার সহিত দধিমঙ্গল খাইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সমস্ত প্রস্তুত। রজনী আসিলেই হয়। ক্রমে বাহিরের অন্ধকার হইতে চক্রের শব্দ এবং ঘণ্টার ঠুংঠুং ধ্বনি আসিল।

মুহূর্ত্ত পরেই রজনী আসিয়া প্রবেশ করিল। সে তাহার জিনিসপত্র ভৃত্যহস্তে রেলে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নলিনী পরিহাস করিয়া বলিলেন, "আগে বরকনের দধিমঙ্গল আলাদা আলাদা হত।"

প্রভার মা বলিলেন, "তুই ত জিদ্ ক'রে বেচারিকে আনালি। এখন আবার ঠাট্টা করছিস কেন?"

রজনী বলিল, "দেখুন ত একবার অন্যায়। উনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—'আমার বিয়ের সময় আমাকে একলা দধিমঙ্গল খেতে হয়েছিল, সে দুঃখ আমার এখনও মনে আছে। আমার ত দিদি ছিল না। প্রভাকে দিয়ে আমার সে সাধ পূর্ণ হোক।' এখন এই কথা বলছেন!"

নলিনী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি বলেছি? কখন বললাম তোমায়?"

"আপনি বলেন নি?"

"কখনো না।"

"তা না হতে পারে। কিন্তু তখন আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনার মনের ভিতর ঠিক ঐ রকম ভাবটাই জাগছে।"

সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নলিনী বলিলেন, "তোমার ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা! মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা বলতে পার নাকি?"

"অনায়াসে।"

"আচ্ছা, আমার মনে এখন কি কথা হচ্ছে বল দেখি?"—বলিয়া নলিনী মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী গম্ভীরতর ভাবে, পকেট হইতে তাহার চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইল। পরে অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে, ঝুঁকিয়া, নলিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব ?"

"ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও।"

"আপনার মনে হচ্চে, কতক্ষণে কলকাতায় পৌঁছবেন—কতক্ষণে একটি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" নলিনীর স্বামী তখন কলকাতায় ছিলেন।

নলিনী বলিলেন, "ভুল। আমার মনে হচ্ছিল তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।"

রজনী অত্যন্ত বিনযের ভাণ করিয়া বলিল, "আহা অযথা আমায় কেন বাড়িয়ে তোলেন ? আমি ক্ষুদ্র-প্রাণী মাত্র।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। এইরূপ হাস্যামোদের মধ্যে দধিমঙ্গল সমাপ্ত হইল।

তখন ভোর পাঁচটা। ছয়টার সময় ট্রেণ ছাড়িবে—সেই ট্রেণে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী আসিযা দাঁড়াইয়া আছে।

সকলে প্রস্তুত হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার মা রজনীকে বলিলেন, "খুব সাবধানে যাবে তোমরা। পথে যেন কোনও বিপদ ঘটিও না বাছা। আর, খুব সকাল সকাল পৌঁছতে হবে। বেলা আটটার বেশী দেরি না হয়। কলকাতায় গিয়ে তবে গায়েহলুদ হবে। তোমাদের বাড়ী থেকে তেল আসবে, ক্ষীর আসবে, মাছ আসবে, তবে সেই তেল হলুদ মেখে প্রভা স্নান করবে—সেই ক্ষীর, মাছ প্রভা খাবে। আর, পথে যেন কিছু খেও না। গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নাই।"

নলিনী বলিলেন, "খালি তেল হলুদ ক্ষীর মাছ আসবে কেন ? তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও আসুক না।"

রজনী বলিলেন, "ফাউস্বরূপ নাকি ?"

নলিনী বলিলেন, "না—বাহক হয়ে, বকশিস পাবে।"

হাস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও প্রভার মা জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিতেছেন "খুব সাবধানে যাবে।" নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "গুরুজনের কথা না শুন কাণে—।"

আর শুনা গেল না। গাড়ী ফটকের বাহিরে গিয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

ক্রমে আলো হইতে লাগিল। রজনীকে একাকী রাখিয়া প্রভা যাত্রার জন্য সজ্জিত হইতে গেল। কয়েক মিনিট পরে দুইখানি বাইসিক্ল লইয়া দু'জনে বারান্দার নিম্নে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখনও আলোকের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। বাগানে দেশী বিলাতী অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—দূরের ফুল তখনও ভাল নজর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত সৌরভটুকু অনুভব করা যায় মাত্র। প্রভা ও রজনী কয়েক মুহূর্ত্ত একাকী এই বাগানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সস্নেহে রজনী প্রভার হস্ত নিজ হস্তযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিল, "প্রভা, আজ আমরা কোথা যাচ্চি ?"

প্রভার মনে উত্তর জাগিল, 'সুখসাগরে স্নান করিতে'—কিন্তু লজ্জায় সে কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু সমীপস্থ একটি গাছ হইতে একটি শিশিরসিক্ত নবস্ফুট গোলাপ তুলিয়া রজনীর কোটে লাগাইয়া দিল। রজনী ধন্যবাদ দেওয়ার হিসাবে স্বীয় প্রিয়তমার আরক্তিম ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

তখন আরও একটু আলো হইযাছে। আকাশ ধূসরতা পরিত্যাগ করিয়া নীলাভ হইয়া আসিতেছে। বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া দুইজনে যাত্রা করিল।

হুগলি সহরের সীমানা অতিক্রম করিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। এ পথে পূর্ব্বে ইহারা কতবার গিয়াছে—তবে কখনও পাঁচ সাত মাইলের বেশী যায় নাই। বেশ শীত করিতে লাগিল। বাইসিক্ল দুইখানি দ্রুতভাবে পাশাপাশি যাইতেছে।

পথের দুইধারে তরুগুল্মের সারি। বামে মাঝে মাঝে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে মাঠ। খানিকটা মাঠ—তাহার পরেই রেলওয়ে লাইন। কিয়ৎক্ষণ পরে সশব্দে কলিকাতাভিমুখে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বাহির হইয়া গেল। তাহাতে প্রভার পিতামাতা প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল—তখন শীতক্লেশ অনেকটা নিবারিত হইল। এখন ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ভ্রমিত পথের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে দুই একটি করিয়া লোকসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। দুই একখানি গরুর গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রেলওয়ে লাইন আর দেখা যায় না। পথ গঙ্গার

সন্নিকট দিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ পার্শ্বে দূরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে কোনও গ্রামের মন্দিরচূড়া জাগিয়া উঠে, আবার দেখিতে দেখিতে তাহা দ্রুতগামী আরোহিদ্বয়ের পশ্চাতে পড়িয়া যায়।

ক্রমে সূর্য্য উচ্চে উঠিল, বেশ রৌদ্র হইল। কিন্তু এখন একটু অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ঠিক সম্মুখে সূর্য্য। উত্তাপে প্রভার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। এ সম্ভাবিত অসুবিধাটির কথা কিন্তু পূর্ব্বে প্রভা বা রজনী কাহারও মনে হয় নাই। নবপ্রণয়ীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কবেই বা কার্য্য করিয়া থাকে?

যখন অনুমান পনেরো ষোল মাইল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন সম্মুখরৌদ্রে প্রভার বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রজনী বেশ বুঝিতে পারিল যে প্রভার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রভা তাহা স্বীকার করিবে না। স্বীকার করিলেই বা উপায় কি?

কিন্তু প্রভার যখন অত্যন্ত পিপাসা পাইল—তখন আর প্রভা থাকিতে পারিল না—রজনীকে বলিল। পার্শ্বেই গঙ্গা। রজনী প্রস্তাব করিল—এইখানে থামিয়া, গঙ্গাতীরে গিয়া তাহারা উভয়ে জলপান করিয়া আসিবে। পথে একজন রাখাল-বালক চলিতেছিল, বকৃশিসের লোভে সে বাইসিক্ল দুইখানা আগলাইতে সম্মত হইল।

প্রভা ও রজনী বাইসিক্ল হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিল। রাস্তা হইতে নামিয়া শস্যক্ষেত্র—মধ্যে সরু আল-পথ। গঙ্গার ঠিক তীরের উপর আমের বাগান।

ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠিক সেইখানটাতেই জল খাইবার সুবিধা হইল না। একটুকু ওদিকে সরিয়া যাইতে হইল। সেখানে একটা বৃহৎ পাথর অর্দ্ধজলমগ্ন অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার উপর বসিয়া প্রভা ও রজনী মুখে হাতে জল দিয়া শ্রান্তি দূর করিল। অঞ্জলি ভরিয়া শীতল গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করিয়া বাঁচিল।

ঈষৎ বায়ুসঞ্চারে গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। ওপারে একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। দুই একখানি জেলে-নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেক দূর দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রান্তি দূর হইলে প্রভা ও রজনী ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যেখান দিয়া নামিয়াছিল, সেইখান দিয়া উঠিয়া নির্জ্জন আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকগুলি গাছে আম্রমুকুল ধরিয়াছে, তাহার মদিরগন্ধে বাতাস

পরিপ্লাবিত। আমবাগানের পরেই শস্যক্ষেত্র। একদিকে কড়াইসুঁটির ক্ষেত, অপরদিকে সরিষা। সরু আল-পথ দিয়া দুইজনে চলিয়াছে; দাঁড়াইয়া কড়াইসুঁটির ক্ষেতের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী বলিল, "দেখ, ফুলগুলি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।"

প্রভা বলিল, "চমৎকার।"

"আমি অনেক সময় ভাবি, এমন সুন্দর ফুল আমাদের কাব্যে কেন কখনও স্থান পায়নি।"

প্রভা বলিল, "ইংরাজি কাব্যে ত দেখা যায়, সুইট্ পীজ্। আমাদের কাব্যে যে সকল ফুলের আদর বেশী, সবই গন্ধযুক্ত ফুল। গন্ধ নেই ব'লে এ ফুল আমাদের কাব্যে অনাদৃত।"

রজনী বলিল, "আবার দেখা যায়, রূপের কোনও ভাণ নেই, শুধু গন্ধের জোরে ফুল কাব্যে স্থান পেয়েছে—যেমন বকুল।"

এইরূপ গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে প্রণয়িদ্বয় চলিল। পথের কাছে একথোলো মটরসুঁটি ফলিয়াছিল, প্রভা কয়েকটি তুলিয়া নিজে খাইল এবং রজনীকেও খাওয়াইয়া দিল।

যখন ইহারা রাস্তায় উঠিল, তখন যাহা দেখিল, তাহাতে দুইজনেরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

রাখাল-বালক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহার নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে। প্রভার বাইসিক্লখানি শুধু আছে, রজনীর খানি নাই।

রাখাল বলিল—একটা পল্টনের গোরা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একখানা বাইসিক্ল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সে বাধা দিতে গিয়াছিল বলিয়া তাহার নাসিকার উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গিয়াছে।

রজনী উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে গেল?"

রাখাল অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া হুগলির দিকের পথ দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, সে অধিকক্ষণ যায় নাই, এইমাত্র গিয়াছে।

রজনী প্রভাকে বলিল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখি।"—বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভার বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া তীরবৎ বেগে সেইদিকে ছুটিল।

একমিনিট—দুইমিনিট—তিনমিনিট, বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া, শেষে দূরে

বাইসিক্ল-চোরকে দেখিতে পাইল। লাল কোর্ত্তা পরা মূর্ত্তি, বাইসিক্ল ছুটাইয়া চলিয়াছে।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া, দ্বিগুণ বেগে রজনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ক্রমে নিকটে, আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। গোরাটা বোধ হয় নিজেকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরাপদ মনে করিয়া, সানন্দচিত্তে চলিয়াছে। রজনী ইংরাজিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম্ বদমায়েস !"

এই অপ্রত্যাশিত শব্দে গোরাটা তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। চালনাকার্য্যে অপটুতাবশতই হউক, অথবা পথে ইষ্টকাদির বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই হউক, যে তৎক্ষণাৎ বাইসিক্লসুদ্ধ মহাশব্দে পথে পড়িয়া গেল।

রজনী তাহার বাইসিক্ল পথে ফেলিয়া রাখিয়া, কয়েক লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্রের মত সেই গোরাটার কাছে আসিয়া পড়িল।

সেই নরাকার বৃটিশ বন্যজন্তুটি সেইমাত্র পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রজনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার উপর পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘুসি ও লাথির চোটে তাহাকে পুনশ্চ ভূমিশায়ী করিয়া ফেলিল।

গোরা মাটিতে পড়িলে রজনী দেখিল, তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইতেছে। তখন তাহার মনে হইল, ইহা ঠিক ন্যায়যুদ্ধ হইতেছে না—উহাকে প্রস্তুত হইবার জন্য সময় দেওয়া উচিত। ইহা ভাবিয়া রজনী আক্রমণ হইতে বিরত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গোরাটা আবার ঝাড়িয়া উঠিল। রজনী বলিল, "প্রস্তুত ?"

রজনীর সেই জিমন্যাষ্টিক করা ডাম্বেল ভাঁজা বদ্ধমুষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোরাটা বলিল, "থাক্—যথেষ্ট হইয়াছে। ক্ষমা কর। শুনিয়াছিলাম বাবুর বাইসিক্ল। বাবুদের মধ্যে এমন কেহ আছে তাহা জানিতাম না।"—বলিয়া লোকটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুগলী অভিমুখে রওনা হইল।

এতক্ষণ রজনী অপহৃত বাইসিক্লটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় নাই। এখন দেখিল, চক্রদ্বয়ের যোজক-দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া বাইসিক্ল দুইখান হইয়া গিয়াছে। চাকাও স্থানে স্থানে বাঁকিয়া গিয়াছে।

রজনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া, বাইসিক্লটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পথ দিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, তাহাকে বলিল, "চাকা দু'খানি কাঁধে ক'রে খানিক দূরে নিয়ে যেতে পারিস ? বকশিস পাবি।"

সে স্বীকৃত হইল। রজনী তাহাকে বলিল, "তুই নিয়ে আয়। এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে রাস্তায় যে পাকা সাঁকো আছে—আমি সেইখানে থাকব।" বলিয়া রজনী বাইসিক্ল ছুটাইয়া প্রভার নিকট পৌঁছিল।

॥ ৪ ॥

প্রভা তখন সাঁকোর উপর একখানি রুমাল বিছাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাখাল-বালক গঙ্গা হইতে নাক মুখ ধুইয়া আসিয়াছে, প্রভা তাহাকে চকলেট দিয়াছে। সে তাহাই খাইতেছে।

রজনী পৌঁছিয়া সংক্ষেপে সমস্ত জানাইল। প্রভা দেখিল রজনীর ভ্রূ কুঞ্চিত মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। প্রভা তখন নিপুণা গৃহিণীর মত রজনীর মন হইতে বিরক্তি ও চিন্তা অপনোদন করিতে যত্নবতী হইল। সে হাসিয়া বলিল, "তার জন্যে অত ভাবনা কেন?"

রজনী বলিল, "এখন কলকাতায় পৌঁছবার কি উপায়?"

প্রভা বলিল, "কেন? রেলে যাব আমরা। এখান থেকে রেল ত বেশী দূর হবে না। পরের ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠিগে চল।"

রজনী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, শ্রীরামপুর ষ্টেশন সেখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

প্রভা বলিল, "চল তবে আমরা শ্রীরামপুর যাই। সে লোকটা ভাঙ্গা বাইসিক্ল নিয়ে এলেই হয়।"

রজনী বলিল, "তুমি কি এত রোদ্দুরে দু'ক্রোশ চলে যেতে পার? তোমার ভারি কষ্ট হবে।"

প্রভা প্রফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত বলিল, "কিছু না। দু'ক্রোশ ভারি ত; আমি খুব যেতে পারি।"

রজনী রাখাল-বালককে বলিল, "কোনও গ্রাম থেকে একখানা পাল্কী ডেকে আনতে পারিস?"

রাখাল বলিল—অবশ্য পারে। কিন্তু গ্রাম দূর, যাইতে আসিতে দুই ঘণ্টা লাগিবে।

প্রভা বলিল, "না না—পাল্কীর কোনও দরকার নেই। আমি বেশ চ'লে

যেতে পারি। ওগো, তুমি আমায় যত সুকুমারী মনে করছ আমি তা নই। আমি সেকালের রাজকন্যাদের মত ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইনে।"

ফুলের কথা শুনিয়াই রজনী তাহার কোটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও চক্ষু সেইদিকে পড়িল। প্রভা বলিয়া উঠিল, "আমার ফুল কি করলে? যুদ্ধে খুইয়ে এসেছ নাকি বীর-মশাই?"

রজনী দুঃখিত ভাবে বলিল, "ফুলটি গেছে দেখছি।"

প্রভা বলিল, "আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।"—বলিয়া প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া একগুচ্ছ কড়াইসুঁটির ফুল তুলিয়া আনিল। রজনীর কোটে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এ ফুলের যে ভারি প্রশংসা করছিলে—এই নাও।"

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সেখানে রাখাল-বালক উপস্থিত ছিল, সুতরাং এবার আর 'ধন্যবাদ' দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া সস্নেহে নিষ্পেষণ করিল।

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে। উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আশা করিতে লাগিল গাড়ীখানি যদি খালি থাকে ত বড় ভাল হয়।

গাড়ীখানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে কোনও গ্রামের জমিদারের জামাতাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন বাইসিক্ল গাড়ীর ছাদে তুলিয়া লোক দুইটাকে পুরস্কৃত করিয়া প্রভা ও রজনী শ্রীরামপুর অভিমুখে চলিল।

গাড়ী ছাড়িল। রজনী বলিল, "প্রভা, আজ তোমার বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? তোমার মুখখানি যেন শুকিয়ে গেছে।"

প্রভা হাসিয়া বলিল, "গুরুজনের কথা না শোন কাণে—!"

রজনী বলিল, "সে ত ক'দিন থেকেই শুনছি। আমার কথার উত্তর দাওনা। খুব ক্ষিদে পেয়েছে না? চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে।"

প্রভা বলিল, "ক্ষিদে পেলে কি খেতে আছে? মা বলে দিয়েছেন গায়েহলুদের আগে কিছু খেতে নেই।"

রজনী বলিল, "সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।"

প্রভা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কখন গো ?"

"কড়াইসুঁটির ক্ষেতে।"

প্রভা বলিল, "ওগো তাই ত! তুমি আমায় মনে করিয়ে দিলে না কেন?"

"আমার দোষ? তুমি আমাকেও খাইয়ে দিয়ে আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ।"

"তোমার দোষ নয় ত কার দোষ তবে?"

রজনী বলিল, "বেশ! তোমার দোষও বুঝি আমার দোষ? তবু এখনও বিয়ে হয়নি!"

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল, "আমার কখনও কোনও দোষ হতে পারে? সব দোষ তোমার!"

এই অন্যায় অপবাদ রজনীর একান্ত অসহ্য হইল। সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে—রাস্তার দুইপাশ জনশূন্য দেখিয়া—প্রভার মুখখানি নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া লইল।

নবীন সন্ন্যাসী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাস 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে ১৩১৭ এবং ১৩১৮—এই দুই বৎসর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল।

'বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা'র বিবরণ পাঠ করিয়া আমার কোন কোন বন্ধু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন ইহাতে আমি হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, শাস্ত্রোক্ত বা প্রচলিত কোনওরূপ হিন্দুধর্ম্মকে আমি আক্রমণ করি নাই।—হিন্দুনামধারী বিকৃতমস্তক একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে আমি বিদ্রূপ করিয়াছি মাত্র।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'একটি ভৌতিক কাণ্ড' গল্পটি সত্য বলিয়া আমি শুনিয়াছি। যিনি উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিকই শিক্ষা-বিভাগের একজন পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী—এখনও জীবিত আছেন। যদি কেহ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, আমায় পত্র লিখিলে তাঁহার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা জানাইতে পারি।

গয়া
১লা ভাদ্র ১৩১৯

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ পিতৃ-আজ্ঞা

"বাবা—বাবা—এই ওষুধটুকু খেয়ে ফেলুন।"

বক্তা একজন পঞ্চত্রিংশবর্ষীয় যুবাপুরুষ। একটি ছোট কাঁচের গেলাসে ঔষধ লইয়া মুমূর্ষু পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া কাতরভাবে ঐ কথা বলিলেন।

"বাবা—শুনছেন—বাবা—ও বাবা।"

কিন্তু বৃদ্ধের সংজ্ঞা নাই। চৈত্রমাস, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। খোলা জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। শয্যার অনতিদূরে একখানি চেয়ারে চোগাচাপকান পরিহিত সুবিজ্ঞ ডাক্তারবাবু সোণার চশমা চোখে দিয়া বসিয়া আছেন। যুবক তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি করা যায়?"

ডাক্তার বলিলেন, "আস্তে আস্তে মুখটি একটু ফাঁক করে, ঢেলে দিতে পারেন?"

"আমি না হয় মুখটি ফাঁক করে ধরি—আপনি এসে ঢেলে দিন।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া যুবকের হস্ত হইতে গেলাস লইলেন। যুবক পিতার ওষ্ঠস্পর্শ করিয়া মুখটি ফাঁক করিতে চেষ্টা করিবামাত্র, বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিলেন—"অ্যাঁ—"

যুবক বলিলেন, "বাবা, এই ওষুধটুকু খান।"

বৃদ্ধ চিৎ হইযা শুইয়া ছিলেন। পাশ ফিরিয়া, আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিযা, পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওষুধ?—আর ওষুধ কেন বাবা? আমার ওষুধ এখন গঙ্গাজল। তাই একটু মুখে দাও। বড় পিপাসা।"

যুবক নীরবে ডাক্তারবাবুর প্রতি অবলোকন করিলেন। তিনি বলিলেন—"ক্ষতি নাই।"

যুবক উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বারান্দায় তাঁহার রোরুদ্যমানা পত্নী ও অন্যান্য পুরমহিলাগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। যুবক গঙ্গাজল চাহিলেন।

গঙ্গাজল পান করিয়া বৃদ্ধের চেতনা যেন একটু জাগিয়া উঠিল। ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "মোহিত কই?"

"তাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। এখনও এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু আর বোধ হয় দেরী নেই।"

বৃদ্ধ জড়িত-স্বরে একটু বিমনা হইয়া যেন নিজের মনে মনেই বলিলেন—"দেরী নেই ?—আর দেরী নেই ?"

পুত্র বলিলেন, "বোধ হয় বেশী দেরী হবে না।"

তখন বৃদ্ধ অল্পে অল্পে আবার নিশ্চেতন হইয়া পড়িলেন।

এই বৃদ্ধের নাম ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন ক্ষুদ্র জমিদার—বার্ষিক আয় কুড়ি বাইশ হাজার টাকা হইবে। যে গ্রামে এই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, তাহার নাম কমলপুর—ইহা খুলনা জেলার অন্তর্গত। উপরি-উক্ত যুবকটি ব্রজকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—নাম গোপীকান্ত। ইনি, বৃদ্ধের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত। প্রথমার মৃত্যু হইলে, প্রৌঢ় বয়সে ব্রজকিশোর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। সে স্ত্রীও একটি দুই বৎসরের পুত্রসন্তান রাখিয়া অকালে পরলোক প্রাপ্ত হন। এই পুত্রটিরই নাম মোহিতলাল। ব্রজকিশোর বৈষ্ণব-তন্ত্রের লোক—তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন এ পুত্রটির নাম নন্দদুলাল কিম্বা লক্ষ্মীনারায়ণ, এইরূপ একটি কিছু রাখিবেন—কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘোরতর আপত্তি করিয়া মোহিতলাল নামই কায়েম করিয়াছিলেন। এ বংশে ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরদেবতার নাম ছাড়া অন্য নাম কখনও আমল পায় নাই—কিন্তু বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা সে নজির মানিলেন না। বৃদ্ধবয়সের সন্তান বলিয়া মোহিতলালের প্রতি ব্রজকিশোরের স্নেহ একটু অধিক ছিল। মোহিতের বয়স এখন অষ্টাদশ বর্ষ—সে কলিকাতায় কলেজে বি-এ পড়িতেছে।

ঠাকুরদেবতার নামে নামকরণ না হইলেও, মোহিত ছেলেটি বেশ নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। পূজা আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করে না ;—এই বয়সেই মৎস্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। অপর পক্ষে গোপীকান্তবাবু বাড়ীতে মাছ এবং বন্ধুবান্ধবের গৃহে মাংস (ইঁহাদের বাড়ীতে মাংস আসিবার যো নাই) প্রকাশ্যভাবেই ভোজন করিয়া থাকেন। জুতা পায়ে দিয়া জল এবং কেল্‌নারের মুসলমান খানসামা-হস্তের চা পান করিতে লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া দলে মিশিয়া মদ্যপান করেন, এই প্রকার অখ্যাতিও আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আরও একটা কাণাকাণি আছে, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিলাম—তবে এ সকল ব্যাপার বেশী দিন গোপন থাকে না—এক সময় ঢাক বাজিয়াই উঠে।

অপরাহ্নকালে একখানি গোরুর গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় দণ্ডায়মান

হইল। গাড়ী হইতে মলিনবেশ, শুষ্কমুখ মোহিতলাল অবতরণ করিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই, গোপীকান্ত আসিয়া বলিলেন—"ভাই—এসেছ ?"

মোহিত তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া সভয়কণ্ঠে বলিল, "বাবা আছেন ত ?"

গোপী বলিলেন, "আছেন বটে—কিন্তু রাত বুঝি কাটে না।"

মোহিত দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

গোপীকান্ত সস্নেহে ভ্রাতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয় ?"

"না।"

"কলকাতা থেকে কখন বেরিয়েছিলে ?"

"বেলা আটটায়।"

"জলটল খেয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—স্নান-আহ্নিক করে জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

ইতিমধ্যে সেখানে ব্রজকিশোরের বিধবা ভগ্নী—মোহিতের পিসিমা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মোহিত প্রণাম করিলে, তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া পিসিমা বলিলেন—"আহা বাছার আমার মুখ শুকিয়ে আধখানি হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল। আমি বামুণ ঠাকরুণকে ভাত চড়িয়ে দিতে বলিগে। একটু জল খাও ততক্ষণ।"

মোহিত বলিল, "বাবাকে আগে দেখি।"

পিসিমা বলিলেন, "খুব সময়ে এসে পড়েছ বাবা। আজ না এসে যদি কাল আসতে, তবে দেখতে পেতে কিনা নারায়ণ জানেন। আহা, বামুণের যখনই জ্ঞান হচ্ছে, তখনই জিজ্ঞাসা করছেন—মোহিত এসেছে ?—আমার মোহিত এল ?"—বলিয়া পিসিমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

জুতা পরিত্যাগ করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া, দুই ভাই পিতার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইল। মোহিত দেখিল, পিতার সে মূর্ত্তি আর নাই। সে নধর পুষ্ট দেহ এখন বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

মোহিত শয্যাপ্রান্তে গিয়া অচেতন পদদ্বয়ে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল। দশবর্ষবয়স্কা একটি বালিকা পাখা হাতে করিয়া বৃদ্ধের শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল। সাত বৎসরের একটি বালক ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। মোহিত বালককে বলিল—"তুমি ওঠ—আমি পায়ে হাত বুলুচ্ছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতের বধূঠাকুরাণী সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো—এস, তোমার ভাত বাড়া হয়েছে।"

মোহিত বলিল, "থাক্, আমি এখন খাব না।"

বধূঠাকুরাণী তখন সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া একরকম জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

আহারাদির পর, পিতার নিকট আসিয়া মোহিত আবার তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

রাত্রি নয়টার সময় ব্রজকিশোরের লুপ্তচেতনা পুনরাগমন করিল। তাঁহাকে পাশ ফিরিতে ও চক্ষু খুলিতে দেখিয়া গোপীকান্ত বলিলেন—"বাবা—মোহিত এসেছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"মোহিত?—মোহিত?—কই মোহিত?"

"এই যে বাবা, আমি রয়েছি।"—বলিয়া মোহিত পিতার একখানি শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তদ্বয়ের মধ্যে গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার গলাটা বড় শুকিয়ে উঠেছে। মোহিত একটু গঙ্গাজল দাও।"

মোহিত উঠিয়া গঙ্গাজল লইয়া পিতার মুখে দিতে লাগিল। জলপান করিয়া যেন বৃদ্ধের চেতনা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুই তিন বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তখন তিনি বলিলেন, "গোপী!"

"এই যে আমি রয়েছি বাবা!"

"নন্দলাল কোথা?"

নন্দলাল, গোপীকান্তের শিশুপুত্র। বয়স তিন বৎসর মাত্র। মাতা নন্দলালকে কোলে করিয়া শয্যাসান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোপীকান্ত বলিলেন—"এই যে নন্দলাল এসেছে—ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ব্রজকিশোর বলিলেন—"বউমা?"

মোহিত বলিল, "এই যে তিনি ঘুমন্ত নন্দলালকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা।"

"সারদা কই? সারদার ছেলেটি কই?"

পিসিমাতা বলিলেন, "এই যে দাদা আমি রয়েছি। তোমার ভাগনে বিনোদের কি উপায় করে যাচ্ছ দাদা?"—বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "কেঁদ না। ভাবনা কিসের? গোপী রইল, মোহিত রইল—তারাই তোমার ছেলের ভার নেবে।"

একটু নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ আবার গঙ্গাজল চাহিলেন। জলপান করিয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই আছ ?"

গোপী বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা—আমরা সবাই এখানে রয়েছি।"

বৃদ্ধ তখন ধীরে ধীরে একটি একটি কথা পৃথকভাবে উচ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আর বেশী দেরী নেই। তোমরা সবাই আমায় হরিনাম শোনাতে পারবে? রাধানাম—কৃষ্ণনাম—হরিনাম ?"

সকলে কাঁদিতে লাগিল। মোহিত বলিল, "হ্যাঁ বাবা—শোনাতে পারব বইকি।"

ব্রজকিশোর বলিলেন, "আচ্ছা। কিন্তু হরিনাম শোনবার আগে, একটা সাংসারিক কর্ত্তব্য আছে সেটা সেরে নিই। তারপর, তোমাদের মুখে মধুর হরিনাম শুনতে শুনতে, হাসতে হাসতে, রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাব। গোপীকান্ত, মোহিতলাল—কাছে এস! বাবা গোপী—তোমাকে আমি মানুষ করে তুলেছি। বিবাহাদি দিয়েছি, সন্তান সন্ততিও হয়েছে। কিন্তু মোহিত এখনও নাবালক—ওর গর্ভধারিণীও স্বর্গে গিয়েছেন—ওর কিছু কিনারা করে যেতে পারলাম না। বাবা মোহিতলাল, আমার অবর্ত্তমানে, তোমার বড় ভাই-ই তোমার বাপ, তোমার বউঠাকরুণই তোমার মা রইলেন। আমাকে যেমন মান্য করতে, ভক্তি করতে, তোমার দাদাকেও তেমনি করবে। আর এক বিষয় সাবধান করে দিই—কলিকালে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হয় না। দেখো যেন তোমাদের দুটি ভাইয়ে কখন বিচ্ছেদ না হয়। আমি যা সম্পত্তি রেখে যাচ্ছি, অপব্যয় না করলে, তা থেকে তোমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে! দুটিতে মিলে মিশে এক সংসারে এক অন্নে থাকবে। পরের কথা শুনে যেন ভাইকে পর কোরো না। স্ত্রীলোকের কথায় কাণ দেবে না, স্ত্রীলোকেরা ঘরভাঙ্গানী। অনেক সংসারে দেখেছি, ভাইয়ে ভাইয়ে খুবই প্রণয়, কিন্তু তাদের স্ত্রীরা মধ্যে পড়ে সে প্রণয় ভেঙ্গে দিয়েছে। ভিন্ন হবে না—বিষয় ভাগ করবে না। ভাগ করতে করতে পর্ব্বতও ধূলিমুষ্টি হয়ে যায়। ধর্ম্মপথে থেক—তা হলে ভগবানের কৃপা তোমাদের উপর থাকবে। এই আমার বলবার ছিল, তা শেষ হল। এখন তোমরা আমায় মধুর হরিনাম শোনাও।"

বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতলাল বলিতে আরম্ভ করিল—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সংস্কৃত নয়—বাঙ্গালা হরিনাম বল। সেই গানটি গাও না—রিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে—"

মোহিত, গোপীকান্ত কেহই গান গাহিতে পারিল না। বৃদ্ধ তখন নিজেই আরম্ভ করিলেন—

"হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে ?
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে—
বল্ মাধাই মধুর স্বরে।"

পুত্রগণের কণ্ঠোচ্চারিত তারকব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে, গভীর রাত্রিতে বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ চক্ষুজল

উপরে বর্ণিত ঘটনার পর পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে মোহিতলাল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, এম-এ, বি-এল, উপাধি লাভ করিয়াছে। দাদার অনুরোধে, ওকালতী করিবার জন্য সদরে গিয়া বৎসরাধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিল—কিন্তু মক্কেলও জুটে নাই এবং সে ব্যবসায় তাহার মনঃপূত না হওয়াতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রচর্চ্চা এবং পূজা আহ্নিকেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে কয়েকবার গোপীকান্ত ভ্রাতার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মোহিত সম্মত হয় নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ সংসারধর্ম্মে অনিচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ ভ্রাতৃবিচ্ছেদাশঙ্কা। মোহিতের মনে হইত, পিতা মৃত্যুশয্যায় আদেশ দিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কথায় যেন ভ্রাতার সহিত প্রণয়ভঙ্গ না হয়। তাই মোহিত ভাবিত, দূর হোক, বিবাহ না করাই ভাল। এখন যেন মনে করিতেছি,

ভ্রাতার বিরুদ্ধে স্ত্রী হাজার বলিলেও সে কথা কখনই গ্রাহ্য করিব না। কিন্তু কার্য্যকালে, প্রণয়ের মোহে যৌবনের কুহকে মজিয়া, তখন আমার মতিগতি যে এই প্রকার থাকিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তাহার অপেক্ষা, ও পথে না যাওয়াই ভাল।

মোহিত স্বয়ং বিবাহবিমুখ, কিন্তু গ্রামের লোকে—বিশেষতঃ তাহাদের বর্ষীয়সী আত্মীয়াগণ—বলিতেছে, ভাইয়ের বিবাহ দিতে গোপীকান্তবাবুর তাদৃশ আগ্রহ নাই। বৈমাত্রেয় ভাই কিনা—সহোদর হইলে কি এমনটি ঘটিতে পারিত? ছেলেটি লেখাপড়ায় যতগুলা পাস করিবার ছিল সমস্তই করিয়াছে, রূপে কার্ত্তিকেয়-তুল্য—পূর্ণ যৌবনকাল উপস্থিত—আহা এমন সোণার চাঁদকে আইবুড় থাকিতে দেখিয়া কোন্ মাসী, কোন্ পিসী, কোন্ খুড়ীমা, জেঠিমা, দিদিমা প্রাণ ধরিতে পারেন? আহা আজ যদি ব্রজকিশোর বুড়া বাঁচিয়া থাকিত—ইত্যাদি।

গ্রামে কোনও সঙ্কেত-লেখক না থাকিলেও, উক্ত ভাবাত্মক বক্তৃতাগুলি যথাবিধি গোপীকান্তবাবুর স্ত্রীর নিকট 'রিপোর্টেড' হইত। সুতরাং ইদানীং তিনি স্বামীকে, দেবরের বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এবার গোপীকান্ত কলিকাতায় ভ্রাতার জন্য একটি সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। কন্যার পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। নগদ টাকাকড়ি অনেক পাওয়া যাইবে। বড় বড় এটর্ণিগণের সহিত তাঁহার কারবার আছে, বিবাহের পর জামাতাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, হাইকোর্টে বাহির করিয়া, বিশেষ রকম সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। ভাইটি নিষ্কর্ম্মার মত ঘরে বসিয়া থাকে, ইহা গোপীকান্তের ইচ্ছাও নহে—এবং তাহাতে তাঁহার কিছু অসুবিধাও আছে। ভাইটি কলিকাতায় গিয়া ওকালতী করিলেই তিনি সুখী হন। কিন্তু কন্যা-পক্ষের এক বিষম পণ। পাত্রটি রূপবান কান্তিমান হওয়া চাই। সেজন্য যত টাকা লাগে ব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। আজ তাঁহারা পাত্র দেখিতে আসিবেন। পাত্র যদি পছন্দ হয়—তখন যেমন করিয়া পারেন, গোপীকান্ত ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে সম্মত করাইবেন।

আশ্বিন মাস। আকাশ ও ধরণী স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণে পরিপ্লাবিত। অন্তঃ-পুরের বাগানে দীর্ঘিকা-তীরে একটি গাছের তলায় কুশাসন পাতিয়া বসিয়া চশমা চোখে দিয়া, মোহিতলাল একখানি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মনঃসংযোগ-

পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছিল। পার্শ্বে কুশাসনের উপর একটি কাঁচকড়ার নস্যের ডিবা পড়িয়া আছে—তাহার ডালার উপর সোণার অক্ষরে লেখা—হরিনাম সত্য। মোহিত যেখানে বসিয়া ছিল, তাহার অনতিদূরেই দীর্ঘিকাজলে কত পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, হাঁস সাঁতার দিতেছে, মাঝে মাঝে মাছরাঙা পাখী আসিয়া ছোঁ মারিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ সকলের প্রতি মোহিতলালের দৃক্‌পাত নাই—সে আপনার অধ্যয়নেই নিমগ্ন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা মোহিতলালকে বালকাবয়ব দেখিয়াছিলাম—এ পাঁচ বৎসরে সে পূর্ণবয়ঃ যুবাপুরুষ হইয়াছে। ওষ্ঠের উপরাংশ এখন সুপুষ্ট গুম্ফরাজির দ্বারা আবৃত। ক্ষৌরীকৃত চিবুকের অন্তভাগ মানসিক দৃঢ়তার পরিচায়ক।—চক্ষু দুইটি ধীর ও স্থির—দৃষ্টি যেন শাণিত শলাকার মত। ললাট চিন্তাশীলতার পরিচায়ক কুঞ্চনরেখাবলী-সমাবৃত।

বেলা বাড়িয়া উঠিল। সহসা মোহিলালের কর্ণে প্রবেশ করিল—"ছোট দাদা।"

পুস্তক হইতে মুখ উঠাইয়া মোহিতলাল পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল। একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক বলিতেছে—"ছোটদাদা!"

বালকের নাম বিনোদচন্দ্র, মোহিতের পিসতুতো ভাই।

"ছোট দাদা—বাড়ী আসুন।"

মোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন ?"

"বড়দাদা ডাকছেন।"

"একটু পরে যাব এখন, যা।"

বালক বলিল, "না, এখনই আসুন। বৈঠকখানায় দুটি কে লোক এসেছেন। বড়দাদা আমাকে বললেন, যা, তোর ছোটদাদাকে চট করে ডেকে নিয়ে আয়, দেরী না হয়।"

এ কথা শুনিয়া মোহিতলাল কয়েক মুহূর্ত্ত বালকের মুখের পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল। পরে বলিল—"কেন রে? দুজন লোক কেন এসেছে?"

বালক জানিত তাহারা কেন আসিয়াছে। কিন্তু বড়দাদা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই সে বলিল—"কি জানি।"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মিথ্যাভাষণজনিত একটা সঙ্কোচ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মোহিতলাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "ছি—ছি—ছি বিনোদ! মিথ্যা কথা বললে? ছি ছি ছি!"

বালক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মোহিতলাল বলিল—"প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় থেকে পড়নি যে মিথ্যা বলা বড় দোষ—বড় পাপ ? পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র রাজার ছেলে হয়ে বনে গিয়েছিলেন, পড়নি ? প্রাচীনকালের হিন্দুরা প্রাণ দিয়েছে তবু মিথ্যা বলেনি—এ কথা শোননি ? তুমি সেই হিন্দু সন্তান, তা কি তুমি ভুলে গেলে ? মিছে কথা বলার ভীরুতা, কাপুরুষতা আজ তোমায় কলঙ্কিত করেছে। বড় দুঃখের বিষয় বিনোদ, বড় লজ্জার বিষয়—ছি ছি ছি !"

এই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। মোহিতলালের তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি সে সহ্য করিতে না পারিয়া, দুই হাতে নিজমুখ ঢাকিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মোহিতলাল বলিল, "কাঁদ। যে পাপ করেছ তা চোখের জলে ধুয়ে ফেলে আবার পবিত্র হও। পাপের কালি কেবল চোখের জলেই ধৌত হয়, অন্য কিছু দিয়ে তা পরিষ্কার করবার উপায় নেই।"—বলিয়া সে আবার যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে নিমগ্ন হইল। বালকটি অবনত মুখে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। দূরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উত্থিত হইল। মোহিতলাল একবার মাত্র সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী কিরণবালা আসিতেছে। দেখিয়া, সে পাঠে মনোনিবেশ করিল।

কিরণ আসিয়া নির্ব্বাক পুত্তলিকার মত নতনেত্রে কাছে দাঁড়াইল। ক্রমে মোহিতলাল পুস্তক হইতে মুখ উঠাইয়া বলিল, "কেন রে কিরণ ?"

কিরণ বলিল, "কাকা, একবার বাড়ী আসুন, বাবা ডাকছেন।"

"কেন ডাকছেন ?"

"দুটি লোক এসেছেন।"

"কে তাঁরা ?"

"তা ত জানিনে—বৈঠকখানায় বসে আছেন।"

মোহিতলাল মনে মনে বলিল, 'হুঁ !' বালিকার নৈতিক পরীক্ষাগ্রহণ মানসে অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—"লোক দুটি কোথা থেকে এসেছেন ?"

"কলকাতা থেকে।"

"কেন ?"

বালিকা দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল, "আপনাকে দেখতে।"—বিনোদচন্দ্রের লাঞ্ছনার বিষয় সে অনবগত ছিল না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহিত বলিল, "কেন, দেখবে কি? আমি বাঘ না ভালুক?"

ঈষৎ হাসিয়া কিরণ বলিল, "আপনার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

কিরণের এই হাসি দেখিয়া মোহিতলালের মনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। গুরুজনের সম্মুখে কিরণের এ লঘুতা, ধৃষ্টতা, চপলতা একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাই সে চক্ষু লাল করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "কিরণ!"

কাকার ভাবভঙ্গি দেখিযা হতবুদ্ধি কিরণ তাহার প্রতি সভয় দৃষ্টিপাত করিল।

"কিরণ, তুই হাসলি যে?"

বালিকা তথাপি নীরব—কিন্তু তাহার চক্ষু দুইটি বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

মোহিতলাল তখন গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"তোর কাকার বিয়ের কথা কি তোর পক্ষে রঙ্গতামাসার বিষয়? গুরুজনের সাক্ষাতে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা কি তুই আজও জানিসনে? তোর মা কি এ সম্বন্ধে তোকে কোন শিক্ষাই দেননি? মাঝে মাঝে তুই রামায়ণ মহাভারত খুলে পড়িস দেখতে পাই। কি উপদেশ তুই সংগ্রহ করলি রামায়ণ মহাভারত থেকে?—ধিক্।"

কিরণের ডাগর চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল। ক্ষীণ কম্পিত স্বরে সে কহিল, "আমি ত আপনার বিয়ের কথায় হাসিনি।"

"কি কথায় হাসলি তবে?"

"আপনি যে বললেন আমি বাঘ না ভালুক, সেই কথা শুনে আমার মনে হল—বাঘ ভালুকে কখনো চশমা চোখে দিয়ে রামায়ণ পড়ে? তাই আমার হাসি পেয়েছিল।" বলিতে বলিতে কিরণের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বালিকার অবস্থা দেখিয়া মোহিতলালের হৃদয় যেন একটু গলিল। ক্রোধ সংবরণ করিয়া, আবার সে রামায়ণখানির পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বদ্ধ করিল।

কিরণ কিন্তু গেল না, দাঁড়াইয়া রহিল। আঁচল দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া, চুপটি করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া

মোহিতলাল বলিল, "যা না—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"—এবার তাহার স্বর পূর্ব্বের মত কর্কশ নহে।

কিরণ বলিল, "চলুন কাকা।"

"বিরক্ত করিস কেন?"

"আপনার পায়ে পড়ি কাকা!"

"দেখ্, আমি বার বার করে সকলকে বলেছি, আমি বিয়ে করব না। আমায় কেন দেখতে এসেছে?" বলিয়া মোহিত পুস্তকে মনঃসংযোগ করিতে বৃথা যত্ন করিতে লাগিল।

কিরণ বলিল, "তা আমি জানিনে কাকা। আপনার যা বলবার, তা বাবাকে বলবেন এখন। আসুন।"

"গিয়ে কি করব? কি ফলটা হবে শুনি?"

"কাকা—আসুন।"

মোহিত তখন চশমাখানি খুলিয়া পকেটে লইল। নস্যের ডিবা হইতে কিঞ্চিৎ নস্য লইয়া, বহিখানি বগলে করিয়া, আসনখানি হাতে ঝুলাইয়া, অপ্রসন্ন মুখে কিরণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূত্রপাত

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বৈঠকখানাটি আজ বেশ গুলজার। কলিকাতা হইতে যে দুইটি বাবু পাত্র দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন কন্যার খুল্লতাত—নাম বীরেশ্বরবাবু। সঙ্গে যিনি আসিয়াছেন, তিনি ইঁহাদের কোনও আত্মীয় নহেন, বন্ধু মাত্র। ইঁহার নাম শ্যামাচরণবাবু—কলিকাতার কোনও বেসরকারী কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যখন অপ্রাপ্তবয়ঃ পাত্রের বিবাহ হইত, তখন দেখিতে আসিয়া তাহার একটা মোটামুটি পরীক্ষা লওয়ার প্রথা ছিল। যদিও এক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ জানিতেন, ছেলেটি এম-এ, বি-এল, পাস করিয়াছে এবং তাহা সরকারী গেজেটে পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা লওয়ার কোনও আবশ্যকতা নাই এবং পরীক্ষক খুঁজিয়া

পাওয়াও শক্ত, তথাপি সঙ্গে একজন বিদ্বান লোককে পাঠাইয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছেন।

বীরেশ্বরবাবু ও শ্যামাচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। গোপীকান্ত-বাবু তাঁহাদের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন। পাড়ার দুই চারিজন মাতব্বর লোকও আসিয়া জুটিয়াছেন। দুইটি বাঁধা হুঁকা রাশি রাশি সুগন্ধি ধূম উদ্গিরণ করিয়া সেই কক্ষটিকে অন্ধকারপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। গল্প খুব জমিয়া উঠিয়াছে। সকলেরই মুখে তুবড়ি ফুটিতেছে, কেবল অধ্যাপক বাবুটি চুপ করিয়া আছেন। তিনি মাঝে মাঝে নস্য লইতেছেন, এবং অন্যের খোস-গল্প শুনিয়া সরল হাস্যে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিতেছেন।

বেলা হইল এখনও মোহিতলাল আসিল না দেখিয়া গোপীবাবু স্বয়ং উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, অগ্রে অগ্রে তাঁহার কন্যা কিরণবালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহি বগলে কুশাসন হস্তে মোহিতলাল প্রবেশ করিতেছে।

ভাইকে দেখিয়াই গোপীবাবু বলিলেন, "এতক্ষণ কোথা ছিলে বল দেখি? একবার বৈঠকখানায় এস। এত ডাকাডাকি করছি, লোকের উপর লোক পাঠাচ্ছি—তোমার কি হুঁস হয় না?"

আজ প্রাতঃকাল অবধি—যখন হইতে শুনিয়াছে যে তাহাকে 'দেখিবার' জন্য কলিকাতা হইতে লোক আসিতেছে—মোহিতলালের মনটা খিচড়াইয়া ছিল। মনের বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করিয়া, বিনীতভাবে বলিল, "দাদা, বৈঠকখানায় যাবার তেমন কি বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে?"

"হ্যাঁ—কলকাতা থেকে দুটি ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবে এস।"

"তাঁরা কি আমার বিয়ের জন্য এসেছেন?"

একটু নীরব থাকিয়া গোপীবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"আমি ত বলেছি আমি বিবাহ করব না, তবে কেন আমায়—"

বাধা দিয়া গোপীবাবু বলিলেন, "কি মুস্কিল! তোমাকে তারা দেখলেই যে বিয়ে হয়ে গেল, তা ত নয়! এখন শুধু তোমায় দেখতে এসেছে। তাদের প্রতিজ্ঞা, পাত্র দেখতে খুব সুশ্রী হলে তবে তারা বিবাহ দেবে। টাকার পরোয়া তারা করে না।"

এই কথা শুনিয়া মোহিতের বিমুখ মন আরও বিমুখ হইয়া গেল। ধনগর্ব্বী মদোদ্ধত পিতা তাহাকে যাচাই করিয়া দেখিতে আসিয়াছে, পছন্দ হয় ত কন্যার জন্য কিনিবে, যত টাকাই লাগুক। পছন্দ না হয়, অবজ্ঞাভরে ভুঁড়ি দুলাইয়া চলিয়া যাইবে।

ভ্রাতাকে নীরব দেখিয়া, গোপীকান্ত বলিলেন, "তারা খুব বড়লোক। যদি তারা তোমায় পছন্দ করে ত জেনো যে কপাল ফিরে গেল। কলকাতায় বড় বড় এটর্ণিরা তাদের হাতধরা। বলেছে, কলকাতায় তোমায় নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গিতে একখানি তিনতলা বাড়ী দেবে। জুড়ি গাড়ী দেবে। হাইকোর্টে যাতে ছমাসের মধ্যে তোমার বিলক্ষণ পসার জমে যায়, তার বন্দোবস্ত করবে। এখন আসল কথাটা হচ্ছে, তোমাকে তাদের পছন্দ হলে হয়। এস বৈঠকখানায় এস।"

যে আগুন ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল, গোপীকান্ত অজ্ঞাতসারে তাহাতে উক্তপ্রকার তৈলনিষিক্ত ইন্ধন যোগাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রতি কথা মোহিতলালের বক্ষে অপমান-শেলের মত বাজিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া মোহিতলাল বলিল, "দাদা, আমায় মাফ করবেন, আমি এখন যাব না।"

"কেন?"

"আমার মনটা এখন ভাল নেই।"

গোপীকান্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আজকাল এইসব কি তোমাদের এক ধরণ হয়েছে। 'মনটা ভাল নেই।'—ভাল নেই তাতে আর হয়েছে কি? কতদূর থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছে, তাদের সঙ্গে বসে একটু আলাপ করা—এও তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না?—তাতে আবার তারা যে-সে লোক নয়। তাদের জমিদারীতে একটা ম্যানেজারি চাকরি পেলে আমরা বেঁচে যাই! এস।"

ইন্ধনের উপর ইন্ধন নিক্ষেপ। নিজের ওষ্ঠ দংশন করিয়া, কম্পিত স্বরে মোহিতলাল বলিল, "আচ্ছা চলুন তবে। কিন্তু ফলাফলের জন্যে আমায় দায়ী করবেন না।"

ভ্রাতাকে লইয়া গোপীবাবু বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। বীরেশ্বরবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই চক্রবর্ত্তী মশাই। প্রণাম কর।"

মোহিতলাল উক্ত বাবুটির স্থূল সুগোল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার বক্ষোবিলম্বিত বহুমূল্য গার্ডচেনের প্রতি, দুই হস্তে গোটা চারি পাঁচ

হীরকাঙ্গুরীয়র প্রতি লক্ষ্য করিল। হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কিছু দূরে উপবেশন করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "বাবাজীর নামটি কি?"

মোহিত তাহার চশমার দুইটি পরকলের ভিতর হইতে প্রশ্নজিজ্ঞাসুর প্রতি দুইটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার নাম শ্রীমোহিতনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার পিতার নাম ঈশ্বর ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কুড়ির কোঠা পর্য্যন্ত নামতা আমার মুখস্ত আছে। নেবুকাড্‌নাজার বানান করতে জানি—কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাঁহারা তামাক খাইতেছিলেন তাঁহাদের হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। গোপীকান্তবাবু লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ওঃ—তা জানতুম না।"

মোহিতলাল তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

যাঁহাদের হস্তে হুঁকা ছিল, তাঁহারা আবার ধীরে ধীরে ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এ রকম করে ডেকে এনে আমাদের অপমানটা না করলেই হত!"

গোপীবাবু বলিলেন, "কি আর বলব বলুন, বলবার মুখ নেই। আমি ত ভাল ভেবেই এ কাজে হাত দিয়েছিলাম। আপনারা মহৎ লোক, মনে করেছিলাম এ বিবাহ হলে, আখেরে ছোঁড়ার ভাল হবে। কিন্তু যে রকম দিন সময় পড়েছে দেখছি, তাতে এমন কি আপনার ভাইয়েরও উপকার করার চেষ্টা মহা বোকামি।"

প্রতিবেশী একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "চিরকালই শুনে আসছি, বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। মোহিতলাল যে এত লেখাপড়া শিখেও এ রকম উদ্ধত-প্রকৃতি হয়েছে, সেটা বড় দুঃখের কথা। এখন ত দেখছি, আমরা যে বেশী লেখাপড়া শিখিনি একরকম তা ভালই করেছি।"

অধ্যাপক মহাশয় এইবার বলিলেন, "আসল কথাটা হয়েছে কি জানেন, আজকাল স্কুল কলেজে খুব বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে নীতিশিক্ষা আদৌ নেই। সুতরাং এইরকম ফলই ফলছে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তবে আজ্ঞা করুন, এখন আমরা উঠি।"

গোপীবাবু বলিলেন, "অনেক বেলা হয়েছে। স্নানাহার করে গেলে ভাল হত না?"

"আজ্ঞে মাফ করবেন, মনের সে রকম অবস্থা নয়। বড় অপমান বোধ হয়েছে। আপনার কোনও দোষ দিইনে—আমাদের অদৃষ্টের দোষ। ষ্টেশনের কাছে আমাদের এক বন্ধু আছেন, সেখানে গিয়েই স্নানাহার করব এখন। ওরে—বেয়ারাগুলো কোথায় গেল?"

অতিথিগণকে থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, গোপীকান্তেরও মনের অবস্থা এরূপ ছিল না। তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল, একবার মোহিতের নাগাল পাইলে, এস্পার কি ওস্পার যাহা হউক একটা করিবেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল।

পাল্কী আসিলে, বাবু দুইটি বিদায়গ্রহণ করিলেন। প্রতিবেশী ব্যক্তিগণও এই ঘটনার গল্প করিবার দুঃসহ আবেগ হৃদয়ে বহন করিয়া মৃদুমন্দ পদক্ষেপে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গোপীকান্ত তখন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, ভ্রাতার অনুসন্ধানে ধাবিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ বাক্যবাণ

অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মোহিত একেবারে দ্বিতলে আপনার শয়নকক্ষে গিয়া উপনীত হইল। তাহার পিসিমা, বধূঠাকুরাণী, কিরণ প্রভৃতি উৎসুক নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—বধূঠাকুরাণী একটু পরিহাসের উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু মোহিতের মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়া নিরস্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই গোপীকান্তবাবু প্রবেশ করিলেন। পিসিমাকে দেখিয়া বলিলেন, "মোহিত গেল কোথায়?"

"উপরে গেল। কি হল? পছন্দ হল ওদের?"

"সে অনেক কথা।"—বলিয়া গোপীবাবু দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। এঘর

ওঘর খুঁজিয়া অবশেষে মোহিতের শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলেন, খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে অন্যমনে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। জানালার নিম্নে বাগান—বাগানের মধ্যে তরুশাখার অন্তরালে একটি পুষ্করিণী।

গোপীকান্ত প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভ্রাতার কাছে আসিয়া বাতায়ন-পথে পুষ্করিণীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বাটীর পাচিকা জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছে। এই পাচিকা একটি অনাথা ব্রাহ্মণ কন্যা, নবযৌবনা বিধবা। গোপীকান্ত একবার পুষ্করিণীর প্রতি একবার ভ্রাতার প্রতি সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রুক্ষস্বরে বলিলেন, "মোহিত, তোমার মৎলবখানা কি ?"

মোহিত ভ্রাতার প্রতি একবার মাত্র অবলোকন করিয়া নিরুত্তরে দণ্ডায়মান রহিল।

জ্যেষ্ঠ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মৎলবখানা কি বল দেখি ?"

স্থিরভাবে মোহিত উত্তর করিল, "আমি বিবাহ করব না, অনেক পূর্ব্বেই তা ত জানিয়েছিলাম।"

"তা যেন হল। কিন্তু বাড়ীতে অভ্যাগত ভদ্রলোককে কি সাহসে তুমি অপমান করলে ? ওতে আমাকেই অপমান করা হল তা তুমি জান ?"

মোহিত নিরুত্তর।

ক্রুদ্ধ গোপীকান্ত বলিলেন, "উত্তর দাও না কেন ?"

মোহিত বলিল, "আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

"উদ্দেশ্য ছিল না ?—তবে কি উদ্দেশ্য ছিল তোমার ? ওদের অপমান করা তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল ? বাড়ীতে যে ভদ্রলোকদের ডেকে আনা হয়েছে—উদ্ধত ভাবে তাদের অপমান করা তোমার উদ্দেশ্য ছিল ? এই তুমি লেখাপড়া শিখেছ ? এই তোমার জ্ঞান হয়েছে ? এই তোমার ভদ্রতার আদর্শ ? ধিক্—ধিক্ !"

মনের রাগ প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া মোহিত শান্ত ভাবে বলিল, "ওঁরা কি আমাদের অপমান করেন নি ?"

মুখ খিঁচাইয়া গোপীবাবু বলিলেন, "ওঁরা আমাদের কি অপমান করলেন ? আমাদের মত অবস্থার লোকের ঘরে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা আমাদের সম্মান না অপমান ?"

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মোহিত বলিল, "কি করে আপনাকে বোঝাব বলুন।"

"আমাকে বোঝাবে কি করে? খুলে বললেই বোধ হয় আমি বুঝতে পারি। বাঙ্গালা ভাষা আমার মাতৃভাষা—যদি বাঙ্গালা করে বল, তবে হয়ত বুঝতেও পারি। তুমি কি মনে কর আমি এমনি মূর্খ, এমনি গ্রাম্য, এমনি নির্ব্বোধ যে একটা শাদা কথা বুঝতে পারিনে? তুমি না হয় কলেজে পড়ে অনেক পাস টাস করেছ—আমি সেকেন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম মাত্র—কিন্তু এ ত সেক্সপিয়রও নয়, মিল্টনও নয়, বেদান্তও নয়, স্মৃতিশাস্ত্রও নয়, তবে কেন বুঝতে পারব না? একবার বুঝিয়ে বলেই না হয় দেখ না। তাতে কি তোমার মনের কোনও লাঘব আছে, না, তোমার বিদ্যা ক্ষয় হয়ে যাবে?"

ইতিমধ্যে পাচিকাটি গাত্রমার্জ্জন সমাধা করিয়া, একটি জলপূর্ণ ছোট পিতলের ঘড়া কক্ষে লইয়া, হেলিতে দুলিতে বাগানের ছায়ায় ছায়ায় ফিরিয়া আসিতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইলে একবার বাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজ অনাবৃত মস্তকের উপর কাপড় টানিয়া দিল। এটুকু গোপীকান্তের চক্ষু এড়াইল না।

মোহিত বলিল, "আপনি বললেন, আমাদের মত অবস্থার লোকের ঘরে ওঁরা মেয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দিতে চেয়েছিলেন কি? ওঁরা এসেছিলেন আমাকে দেখতে, পছন্দ করতে। আমি যেন বাজারের একটা পণ্যদ্রব্য কিম্বা একটা ঘোড়া, মেলায় বিক্রী হতে এসেছি। দেখে যদি পছন্দ হয় তবে দামের জন্যে আটকাবে না। এটা কি অপমান নয়?"

গোপীকান্ত একটু নরম হইয়া বলিলেন, "ঐ তোমাদের এক কথা!—কেন, এতে অপমানটা কিসের? বিবাহ স্থির হবার পুর্ব্বে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে, কন্যাপক্ষ ছেলে দেখে—এ ত চিরদিনের প্রথা চলে আসছে। পছন্দ হয় না হয় এই জন্যেই ত দেখা। যদি উভয় পক্ষের পছন্দ হয়, তখন কথাবার্ত্তা পাকাপাকি স্থির হয়। এতে অপমানটা কি?"

মোহিত নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড আমগাছ। তাহাতে বসিয়া অনেকগুলি শালিক পাখী কিচির মিচির করিতেছে। একটা বানর লম্ফ দিয়া সেই গাছের ডাল ধরিয়া দুলিতে আরম্ভ করিল। পাখীগুলি

উড়িয়া পলাইয়া গেল। একটু নীরব থাকিয়া দাদা বলিলেন, "তুমি বিবাহ করবে না এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন করবে না শুনতে পাই ?"

"ইচ্ছা নাই।"

"এ যে তোমার আজগুবি ইচ্ছা।"—বলিয়া গোপীকান্তবাবু পালঙ্কের প্রান্তে উপবেশন করিলেন। বলিতে লাগিলেন—"এ যে তোমার সৃষ্টিছাড়া ইচ্ছা। সংসারী লোক—যে সংসার আশ্রমে থাকবে—তার পক্ষে বিবাহ করাই ধর্ম্ম। বিবাহ হচ্ছে হিন্দুর পক্ষে একটা সংস্কার—তা কি জান না? এদিকে ত নিজেকে খুব ধার্ম্মিক বলে পরিচয় দাও।"

বেচারী মোহিত আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে ঠিকানা নাই। প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত খিটিমিটি—ক্রমাগত অপ্রীতিকর মন্তব্য। ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "সংসারী লোকের পক্ষে বিবাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সে ধারণা আমার নেই।"

একটু বিদ্রূপের স্বরে গোপীকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা, যেন বিবাহ নাই করলে। কিন্তু নিজে ঠিক থাকতে পারবে ?"

মোহিতলাল কোনও উত্তর করিল না। এ প্রশ্নই তাহার অপমানজনক বলিয়া মনে হইল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোপীকান্ত বলিতে লাগিলেন—"তুমি না হয় খুব লেখাপড়া শিখেছ, আমরা মুখ্য সুখ্যু মানুষ। কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশী, পৃথিবীকে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী চিনেছি। সংসার সম্বন্ধে তোমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানলাভ করেছি, এ কথা জোর করে বলতে পারি। তোমার মত বয়সের সংসারী লোকের পক্ষে বিবাহ করা অত্যাবশ্যক। তুমি যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে, গৃহাশ্রমে না থাকতে, তবে সে অন্য কথা ছিল। কিন্তু গৃহাশ্রমে থেকে তার নিয়ম প্রতিপালন করবে না, এর কুফল অবশ্যম্ভাবী। আমার মতে, তুমি যদি বিবাহ কর, তাতে তোমার ধর্ম্মচর্চ্চার ক্ষতি হবে না। যদি অবিবাহিত থাক, তাতেই হানি হবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিবাহ করেও অনেকে নির্ম্মল থাকতে পারে না। তুমি বিবাহ না

করেও নির্ম্মল থাকবে যদি বল, সেটা শুধু তোমার ভণ্ডামি। স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোকের প্রতি পাপ দৃষ্টি করার চেয়ে বিবাহ করা ভাল।"

শেষ কথাগুলিতে মোহিতলালের কোপাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাক্যসংযম হারাইয়া হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিল—"সবাইকে নিজের মত মনে করবেন না।"

এই কথায় গোপীবাবু পালঙ্ক হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া রোষে গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা?"

মোহিত ধীর ভাবে বলিল, "মিছে আমায় চোখ রাঙাচ্ছেন। আমি সব জানি।"

গোপীবাবু পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "কি জান?"

"যা জানি, তা বলে আর নিজের মুখকে কলঙ্কিত করব না। কিন্তু আপনি সাবধান হবেন। আপনি যদি স্বেচ্ছায় মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ না করেন, তবে তার প্রতিকার আমায় নিজের হাতে নিতে হবে।"

গোপীবাবু একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। মোহিত কি জানে এবং কতখানি জানে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সর্পভীত মনুষ্য অন্ধকারে যেমন সাবধানে পদক্ষেপ করে, সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নরম স্বরে বলিলেন, "বটে!—তুমি আমার অভিভাবক নাকি? গুরুজন?"

"না—গুরুজনও নই, অভিভাবকও নই। আমি আপনার ছোট ভাই। ছোট ভাইকে অধর্ম্ম পথ থেকে নিবৃত্ত করা সম্বন্ধে, বড় ভাইয়ের যেমন অধিকার, বড় ভাই সম্বন্ধে ছোট ভাইয়েরও ঠিক সেই রকম অধিকার।"

যেন গোপীবাবু কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই—শঙ্কিত হন নাই—এইরূপ ভাবটা অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "বটে! এ যে নতুন শাস্ত্র শুনছি। তা, কি করতে চাও তুমি?"

মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল, "এখনও স্থির করিনি। আপনি যদি সহজে সৎপথে না আসেন, তবে আমাকে অপ্রীতিকর উপায় অবলম্বন করতে হবে।"

যুবকের মুখে চক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দেখিয়া গোপীকান্ত একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠায় বিবর্ণমুখ হইয়া গেলেন। পুনর্ব্বার সমীপবর্ত্তী পালঙ্কে উপবেশন করিয়া, বাম হস্তের দ্বারায় আপনার দুই চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া উৎপীড়িত ধার্ম্মিকের মত বলিতে লাগিলেন—"তা হবেই ত! না হবে কেন?

কলিকাল কিনা। একালে সবই উল্টো। পূর্ব্বে ছোট ভাই, বড় ভাইকে পিতার মত গুরুর মত ভক্তি করত। একালে ছোট ভাই বড়কে ধর্ম্মোপদেশ শোনায়, তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করে, নানা রকমে শাসায়। এ নইলে আর কলিকাল বলবে কেন? পূর্ব্বে ছিল গুরুনিন্দা মহাপাপ। গুরুনিন্দা করলে লোকের জিহ্বা খসে যেত। এখন আর গুরু লঘু কেউ নেই। সবাই স্ব স্ব প্রধান। তবে উঠি। এখন আর তোমার সময় নষ্ট করব না। পাপীর সংসর্গে থাকলে তোমার ক্ষতি হতে পারে।"—বলিয়া গোপীবাবু পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইলেন। দ্বারের বাম দিকেই নীচে নামিবার সিঁড়ি। দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী সেই সিঁড়ি দিয়া দ্রুতভাবে অবতরণ করিতেছেন।

বাহিরে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, একটি মধ্যবয়স্ক অপরিচিত ব্যক্তি, পরিধানে নূতন কাপড়, নূতন চাদর, নূতন জামা, নূতন জুতা, বগলে একটি নূতন ছাতি, এক হাতে একটি পুঁটুলি অন্য হাতে একটি থেলো হুঁকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটির মাথায় টাক। গোঁফগুলা খোঁচা খোঁচা। বর্ণটি মসীনিন্দিত। গোপীবাবুকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

গোপীবাবু বলিলেন, "কে তুমি?"

লোকটি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল।"

"বাড়ী কোথায়?"

"আজ্ঞে, হুগলি জেলা।"

"কি মনে করে এসেছ?"

হাতদুটি যোড় করিয়া, কাতর প্রার্থনার স্বরে সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"আজ্ঞে, হুজুরের দ্বারা প্রতিপালন হব বলে।"

"কি কায জান?"

"আজ্ঞে, জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাযই জানি।"

গোপীবাবুর জমিদারীতে একজন কর্ম্মচারীর পদ শূন্য ছিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন কাছারিবাড়ীতে থাক, স্নানাহার কর। সময় মত কথাবার্ত্তা হবে।"—বলিয়া, একজন ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া, আগন্তুক লোকটিকে কাছারিবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ গদাধর-চরিত

এখানে অল্পদিন পূর্ব্বের কয়েকটা ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক।

প্রাতঃকাল। আলিপুর জেলের ভিতর, ফটকের নিকট, জন পনেরো কয়েদী অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে হাস্য কৌতুক করিতেছে। তাহাদের মন বেশ প্রফুল্ল, কারণ আজ তাহাদের কারাবাসের অবসান। জেলরবাবু আসিলেই হয়।

সাতটা বাজিল। জেলরবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। দ্বাররক্ষী চলমান প্রহরী সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং স্কন্ধের বন্দুক নামাইয়া অবনত-ভাবে ধারণ করিয়া সামরিক-সঙ্কেতে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। গেট-জমাদার সশব্দে চাবি খুলিয়া প্রবেশ-পথ মুক্ত করিয়া দিল।

জেলরবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অধস্তন কর্ম্মচারিগণ কাগজপত্র হাতে করিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন। আজ যে সকল কয়েদীর কারামুক্তির দিন, তাহাদের নামের তালিকা হাতে লইয়া, উপস্থিত প্রত্যেক কয়েদীর কণ্ঠ-বিলম্বিত কাষ্ঠপদকের নম্বর তারিখ প্রভৃতি সাবধানে জেলরবাবু মিলাইয়া দেখিলেন। পরে, পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লইয়া, নিজ নিজ পরিচ্ছদ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। জেলে আসিবার সময় ইহারা এই সকল বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। সকলে নিজ নিজ বাসস্থানের তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া এবং খোরাকী হিসাব করিয়া পাইল। তখন ফটক খুলিল—কারাগার হইতে তাহারা মুক্ত হইল।

ইহাদের মধ্যে একজন ছিল তাহার নাম গদাধর পাল।—লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হইবে। পৌষমাসে ইহার জেল হইয়াছিল—তাই এ ভাদ্র-মাসের গ্রীষ্মেও ইহার গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে বনাতের কোট, তদুপরি একখানি সার্জ্জের চাদর।

বাহির হইয়া গদাধর ওরফে গদাই চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—যদি তাহার কোনও আত্মীয় স্বজন তাহাকে লইতে আসিয়া থাকে। অনেকের আসিয়াছিল কিন্তু গদাই কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ফটকের ঊর্দ্ধভাগে নির্ম্মিত জেলরবাবুর সরকারী বাসস্থানটির প্রতি চাহিয়া দেখিল। তখনকার দিনে, জেলের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ দুই একজন করিয়া কয়েদী গৃহভৃত্যের কার্য্য করিবার জন্য পাইতেন। বৎসরখানেক হইতে

গদাই পাল, জেলরবাবুর বাসায় বাসন মাজিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য কয়েদীকে পাথর ভাঙ্গা, বাগান খোঁড়া প্রভৃতি নানা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হইত, কিন্তু গদাই পাল খানকতক বাসন মাজিয়াই খালাস। ইহা ছাড়া তাহার উপরি পাওনা ছিল—মাঝে মাঝে 'প্রসাদ' পাইত এবং চাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া একটি হুঁকা আনাইয়া রাখিয়াছিল—কর্ম্মের অবসরে অত্যন্ত গোপনে এক একবার তামাক খাইয়া লইত। জেলের কয়েদীর পক্ষে এ সকল সুযোগ অতি দুর্লভ। সুতরাং একবার উপরে গিয়া মাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই তাহার মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মিল।

ধীর পদক্ষেপে, পশ্চাতের সিঁড়ি দিয়া গদাই উঠিয়া গেল। রান্নাঘরের নিকট গিয়া বলিল, "মাঠাকরুণ।"

"কি রে গদাই—আজ তোর খালাস হল ?" বলিতে বলিতে জেলরবাবুর গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"আজ্ঞে মাঠাকরুণ—আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"তা বেশ। আজকেই বাড়ী যাচ্ছিস ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোদের দেশ কোথায় ?"

"আজ্ঞে হুগলি জেলায়।"

"বাড়ীতে কে কে আছে ?"

"আজ্ঞে—স্ত্রী ছিল, দুটি কন্যে সন্তান ছিল। এখন এ ছ বছরে কে আছে কে নেই ভগবানই জানেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "আছে বইকি। সবই আছে। তুই বাড়ী গেলে তাদের কত আহ্লাদ হবে।"

ইতিমধ্যে জেলরবাবুর কয়েকটি ছেলেমেয়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ গদাই পালকে কারামুক্ত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত।

গৃহিণী বলিলেন, "দেখিস—ছ বৎসর পরে খালাস পেলি, আর যেন কখনও চুরি ডাকাতি করিসনে।"

গদাধর বলিল, "আজ্ঞে মাঠাকরুণ, চুরি ডাকাতি ত করিনি—দাঙ্গা করেছিলাম।"—বলিয়া বুক ফুলাইয়া গদাধর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পরে মাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া গদাই বিদায় চাহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "এবেলা নাইবা গেলি। থাক্, ভাত খেয়ে ওবেলা তখন যাস।"

গদাই বলিল, "তা মাঠাকরুণ আপনাদেরই ত খাচ্ছি। কালীঘাটে গিয়ে, মা কালীকে দর্শন করে—সেইখানেই কিছু জলটল খেয়ে রেলে উঠব।" বলিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গদাধরের বাড়ী হুগলি জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী বারুইপুর গ্রামে। সেখানকার জমিদার রমানাথ বসু মহাশয় ইহাকে একজন অতি প্রিয়পাত্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। জমিদারী কার্য্যে গদাই পাল তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল। এমন দুষ্কার্য্য নাই যাহা মুনিবের আজ্ঞায় গদাধর সম্পন্ন করিতে না পারিত। দাঙ্গা করিতে, জাল করিতে, মিথ্যা মোকর্দ্দমা গঠন করিতে, অবাধ্য প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে, তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতে—গদাই পাল একেবারে সিদ্ধহস্ত। মামলা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে সমস্ত তদ্বিরের ভার তাহারই উপর ন্যস্ত হইত। আইনও তাহার কিছু কিছু জানা ছিল। দণ্ডবিধি আইন, কার্য্যবিধি আইন, প্রজাসত্ত্ববিষয়ক আইন, প্রভৃতির বাঙ্গালা বহি গদাধরের সর্ব্বদা পাঠ্য ছিল। ইহাই তাহার প্রথমবার জেলও নহে। একবার বে-আইনি জনতায় মিলিত হইয়া এক প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবার অপরাধে, তাহার দেড় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। সে আজ দশ বারো বৎসরের কথা। এবার তাহার জেল হইবার কারণ, এক প্রতিবেশী জমিদারের সহিত সরহদ্দের বিবাদ উপলক্ষ্যে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে অপর পক্ষের দুইটি লোক খুন হইয়া যায়। প্রকাশ, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, মুক্ত তরবারি হস্তে, গদাই পাল স্বয়ং সৈন্যচালনা করিয়াছিল। দায়রার বিচারে তাহার দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয়—আপীলে হাইকোর্টের দয়ালু জজগণ সে দণ্ড রহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ছয় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

যথাসময়ে গদাধর দেশে ফিরিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শুনিল তাহার পূর্ব্বপ্রভু রমানাথ বসু ছয়মাস হইল তনুত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রনাথ এখন পিতার গদিতে উপবিষ্ট।

নিজ বাস্তভিটায় গিয়া গদাই দেখিল, বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে—কেবল মাত্র ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ। ইঁটের মধ্য হইতে বড় বড় শেওড়া গাছ ও নানা জাতীয় বন্য গুল্ম বাহির হইয়াছে। দুয়ার, জানালা, কড়ি, বরগা পাড়ার লোকে

টানিয়া লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে। লোকের কাছে সংবাদ পাইল তাহার জেল হওয়ার বছরখানেক পরে, স্ত্রী খাইতে না পাইয়া কন্যা দুইটিকে লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যায়। কিছু দিন পরে সেখানে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মামারা কোনও ক্রমে কন্যা দুইটিকে পাত্রস্থ করিয়া দিয়াছে—রমানাথবাবুও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গদাই পাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কোথায় যাইবে, কি খাইবে, কিছুরই স্থিরতা নাই। গ্রামে তাহার একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল—নাম রসিকমোহন—তাহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুই এক দিন পরে তাহার নিজের মনে হইল, লোকেও পরামর্শ দিল, পূর্ব্ব মনিবের পুত্রের নিকট গিয়া, আপনার অবস্থা সমস্ত জানাইলে, তিনি অবশ্যই একটা কিনারা করিবেন।

গদাই পাল কারাবাসের পূর্ব্বে প্রভুপুত্রকে অল্পই দেখিয়াছিল। তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ। তখন অধিকাংশ সময় তিনি কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ গদাধর কখনও পায় নাই। তবে সাধারণ ভাবে তাহার জানা ছিল যে, এ কালের শিক্ষিত যুবকগণ ঠাকুর দেবতা ও গুরু পুরোহিতের প্রতি তাদৃশ ভক্তিমান না হইলেও লোকের সহিত আচার ব্যবহারে ধর্ম্মভীরু। তাই তাহার একটু ভাবনা হইল যে এই নব্যতন্ত্রের জমিদারের নিকট গিয়া দরবার করিলে, কোনও ফল হইবে কিনা।

কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। একদিন পথে যতীন্দ্রবাবুকে দেখিয়া গদাই ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, আত্মপরিচয় দিল।

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "পরিচয় দিতে হবে না। আমি তোমায় চিনি। কবে বাড়ী এলে?"

"আজ্ঞে, এই তিন চার দিন এসেছি। হুজুরের কাছে একবার যাব যাব মনে করি কিন্তু সাহস করে যেতে পারিনে।"

"কোনও প্রয়োজন আছে?"

"হুজুরের কাছে একটা দরবার আছে।"

"তা বেশ ত—এস একদিন।"

"আজ্ঞে, একটু নিরিবিলি পেলে কথাবার্ত্তার সুবিধে হয়।"

"তাই হবে। বৈকালে তিনটে চারটের সময় যে কোনও দিন আসতে পার।"

পরদিন বেলা তিনটার সময়, দুর্গানাম ও অন্যান্য দেবদেবীর নাম ভক্তিভরে স্মরণপূর্ব্বক, গদাই পাল যাত্রা করিয়া বাহির হইল। যতীন্দ্রবাবু তখন একটি নিভৃত কক্ষে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, একখানি ইংরাজি গ্রন্থ ও এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল হইতে তর্জ্জমা করিয়া, 'প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কিনা'—এই সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। গদাই পালকে দেখিয়া খাতা বন্ধ করিয়া কলম উঠাইয়া রাখিলেন।

মেঝেতে ফরাস বিছানা পাতা ছিল, গদাই সেখানে উপবেশন করিয়া বলিল, "সেরেস্তার কাযকর্ম্ম সব নিজেই দেখছেন শুনছেন—এটা বড় ভাল। স্বর্গীয় কর্ত্তামশায়ও তাই করতেন। নইলে আর বিষয়ের এত উন্নতি করে যেতে পারেন ?—তা এখন কোন্ মহালের কাগজপত্র দেখা হচ্ছিল ?"

যতীন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, এখন জমিদারীর কায দেখছিলাম না—একটা রচনায় ব্যস্ত ছিলাম।"

একটা হর্ষ ও বিস্ময়ের ভাব চোখে মুখে আনিয়া গদাই বলিল, "আহা বেশ বেশ! বর্দ্ধমানের দেওয়ানজিরও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এমন সকল শ্যামা-বিষয়ক গান রচনা করতেন যে লোক শুনে ভেউ ভেউ করে কাঁদত। তা হুজুর কি বিষয় রচনা করছিলেন ?"

খাতাখানি উল্টাইতে উল্টাইতে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "এ কোন গান টান নয়। একটা প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখছিলাম।"

"কি তত্ত্ব বললেন ?"

"প্রত্নতত্ত্ব।"

"আজ্ঞে, বুঝতে পারলাম না। নতুন কিছু উঠেছে বুঝি ?"

যতীনবাবু বলিলেন, "পুরোণো কালের অনুসন্ধান, তাকেই প্রত্নতত্ত্ব বলে। এই যেমন এটা লিখেছি—'প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কিনা'—এই প্রবন্ধে আমি প্রমাণ করছি—ছিল—এমন কি রাজা দশরথের সময়ও বন্দুক কামানের ব্যবহার জানা ছিল।"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে বলেন কি !—আরে, না না। রাজা দশরথের সময়

বন্দুক কোথা?—বন্দুক ত এই ইংরেজরাই এনেছে বলে বোধ হয়। তাঁরা ধনুর্ব্বাণ ছুঁড়তেন এই ত পাঁচালীতে শুনেছি—যাত্রাতেও দেখেছি।"

মনে মনে একটু আমোদ পাইয়া যতীন্দ্রবাবু কহিলেন, "না, প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল। রামায়ণে তার প্রমাণ রয়েছে। অযোধ্যানগরী বর্ণনা করতে গিয়ে বাল্মীকি লিখছেন—সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী শতঘ্নীশতসঙ্কুলা। অর্থাৎ অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে একশোটা শতঘ্নী ছিল। শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—যা একবার ছুঁড়লে একশো মানুষ মরে যায়।"

দুইপাটি দন্ত যথাসাধ্য বিস্তার করিয়া গদাই বলিল, "বাবুমশায়—আপনি কিন্তু অবাক করে দিলেন। অ্যাঁ? এতদিন আমরা কেউ জানতাম না? তাই ত বলি—রাবণের মত বীর—রাক্ষস হেন সৈন্য—অমনি তীর ধনুক ছুঁড়ে মেরে ফেললে এও কখন হয়? কামান বন্দুক নিশ্চয়ই ছিল। এতদিন এ কথাটা কেউ জানত না। জানবে কোত্থেকে? দাশুরায়ের পাঁচালী আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পর্য্যন্ত ত দৌড় কিনা অধিকাংশ লোকের—হুজুরের মত সংস্কৃত রামায়ণ আর কজন পড়েছে? তা বেশ—তা বেশ! লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখাটা খুবই ভাল। আজকাল ত বড় বড় লোকের তাই হয়েছে। যাঁরা রীতিমত লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁদের কি এখন আর 'খসড়া খতেন জমাওয়াসিল বাকী'র খাতা নিয়ে মাথা ঘামাতে ভাল লাগে? খুব পাকা দক্ষ কর্ম্মচারী রেখে দিলেই কায চলে যায়। যত সব বড় বড় জমিদার, আজকাল সব কলকাতায়। কত রকম সভা করছেন, বক্তৃতা করছেন, কত জ্ঞানের কথা বলছেন। কেউ কেউ লাটসাহেবের মেম্বরের কৌঁসুলি পর্য্যন্ত হয়েছেন। লাটসাহেবের কাছে কৌঁসুলিরি মত বক্তৃতা করছেন—দেশের কত উপকার হচ্ছে। তা হুজুরের যে রকম বিদ্যেসাধ্যি, যদি কলকাতায় গিয়ে একটু চেষ্টা করেন—তবে আপনিও কৌঁসুলি হতে পারেন।"

সোণার চশমার ভিতর হইতে যতীন্দ্রবাবু সকৌতুকে গদাই পালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে কি একটা কথা আছে বলেছিলে যে?"

মাথাটি হেঁট করিয়া, নখের দ্বারা শতরঞ্চের উপর আঁচড় কাটিতে কাটিতে গদাই পাল বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে, কি আর বলব, আপনি ত সবই জানেন। আমি চিরকাল আপনাদের আশ্রিত, প্রতিপালিত। স্বর্গীয় কর্ত্তামশায় আমার

যৎপরোনাস্তি স্নেহ করতেন। নিজমুখে বললে গুমোর করা হয়—আপনি শুনেও থাকবেন—আমি ছিলাম তাঁর দক্ষিণ হস্ত। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও কাযই তিনি করতেন না। আর আমিই বা তাঁর জন্যে না করেছি কি? এই যে ছ বচ্ছর জেল খেটে এলাম, কার জন্যে? বাজিমাৎপুর জানেন ত?"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "বাজিমাৎপুর? সে কোথা?"

"বাজিমাৎপুর—আপনারই এলাকার মধ্যে। দুর্গানগর থেকে পোয়া দেড়েক হবে।"

"কই স্মরণ হচ্ছে না।"

"সেই বাজিমাৎপুর গ্রামখানা মহেশ চৌধুরী নীলামে খরিদ করে নিলে। ধরুন একটা কতকালকার পৈত্রিক সম্পত্তি, একজন এসে ফস্ করে নীলাম করে নিলে সে কি প্রাণে সহ্য হয়? বছরে পাঁচ ছ শো টাকা তসিল ঐ গ্রাম থেকে ছিল। আমরা কৌশলে করলাম কি—ঐ বাজিমাৎপুরের উত্তরে একটু দূরে খানকতক কুঁড়ে ঘরটর ছিল—কেওরা বাগ্দীরা বাস করত—আমরা বললাম যে ঐ হ'ল আসল বাজিমাৎপুর। নীলাম হয়েছে ঐটে। আর যেটা আসল বাজিমাৎপুর সেটাকে করে দিলাম দুর্গানগরেরই একটা অংশ। এই না করে মশাই, তোরো চৌদ্দ বৎসরের খাতাপত্র বিলকুল বদলে ফেললাম। তারপর দারোগাকে হাত করে, দিলাম ১৪৫ ধারার এক প্রছিডিং খাড়া করে।"

যতীনবাবু বলিলেন, "সে কি?"

জমিদারপুত্রের এই অজ্ঞতায় মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া গদাই বলিল, "সেটা কি জানেন? ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারায় লিখছে—যদি কোন জমির দখল নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ হয় এবং শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, তবে পুলিস-রিপোর্ট দৃষ্টে ম্যাজেষ্টার দখলের প্রমাণ নিয়ে, এক পক্ষের দখল সাব্যস্ত করে অপর পক্ষকে বলবেন, তোমার যদি দাবী থাকে তবে আদালত করতে পার। দারোগা রিপোর্ট দিলে যে আমাদেরই দখল—প্রছিডিং হল—এরই মধ্যে ওরা এল খাজনা আদায় করতে—আমরা লাঠি সড়কী তরোয়াল নিয়ে মোজাহেম্ হলাম। মহা দাঙ্গা। হয়ে গেল মশায় তাদের দলের দুটো লোক খুন। আমরা লাস দুটো ছিনিয়ে নিয়ে, দুজন ঘোড়সওয়ার থানায় ছুটিয়ে দিলাম—শিখিয়ে দিলাম এই বলে এজাহার লেখাও গিয়ে যে তারা আমাদের

দুটো লোককে খুন করেছে। দুইজন ঘোড়সওয়ার কেন পাঠালাম তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন ?”

যতীনবাবু বলিলেন, “কেন ?”

“আপনি ছেলেমানুষ, তাই এসব আপনার জানা নেই। জমিদারী রাখতে হলে, অনেক ফিচেলী বুদ্ধির দরকার। একটা যদি দাঙ্গা হয় তবে যে পক্ষের এজাহার থানায় প্রথম লেখান হবে—আদালতে সেই পক্ষের অনেকটা সুবিধে হয়। যেমন করে হোক প্রথমে থানায় পৌঁছন আবশ্যক। যদি একটা লোক মাত্র থানায় পাঠানো যায়—তবে পথে তার বিপদ আপদ হতে পারে, ব্যারাম হতে পারে—অপর পক্ষ থানায় পৌঁছে এজাহার লিখিয়ে ফেললেই মুস্কিল। তাই দুটো লোক পাঠানো। যা হোক্—থানায় আমাদের এজাহারই প্রথমে পৌঁছল, দারোগাকে অনেক টাকা খাইয়ে আমাদের মোকর্দ্দমা সত্য ওদের মোকর্দ্দমা মিথ্যা বলে খাতেমা রিপোর্ট দেয়ালাম—তাদের দলই চালান হল। কিন্তু ধর্ম্মস্য সূক্ষ্ম গতি কিনা—তাদের দল খালাস হয়ে গেল—পড়ল এসে পাল্টা মোকর্দ্দমা আমাদের উপর। আমাদের জেল হয়ে গেল। আঃ—এ ছটা বছর কি রকম কষ্ট পেয়েছি! কিন্তু আপনাদের নিমক খেয়েছিলাম—আপনাদের জন্যে জেলে যাব তার আর বিচিত্র কি ? প্রয়োজন হয় আবার জেলে যেতে প্রস্তুত আছি—তাতে গদাধর শর্ম্মা পিছপাও নন।”

বলিয়া গদাই পাল নীরব হইল। আশা করিয়াছিল তাহার বীরত্ব, বুদ্ধিকৌশল ও আত্মত্যাগের এই জ্বলন্ত বর্ণনায় যতীন্দ্রবাবু একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ ভাব কিছুই দেখিতে না পাইয়া সে একটু নিরাশ হইল।

যতীন্দ্রবাবু অন্যমনে প্রবন্ধের পাতা উল্টাইতেছিলেন। এখানে ওখানে একটু আধটু সংশোধন করিতেছিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া গদাই পাল বলিল—“জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম—আমার বাড়ী ঘর সব পড়ে গিয়েছে। ‘বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা’ গোছ অবস্থা হয়েছে। এখন হুজুর যদি আমায় কর্ম্মে বাহাল করেন তবেই গরীব দুটো খেতে পায়।”

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, “দেখ, এখন দিন-কাল বড় শক্ত পড়েছে। জমিদারদের উপর গভর্ণমেণ্টের এখন ভারি কড়া নজর। দাঙ্গা হাঙ্গামা ফৌজদারীতে আর সুবিধে নেই। তাই আমি এলাকার সমস্ত লাঠিয়ালকে বরতরফ করেছি। আইন আদালতের সাহায্যে যতদূর হয় তারই উপর নির্ভর।”

গদাধর ছাড়িবার পাত্র নহে। বলিল—"তা, সে সম্বন্ধেও এ অধমের যোড়া পাবেন না। কর্ত্তার আমলে মামলা মোকর্দ্দমার সমস্ত তদ্বিরের ভার আমারই উপর ছিল।"

যতীন্দ্র বলিলেন, "মামলা মোকর্দ্দমা দেখাশুনার একজন ভাল লোক আমার চাই বটে। একজন ল-এজেণ্ট নিযুক্ত করব মনস্থ করেছি। তা তুমি মামলা মোকর্দ্দমা বেশ চালাতে পার ?"

এ কথা শুনিয়া গদাধরের বুক উৎসাহে ফুলিয়া উঠিল। মুখে তুবড়ী ছুটাইয়া বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে সে কথা নিজ মুখে আর কি বলব ? কর্ত্তা আমাকে প্রায়ই বলতেন গদাধর, তুমি যদি ইংরিজি জানতে, উকীল হতে পারতে—তা হলে জ্যাকসেন সাহেবও তোমায় পেরে উঠত না।—আর কিছু হোক্ না হোক্ আমার মাথাটা বেজায় খেলে। একবারের কথা বলি—হুজুরের বিবাহের সময় সকল গোমস্তার নামে কর্ত্তার পরোয়ানা বেরুল, প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে বাৎসরিক খাজনার টাকায় এক আনা করে মাঙ্গন আদায় করে পাঠাবে। হাজিপুরে রমণ ঘোষ এক বর্দ্ধিষ্ণু গোয়ালা প্রজা ছিল—গোমস্তা গিয়েছিল তার কাছে মাঙ্গন আদায় করতে। তা বেটা বল্লে কি—'যাও মাঙ্গন দেব না—ও সব বে-আইনি। জমিদারের জমি রাখি, খাজনা দিই। মাঙ্গন চাইবার তিনি কে ?'—এই কথা শুনে, কর্ত্তা ত একেবারে রেগেই খুন। আমাকে ডেকে বল্লেন, 'গদাই, বেটাকে জব্দ করতে পার ? গয়লা বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা ?—আমাকে আইন দেখায় ? বেটার সর্ব্বস্ব লুট করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পার ?'—আমি হাতযোড় করে বল্লাম—'ধর্ম্মাবতার, আপনার হুকুম হলে কি না পারি ? কিন্তু তার চেয়ে, এমন উপায় করছি যাতে বেটাকে আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়। বিস্তর ভাল ভাল জমি অল্প খাজনায় করে আসছে। সেই সব জমিগুলো অন্য লোককে বিলি করলে অনেক বেশী খাজনা পাওয়া যাবে।' ভেবে চিন্তে, ষোলশো বাষট্টি টাকার এক তমস্থক তৈরি করলাম বেটার নামে।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "জাল করলে ?"

"আজ্ঞে যা বলেন। জমিদারী রক্ষা করতে হলে ও সব না হলে চলে না।"

"তার পর ?"

"আজ্ঞে তার পর সেই তমস্থকের মামলা। তারিখের তিন চার দিন আগে

থাকতে, সব সাক্ষীদের কসে তালিম দিতে লাগলাম। ও তরফ থেকে যা জেরা টেরা হতে পারে—সব ঠিক করে শিখিয়ে দিলাম—কোন্‌খানে বসে তমস্সুক লেখা হয়েছিল—তখন বেলা কত—দোয়াত কে আনলে—কলম কটা—কাতিব কোন মুখো হয়ে বসেছিল—প্রথমে মুসবিদে করলে না একবারেই লিখে গেল—তার গায়ে কি রঙের জামা ছিল—সমস্ত একবার ঠিক্ ঠিক্। মোকর্দ্দমা উঠল। সবাইকে শেখান ছিল বলবি যে রমণ ঘোষ পেনকলম দিয়ে সই করলে। প্রথম সাক্ষী তাই বল্লে। দ্বিতীয় সাক্ষীটে জেরায় কি রকম হতবুদ্ধি হয়ে গেল, বলে বসলো ইষ্টিল পেন দিয়ে সই করেছিল। মনে করলাম এই রে! ধর্ম্মস্য সুক্ষ্ম গতি, গেল বুঝি মোকর্দ্দমা ফেঁসে। কিন্তু তখনি মাথায় এক বুদ্ধি এল। চট্ করে বাইরে গিয়ে, যেখানে বটগাছতলায় বাকী সাক্ষীরা বসে ছিল, তাদের শিখিয়ে দিলাম—যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলবি, একটা ভোঁতা পেন কলমের মুখে একটা ইষ্টিল পেনের নিপ্ গুঁজে রমণ ঘোষ দস্তখৎ করেছিল। ওদের উকীলটেও ছিল গর্দ্দভ। দুই সাক্ষীতে এত বড় একটা অনৈক্য পেলি—ও কথাটা ঐখানেই ছেড়ে দে। তা নয় তৃতীয় সাক্ষীকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। যাহা জিজ্ঞাসা করা, সে ঐ রকম বলে দিলে। উকীল ভায়ার মুখটি চুণ। মোকর্দ্দমা ডিগ্রী হয়ে গেল। টাকা দিতে পারলে না। তার বাড়ী ঘর জোৎ জমা সব নীলাম করে নিয়ে গলাটি টিপে ঘোষের-পোকে এলাকা থেকে বের করে দিলাম।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "সইটাও তুমি জাল করেছিলে নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রমণ ঘোষের জবাবে, ওকালৎনামায় তার যা আসল সই ছিল, হাকিম মিলিয়ে দেখলে, ঠিক একেবারে মিলে গেল।"

যতীন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, "অন্যের সই ঠিক অনুকরণ করতে পার ?"

উৎসাহের সহিত গদাই বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—হুবহু। একটা সই করে দিন—নকল করে দিচ্ছি।"

যতীন্দ্রবাবু একটা কাগজ লইয়া নিজের দস্তখৎ করিয়া দিলেন। গদাই সেটি লইয়া, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অবিকল নকল করিয়া দিল।

দেখিয়া যতীন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গদাধর বুঝিল, বাবুর মন এবার ভিজিয়াছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য ত! কি করে শিখলে?"

আত্মপ্রশংসায় সঙ্কুচিত হইয়া, সলজ্জ হাসির সহিত গদাধর বলিল, "আজ্ঞে ওটা আমার একটা ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা। শিখতে হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া গদাই পাল জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে হুজুরের কি হুকুম হয়?"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এক সপ্তাহ পরে এস, হুকুম দেব।"

"যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার"—বলিয়া গদাধর উঠিল এবং বাবুকে প্রণাম করিয়া সহাস্যমুখে গৃহে গেল

সে চলিয়া গেলে যতীন্দ্রবাবু আপন দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাজিপুরের রমণচন্দ্র ঘোষকে চিনতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সে এখন কোথা?"

"তার জোৎ জমি সমস্ত আমরা এক ডিক্রীর বলে নীলামে খরিদ করে নিয়েছিলাম। তার পর সে আমাদের এলাকা ছেড়ে, খুলনা জেলায় তার মামার বাড়ীতে গিয়ে বাস করছে।"

"তার ঠিকানা জানেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তার সে মোকর্দ্দমার সব কাগজপত্র আমাকে এখনি পাঠিয়ে দিন।"

কাগজপত্র দেখিয়া, পরদিন প্রভাতে যতীন্দ্রবাবু দেওয়ানকে আজ্ঞা দিলেন—"একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পাঠিয়ে, রমণ ঘোষকে এখানে দুয় দিনের মধ্যে আনিয়ে দিন। আর দেখবেন, কথাটা যেন খুব গোপন থাকে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ সর্পে রজ্জুভ্রম

গদাই পাল ধীরপদে বাড়ী আসিল। গৃহস্বামী রসিকমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে—কি রকম বুঝলে?"

গদাই বলিল, "আরে ছি ছি! লেখাপড়া শিখেও মানুষ এমন জন্তু হয়?"

"কি রকম?"

"ঐ তোমার যতীনবাবু, অনেক পাস ত করেছে বলছ—কিন্তু জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে একটি আস্ত গোরু। সরকারী যত লাঠিয়াল ছিল বর্‌তরফ্ করে ফেলেছে। বল্লে কি, আইন আদালতে যতদূর যা হয় সেই ভাল, দাঙ্গাহাঙ্গামা করে প্রজাশাসন করা ঠিক নয়।"

রসিক বলিল, "প্রজার মঙ্গলের জন্যেই ওরকম করেছে।"

গদাই হা হা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ওহে প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়—প্রজার মঙ্গলের জন্যে নয়—উকীল মোক্তারের এতে খুব মঙ্গল হবে বটে। এই ধর, এক প্রজার কাছে খাজনা বাকী আছে, দুষ্টুমি করে দিচ্ছে না। বুড়ো কর্ত্তার আমলে, পাইক পাঠিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে এনে জুতিয়ে খাজনা আদায় করে নেওয়া হত। দুই এক পয়সার চুণেহলুদ খরচ করেই প্রজার পিঠের ব্যথা সেরে যেত—জমিদারের ত সিকি পয়সাও খরচ নেই। আর সুশিক্ষিত পুত্রের আমলে কি হবে? ধর, একটা প্রজার কাছে তিন বছরের তিরিশটে টাকা খাজনা বাকী আছে, তার জন্যে মহকুমায় গিয়ে মুন্সেফীতে নালিশ করতে হবে। প্রথমেই লাগল উকীলের বায়না দু'টাকা, আট আনা তার মুহুরীর তহুরী, ওকালৎনামা সওয়া আট আনা, কোর্ট ফীস দু'টাকা ন'আনা, পেস্কার মশাইয়ের এক টাকা, তার পর সাক্ষীদের তলব-আনা আছে, পেয়াদা এলেন সমন তালিম করতে, তাকে দিতে হলো এক টাকা—অন্ততঃ পক্ষে আট গণ্ডা পয়সা। তারপর তারিখের দিন প্রজা তার হাল গোরু ফেলে রেখে মহকুমায় ছুটলেন—মোক্তার হয় ত বলে দিলে, দে জবাব যে আমি বরাবর খাজনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি—জমিদারের গোমস্তা দুষ্টুমি করে দাখিলা দিত না। গড়াল শ্রাদ্ধ। যখন প্রজা হেরে গেলেন, মায় ড্যামেজ, অপর পক্ষের খরচা, ডিক্রী হল ত্রিশ টাকার জায়গায় ৫২৸১৫—নিজের খরচ শুদ্ধ ধরলে টাকা ষাট পঁয়ষট্টির ধাক্কা। প্রজা হাল গোরু বিক্রী করে ডিক্রীর টাকা শোধ করলেন—নয় ত জোৎ জমি নীলামে চড়ল। কোন্‌টা ভাল বাপু? দু-ঘা জুতো খাওয়া ভাল, না সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ভাল?"

রসিক বলিল, "তুমি ত, দৃষ্টান্তটি বেশ নিজের মনের মত করে গুছিয়ে বললে। কিন্তু জমিদারেরা কি শুধু বাকী খাজনার জন্যেই প্রজার উপর অত্যাচার করে? কত লোকের জমি কেড়ে নিচ্চে—কত লোককে উদ্বাস্ত

করছে—ন্যায্য পাওনার উপর কত লোকের কাছ থেকে অত্যাচার করে বেশী টাকা আদায় করে নিচ্চে, সেগুলো কি প্রজার মঙ্গলের জন্যে?—যাক সে কথা। এখন তুমি বাবুর কাছে কিছু ভরসা টর্সা পেলে?"

"পেয়েছি—কিন্তু অনেক বক্তিমে করে—অনেক কৌশল খাটিয়ে।"

"কি রকমটা শুনি?"

গদাই পাল তখন শাখা পল্লবিত করিয়া যতীন্দ্রবাবুর সহিত তাহার কথা-বার্ত্তার কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া বলিল, "মোকর্দ্দমা মামলায় আমার বুদ্ধি খেলে দেখেই বাবুর মনটা ভিজলো। উনি আইন আদালতের উপরই যখন সম্পূর্ণ নির্ভর করবেন, তখন শর্ম্মাকে নইলে চলবে না। সেটা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন বোধ হল।"

রসিক বলিল, "তা বেশ। চিরকাল ঐ ঘরেই প্রতিপালন হয়েছ, এ বয়সে আর কোথায় যাবে? কিন্তু বুড়ো কর্ত্তার আমলে যেমন দু-হাতে লুট করতে, এর কাছে তেমন পারবে না। এ বড় ঝানু ছোকরা—বার টাকা মাইনে দিয়ে কলেজে পড়েছে—আইন কানুন সব জানে।"

গদাই বলিল, "আইন কানুন?—সে বিষয়ে নবডঙ্কা!"—বলিয়া গদাই মুষ্টি বদ্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে লাগিল। পরে বলিল, "হুঁশিয়ার কেমন! বাজিমাৎপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গার গল্প যখন করছিলাম, বাবু জিজ্ঞাসা করে বসলেন বাজিমাৎপুর কোথায়? এ দিকে বসে—কি তত্ত্ব একটা বললে ভাল—পেত্নীতত্ত্ব না কি—তাই রচনা হচ্চে, দশরথ রাজার কটা কামান ছিল তারই হিসেব লিখছেন। এদিকে নিজের জমিদারীতে কোথায় কি আছে তার হিসেব রাখেন না।"—বলিয়া গদাই পুনশ্চ উচ্ছ্রিত বৃদ্ধাঙ্গুলি সবলে কম্পিত করিতে লাগিল।

রসিক বলিল, "রাখবে—রাখবে। এই ত মোটে ছ'মাস জমিদারীর কায দেখছে কিনা। তাকে সহজে ঠকাতে পারবে না।"

"পারব না?—আচ্ছা বাজি রাখ। আমি বলছি, বুড়ো কর্ত্তার আমলে যা রোজগার করেছি, এর আমলে তার বেশী করব বই কম করব না। রোগ বুঝে ওষুধ কিনা! বাহাল হয়েই প্রথমে বলব—(এইখানে গদাই নিজে হাত যোড় করিল)—'হুজুর ধর্ম্মাবতার আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে।' বাবু বলবেন—'কি?'—আমি বলব—'হুজুর—আপনার পিতাঠাকুরের আমলে,

আমার মাইনে বন্দোবস্ত ছিল মাসে পাঁচটি টাকা। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, পাঁচ টাকায় কি করে পেট ভরবে? তাই অন্যায় উপার্জ্জনও করতে হত। প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে বিগড়ে খেতাম। সদরে কি মহকুমায় মোকর্দ্দমা করতে গিয়ে উকীল মোক্তারদের যা ফি দিতাম, তাই থেকে কিছু কিছু বখরা নিতে হত। সে কি তারা ঘর থেকে দিত? জমিদারের কাছ থেকেই আদায় করে নিত। কি করি পেট ত মানে না, কিন্তু হুজুরের আমলে যে রকম বন্দোবস্ত দেখছি—কেউ যে অধর্ম্ম করে কিছু রোজগার করবেন, তার যোটি নেই। তাই প্রার্থনা যে আমার এমন একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করে দিন, যাতে ধর্ম্মপথে থেকে গরীবের পেট ভরে।'—এই কথা শুনলেই বাবুমশায় খুসী হয়ে একবারে সাফ জল হয়ে যাবেন। মাসে পঞ্চাশ টাকাও যদি না হয়, চল্লিশ টাকা মাইনে আমার নিশ্চয় হবে।"

রসিক বলিল, "বুড়ো কর্ত্তার আমলে তার চেয়ে ত বেশী রোজগার কর্ত্তে।"

"আহা আমি কি শুধু মাইনের উপরই নির্ভর করব? মাইনেটা ত হল আমার উপরি পাওনা। তার পর উকীলের ফি থেকে যে কমিশনটা পেতাম—সে সব ন্যায্য পাওনাগুলো আমার যাচ্ছে কোথায়? পূর্ব্বে উকীলের কাছ থেকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন পেয়ে এসেছি। এদানী শুনছি উকীলের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে—উকীলদের মধ্যে বিরিফের জন্যে এমনি খেয়োখেয়ি পড়ে গেছে—যে এখন যদি ফি দিয়ে আধাআধি বখরাও চাই, তাও তারা সোণাহেন মুখ করে দেবে।"

সাতদিন পরে বাবু আসিতে বলিয়াছিলেন, এ সাতদিন গদাই পালের আর কাটেনা। সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে বাবু মহাশয় তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে মোকর্দ্দমার তদ্বিরকারক নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন পঞ্জিকায় কার্য্যারম্ভ করিবার মত দিন ভাল নাই বলিয়া বাবু মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া কোনমতে এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়াছে। সাতদিন পরে তাহাকে চাকরি আরম্ভ করিতেই হইবে। সে যাহার কাছে টাকা কর্জ্জ চাহিল, সেই ভয়ে ভয়ে তাহাকে কর্জ্জ দিল। এই প্রকারে পঞ্চাশ ষাট টাকা সে সংগ্রহ করিল। এ দিকে, তাহার ভবিষ্যৎ ক্ষমতা ও উন্নতির সম্ভাবনা জানিয়া রসিকমোহনের বাড়ীতেও তাহার জলখাবার ও দুগ্ধের বরাদ্দ বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে একদিন সদরে গিয়া উকীলগণের সহিতও গদাই সাক্ষাৎ

করিল। নিজের অসামান্য পদবীলাভ বর্ণনা করিয়া বলিল যে, শীঘ্রই কয়েকটা বড় বড় টাইটেল ছুটের মোকর্দ্দমা দায়ের হইবে। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিল, আর্জ্জির মুসাবিদা করাইবার জন্য আগামী রবিবারে আসিলে উকীল মহাশয়ের অবকাশ হইবে কি? উঠিবার সময় কোনও উকীলকে বলিল, যোড়া দুই কাপড় কিনিবার প্রয়োজন ছিল, কাহাকেও বলিল একযোড়া জুতা কিনিতে হইবে, কাহাকেও বলিল গোটা দুই জামা নিতান্ত আবশ্যক, কাহাকেও বলিল একটা ছাতা না কিনিলেই নয়—কিন্তু বাড়ী হইতে আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে, গোটাকতক টাকা হাওলাৎ পাইলে রবিবারে আনিয়া দিত। এইরূপে প্রত্যেক উকীলের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া জুতা, জামা, ধুতি, ছাতা প্রভৃতি কিনিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

সপ্তাহ পূর্ণ হইল। চাকরি হইলে গ্রামস্থ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে যোড়া পাঁঠা বলি দিবে মানত করিয়া গদাধর জমিদারবাবুর গৃহে উপনীত হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত কক্ষে যতীন্দ্রবাবু চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। গদাই প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে মেঝের উপর বিছানো ফরাসে উপবেশন করিল।

দুই একটা অন্য কথার পর, যতীন্দ্রবাবু একটি বাণ্ডিল খুলিয়া সেই তমস্সুকখানি বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—"বাঃ তোমার বাহাদুরী আছে! সেরেস্তা থেকে পুরান চেকমুড়ি আনিয়ে, তার পিঠে রমণ ঘোষের অনেকগুলো দস্তখতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, তমস্সুকের এ সই একেবারে অবিকল মিলে যাচ্চে।"

গাদাই আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, চেকমুড়ির পিঠে দস্তখত দেখেই ত' তমস্সুকের ও সই জাল করেছিলাম।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "যে সময় জাল করেছিলে, সে সময়ের পাঁচ বছর আগে এ ষ্ট্যাম্প কাগজখানি বিক্রী হয়েছিল—ভেণ্ডারের সই তারিখ রয়েছে। এত পুরান কাগজ পেলে কোথা?"

"আজ্ঞে ফি বছর বাণ্ডিল বাণ্ডিল নানা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ কিনে বাড়ীতে তুলে রেখে দিতাম। কোন্ সময়ে কত বছরের পুরান কাগজ দরকার হয় তা কি বলা যায়?"

"বটে!—আর কালি?—নূতন কালিতে লিখেছিলে ত? আদালতের সন্দেহ হল না?"

মৃদুহাস্য করিয়া গদাই বলিল, "আজ্ঞে, তার উপায় আছে। কাগজখানা,

দিনকতক আছাঁটা চাউলের মধ্যে গুঁজে রাখতে হয়। কুঁড়ো লেগে কালির রং কাগজের রং দুই-ই বদলে যায়।"

যতীন্দ্রবাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—"রমণ!"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে, ঝন্ করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া, রমণ ঘোষ প্রবেশ করিল।

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "কেমন হে গদাধর—এই সেই রমণ ঘোষ নয়?"

গদাই পালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, একটা অনির্দ্দিষ্ট বিপদ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

"কেমন, এই সেই রমণ ঘোষ—যার নাম জাল করে সর্ব্বস্ব নীলাম করিয়ে নিয়েছিলে?"

গদাই হতবুদ্ধি হইয়া কষ্টে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ?"

যতীনবাবু বলিলেন, "রমণ, আমাদের দ্বারা তোমার উপর যা অত্যাচার হয়েছে—তার জন্যে আমি বড় দুঃখিত। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আবার এসে আমার জমিদারীতে বাস কর। আমি তোমায় খুব সুবিধা দরে জমি দেব—বাড়ী নিজে থেকে তৈরি করে দেব।"

রমণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, হুজুরের বড় দয়া, হুজুর গরীবের মা-বাপ। আমার বয়স যদি আরও দশ বছর কম হত, এখনি উঠে এসে এ রামরাজ্যে বাস করতাম। কিন্তু বুড়ো হয়েছি। সেখানে মামাদের কিছু বিষয় পেয়েছিলাম, তাই বাড়িয়ে গুছিয়ে, ছেলেপিলে নাতিপুতি গোরুবাছুর নিয়ে একরকম আছি। এ বয়সে উঠে আসা বড় কষ্টকর হবে।"—বলিয়া রমণ ঘোষ করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীনবাবু বলিলেন, "কোথায় এখন আছ?"

"আজ্ঞা, খুলনা জেলায় সাজিয়াড়া গ্রামে।"

"জমিদার কে?"

"কমলপুরের বাঁড়ুয্যে মশায়েরা। তাঁরা দুই ভাই—বড় গোপীকান্তবাবুই জমিদারী দেখেন।"

"তা বেশ। যদি তোমার সুবিধা হয় সেইখানেই থাক। আমাদের দ্বারা তোমার যা অনিষ্ট হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি তোমায় ৫০০৲ দিচ্ছি। খাজাঞ্চীর নামে এই হুকুমনামা লিখে দিলাম, কাছারি থেকে টাকা নিয়ে যেও।"

আনন্দে রমণ ঘোষ যতীন্দ্রবাবুর পদধূলি লইল।

যতীন্দ্র তখন গদাই পালের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "এ জীবনে তুমি অনেক দুষ্কর্ম্ম করেছ। এখনি তোমায় পুলিসের হাতে দিতাম। কিন্তু সম্প্রতি তুমি ছ বছরের জেল খেটে এসেছ, তাই আপাততঃ তোমায় মাফ করলাম। কিন্তু তোমার প্রতি এই হুকুম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি আমার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। যদি কখনও শুনতে পাই যে তুমি আমার এলাকার মাটি মাড়িয়েছ, তখনি রমণ ঘোষকে দিয়ে তোমার নামে জালের নালিস করিয়ে দেব। আমার কাছে তুমি যে স্বীকারোক্তি করেছ, আমি নিজে সে বিষয়ে সাক্ষী দেব।"—তাহার পর রমণের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"কিহে—আমার চিঠি পেলে তুমি এসে নালিস দায়ের করবে ত?"

রমণ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি বেঁচে থাকি ত হুজুরের হুকুম পাওয়া মাত্র তামিল করব।"

"আচ্ছা বেশ, এখন তোমরা দুজনেই যেতে পার।"

গদাই পাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবুদের যেমন কাণ্ড! এক হপ্তা আমায় বসিয়ে রাখলেন—আজ গেলাম—দুঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করলাম—তবু বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

আহারাদি করিয়া গদাই শয়ন করিল। কিন্তু নিদ্রা গেল না। রাত্রি গভীর হইলে, সকলে যখন নিদ্রিত হইয়াছে, আস্তে আস্তে উঠিয়া, নিজের অল্প যাহা জিনিষপত্র ছিল, পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া পদব্রজে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, পৃথিবীতে তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু রহিল রমণ ঘোষ। বাবু না বলিলেও, সে নিজে যেদিন ইচ্ছা জালের মোকর্দ্দমা দায়ের করিতে পারে। আর, বাবু যদি নালিস করেন, রমণ ঘোষই প্রধান সাক্ষী। রমণ যতক্ষণ আসিয়া না বলিবে এ তমসুকের দস্তখৎ আমার নহে—ততক্ষণ মোকর্দ্দমা প্রমাণ হইবে না। সুতরাং শত্রু দমন আবশ্যক—এবং সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলে—রমণ ঘোষের যিনি জমিদার, কমলপুরের গোপীকান্তবাবু তাঁহার অধীনে চাকরি করাই প্রকৃষ্ট উপায়।

গদাই পাল যে কমলপুরে পৌঁছিয়া গোপীকান্তবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, সে সংবাদ পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ সুলোচনা

গোপীকান্তবাবুর স্ত্রীর নাম সুলোচনা। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ। একটি পুত্র একটি কন্যা আছে। পুত্রটির নাম নন্দলাল—তাহার বয়স আট বৎসর। কন্যাটির নাম কিরণবালা, পাঠক তাহাকে দেখিয়াছেন।

সুলোচনার প্রকৃতিটি বেশ স্নিগ্ধ। রাগিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যায় না। মনে কোনও দুঃখ হইলে মনেই তাহা লুকাইয়া রাখেন—মুখে প্রকাশ পায় না। পরমাত্মীয় জন ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার অন্তরের গোপন বেদনার সন্ধান পায় না। আবার হর্ষেও তাহাই। কোনও হর্ষের কারণ উপস্থিত হইলে, আনন্দে আটখানা হইয়া গড়াইয়া পড়েন না।

সংসারে গোপীকান্তবাবুর পিসিমা রহিয়াছেন—তিনিই গৃহকর্ত্রী। সুলোচনা তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিতেন, ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, কোনও দিন এমন ভাব প্রকাশ করেন নাই যে তিনি নিজে জমিদার-গৃহিণী এবং পিসিমা আশ্রিতা।

সুলোচনা সেদিন সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়া, নিম্নে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর একখানি মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলেন। একাকী শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবর যে কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? স্বামী দেবরকে বক্রভাবে যে অপবাদ দিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? দেবর স্পষ্ট ত কিছু বলিলেন না। 'আপনি যদি আপনার মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ না করেন'—কি সংসর্গ? কাহার সংসর্গ? কে মন্দ? কোনও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি কি তাঁহার বন্ধু জুটিয়াছে? কোন্ বন্ধু?

সুলোচনা অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছুই কিনারা পাইলেন না। বন্ধুর মধ্যে, গ্রামে ত এক রজনী ভট্টাচার্য্য, অপর শশিকমল। এই দুইজন বৈঠকখানায় আসিয়া প্রায়ই বাবুর সহিত পাশা খেলেন বটে। কিন্তু কখনও ত অন্যরূপ কিছু শুনা যায় নাই। আর এক বন্ধু আছেন, তিনি বকুলগঞ্জের জমিদার। গত বৎসর দোলের সময় আসিয়া তিনি বাগান-বাড়ীতে তিন চারি দিন ছিলেন বটে। সে তিন চারি দিন বাবুও বাড়ী আসেন নাই। গুজব শুনা গিয়াছিল, একদিন মদ খাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বকুলগঞ্জের বাবু পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পাইয়াছিলেন—ডাক্তার আনাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত মিশিয়া বাবু কোনও রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, এমন ত শুনা যায় নাই। দোলের পর

আরও দুই তিন বার বকুলগঞ্জের বাবু বাগানবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আসাতে গোপীকান্তবাবু বিরক্ত বই খুসী হইতেন না। কলিকাতার বাবুরা নিজ নিজ বাগানবাড়ীতে গিয়া নানারূপ যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন, ইহা সুলোচনার জানা ছিল। কলিকাতার কোনও বড়লোকের সহিত তাঁহার এক সখীর বিবাহ হইয়াছে। সেই সখী সুলোচনার কাছে স্বামী সম্বন্ধে একবার অনেক কান্না কাঁদিয়াছিল। মাসের অধিকাংশ রাত্রিই সে অভাগিনী স্বামী-সন্দর্শন পায় না—বাবু বাগানবাড়ীতেই থাকেন। গোপীবাবু মধ্যে মধ্যে বাগানবাড়ীতে যান বটে—কিন্তু প্রায়ই ত সেখানে রাত্রিযাপন করেন না। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গ্রীষ্মটা খুব বাড়িয়াছিল, প্রভাতে বাগানবাড়ীতে গিয়া নদীতে স্নান করিতেন, দিবাভাগে সেখানে বিশ্রাম করিতেন, অধিক রাত্রি হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

তবে দেবরের এ কথার অর্থ কি? স্বামী যখন তাঁহাকে শ্লেষোক্তি করিয়া একটা অপবাদ দিলেন, তখনই দেবর উত্তরস্বরূপ বলিলেন—'সবাইকে নিজের মত মনে করবেন না।'—সেই কথা হইতেই মন্দ-সংসর্গ কথার উৎপত্তি। তবে কি—তবে কি—সুলোচনা আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বাহুর উপর মস্তক রক্ষা করিয়া, অনেকক্ষণ রহিলেন। তাঁহার মুদ্রিত নেত্রযুগল অল্পে অল্পে স্ফীত হইতে লাগিল। পল্লবের অবরোধ ভাঙ্গিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বাহিরেও গড়াইয়া পড়িল।

তখন সুলোচনার মনে হইল, এ কি, আমি দিবা দ্বিপ্রহরে চক্ষুজল ফেলিতেছি কেন?—স্বামীর যে অকল্যাণ হইবে! সুলোচনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া, মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নের রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে। মাঝে মাঝে করুণ সুরে চিল চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। একটি নিমগাছ বাতাসে হেলিতেছে দুলিতেছে। নিমফুলের মৃদু মৃদু গন্ধ সুলোচনার মনকে একটু সবল করিল। বসিয়া, সুলোচনা ভাবিতে চেষ্টা করিলেন—যাহা সন্দেহ করিতেছেন, তাহা মিথ্যা, মিথ্যা। তাহা কখনও হইতেই পারে না। দেবর নিশ্চয়ই অন্য কোনও বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর যদি সেই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে দেবর ভ্রান্ত। কোনও মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ও কথা বলিয়াছেন।—সুলোচনা নিজের স্বামীকে ভাল মতেই জানেন—আজ বিশ বৎসর দেখিতেছেন। কই, কোনও

ছিল ত ঘুণাক্ষরেও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। আজ এ কি নূতন কথা ?—অসম্ভব !

হৃদয় কিন্তু এ কৃত্রিম প্রবোধ অধিকক্ষণ মানিল না। সুলোচনার মনে হইতে লাগিল, আচ্ছা যদি কথাটা অমূলকই হয়, তবে দেবর যখন স্বামীকে ও অপবাদ দিলেন, তখন কই স্বামী ত সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না! কই তিনি ত উদ্যতফণা সর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন না। যাহা উত্তর করিলেন—যে ভাবে কথাগুলি বলিলেন—তাহাতে যেন মনে হয় তিনি আত্মদোষ প্রকাশ হওয়াতে লজ্জিত, ভীত, সঙ্কুচিত। তবে কি কথাটা সত্য ?

ভাবিতে ভাবিতে সুলোচনার চোখের পাতা আবার ভিজিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবান, এ অপবাদ যদি সত্যই হয়, তবে তুমি আমার স্বামীকে দয়া কর—তাঁহাকে সুমতি দাও—তাঁহাকে ভাল কর। এ লজ্জার কথা যেন প্রকাশ না হয়। এ কলঙ্ক তাঁহার জীবন হইতে ধৌত করিয়া দাও। তাঁহাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

এমন সময়, পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিতে করিতে, কন্যা কিরণ সেই কক্ষে উপনীত হইল। জননীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার অসুখ করেছে ?"

সুলোচনা বলিলেন, "না মা, অসুখ করেনি "

"তবে তোমার মুখ এমন হয়ে গেল কেন ? চোখদুটি ছলছল করছে কেন ?"—বলিতে বলিতে কিরণ জননীর পদতলে উপবেশন করিল। সকরুণ শঙ্কিত নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

সুলোচনা স্নেহভরে কন্যার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার মনটা আজ তত ভাল নেই। তুমি এখনও স্নান করলে না ? অনেক বেলা হয়েছে যে !"

কিরণ মনে করিল, আজ প্রাতে কাকা যে কাণ্ডটি করিয়াছেন তাহারই জন্য বুঝি মার মন খারাপ হইয়াছে। বলিল—"আজ আর আমি স্নান করব না—শুধু গা ধুয়ে ফেলব। তুমি আর দেরী কোরো না মা, তুমি স্নান করে ফেল।" এই বলিয়া তাঁহার খোঁপার মধ্যে আঙুল দিয়া চুল খুলিয়া দিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পিসিমাও আসিয়া পৌঁছিলেন। বলিলেন—"বউমা—তুমি এখনও বসে রয়েছ ? বেলা যে দুপুর হল। এখনও স্নান করতে গেলে না ? আজ খেতে কত বেলা হবে তার ঠিক নেই, স্নান করে একটু জল মুখে দাও।"

পুত্র নন্দলাল এই সময় ছুটিয়া আসিয়া মাতৃ-অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাঁহার গলাটি ধরিয়া বলিল, "মা, কুকুরকে একখানি চন্দ্রপুলি দেবে? চন্দ্রপুলি খেতে সে বড় ভালবাসে।"

স্বজনস্নেহ সুলোচনার বিক্ষত হৃদয়ে সাময়িক সুস্থতা সঞ্চার করিল। তখন তিনি উঠিয়া প্রাত্যহিক স্নানাহার প্রভৃতি কোনও ক্রমে সম্পন্ন করিলেন।

গোপীকান্তবাবু আজ বহির্ব্বাটীতেই আহার করিয়া সেইখানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন না।

সন্ধ্যার পর গোপীকান্তবাবু শয়নগৃহে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, এমন সময় সুলোচনা আসিয়া বলিলেন, "কোথাও বেরুবে নাকি?

গোপীকান্ত বলিলেন, "বাগানবাড়ীতে যাচ্চি।"

"আজ যে হঠাৎ, অসময়ে?"

"মনটা ভাল নেই—শরীরটেও ভাল নেই। এখন দুই এক দিন সেখান থেকে বিশ্রাম করব।"

সুলোচনা একটু নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তবে আমাকেও নিয়ে চল।"

গোপীকান্তবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি বাগানবাড়ীতে যাবে? এ আবার কি খেয়াল? তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে?"

"তোমার কাছে থাকব। তোমার শরীর ভাল নেই বলছ—তোমার সেবা শুশ্রূষা করব।"

গোপীবাবুর মুখ একটু বিপন্নের মত দেখাইল। বলিলেন—"না—না—হিঁদুর ঘরের বউ বাগানবাড়ীতে যায় নাকি? তুমি কি মেমসাহেব হয়েছ?"

সুলোচনা বলিল, "কেন? বাগানবাড়ীতে অহিন্দুয়ানি কিছু আছে? স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যেখানে ইচ্ছে যাবে তাতে কি দোষ?"

গোপীকান্তবাবু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন ব্যাপার কি? একটু দৃঢ়ভাবে বলিলেন, না—"তুমি যেতে পাবে না।"

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। অবশেষে গোপীকান্তবাবু পুরুষোচিত ক্রোধের সহিত তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"আমার হুকুম, তুমি যেতে পাবে না।"—বলিয়া গোপীবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে সুলোচনা অনেকক্ষণ সেই কক্ষে একাকী বসিয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া, চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে মোহিতের কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সে তখন সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া, আলোটি ঠিক করিয়া, পড়িতে বসিবার উপক্রম করিতেছে। সুলোচনা সেখানে গিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো, বসব ?"

মোহিত বলিল, "বসবে বউদিদি ? এসনা—বস।"—বলিয়া নিজের মাদুরের অনতিদূরে বউদিদির জন্য একখানি আসন বিছাইয়া দিল।

বউদিদি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওবেলা তোমার দাদার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?"

"কখন ?"

"কলকাতার ওঁরা চলে গেলে পরে, উপরের ঘরে দোর বন্ধ করে ?"

মোহিত একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিল। তাহার পর বলিল, "আমি বিবাহ করব না বলে দাদা রাগ করছিলেন।"

"আর কি কথা হয়েছিল ?"

"ঐ সংক্রান্ত কথা।"

সুলোচনা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—উত্তর দেবে ?"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল।

"কি কথা বউদিদি ?"

"তোমার দাদাকে তুমি—কি বলছিলে—যে তুমি সব জান, স্বেচ্ছায় যদি তিনি মন্দসংসর্গ না পরিত্যাগ করেন—"

এই কথা শুনিয়া মোহিত খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"বউদিদি—এ সব কথা তোমায় কে বললে ?"

"কেউ বলেনি—আমি নিজে শুনেছি।"

"কি করে শুনলে ?"

"যখন কথা হচ্ছিল, তখন কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। না—না—তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ কোরো না—বক্তৃতা সুরু কোরো না। তুমি কি বলবে আমি জানি। তুমি বলবে যে ও রকম লুকিয়ে পরের কথা শোনা মহা অন্যায় ইত্যাদি। কিন্তু ভাই, আমি ত তোমার মত লেখাপড়া শিখিনি, তোমার মত ধর্ম্মচর্চ্চা

করিনি, তোমার মত মনের বল আমার নেই। তোমার দাদা যখন দুই চক্ষু কপালে তুলে গস্‌গস্‌ করতে করতে তোমার খোঁজে উপরে উঠে এলেন, তখনও আমি বাইরের খবর কিছুই শুনিনি; কলকাতা-ওয়ালাদের তুমি কি বলেছ না বলেছ কিছুই জানিনে। আমি ভাবলাম কাণ্ডখানা কি? তাই এসে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। তা তোমরা যে বল লুকিয়ে কারু কথা শোনা পাপ—সে পাপের প্রতিফলও আমি পেয়েছি। ঐ কথা শুনে অবধি আমার মনে শান্তি নেই—আমার বুকে কুল-কাঠের আঙ্গরা জ্বলছে। কি হয়েছে তোমায় বলতেই হবে।"

মোহিত অন্যদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বউদিদি একটু অপেক্ষা করিযা বলিলেন, "চুপ করে রইলে কেন?"

মোহিত কঠিন স্বরে বলিল, "বউদিদি—আমি কিছুই বলব না।"

তখন সুলোচনা আবার আরম্ভ করিলেন, "তুমি যে ওঁকে বলছিলে বড় ভাই যদি মন্দ পথে যায় তবে তাঁকে নিবৃত্ত করবার অধিকার ছোট ভাইয়ের আছে। আচ্ছা, তা যদি হয় তবে স্ত্রীর কি অধিকার নেই যে স্বামীর যাতে শুভ হয় এমন কায সে করে? কি হয়েছে বল। জানতে পারলে আমি প্রাণপণে তার প্রতিকার চেষ্টা করি। আমার কাছে গোপন কোরো না। আমি শুধু হীন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছি ভেব না।"—বলিতে বলিতে বউদিদির চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বেচারী মোহিত বড় বিপদে পড়িল। যে যুক্তিতে বউদিদি জানিতে চাহিতেছেন, তাহার সারবত্তা স্বীকার্য্য।

অথচ স্ত্রীর সাক্ষাতে স্বামীর অধঃপতনের কথা প্রকাশ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং সে বলিল, "বউদিদি—এর মধ্যে আমাকে কেন জড়িত কর? তোমার যা বোঝাপড়া করবার আছে, তা তুমি দাদার সঙ্গে করলেই ভাল হয়। তিনি কোথায়?"

"তোমার দাদা এই কতক্ষণ হল বাগানবাড়ীতে গেছেন।"

মোহিত চমকিয়া বলিল, "বাগানবাড়ীতে!" তাহার মন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আজ প্রাতে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও দাদা আজ বাগানবাড়ীতে গেলেন! একটা দিনও দেরী সহিল না? মোহিতের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বউদিদিকে সঙ্গে লইয়া বজ্রের মত বাগানবাড়ীতে গিয়া পড়িতে পারে—তবেই অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হয়।

বউদিদি বলিলেন, "কেন ঠাকুরপো—অমন করে চমকে উঠলে কেন? সেখানে কি কোনও বিপদ আছে?"

"আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না বউদিদি"—বলিয়া মোহিত উঠিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুলোচনা তখন আলোটি নির্ব্বাণ করিয়া, সেইখানে পড়িয়া, বাণবিদ্ধা হরিণীর মত লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ গদাই পালের ধর্ম্মজ্ঞান

গদাই পাল গোপীকান্তবাবুর অধীনে নাজিরী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিল যে বড়বাবুর মন কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাদৃশ প্রসন্ন নহে। কেহ তাঁহার সাক্ষাতে মোহিতের প্রশংসা করিলে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন, নিন্দা করিলে খুসী হন। প্রতিদিন সে লক্ষ্য করিতে লাগিল, দুই ভ্রাতার বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। একজনকে দেখিলে অপরজন দূর হইতে সরিয়া যান। অনুসন্ধানে গদাই অবগত হইল, পূর্ব্বে দুই ভ্রাতার কোনওরূপ মনোমালিন্য ছিল না—বেশ সদ্ভাবই দেখা যাইত। মোহিতবাবু বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই এবং কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে একরকম অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন—এ গল্প গদাই যেদিন আসিয়াছিল, সেই দিনই শুনিয়াছিল। কিন্তু সেইমাত্র কারণে এতদিন ধরিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিচ্ছেদ থাকিবে ইহা কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইল না। সে স্থির করিল, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনও গূঢ়তর কারণ আছে। আর ইহাও গদাই বুঝিতে পারিল না যে মোহিতলালের ন্যায় একজন নব্য যুবক—যাহার [illegible] কিছুমাত্র অভাব নাই—সে বিবাহ করিতে এতদূর অসম্মত কেন। তাহার অপবিত্র সঙ্কীর্ণ মনে নানারূপ সন্দেহ জন্মিতে লাগিল।

গদাই ভাবিল, এ রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। ভিতরের সংবাদ সমস্ত না জানিতে পারিলে সে গোপীকান্তবাবুর উপর আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তাহার উচ্চাভিলাষ ছিল যে কালক্রমে সে গোপীকান্তবাবুকে নিজের মুঠোর মধ্যে আনিবে—তাঁহার প্রধানতম প্রিয়পাত্র হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে—নিজের কণ্টকোদ্ধার করিবে।

তাহাই যদি না হইল তবে কি শুধু সে মাসে পনেরো টাকা বেতন এবং দুই বেলায় দুই সের চাউলের সিধার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে? অতএব ভিতরকার কথাটুকু যেমন করিয়া হউক আদায় করা আবশ্যক। এখন, ভিতরকার কথা বাহির করিতে হইলে এবং সর্ব্বদা কি হইতেছে না হইতেছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সংবাদ রাখিতে হইলে, অন্তঃপুরবাসিনী কোনও ঝিকে হস্তগত করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়, ইহা গদাধর অবগত ছিল। সুতরাং কিছুদিন সেই চেষ্টাতেই সে রহিল।

কমলপুর গ্রামের মধ্যস্থলে গোপীকান্তবাবুদের বাসভবন। বহির্ব্বাটীর সম্মুখে, রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী—তাহার চারিদিকে চারিটি শানে বাঁধা ঘাট আছে। পুষ্করিণীর অপর পারে একটি প্রকাণ্ড মন্দির। তাহাতে নন্দদুলালজীউ বিগ্রহ আছেন। মন্দিরের বাম পার্শ্বে কিয়দ্দূরে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দৈনিক বাজার বসে। পুষ্করিণীর তীরে একখানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ছোট বাড়ী, চারিদিক চেরা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার গায়ে নানাজাতীয় বন্যলতা উঠিয়াছে—তাহার সঙ্গে একটি কেবল উচ্ছেগাছ, বেড়ার সেই অংশটা হলুদবর্ণ ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে। এই কুটীরখানিতে পূর্ব্বে একজন প্রজা বাস করিত—সে এখন পলাতক। অন্য কোথাও সুবিধা না হওয়াতে, বাবুকে বলিয়া কহিয়া গদাধর এই কুটীরখানি নিজের বাসের জন্য লইয়াছে। অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণ পুষ্করিণীর তীরে তীরে গদাই পালের বাসার সম্মুখ দিয়া কখনও বাজারে যাইত, কখনও বা সন্ধ্যার পর নন্দদুলালজীউর মন্দিরে ঘৃতের প্রদীপ বা শীতলের দ্রব্য দিতে যাইত। গদাই পাল দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া, হুঁকা হাতে তামাক খাইতে খাইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত।

গোপন অনুসন্ধানে গদাই জানিতে পারিল, অন্তঃপুরে হরিদাসী নামে একটি ঝি আছে, বাটীতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঝি এবং তাহার প্রতাপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হরিদাসী সদ্গোপকন্যা—গদাই পালেরই স্বজাতি। আরও জানিতে পারিল, সে বালবিধবা, ঘোষপাড়া গ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ঘোষপাড়া কমলপুর হইতে তিন চারি ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। বিধবা হওয়ার অল্পদিন পরেই হরিদাসী বাবুদের বাড়ীতে নিযুক্ত হইয়াছে—তাহার পিত্রালয়ে কেহ নাই—শ্বশুরবাড়ীর লোকেও আর খোঁজ খবর লয় না। গদাই

নিজে অদৃশ্য থাকিয়া এই হরিদাসীকে দেখিল। তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল, মানুষটি নিতান্তই সরল অর্থাৎ বোকা। হরিদাসীর চেহারাটি গোলগাল—অন্য দাসীরা ঠাট্টা করিয়া তাহাকে 'বাতাবী নেবু' বলিত। কপালের মাঝখানে একটি উল্কি আছে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখিয়া শুনিয়া গদাই স্থির করিল এই উত্তম শিকার জুটিয়াছে। ইহাকে একবার ধরিতে পারিলে, নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে সে অনায়াসে জড়াইয়া রাখিতে পারিবে। সুতরাং কি উপায়ে হরিদাসীর নাগাল পাওয়া যায়, সেই চিন্তাতেই গদাই নিযুক্ত রহিল।

চক্রান্তটি সম্পূর্ণভাবে মাথায় যখন খেলিতে লাগিল—গদাধর তখন প্রভুর নিকট একদিন ছুটি লইয়া, ঘোষপাড়া চলিয়া গেল। সেখানে আত্মপরিচয় গোপন করিয়া, হরিদাসীর শ্বশুরালয়ের সমস্ত সংবাদ—পরিবারস্থ সকলের নাম, তাহাদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং অন্যান্য যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া লইল।

পরদিন বেলা দশটার সময় গদাধর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিতেছে—এমন সময় দেখিল অন্তঃপুরের একজন ঝি, তাহার কাঁকালে একটি ধামা, বাজার হইতে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই গদাধর বলিল—"হ্যাঁগা বাছা—তুমি কি বাবুদের বাড়ীর ঝি?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"হ্যাঁ, কেন গা?"

"তুমি কি জাত বাছা?"

"আমরা কৈবর্ত্ত।"

"বলি হ্যাঁ গা—বাবুদের বাড়ীতে কোনও সদ্গোপের মেয়ে ঝি আছে কি?"

"আছে—দুজন আছে। কেন বল দেখি?"

"ঘোষপাড়া জান কি? সেই ঘোষপাড়ায় আমাদের আপনার লোক আছে। আমি শুনেছিলাম, তাদেরই বাড়ীর একটি বউ, এ বাড়ীতে ঝির কায করে। বেচারী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল—স্বামীঘর করতে পায়নি। এমন কেউ আছে?"

"আছে। হরিদাসীর বিয়ে হয়েছিল ঘোষপাড়ায়—জেতে সদ্গোপও বটে—অল্প বয়সে বিধবাও হয়েছিল। তারই কথা জিজ্ঞাসা করছ কি?"

"হ্যাঁ—তার নামটি হরিদাসীই বটে। দেশ থেকে যখন আমি এখানে আসি—তখন পথে দিন দুই ঘোষপাড়ায় ছিলাম। হরিদাসীর শ্বশুরের নাম ছিল নিতাই ঘোষ। আমার বাবা, সেই নিতাই ঘোষের কাছে কিছু টাকা ধারতেন। তা, এখন আমার বাবাও নেই, নিতাই ঘোষও মরেছে। ভাবলাম, পিতৃঋণ রাখতে নেই, ওটা শোধ করে ফেলাই উচিত। বিশেষ যখন হাতে কিছু টাকাও রয়েছে। কিন্তু হরিদাসীর খুড়তুতো দেওর, সে বললে ও টাকা আমরা আর নিয়ে কি করব, তুমি ত কমলপুরে যাচ্চই, সেখানে বাবুদের বাড়ী জ্যাঠামশায়ের পুত-বৌ ঝি-গিরি করে, সেই ধর্ম্মতঃ ওয়ারিশ, তাকেই বরঞ্চ দিয়ে দিও।—তোমাদের হরিদাসীকে বোলো একদিন কোন সময় এসে যেন টাকাগুলো নিয়ে যায়।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "বটে!—আচ্ছা, আমি বলব এখন গিয়ে হরিদাসীকে।"

দুইদিন গেল—চারিদিন গেল—কিন্তু হরিদাসীর দর্শন নাই। সপ্তাহ অতীত হইল, অথচ হরিদাসী টাকা লইতে আসে না!

এবার ৪ঠা কার্ত্তিক দুর্গাপূজা। পঞ্চমীর দিন সেরেস্তা বন্ধ হইল—আমলাগণ ছুটি পাইল। ষষ্ঠীর দিন বৈকালে পাঁচটার পর, শয়নঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া বসিয়া, গদাধর তামাক খাইতেছিল, এমন সময়ে সদর দরজার নিকট হইতে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"নাজির মশাই আছ?"

"কে গা?"—বলিয়া, গদাই একটি ছোট রকম হাঁক দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি একখানি বস্ত্রাবৃত থালা হাতে করিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল। গদাই দেখিল, হরিদাসী। মনে মনে বলিল টোপ গিলেছে। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

"আমি বাবুর বাড়ীর ঝি।"

"বাবুর বাড়ীর ঝি তুমি? এস এস, বস। কি মনে করে ঝি?"

না বসিয়া হরিদাসী বলিল, "বেয়াই বাড়ী থেকে পুজোর তত্ত্ব এসেছিল, তাই মাঠাকরুণ বল্লেন, সকল আমলার বাড়ী বাড়ী কিছু সন্দেশ দিয়ে এস।"

"সন্দেশ এনেছ? তা বেশ বেশ। রাখ ঐখানে।"

ঝি থালা রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাই বলিল, "ভাল কথা, হ্যাঁ গা, তোমাদের সঙ্গে হরিদাসী বলে কেউ চাকরি করে? সদ্গোপের মেয়ে?"

হরিদাসী মনে করিল, হঠাৎ পরিচয়টা নাই বা দিলাম। ব্যাপারটা কি দেখাই যাক না। সুতরাং সে বলিল—"কেন গা?"

গদাই বলিল, "হরিদাসী যে আমাদের আপনার লোক। ঘোষপাড়ায় যাদের বাড়ী হরিদাসীর বিয়ে হয়েছিল, তারা আমাদের কুটুম্ব কিনা। আমার বাবাতে আর হরিদাসীর শ্বশুরে একেবারে হরিহর এক আত্মা ছিল।"

একটু দুষ্টামি করিয়া ঝি বলিল, "হরিদাসীকে কখনও দেখেছিলে?"

"দেখিনি আবার? তবে সে অনেক দিনের কথা। তখনও তার বিয়ে হয়নি—বছর দশ এগারোরটি দেখেছিলাম। আহা কিবে তার চেহারা ছিল—যেন পদ্মফুলটি! কিন্তু ছুঁড়ির কপাল মন্দ—অদৃষ্টে সুখ নেই। বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই বিধবা হয়ে গেল। আমারও কপাল মন্দ। যার সঙ্গে যার ভবিতব্য, কে খণ্ডাবে বল! নইলে আজ কি হরিদাসী বিধবা হয়—না আমাকেই এ কষ্টটা ভোগ করতে হয়?"—বলিয়াই গদাই একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

শেষ কথাগুলির অর্থ হরিদাসী কিছুই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "ও কথা কেন বলছ গা?"

গদাই আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে শুনে আর কি হবে? যা হয়ে গেছে তার ত আর চারা নেই!"

"কি হয়ে গেছে?"

"শুনে কি করবে বল? তুমি এখনি গিয়ে আবার হরিদাসীর কাছে গল্প করবে—তারও মন খারাপ হয়ে যাবে।"

হরিদাসীর কৌতূহল আরও বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিল, "না—আমি হরিদাসীকে বলব না। কখ্‌খনো বলব না। তোমার দিব্যি, বলব না। বল, কি হয়েছিল।"—বলিয়া হরিদাসী সেইখানে উপবেশন করিল।

গদাই তখন বলিতে আরম্ভ করিল—"ঐ যে হরিদাসী, ওর সঙ্গে ত প্রথমে আমারই বিয়ে হবার কথা হয়। সমস্ত ঠিকঠাক—দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েটি বড্ড সুন্দরী দেখে নিতাই ঘোষ আমার বাবাকে ধরে বসলে—বল্লে, 'ভাই, ও মেয়েটির সঙ্গে আমার ছেলে নবীনের বিয়ে দিই—অমন মেয়ে আর পাব না। এ আমাদের গাঁয়ে ঘরে, তুমি থাক সেই হুগলি জেলায়—অতদূরে কুটুম্বিতে করে তোমারও সুখ হবে না। তোমাদের ও সব জেলায় কত

ভাল ভাল মেয়ে পাবে এখন—তোমার ছেলের বিয়ে দিও, কিন্তু ও মেয়েটি হাতছাড়া হলে আমার ছেলের ভাগ্যে অমনটি আর জুটবে না।'—আমার বাবাও ছিলেন ভালমানুষ—চক্ষুলজ্জা এড়াতে পারলেন না। নবীনের সঙ্গে হরিদাসীর বিয়ে হয়ে গেল, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। আমারও অন্য জায়গায় বিয়ে হল। দিনকতক পরে হরিদাসীও বিধবা হয়ে গেল—আমারও বউ মরে গেল। নইলে যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে কি ওই বিধবা হয়, না আমারই এমন দশা হয়? কত সুখের হত বল দেখি? কিন্তু অদৃষ্ট!—অদৃষ্ট!"—বলিয়া গদাই স্বীয় ললাটে করাঘাত করিল।

শুনিয়া হরিদাসী চুপ করিয়া রহিল। গদাইকে দেখিয়া সুপুরুষ বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। হইলে-হইতে-পারিত এই পতিটি হাতছাড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশেষ আপশোষ হইল না। কিন্তু সে যাহা হউক, গদাধর যে কথাগুলি বলিয়াছে, শুনিতে হরিদাসীর বেশ ভালই লাগিয়াছে। গদাই বলিয়াছে অল্প বয়সে পদ্মফুলটির মত তাহার চেহারা ছিল। ছিলই ত। এ কথা শুনিলে কোন্ রমণীর না কাণ জুড়াইয়া যায়? এমন একজন পৃথিবীতে আছে যে হরিদাসীকে পায় নাই বলিয়া হা হুতাশ করিতেছে। থাকুক না তাহার মাথায় টাক—হউক না তাহার গোঁফগুলা ঝাঁটার কাঠির মত—তবু শুনিতে বেশ লাগে।

হরিদাসী ভাবিতে লাগিল, এইবার পরিচয়টা দেওয়া উচিত কিনা। পরিচয় না দিলে, সে টাকার কথাটা কেমন করিয়া উঠিবে? কিন্তু গদাই এইমাত্র যে প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছে, এখনি পরিচয়টা দিতে হরিদাসীর লজ্জাও করিতে লাগিল। তাই সে বলিল, "তোমার স্ত্রী কত দিন মরেছে?"

গদাই অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিল, "বহুকাল।"

"ছেলেপিলে আছে?"

"পুড়িয়ে খেতেও নেই।"

"আর বিয়ে করনি?"

"না।"

"কেন?"

"এই বয়সে আবার বিয়ে? আমার বয়স ধর, পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এই বয়সে কি একটি কচি খুকীকে বিয়ে করে এনে বিপদে পড়ব? সে কথা যাক। তা তুমি একবার হরিদাসীকে আসতে বোলো। একটু কায আছে।"

মুচকি হাসিয়া হরিদাসী বলিল, "তার সঙ্গে তোমার কি কায ?"

"সে আমার কাছে কিছু টাকা পাবে।"

"কত টাকা ?"

"সে হরিদাসী এলেই বলব। সুদে আসলে কত হয়েছে একবার হিসেব করতে হবে।"

ঝি তখন একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আমারই নাম হরিদাসী।"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এইরূপ ভাবটা করিয়া গদাই বলিল, "অ্যাঁ!—তুমিই হরিদাসী ? দেখি দেখি, তোমার মুখখানি দেখি।"—বলিয়া গদাই নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। হরিদাসী একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। গদাই আবার বলিতে লাগিল—"সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক। সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, আর ত দেখিনি, কি করে চিনব বল ?—কপাল!—আমার কপাল!"

হরিদাসী মনে মনে বলিল, 'মিনষের ধাঁচা দেখ!' প্রকাশ্যে বলিল—"টাকাটা যদি দিতে হয়, হিসেবটা দেখ না।"

গদাই বলিল, "বেশ বেশ। বোসো একটু।"—বলিয়া ঘরের মধ্যে হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া আনিল। চশমা পরিয়া, উঠানে দাঁড়াইয়া, খাতাটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিল। শেষে বলিল, "দেখ, তোমার শ্বশুর, আমার বাবাকে চারটি টাকা ধার দিয়েছিলেন। সে আজ বিশ বছরের কথা। যদি টাকায় মাসে সিকি পয়সা করে সুদ ধরা যায়—"

বাধা দিয়া হরিদাসী বলিল, "সিকি পয়সা কি গো ? আমরা দু'পয়সা সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকি—তেমন তেমন হলে চার পয়সাও নিই।"

গদাই বলিল, "আ—হা! যখন তোমার শ্বশুর আমার বাবাকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, তখন সুদের কথা ত কিছু হয়নি। আমি শুধু ধর্ম্ম ভেবেই টাকায সিকি পয়সা করে সুদ হিসেব করেছি বই ত নয়। আচ্ছা না হয় আধ পয়সা করেই ধরি। তা হলে হল মাসে তোমার দু'পয়সা, বছরে ছ'আনা। কুড়ি বছরে ছ'কুড়িং একশো কুড়ি আনা—ছ'টাকা বারো আনা—কেমন ? আসল চার টাকা—সুদে আসলে হল দশ টাকা বারো আনা—কেমন ? তা বারো গণ্ডা পয়সা কিন্তু আমায় রেয়াৎ দিতে হচ্ছে। সোজাসুজি দশটি টাকা পাবে—কি বল ?"

হরিদাসী বলিল, "আমি আর কি বলব ? তোমার ধর্ম্মে যা হয় তাই দিও।"

"বেশ বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমার যদি ধর্ম্মজ্ঞানই না থাকবে, তবে নিজে আমি উপযাচক হয়ে তোমায় ডেকে এনে ঘরের টাকা দেব কেন বল? আমি না বললে তুমি ত এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারতে না। জানলেই বা কি করতে—আর যদি আমার বাপের দস্তখৎ করা তমস্সুকই তোমার হাতে থাকত তা হলেই বা কি করতে? ও টাকা কোন্ কালে তামাদি হয়ে গেছে—তামাদিস্য তামাদি তস্য তামাদি হয়ে গেছে। আমি কিন্তু বড় ধর্ম্মভীরু—চিরটা কাল। গলায় ছুরি দিলেও অধর্ম্ম কার্য্য আমার দ্বারা হবে না। একটু বোসো। দেখি বাক্স খুলে টাকাকড়ি কি আছে।"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গদাই বাক্স খুলিল। বাহিরে আসিয়া বলিল— "তাই ত হরিদাসী—সব টাকা ত এখন হল না। ছটি টাকা আছে, তাই নিয়ে যাও। বাকি টাকা কারু কাছে হাওলাৎ বরাৎ করে, সংগ্রহ করে রাখব এখন, কাল আবার এই সময় এসে নিয়ে যেও।"

হরিদাসী টাকা ছয়টি পাইয়া, একে একে বৃদ্ধাঙ্গুলির টোকা দিয়া বাজাইয়া লইল। আঁচলের খুঁটে সেগুলি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তবে কাল এলে নিশ্চয় পাব ত?"

"পাবে বইকি হরিদাসী। তোমার হক্কের ধন যাবে কোথা?"—বলিয়া গদাই থালাটি আজাড় করিয়া দিল। একটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া বলিল, "বা, বেশ সন্দেশ—খাসা সন্দেশ! দুটো খাবে হরিদাসী?"

হরিদাসী হাসিয়া অস্বীকার করিল। গদাই আরও দুইটা সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তোফা সন্দেশ—চমৎকার সন্দেশ! হরিদাসী— ঐখানে জলের কলসী থেকে একঘটি জল গড়িয়ে দাও না।"

'মিনষের ধাঁচা' সত্ত্বেও, নগদ ছয়টি টাকা পাইয়া হরিদাসীর মন গলিয়াছিল। কলসী হইতে একঘটি জল গড়াইয়া সে গদাধরের কাছে রাখিল। গদাধর একবার হরিদাসীর মুখের পানে চাহিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘটিতে চুমুক দিল। ঘটি নামাইয়া, মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "পোড়া কপালে তবু এটুকু সুখ লেখা ছিল।"

ঝি তখন দরজার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল; একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া, মুচকি হাসিয়া, বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ ॥ গদাই বিধবা-বিবাহ করিবে

হরিদাসী চলিয়া যাওয়া মাত্র, গদাধরের মুখমণ্ডল হইতে ঘনান্ধকার অপসৃত হইয়া গেল এবং কৌতুকের প্রবল উচ্ছ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিল। বাটা হইতে পান মুখে পুরিয়া, হুঁকাটি হাতে ধরিয়া দুলিয়া দুলিয়া সে খুব হাসিতে লাগিল। আপনার মনে মনে বলিতে লাগিল—'খুব আমড়াগেছে করে দিয়েছি মাগীকে। আজ রাত্তিরে আর ওর ঘুম হচ্চে না। শুয়ে শুয়ে খালি মনে করবে—আহা ওর সঙ্গেই যদি আমার বিয়ে হত—তাহলে আজ আমার কত সুখ!—আমার বয়েস হয়েছে বটে—কিন্তু তবু চেহারাখানায় এখনও জলুস আছে।'

গদাই ফুরুৎ ফুরুৎ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার হুঁকা নামাইয়া চিন্তা করিল—'আজ নগদ ছ'টা টাকা জলে ফেলেছি। কোনও পুরুষে আমার বাবার সঙ্গে ওর শ্বশুরের দেখাশুনো নেই—সাফ বলে দিলাম আমার বাবা তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। আবার বিশ বছরের সুদ কড়ায় গণ্ডায়—কেবল হিসেবে বারো গণ্ডা পয়সা মেরে নিয়েছি—মাগী ধরতে পারলে না। তাই ত! টাকাগুলো কি জলেই যাবে নাকি? ছ'টা গেল—আরও চারটে যাবে। তা, বঁড়শিও ত মানুষ জলে ফেলে। দেখি আমার ভাগ্যে কত বড় মাছটা ওঠে। কালকে কিন্তু বাকী চার টাকাই দিচ্চিনে। হেঁ হেঁ তেমন শর্ম্মা নন্। কতদিন ঘোরাব—একটি একটি করে পেটের কথা আদায় করব—একটি একটি করে টাকা দেব। কিন্তু টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে, তার পরে? আরও একটা কিছু কৌশল করতে হবে।'

পরদিন সপ্তমী পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। গদাই প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিল। প্রভুর আলয়ে ও অন্য কয়েক স্থানে প্রতিমা দর্শন করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ কাটাইল। বৈকালে হরিদাসীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া দুই তিন ছিলিম তামাক পোড়াইয়া ফেলিল, কিন্তু সে দর্শন দিল না। পরদিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু হরিদাসী কই? নবমী পূজার দিন একাকী বসিয়া গদাই চিন্তা করিতেছিল, বেলা প্রায় এগারটা, সদর দরজা হইতে হরিদাসীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"কই গো, সুদের সে টাকা কটা আজ দেবে?"

গদাধর বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "হরিদাসী? এস এস।"

হরিদাসী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল, "বোসো না—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"না এখনি যেতে হবে। বেশীক্ষণ বসবার অবকাশ নেই।"

"বেশীক্ষণ না বসতে পার, একটু ত বোসো। কিন্তু তোমার কি আক্কেল বল দেখি? রোজ তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি—তুমি আস না।"

হরিদাসী দেখিল, মিনষে আবার ধাঁচা আরম্ভ করিতেছে। বসিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "পাওনাদারের জন্যে দেনদার কে কবে হা পিত্যেশ করে বসে থাকে?"

মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া গদাধর বলিল, "তুমি হাসবে বইকি! তোমাদের বয়সে আমরাও সকল কথায় অমনি করে হাসতাম। তুমি আমায় আশা দিয়ে নৈরাশ করেছ। এ ক'দিন আমার যে কি কষ্টেই গেছে—তা আমিই জানি আর ধর্ম্মই জানেন।"

হরিদাসী হাসি লুকাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি কষ্ট?"

"সে আর তোমায় কি হিসেব দেব? আমি তিনদিন আজ খাইনি জান?"

"তিনদিন খাওনি? কেন?"

"একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই জন্যে খাইনি।"

এবার হরিদাসীর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল—স্বপ্ন দেখিয়াছিল সেই জন্য তিনদিন খায় নাই! নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোনও অদ্ভুত রহস্য আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি স্বপ্ন?"

মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া গদাই বলিল, "সে তোমায় বলব না। তুমি আবার পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে।"

হরিদাসী ভাবিল—তবে নিশ্চয়ই তাই। হয়ত কোনও দেবী স্বপ্ন দিয়াছেন, তিনদিন উপবাস করিয়া অমুক স্থান খুঁজিলে অমুক ঔষধ পাইবে—কিম্বা অমুক স্থান খুঁড়িলে টাকা পাইবে—কিম্বা ঐরূপ একটা কিছু। অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে বলিল—"কাউকে বলব না। জিভ কেটে ফেললেও না।"

গদাই গম্ভীর ভাবে বলিল, "মেয়েমানুষকে বিশ্বাস কি?"

হরিদাসী বলিল, "কেন গা? মেয়েমানুষ কি এমনি হাল্কা? এমনি অপদার্থ? মেয়েমানুষ আছে বলেই সংসার চলছে।"

গদাধর একটু ইতস্তত: করিবার ভাব দেখাইয়া বলিল, "কাউকে বলবে না, দিব্যি কর! আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর।"

হরিদাসী একবার চকিতনেত্রে দরজার পানে চাহিয়া দেখিয়া, গদাই পালের পা ছুঁইয়া দিব্য করিল।

গদাই তখন বলিতে আরম্ভ করিল—তাহার স্বর অত্যন্ত মৃদু ও কোমলতা মাখা—"দেখ হরি, তুমি ত সেদিন সন্ধ্যেবেলা টাকা নিয়ে চলে গেলে। আমি এইখানে শুয়ে শুয়ে তোমায় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর স্বপ্ন দেখলাম—শোন।"

ঔৎসুক্যের সুরে হরিদাসী বলিল, "বল না।"

কণ্ঠ অত্যন্ত নীচু করিয়া গদাধর বলিল, "স্বপ্ন দেখলাম যেন তুমি রান্নাঘরের ঐ চালাখানিতে বসে, হাঁড়ি থেকে আমার জন্যে ভাত বাড়ছ, তোমার পরণে যেন একখানি চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, সীঁথিভরা সিঁদূর, হাতে হাঙ্গরমুখো বালা। ভাত বেড়ে যেন আমায় ডাকলে—আমি গিয়ে খেতে বসলাম। এটি খাও, ওটি খাও বলে কত যত্ন করে তুমি যেন আমায় খাওয়াতে লাগলে। যখন আধ-খাওয়া হয়েছে তখন চট করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে চুপ করে জন্তুটির মত বসে রইলাম। অন্যদিন রাত্রে উনুন ধরাই—রাঁধি—খাই—সেদিন আর ইচ্ছে হল না। তুমি সন্দেশ দিয়ে গিয়েছিলে, তাই দুটো মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে মনে হল—এমনি আমার পোড়া অদৃষ্ট!—এ সবই ত হতে পারত। তোমারই সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, সমস্তই ঠিকঠাক। তুমিই ত বারোমাস তিরিশ দিন আমায় রেঁধে ভাত দিতে। সমস্ত রাতই কেবল মনে মনে ঐ কথা হেঁচড় পাঁচড় করতে লাগল। তার পরদিন প্রতিমে দর্শন করে এসে, উনুন জ্বেলে রাঁধতে গেলাম।আর সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। রাঁধা বাড়া আর হল না। দুটি সন্দেশ খেয়ে একঘটি জল খেলাম, মনের খেদে চুপ করে শুয়ে রইলাম। এবেলা দুটি সন্দেশ—ওবেলা দুটি সন্দেশ—এই খেয়ে তিনদিন জীবন ধারণ করে আছি।"

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া হরিদাসী এই প্রণয়-বিহ্বল কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। শেষ হইলে বলিল, "বলি সে কি গা! তিনদিন খাওনি?"

গদাই বলিল, "তোমার দিব্যি, খাইনি। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি"—বলিয়া হরিদাসীর একখানি হাত গদাই নিজ হস্তযুগলের মধ্যে বন্দী করিল।

হরিদাসীর মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল। গদাইয়ের এ কার্য্য আর ধাঁচা বলিয়া মনে বোধ হইল না। নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া লইবারও সে কোনও চেষ্টা করিল না। ধীরে ধীরে বলিল, "এ কোন্ দেশী কথা গো? এমন করে না খেয়ে কতদিন থাকবে?"

ছলছল চক্ষু দুইটি মৃত্তিকার পানে স্থাপন করিয়া গদাই বলিল, "যতদিন না তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এসে আমায় ভাত রেঁধে দেবে। আজকাল ত বিধবার বিয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী নিজের হাত ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া সেখানি নিজের গালে রাখিয়া বলিল, "ওমা, কি ঘেন্নার কথা! বিধবার বিয়ে কি গো? আমাদের জেতে কি তা হয়? সে ত ছোট নীচ জেতের ঘরেই হয়ে থাকে।"

গদাই অনুযোগের স্বরে বলিল, "পৃথিবীর কোন খবরই রাখ না? এখন যে ভাল ভাল বামুন কায়েথের ঘরে বিধবা-বিয়ে হচ্ছে।"

হরিদাসী কহিল, "অমন অধর্ম্মের কথা বোলো না। বামুন কায়েথের ঘরে বিধবার বিয়ে হলে কি ধর্ম্ম থাকে?"

গদাই বিজ্ঞভাবে বলিল, "একবার কলকাতায় গিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে ঐ কথাটা বলে দেখ না!"

"পণ্ডিতে কি বলেছে?"

"বলেছে বিধবার বিয়ে শাস্ত্রে আছে। হলে কোনও দোষ নেই।"

একটু নীরব থাকিয়া হরিদাসী বলিল, "হ্যাঁ গা সত্যি নাকি?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যে বলছি, হরি?"

শুনিয়া হরিদাসী নীরবে বসিয়া রহিল। গদাই পালও মুখখানি বিমর্ষ করিয়া, চালের বাতার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "তা হলে কি বল হরি? আমায় বিয়ে করবে? বাপের বুদ্ধির দোষে আমি আমার হক্কের ধনে বঞ্চিত হয়েছি।"

হরিদাসী কিছুই বলে না। গদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল—"ছি, ও কথা আমায় বোলো না। তুমি নাও—খাও। অমন করে উপোস করে থেক না।"

"ও কথা তোমায় বলব না তবে কাকে বলব হরি? ত্রিসংসারে আমার কে আছে? ন মাতা ন পিতে ন বন্ধু। তুমি যে রাজি হবে না সে আমি আগে

থেকেই জানি। আমার কি দেখে ভুলবে ? রূপ আছে, না গুণ আছে, না অর্থ আছে ? আচ্ছা রাজি না হও, না-ই হবে। আমায় আর খেতে বোলো না— আমার পক্ষে মিত্যুই ভাল।”—বলিয়া গদাই মাথাটি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

হরিদাসী সান্ত্বনার স্বরে বলিল, “বেলা হল, ওঠ। রাঁধবার যোগাড় কর। আমি না হয় উনুনটা ধরিয়ে দিই। আমার বেশী সময়ও নেই, শীগ্‌গির যেতে হবে।”

গদই বলিল, “না হরিদাসী, আর উনুন ধরাতে হবে না। আমি ত প্রতিজ্ঞেই করেছি—তুমি এসে যদি কখনও রেঁধে দাও তবেই খাব, নয় ত খাব না।”

“তা এ বেলা ত আমার সময় নেই।”

গদাই যেন আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “তবে ও বেলা ?—ও বেলা এসে রেঁধে দেবে হরি ?”

“দেখি যদি পারি ত আসবো। এখন এ বেলা ত তুমি রাঁধ খাও।”

“কখনই না। তোমার সেই সন্দেশ খেয়ে আমি জল খাব। তাও কি খেতাম ?—আমার হরি এ সন্দেশ দিয়ে গেছে—এই কথা মনে হয় তাই খাই।”

“আচ্ছা তবে গোটাকতক বেশী করে খেও। নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে নেই। আমি সন্ধ্যের পর চুপি চুপি এসে তোমায় রেঁধে খাইয়ে যাব এখন।”

অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার ভান করিয়া গদাই বলিল, “বাঁচালে হরি—আমার দেহে প্রাণ এল। কিন্তু সে কথাটার উত্তর দিলে না ত।”

“কোন্ কথাটার ?”

“আসল কথাটার। বিয়ের কথাটার।”

“সে কথা ও বেলা হবে এখন।”—বলিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ স্বপ্নের সফলতা

হরিদাসী চলিয়া গেলে গদাধর মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বলিল, ‘মাগীর সঙ্গে আচ্ছা ন্যাকরা জুড়ে দিয়েছি যা হোক। মনটা বিলক্ষণ ভিজেছে, তার আর সন্দেহ নেই। যখন বাড়ী ঢুকলো— সুদের টাকা কটা দেবে কি ?—বলতে বলতে ঢুকলো। কিন্তু মা

প্রজাপতির এমনি মাহিত্ম, বিয়ের কথা শুনে টাকার কথা আর তার মনেই পড়ল না।'

কলিকায় হাত দিয়া গদাধর দেখিল আগুন নিবিয়া গিয়াছে। তামাক সাজিতে সাজিতে মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"কে ধনি! তুই ভ্রমিস গোকুলে।
অকুলে—এ-এ-এ—
হয়েছিস আকুলে।
কে-এ-এ—ধনি তুই—আ।"

আহা! কি গানই বেঁধে গেছে দাশু রায়!

তামাক টানিতে টানিতে গদাই রান্নার চালায় গেল। উনুন ধরাইবার জন্য একখানা কাঠ হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল—'এই মরেছে! নিজেকে ত আচ্ছা বিপদে জড়িয়েছি দেখছি। এখন রাঁধি কি করে? উনুন জ্বাললেই ত ধোঁযা উঠবে—কি জানি যদি মাগী দেখতে পায়? তা হলেই মোকদ্দমা ফেঁসে গেল। এই ঠিক দুকুথুর বেলা—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—কি খেয়ে প্রাণধারণ করি?'

কাঠখানি ফেলিয়া, হাঁড়ি খুলিয়া গদাই দেখিল, গতরাত্রির কিছু বাসি ভাত ও তরকারী অবশিষ্ট আছে। স্নান করিয়া আসিয়া, সেই কটি খাইয়াই, কোনক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

আহারান্তে শয্যায় বসিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল—'না হয় একবেলা আধপেটাই খেলাম। কি করা যাবে? ও বেলা মাগীর কাছ থেকে অনেক কাযের কথা হাঁসিল করে নেব এখন। দাশু রায়ের ছড়াতেই ত রয়েছে—দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?—একটু কষ্ট না করলে চলবে কেন?'

সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে হরিদাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে হইতে ক্ষুদ্র অথচ পরিপুষ্ট একটি মোচা বাহির করিয়া বারান্দায় রাখিল।

গদাই মোচাটি হাতে করিয়া বলিল, "বাঃ—দিব্যি মোচাটি ত! কোথায় পেলে হরিদাসী?"

হরিদাসী বলিল, "তুমি মোচা খেতে ভালবাস?"

"বাসিনে আবার? খুব ভালবাসি। আজ ছ' বচ্ছর মোচা খাইনি। কোথা থেকে আনলে?"

"আসবার সময় অন্দরের বাগান থেকে ভেঙ্গে নিয়ে এলাম। কিন্তু রান্নার যোগাড় যন্ত্র কই? কিছুই ত দেখছিনে।"

গদাই এমন ভাবটা প্রকাশ করিল যেন হরিদাসীকে দেখিয়াই সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। বলিল, "এখন তুমি এসেছ হরিদাসী, এখন রান্না হলেও হয় না হলেও হয়।

হরিদাসী বলিল, "নাও—নাও—আর ঠাট্টা করতে হবে না। রান্নার যোগাড় করে ফেল। ডাল চড়িয়ে দিয়ে মোচাটা কুটি। আমায় আবার রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। গিন্নী কি আসতে দেয়? ও পাড়ায় বোনঝি এসেছে এই বাহানা করে, কত ছিষ্টি করে তবে ছুটি নিয়ে এসেছি।"

গদাই তখন রান্নার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল। ভাণ্ডার হইতে চাউল, ডাল, নুন, তেল, মসলা, তরকারী প্রভৃতি বাহির করিয়া দিল। কাঠ ও ঘুঁটে ধরাইয়া উনুন জ্বালিয়া দিল। হরিদাসী উনুনের কাছে বসিয়া রন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। গদাই কিছু দূরে একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া মনের সুখে তামাক খাইতে লাগিল।

গল্পে গল্পে, কথার কৌশলে, হরিদাসীর অনেক সংবাদই গদাধর আদায় করিয়া লইল। সে বিধবা হওয়া অবধি কুড়ি বৎসর কাল এ বাড়ীতে চাকরি করিতেছে। তাহার উপর সকলের অত্যন্ত বিশ্বাস। চাকরি করিয়া হরিদাসী কিছু টাকাও জমাইয়াছে। তাহার কতক উচ্চ সুদে ধার দেওয়া আছে—কতক একটি পিতলের ঘটির মধ্যে করিয়া, কোনও স্থানে পোঁতা আছে। কোথায় পোঁতা আছে জানিবার জন্য গদাধরের বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিল। অথচ পাছে হরিদাসী সন্দেহ করে এই জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না। কিন্তু সবশুদ্ধ কত টাকা, তাহা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিল, "সুদ ফেলে রাখতে নেই! সুদ ফেলে রাখলে কি হয় জান? শেষ-কালে সুদও যায় আসলও যায়। ক্রমেই ভারি হয়ে পড়ে কিনা, খাতক আর সামলাতে পারে না। সুদটা মাসে মাসে আদায় হয়ে গেলে খাতক মনে করে আসলও কিছু শোধ করে দিই—তা হলে আসছে মাসে সুদ কম দিতে হবে। ফি মাসে সুদ আদায় করে যাচ্ছ ত?"

হরিদাসী বলিল, "হ্যাঁ—তবে সবাই মাসে মাসে দেয় না। ছ'মাস চার মাসের জমলে, কিছু দেয়, কিছু বাকী রাখে। আবার কেউ কেউ মাসে মাসে ফেলেও দেয়।"

"বেশীর ভাগই বোধ হয় অনাদায়? আচ্ছা, গেল মাসে কত আদায় করলে?"

"গেল মাসে?—দেখি হিসেব করে। একজনের কাছে আট আনা, একজনের কাছে এক টাকা। একজনের কাছে দশ আনা। আর একজন দিয়েছে পাঁচসিকে। কত হল?"

গদাই বলিল, "তিন টাকা ছ' আনা। মোটে তিনটি টাকা ছ' আনা! সবাই যদি মাসে মাসে ঠিক ঠিক সুদটি দেয়, তাহলে বোধ হয় পাঁচ ছ' টাকা পাও?"

"অত হবে না। তবে হ্যাঁ—চারটে টাকা পাই।"

"ওঃ—তা হলে আদায় কিছু মন্দ নয়। যাদের দিয়েছ তারা বোধ হয় লোক ভাল?"

"ভাল লোক দেখেই ত দিই।"

"তা হলে এক কায কর না। যে টাকাগুলো পোঁতা আছে—সেগুলোও উঠিয়ে এনে ধার দিলেই ত হয়। তা হলে মাসে আরও কোন্ চারটে না পাও?"

হরিদাসী বলিল, "চারটে টাকা কি গো? মোটে চারটে টাকা?"

"তবে?"

"পাঁচ ছ'টাকা ত পাই-ই যেমন করে হোক। কিন্তু আমি মনে ভাবি যে, সব টাকাগুলি পরের হাতে দেব—আমি মেয়েমানুষ—যদি আদায় না হয়, তখন শেষে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদব? মানুষের শরীর আছে অশরীর আছে, এ চাকরি যদি না-ই থাকল, তখন খাব কি?"

গদাই মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ সে কথা ঠিক। তবে সে টাকাটা পোঁতাই থাকুক। তাকে আর তুলে কায নেই। বেশ ভাল জায়গায় আছে ত?—খুব সাবধান, আমাকে যা বললে তা বললে, আর কাউকে বোলো না। কেউ টের না পায়।"

"নাঃ—আমি কি তেমনি বোকা?"—বলিয়া হরিদাসী একটা বাটি করিয়া মশলা গুলিতে লাগিল।

গদাধর মনে মনে হিসাব করিল—'সেদিন বলেছিল আমরা দু' পয়সা সুদে টাকা ধার দিই—তেমন তেমন হলে চার পয়সাও নিই। গড়ে যদি টাকায় আড়াইটে পয়সা করেও সুদ হয়, তা হলে পঁচিশ টাকার হল এক টাকা আন্দাজ, একশো টাকায় চার টাকা। শ' খানেক টাকা ধার দেওয়া আছে দেখছি—আর শ' দেড়েক টাকা পোঁতা আছে। এখন নয়—কিছুদিন যাক—ঐ পোঁতা টাকাটা তুলিয়ে এনে নিজের বাক্সজাত করতে পারলে টাকাটা হেফাজতে থাকে।'—এই মনে করিতে করিতে গদাধরের মুখে অল্প পরিমাণ হাসি দেখা দিল, কিন্তু আলোকের ক্ষীণতা বশতঃ হরিদাসী তাহা দেখিতে পাইল না।

তারপর ক্রমে ক্রমে বাবুদের, গৃহিণীর, কথা উঠিল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ছোটবাবু বিয়ে করে না কেন?"

"সংসার ধর্ম্মে মন নেই—তাই করে না। ছোটবাবু আমাদের দেবতুল্যি মানুষ। রাতদিন পুজো-আচ্ছা নিয়েই আছে। বিয়ের ত সমস্তই ঠিকঠাক হয়েছিল। কলকাতা থেকে ছোটবাবুকে দেখতে এসেছিল—তারা খুব বড়লোক, রাজা বললেই হয়। কিন্তু ছোটবাবু তাদের যা মুখে এল তাই বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। সেই হতে দুই ভায়ে মনান্তর—কত্তা গিন্নীতে লাঠালাঠি।"

অতিমাত্র ঔৎসুক্যের সহিত গদাই বলিল, "কত্তা গিন্নীতে কি হল আবার?"

"বলি তবে"—বলিয়া হরিদাসী মশলার গোলা দালের হাঁড়িতে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার মুখে সরা চাপা দিয়া পা দুটি ছড়াইয়া, নিজের মুখ খুলিয়া দিল—

"দেখ, ঐ যেদিন কলকাতা থেকে তারা ছেলে দেখতে এসেছিল, সেদিন দেখলাম গিন্নী সারাদিন মুখভার করে বেড়ালে। সমস্ত দিন কারু সঙ্গে বাক্যি কইলে না। অন্যদিন বড়বাবু অন্দরেই এসে খাওয়া দাওয়া করেন, উপরে গিয়ে শোন্; এ দিন দেখলাম বাবু বাইরেই খেলেন, বাইরেই শুলেন। আমি মনে মনে বললাম, এদের হল কি? লক্ষণ ত ভাল দেখছিনে—কুরুক্ষেত্র হবে একটা বোধ হয়।"

গদাই তাহার ছুঁচলো মুখটি আরও গুটাইয়া বলিল, "বটে!—কি হল তার পর?"

"শোন না বলি। আমি মনে মনে এঁচে রেখেছি, এদের কি হল, আড়ি পেতে শুনতে হবে। সন্ধ্যের পরেই দেখলাম, কত্তা বাড়ীর মধ্যে এসে উপরে

গেলেন, গিন্নীও গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করে দিলেন। আমি বিছানা করবার নাম করে উপরে গিয়ে, পাশের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। কত্তা বললেন আমি বাগানবাড়ীতে যাচ্ছি। গিন্নী প্রথমে কিছুতেই যেতে দেবে না, শেষে বললে যদি যাবে ত আমাকেও নিয়ে চল, তুমি বাগানে গিয়ে কি কর আমি দেখব। বাবু ত রাগারাগি করে চলে গেলেন, তার পর গিন্নী ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে কেঁদে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল। বললে, তুমি যে ওবেলা তোমার দাদাকে বলছিলে যে তিনি যদি তাঁর মন্দ সংসর্গ না ছাড়েন তবে তুমি জোর করে ছাড়াবে, সে কথার অর্থ কি? কে তাঁর মন্দ সংসর্গ জুটেছে, তিনি কি করেন, খুলে আমায় বল। এই কথা শুনে ছোটবাবু ত রেগেই খুন। বললে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার এ সব সাত সতেরো জানবার দরকার কি? বলে, ছোটবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

এই কথা শুনিয়া গদাধর উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল, "বটে!"—আনন্দে তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। ব্যাপারটা কতক বুঝা যাইতেছে বইকি। শুধু বিবাহ করিতে চাহিতেছে না বলিয়াই ভাইয়ে ভাইয়ে বাক্যালাপ বন্ধ—ইহাও কখন হয়? কারণটা এইবার স্পষ্ট হইল। এইবার সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করিবার, কৌশল খাটাইবার, অবসর পাইবে। বলিল—"তার পর আর কিছু কোন দিন শুনেছ?"

হরিদাসী বলিল, "বাবু দু' দিন বাগানবাড়ীতে রইলেন, বাড়ী এলেন না। এ দিকে গিন্নী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। আমাকে ডেকে বললেন, হরিদাসী, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে, বাবু কেমন আছেন বাগানবাড়ীতে গিয়ে দেখে আসতে পারিস? আমি বললাম—ওমা, সে যে অনেক দূর, পেরায় আধক্রোশ পথ, একলা মেয়েমানুষ কি করে যাব গো? গিন্নী বললেন—একজন দরোয়ানকে বলে পাঠাচ্ছি, তোকে সঙ্গে করে নিয়ে বাগানবাড়ীতে পৌঁছে দেবে এখন। আমি বললাম, আচ্ছা! খাওয়া দাওয়া করে, পাণ চিবুতে চিবুতে, দরোয়ানটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম। পৌঁছে, দরোয়ান তার গামছাখানি বিছিয়ে বাইরের ফটকের থামে ঠেস দিয়ে বসল, আমি সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি উপরের সিঁড়িতে ওঠবার রাস্তায়, একখানা কম্বল বিছিয়ে, রাস্তাটি জুড়ে এক তাড়কা রাক্কুসী শুয়ে আছে।"

গদাই বিস্ময়ে বলিল, "অ্যাঁ?"

হরিদাসী একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যিই কি আর রাক্কুসী ? ওটা উপমা দিয়ে বললাম। এক মাগী খোট্টা বুড়ী শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার কাছে একটি হুঁকো রাখা আছে, সে হুঁকোর গায়ে আবার একটি চিমটে বাঁধা। পায়ের কাছে একটা মালসায় করে খানিকটে আগুন, একটা মানকচুর পাতার উপর টিকে তামাক। আমি পা টিপে টিপে নীচে এঘর ওঘর সব খুঁজে দেখলাম, কোথাও জনমনিষ্যি নেই। তখন ভাবলাম, উপরে যাই। একটু ভয়ও হতে লাগল। মনকে দেঢ়ো করে বললাম—নিজের মনিবের বাড়ী, তার আর ভয় কিসের ? তুড়ুক করে বুড়ীকে ডিঙ্গিয়ে, টুক টুক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। উপরে একটা মস্ত হল্, তার দুধারে অনেকগুলো কামরা। হল্ পার হয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম, নদীর ধারে বসে বাবু মাছ ধরছেন। ভাবলাম তবে নীচে নেমে বাবুর কাছে গিয়ে কথাবার্ত্তা কই। বারান্দা থেকে হলে ঢুকেছি—মাঝামাঝি এসেছি—মা গোঃ—এখনও ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে !"

গদাই বলিল, "কি—কি—হরিদাসী ? কি হয়েছিল ?"

"মাঝামাঝি এসেছি, এমন সময় কোণের দিক থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম, কে যেন কাঁদছে। অমনি আমার গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল।"

"কান্নার শব্দ ?"

হরিদাসী বলিল, "হ্যাঁ গো। ঠিক যেন উহুঁহুঁহুঁ—এই রকম একটা বিতিকিচ্ছি শব্দ। মনে করলাম ঠিক দুকুখুর বেলায়, কোথায় কোন উপদেবতা আছেন, এই তেপান্তর মাঠে নির্জ্জন পুরী, কেন মরতে এলাম! আমার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। সেই শব্দ আবার কাণে এল—উহুঁহুঁহুঁ—তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম। তখনও সেই বুড়ী শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে যেই তাকে ডিঙ্গিয়ে নামতে গেছি—বললে না পিত্যয় যাবে—ঠিক যেন পিছন থেকে কে আমার পা-টা ধরে টেনে দিলে। আমি অমনি সেই তাড়কা রাক্কুসীর ঘাড়ে দড়াম করে আছাড়। বুড়ী অমনি হাঁউ মাউ খাঁউ করে উঠে পড়ল। আমি আধশোয়া আধবসা গোছ করে, বাঁ হাতে ভর দিয়ে মাথাটি তুলে দেখি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বুড়ী আমার দিকে চেয়ে আছে। দাঁতগুলোও সব নেই। একটা করে দাঁত, একটা করে ফাঁক। চুলগুলো মুড়ো ঝাঁটার মত মাথার

চারিদিকে যেন সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন বাঘের মত জ্বলছে। তার সঙ্গে চোখোচোখী হতেই মাগী 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে লাগল। আমি তখন উঠে বসে, মাগো বাবাগো বলে কাঁদতে লাগলাম। হাতের দুটো কুনুই আর এই নাকটা একেবারে ছেঁচে গিয়েছিল। তার গোলমাল শুনে খোট্টা মালী এসে উপস্থিত। আমায় বললে—কে রে মাগী ? কোথা থেকে এসেছিস ?—অত যে আমার লেগেছিল, তবু খোট্টা মালীর মুখে ঐ কথা শুনে আমার রাগ হয়ে উঠলো। বললাম—তুই কে রে মুখপোড়া আমায় মাগী মাগী করিস ? যত বড় মুখ, তত বড় কথা ? বাবুকে বলে দূর করে তাড়িয়ে দেব, জানিস ?—মালী বললে—তুই চোর। চল্ তোকে বাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাই। আমি বললাম—খপর্দ্দার আমার গায়ে হাত দিসনে। চল্ বাবুর কাছে যাচ্ছি।—তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে যেতেই সে বললে—বাবু একঠো চোর পাকড়া।—চুপ কর্ মুখপোড়া মিন্‌ষে—বলে তাকে ধমক দিয়ে, বাবুকে প্রণাম করে বললাম—আপনার শরীর কেমন আছে জানবার জন্যে মাঠাকরুণ পাঠিয়ে দিলেন—তিনি বড় ভাবছেন। শুনে বাবু আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে রইলেন। বললেন—বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলি ? আমি বললাম আপনাকে খুঁজছিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন—উপরে গিয়েছিলি ? আমি বললাম—আজ্ঞে না। তাঁর চোখ-মুখ দেখে এমনি ভয় হল যে ওটা অস্বীকার করে গেলাম। বললাম—উপরে যাব ভেবেছিলাম, একটা বুড়ী সেখানে শুয়েছিল, তার গায়ে পা ঠেকে দড়াম করে পড়ে গেলাম। শুনে বাবু বললেন—যা, বাড়ীতে বলিস, আমি ভাল আছি।"

গদাধর বলিল, "বাড়ী ফিরে এলে ?"

"হ্যাঁ। ফটক থেকে বেরিয়ে দেখি, দরওয়ানটা সেই থামে হেলান দিয়ে বসে দিব্যি নিদ্রে দিচ্ছে। তাকে উঠিয়ে, সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী এলাম। এসে মাঠাকরুণকে বললাম—মাঠাকরুণ, বাবু ত ভাল আছেন দেখে এলাম, কিন্তু বড় বিপদ ! মাঠাকরুণ চোখ কপালে তুলে বললেন, কেন কি দেখে এলি হরিদাসী ?—আমি বললাম—মা, মনে হলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হানাবাড়ী মা, হানাবাড়ী। বাবুকে সেখানে থাকতে দিওনি। বারোমাস বাড়ী বন্ধ থাকে, সন্ধ্যে পড়ে না, শাঁক বাজে না, চৌকাঠে কেউ জল দেয় না, ও রকম ত হবারই কথা। সে বাড়ীতে মা, উপদেবতা আছেন।—বলে, সব কথা গিন্নীকে খুলে বললাম।"

"শুনে গিন্নী কি বললেন ?"

"কিছুই বললেন না—চুপ করে রইলেন। সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই বাবু বাড়ী এলেন। অন্দরে এসে উপরের ঘরে গেলেন। একটা কাযের অছিলে করে, আমিও উপরে গেলাম। কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলাম, কর্ত্তা-গিন্নীতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। চুপি চুপি কথা—সব কথা শুনতে পেলাম না। কেবল এইটুকু কাণে গেল, বাবু রেগে বলছেন, মোহিত যদি আমার কোন রকম অনিষ্ট করে, তবে আমি তার শক্ত সাজা করব—ভাই বলে রেয়াৎ করব না।"

গদাধর মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। বাগানবাড়ী সম্বন্ধে হরিদাসীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। বাড়ীটি কোন দ্বারী, উপরে কয়খানা ঘর, সেগুলির অবস্থান কিরূপ ইত্যাদি। কিন্তু হরিদাসী অত্যন্ত সামান্য সংবাদই বলিতে পারিল। গদাধর স্থির করিল, এ বিষয়ের তদন্ত করিতে হইতেছে।

ক্রমে অন্ন প্রস্তুত হইল। গদাধর খাইতে বসিল। হরিদাসী সযত্নে তাহাকে পরিবেষণ করিতে লাগিল। পাতের কাছে বসিয়া 'এটি খাও ওটি খাও' বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাই পালের তথাকথিত স্বপ্ন সফলতা লাভ করিল।

আহারান্তে আচমন করিয়া গদাই বলিল, "হরিদাসী, তুমি আমার পাতে প্রসাদ পাও।"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মত হয় না। গদাই অনেক পীড়াপীড়ি করিল। অবশেষে রাগ করিবার উপক্রম দেখিয়া হরিদাসী বলিল, "এমন একগুঁয়ে মানুষও ত কখন দেখিনি। আচ্ছা, রাগ কোরো না, চারটি খাচ্ছি।"—বলিয়া, অল্প অন্ন ব্যঞ্জন হাঁড়িতে যাহা অবশিষ্ট ছিল, পাতে ঢালিয়া লইয়া আহারে বসিল। গদাই নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া পাণ সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

আহারান্তে হরিদাসী বিদায় চাহিল।

গদাই বলিল, "কই, সে কথার ত উত্তর দিলে না ?"

"কোন কথার ?"

"আসল কথার ? বিয়ের কথার ?"

হরিদাসী মাথাটি নীচু করিয়া আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "তা—তুমি যা ভাল বোঝ।"

গদাই বলিল, "তা হলে তোমার মত আছে ?—বেশ বেশ ! এইবার তবে দুজনে একদিন বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। কবে আসবে বল দেখি ?"

"সুবিধে পেলেই আসব"—বলিয়া হরিদাসী দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

গদাধর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিল, "যেন ভুলো না।"

হরিদাসী বলিল, "আমার একটা কথা কিন্তু তোমায় রাখতে হবে।"

"কি কথা হরিদাসী ?"

"কাল থেকে তুমি আর উপোস করে থাকতে পাবে না। দুবেলা রাঁধবে, খাবে। বুঝলে ?"

গদাই সম্মত হইল। হরিদাসী তখন নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ বাগানবাড়ী

কমলপুর গ্রামের পূর্ব্বসীমা দিয়া ভুঁইচোরা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীটি শীর্ণকলেবরা, কিন্তু বর্ষাকালে প্রায়ই ইহাতে অপরিমিত জলোচ্ছাস হইয়া থাকে। সে সময় উভয় কুলস্থিত অনেক ভূমি ভাঙ্গিয়া লইয়া স্বীয় কুক্ষিসাৎ করে বলিয়াই নদীটির নাম ভুঁইচোরা হইয়াছে।

এই নদীর তীরে, গ্রাম হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে, গোপীকান্তবাবুর বাগানবাড়ী। কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমির উপর বাগানখানি—চতুর্দ্দিকে কোথাও কোথাও বা বাঁশের বেড়া আছে, কোথাও কোথাও বা ঘন ফণিমনসার জঙ্গল বেড়ার কার্য্য করিতেছে। বাড়ীটি দ্বিতল—ঠিক নদীর উপরেই। বাড়ীর প্রান্ত হইতে নদীর জল অবধি সিঁড়ি গাঁথা। আম, জাম, নারিকেল, আতা, কলা, পীচ ও লেবুগাছে বাগানখানি পরিপূর্ণ। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অংশটুকুতে কেবল ফুলগাছ। বড় গাছের মধ্যে বকুল, শিউলি, শ্বেত ও রক্ত করবী, চাঁপা ও কুর্চ্চি ফুলের গাছই অধিক। এখন হেমন্তের প্রারম্ভে বিস্তর গোলাপ ফুটিয়াছে। রজনীগন্ধাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরিদাসীর সহিত কথোপকথনের পর হইতে গদাই পাল নানা প্রকার চিন্তা করিতেছে। বাগানবাড়ীতে হরিদাসী যে কান্না শুনিয়া আসিয়া-

ছিল, তাহা ভূতের কান্না বলিয়া কিছুতেই তাহার বিশ্বাস হইতেছে না। অবশ্য ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গদাধর সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান—কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে মনুষ্য-বসতিতে ভূত আসিয়া কেন যে কান্না জুড়িয়া দিবে, তাহার কোনও কারণ গদাধর নির্ণয় করিতে না পারিয়া স্থির করিয়াছে, ঐ বাড়ীতে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ বন্দী আছে। জমিদারী রক্ষা করিতে হইলে মাঝে মাঝে ওরূপ দুই একটা বে-আইনি কার্য্য করিতে হয়—গদাধরও পূর্ব্বে করিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বন্দী কে? আর, বাগানবাড়ীতেই বা বন্দী কেন? এবং যে বাড়ীতে এরূপ একটা লোক বন্দী আছে, সে বাড়ীতে বাবুই বা দুই তিন দিন স্বয়ং বাস করিলেন কেন? সে বন্দী স্ত্রীলোক নহে ত? ছোটবাবু যে বড়বাবুকে শাসাইয়াছেন, তাহার সহিত এ বন্দী বা বন্দিনীর কোনও সংস্রব আছে নাকি? এ রহস্য যেমন করিয়া হউক উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে—এই স্থির করিয়া পরদিন প্রভাতে পিরিহান গায়ে দিয়া, একটি বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, গদাই পাল প্রাত-র্ভ্রমণে বহির্গত হইল। আজ বিজয়া দশমীর ছুটি, কাছারি বন্ধ—সুতরাং এ সময় ভ্রমণে কোনও বাধা নাই।

বেড়াইতে বেড়াইতে গদাই পাল বাগানবাড়ীর সন্নিকটে উপস্থিত হইল। প্রথমেই প্রবেশ করিল না—দূর হইতে বাড়ীটির দৃশ্যমান অংশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যেটুকু দেখিতে পাইল, সে অংশের জানালাগুলি সমস্তই বন্ধ—কোথাও মনুষ্যবাসের পরিচয় নাই। গদাই তখন নদীতীরে উপস্থিত হইল। দেখিল, পার হইবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। পরপারে মাঠ ধু ধু করিতেছে। সীমান্ত রেখায় অস্পষ্ট বংশবনের মধ্যে একটি মন্দিরচূড়া এবং একটি অট্টালিকার উর্দ্ধভাগ দেখা যাইতেছে—নিশ্চয়ই ওখানে একটি গ্রাম আছে। গদাধর শিস্ দিয়া গান করিতে করিতে এবং হাতের লাঠিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইল, পার্শ্বে অল্পদূরে, বাগানবাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী নদীর ঘাটে, একটি বৃদ্ধা কলসী লইয়া জল ভরিতেছে। দূরত্ববশতঃ সে বৃদ্ধার অবয়ব স্পষ্টরূপে গদাই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে যে বাঙ্গালী নহে—পশ্চিমদেশীয়া, তাহা বেশ বোঝা গেল। গদাধর আপন দৃষ্টি সেই দিকে বদ্ধ করিয়া রহিল। দেখিল, জল ভরিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পাছে সে দৃষ্টিপথের অতীত হয়, এই আশঙ্কায় গদাধরও চলিতে লাগিল। ক্রমে বৃক্ষের

অন্তরাল হইতে দেখিল, সেই বৃদ্ধা অট্টালিকার এক অংশের নিকট পৌঁছিয়া কলসীটি নামাইয়া রাখিয়া, কোমর হইতে একটি চাবি বাহির করিল। একটি দরজায় তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে সেই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গদাই সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া বেড়াইত লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, বৃদ্ধা আবার কলসী লইয়া বাহির হইতেছে—দরজায় তালা বন্ধ করিতেছে। আবার নদী হইতে জল আনিয়া, পূর্ব্ববৎ তালা খুলিয়া প্রবেশ করিল। গদাই তখন মনে মনে হাসিয়া বলিল—'এ ভূতের জল পিপাসাটা অত্যন্ত অধিক দেখছি।'—সেই যে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধা আর বাহির হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, অট্টালিকার গাত্রস্থিত একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া ধুম নির্গত হইতে লাগিল। গদাই মনে মনে বলিল—'ভূতটা দেখছি সৌখীন—কাঁচা সিন্নি খান না।'

তখন বেলা প্রায় নয়টা। গদাই আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাগানের সম্মুখস্থ গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হইয়া, মালীর কুটীরের নিকট গেল। মালী তখন কুটীরের সম্মুখে একটি খাটিয়ায় বসিয়া পুত্রের জন্য কোর্ত্তা সেলাই করিতেছিল। গত মাসে কাছারীতে বেতন আনিতে গিয়া মালী গদাই পালকে দেখিয়া আসিয়াছিল। চিনিতে পারিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল।

গদাই বলিল, "কি মালী, ভাল আছ?"

"আজ্ঞে ভাল আছি।"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি খাটিয়া হইতে অন্য জিনিষ পত্র সরাইয়া, তাহার উপর একখানি পুরাতন মাদুর বিছাইয়া, গদাধরকে বসিতে দিল।

গদাই বসিয়া বলিল, "তামাক্‌ টামাক রাখ?"

"হাঁ বাবু—তামাক সেজে দিচ্ছি।"—বলিয়া সে তামাক সাজিতে গেল।

ক্ষণপরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, একটা কলাপাতার ডাঁটা হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। গদাধর পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া, ডাঁটাটি কাটিয়া কুটিয়া ঠিক করিয়া লইল। তামাক খাইতে খাইতে মালীকে বলিল—"গোটাকতক চালতে, কাঁচকলা—মোচা পেড়ে দিতে পার? বাজারে আজকাল কিছুই তরকারী মেলে না, খাবার দাবার বড়ই কষ্ট হয়েছে।"

মালী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। দেব বইকি। পেড়ে নিয়ে আসি?"

"দিও এখন—দিও এখন। তাড়াতাড়ি কি? বোস, দুটো গল্পগুজব করি—যাবার সময় নিয়ে যাব।"

মালী বসিল। গদাধর তাহার বাসভূমি, পরিজনাদি সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। মালীর আদিবাস চম্পারণ জেলায়। দশ বারো বৎসর বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে। এখানে তাহার স্ত্রী আছে, একটি পুত্র ও একটি কন্যা আছে। আরও দুইটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বেশী দিন বাঁচে নাই।

বলিতে বলিতে মালীপুত্র আসিয়া দাঁড়াইল। পায়ে দুইটি কাঁসার মল, গায়ে একটি ময়লা গেঞ্জি, হাতে তীরধনুক।

গদাই বলিল, "এটি তোমার ছেলে নাকি?—কিরে, তোর নাম কি?"

সে বলিল, "রামদাসোয়া।"

"রামদাসোয়া?—বেশ বেশ! এই নে একটা পয়সা, মিঠাই খাবি।"

রামদাসোয়া পয়সাটি লইয়া, তৎক্ষণাৎ সেটিকে বাঁ হাতে মুঠা করিয়া ধরিল। সে হাতটি পৃষ্ঠের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বিতীয় বার প্রসারিত করিয়া বলিল, "আউ।"

গদাধর হাসিয়া বলিল, "আর একটা নিবি? আচ্ছা এই নে।"

সে পয়সাটিও তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধৃত বামহস্তে চালনা করিয়া দিয়া, পুনরায় দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া বলিল, "আউ।"

মালী তখন লজ্জিত হইয়া, "তু তো বড়া পাজি বুঝাওত হ রে"—বলিয়া তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে লাগিল।

এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ রামদাসোয়া সপ্তম সুরে 'এজিটেশন' আরম্ভ করিল।

গদাই বলিল, "মালী ছোড় দেও—ছোড় দেও। আচ্ছা এই নে আর একটা পয়সা নে।"

পয়সা পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে রামদাসোয়া প্রস্থান করিল।

সে পয়সা পাইয়াছে শুনিয়া—তাহার ছোট ভগ্নীও আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া বিনা ভূমিকায় হাত পাতিল। ইতিমধ্যে মালীর স্ত্রী "আ গে ছৌঁড়ি—তোরা হাম মারতে মারতে—" বলিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল।

গদাই বলিল, "থাক্ থাক্, রহে দে—রহে দে। এই নে, তুইও দুটো পয়সা নে।"

গল্পগুজব করিতে করিতে, তামাক-ছিলিমটি পুড়িতে লাগিল। বাবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া মাঝে মাঝে মালী প্রসাদ পাইতেছে। ক্রমে আরও এক ছিলিম তামাক সাজা হইল। তাহার সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে করিতে মালী বলিল, "আজকাল দিন-সময় বড়ই শক্ত পড়েছে বাবু। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। মাইনে যা পাই, খেতে কুলায় না। বাবুকে বলে আমার মাইনে যদি কিছু বাড়িয়ে দেন ত বড় উপকার হয়। গরীব চির-দিন আপনার নাম করে।"

মালীর প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া গদাই বলিল, "তাই ত!—তুমি যা মাইনে পাও তাতে তোমার চলে না? কষ্ট হয়?—আহাহা—এ কথা আমায় এতদিন বলনি কেন?—এই যে লোকে বিদেশে চাকরি করতে আসে—কেন?—তুমি এসেছ—আমি এসেছি—কেন?—যদি পেটই না ভরল, তবে নিজের বাড়ী ঘর ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকায় লাভ? আচ্ছা আমি নিশ্চযই তোমার জন্যে বাবুকে অনুরোধ করব। আর এবার যেদিন বাবু আসবেন, তুমিও একবার নিজে তাঁকে বোলো।"

মালী বলিল, "বাবু শীঘ্র আসবেন কি?"

গদাই বলিল, "শীঘ্রই একদিন আসবেন। কেবল কাযের ভিড়ে আসতে পারছেন না, একটু অবসর হলেই আসবেন।"—বলিয়া গদাই, একবারমাত্র অট্টালিকার পানে চাহিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। মালীও সন্দিগ্ধ ভাবে গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বলিল, "একজন বুড়ী এখানে ছিল, তাকে দেখছিনে?"

মালী বলিল, "সেও আছে।"

শুনিয়া গদাধর মালীর প্রতি চাহিয়া, প্রকাশ্য ভাবেই অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমার কে হয়?"

"আজ্ঞে আমার শাশুড়ী হয়। আমার ইস্তিরীর আপন মা নয়—চাচানী হয়।"

গদাই বলিল, "তুমি নিমকের চাকর, তোমার মাইনে বাড়বে বইকি মালী।

বাবুকে বলে কয়ে আমি তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব কিন্তু দেখো বাপু ভুলেও যেন কখন মনিবের নিমকহারামী কোরো না।”

“আজ্ঞে না—আমার জীবন থাকতে তা হবে না”—বলিয়া মালী গদাধরের মুখের পানে বিশেষ কৌতূহলের সহিত চাহিয়া রহিল।

গদাই বলিল, “তা হলে এখন উঠি। এস ছুটো চালতে মোচা পেড়ে দেবে এস।”

তরকারী সংগ্রহ হইলে মালী বলিল, “বাবু, কিসে করে নিয়ে যাবেন ?”

“তোমার একখানা গামছা-টামছায় বেঁধে দাও না। কাল আবার এসে গামছাখানি ফিরিয়ে দেব এখন।”

মালী তাহাই করিল।

বিদায় লইবার সময় গদাই বলিল, “দেখ, একটা কথা বলি—কিন্তু কারু কাছে যেন প্রকাশ কোরো না। আমি ত তোমার মাইনে বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে দেখবই—কিন্তু ধর যদি বাবু না-ই শোনেন। আমার সন্ধানে একটা কায আছে—বেশ মোটা মাইনে। করবে ?”

“কোথায় বাবু ?”

“আমি পূর্ব্বে যে বাবুর বাড়ীতে ছিলাম—সে বাবু অনেক দিন থেকে একটি পশ্চিমে মালী খুঁজছেন। উড়ে মালীরা কেবল ফাঁকি দেয়, মেহনৎ করে না—তাই উড়ে মালী তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন যে একটি ভাল হিন্দুস্থানী মালী পেলে দশ বারো টাকা পর্য্যন্ত মাইনে দিয়ে রাখি।”

“বাবু, সে কতদূর ?”

“বেশী দূর নয়—কলকাতার খুব কাছেই। আমার ভাই সেখানকার সদর নায়েব। দশ বারো টাকা মাইনে ত পাবেই—আর যদি চাষবাস করতে ইচ্ছে কর, আমার ভাইকে বলে খুব ভাল ভাল জমি বিঘে কতক তোমায় সেরেফ্ নামমাত্র খাজনায় দেওয়াতে পারি।”

মালী শুনিয়া বলিল, “আজ্ঞে, আপনি আগে এই মনিবের কাছে চেষ্টা করে দেখুন—যদি বাবুর দয়া হয়—এইখানেই থাকব। আর, যদি তা না হয়—তবে সেইখানে আমায় লাগিয়ে দেবেন।”

“তা চেষ্টা করে দেখব বইকি! হবে—এইখানেই মাইনে বেড়ে যাবে।

হাজার হোক পুরোণো মনিব। পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে, পুরোণো মনিব কি আর মাইনে বাড়িয়ে দেবে না?"

"আজ্ঞে দয়া রাখবেন।"—বলিয়া মালী গদাইকে প্রণাম করিল।

তরকারীর মোট হাতে ঝুলাইয়া গদাই ধীরপদে গ্রামে ফিরিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা

খুলনা সহরের প্রান্তভাগে একজন জমিদারের একটি পুরাতন পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন কাছারী বাড়ী আছে। বাড়ীটি দ্বিতল, দেওয়ালে নানাস্থানে উপর হইতে নীচে অবধি ফাট ধরিয়াছে। স্থানে স্থানে ইষ্টকের মধ্য হইতে অশ্বত্থ গাছ বাহির হইয়াছে। বাড়ীটির চারিদিকে বাগান, কিন্তু যত্নাভাবে তাহা প্রায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ফটকটিও ভগ্ন। এই ফটকের ঊর্দ্ধদেশে একটি বৃহৎ সাইন-বোর্ডের তক্তা বসান আছে, তাহাতে ইংরাজী বাঙ্গালায় নিম্নপ্রকার লেখা দেখা যায়।

SOCIETY FOR THE PROPAGATION
of
ELECTRICAL HINDUISM

বৈদ্যুতিক হিন্দুধর্ম্মপ্রচারিণী সভা

প্রতি রবিবার বৈকালে এই সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া থাকে। সভ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—সাধারণ ও বিশিষ্ট। সাধারণ সভ্যগণ অধিকাংশই নব্য যুবক—বয়স ষোল হইতে কুড়ি বাইশের অধিক নহে। মাসে ইহাদিগকে আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। বিশিষ্ট সভ্যগণকে কোনও চাঁদা দিতে হয় না এবং তাঁহারা সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিতও থাকেন না। তাঁহারা সকলেই স্থানীয় গণ্যমান্য লোক এবং আচারনিষ্ঠ হিন্দু, সভাপতি মহাশয় অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট সভ্যের পদ স্বীকার করাইয়াছেন। বালকগণের এই মস্তিষ্কবিকৃতি দর্শনে তাঁহারা ব্যথিত হইতেন এবং মাঝে মাঝে সস্নেহ উপদেশাদি দিতেন।

এই সভার সভাপতির নাম বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায়। ইনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বি-এ পাস করিতে না পারায়

বৎসর দুই হইতে ঘরে বসিয়া আছেন। বিমলাবাবুর পিতা একজন স্থানীয় সম্পন্ন জমিদার। বিমলাবাবুই এই সভা স্থাপিত করিয়াছেন, তিনিই অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং এই সভার মতাদি অধিকাংশ তাঁহারই আবিষ্কৃত। বলা বাহুল্য ইঁহার অনেকগুলি ভক্তিমান শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে এবং সভার সাধারণ সভ্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া এখন প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনে দাঁড়াইয়াছে।

ইঁহাদের মত এই যে বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি বা ফোর্স। পূর্ব্বকালে যাহাকে ব্রহ্মতেজ বলিত তাহা বিদ্যুৎ ভিন্ন কিছুই নহে। মানুষের আত্মা, খানিকটা বিদ্যুৎ। পূজা হোম জপতপ করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। হিন্দুর ক্রিয়া-কর্ম্মগুলি বিদ্যুৎ বাড়াইবার কৌশল মাত্র। হিন্দুর পক্ষে যে সকল খাদ্য নিষিদ্ধ, তাহা খাইলে আত্মার বিদ্যুৎহানি হয় এই কারণেই নিষিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়াছেন গঙ্গাস্নানে পুণ্য হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সকল নদী অপেক্ষা গঙ্গায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। ইঁহারা যেমন আচার-বিবর্জ্জিত নব্যহিন্দু ও ব্রাহ্মণগণকে গালি দিতেন, তেমনি সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণকেও—অর্থাৎ যাঁহারা সরল ভক্তির সহিত পিতৃপিতামহগণের আচরিত ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন এবং বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান—তাঁহাদিগকেও অন্ধকুসংস্কারাপন্ন বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না।

প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে এই সভার সাধারণ সভ্যগণ মিলিত হইয়া নানারূপ বৈদ্যুতিক তত্ত্বালোচনা করেন এবং কোনও না কোন সভ্য প্রবন্ধ-পাঠও করিয়া থাকেন। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হয়, সুতরাং সায়ংসন্ধ্যা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাই ইঁহারা সভাতেই সকলে মিলিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবার একটি সংক্ষিপ্ত উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মত এই যে বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করিবার জন্যই যখন সন্ধ্যামন্ত্র উচ্চারণ করা, তখন যে কোন উপায়ে দেহের বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সন্ধ্যা করার সমান ফল হয়। তাই সভাপতি মহাশয় অনেক টাকা ব্যয় করিয়া একটি বিদ্যুৎবাহন যন্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। যথাসময়ে সেই কলের দ্বারা শরীরে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া ইঁহারা সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া লইতেন।

আজ রবিবার। বৈকাল পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্বেই সভ্যগণ সমবেত হইতে

আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্থানীয় উকিলগণের বংশধর, দুই একজন জমিদারের পুত্র, অপর সকলের পিতা সরকারী চাকরি করিয়া থাকেন। সকলেই তরুণবয়স্ক যুবক—কেবল একজন আসিলেন তিনি বৃদ্ধ। ইঁহার নাম মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতি। লোকটির দেহখানি শীর্ণ। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। ক্ষৌরিত মুখমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার নাসিকাটিই যেন সগর্ব্বে আত্মঘোষণা করিতেছে। মস্তকের সম্মুখভাগ কেশহীন। স্কন্ধে এক-খানি নামাবলি। হস্তে একটি বংশদণ্ড লইয়া বাচস্পতি মহাশয় সভায় দর্শন দিলেন। ইনি সাধারণ সভ্য নহেন, তবে সভা হইতে মাসিক দশটি টাকা বৃত্তি পান। ইঁহার কার্য্য, সভ্যগণের মতের সমর্থন করা এবং যদি পারেন তবে দুই একটা শাস্ত্রীয় শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা। টাকা দশটির লোভে ইনি সভ্যগণের নূতন নূতন বৈদ্যুতিক তত্ত্বাবিষ্কার শ্রবণ করিয়া বাহবা দিতেন, কিন্তু বাড়ী গিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট এ সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন—বড়লোকের ছেলেরা অন্য কোনও রকম বদখেয়ালী না করে এই এক হুজুগে মেতেছে মন্দ নয়।

পাঁচটা বাজিল। একখানি ফুলস্কেপে বাঁধা বৃহৎ খাতা বগলে করিয়া সেক্রেটারি মহাশয় উপস্থিত হইলেন। হেলিতে দুলিতে স্থূলকায় সভাপতি মহাশয়ও আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে একজন তকমাআঁটা আর্দ্দালি। একজন ভৃত্য ইতিপূর্ব্বেই সভাগৃহ ঝাঁট দিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহের মধ্যস্থলে আধ হাত উঁচু একখানি চৌকি, তাহার উপর একখানি গালিচা বিছানো। ইহাই বেদীস্বরূপ ব্যবহার হইত। বাচস্পতি মহাশয়কে বামে লইয়া সভাপতি বিমলাচরণবাবু তদুপরি উপবেশন করিলেন। বেদীর দক্ষিণভাগে একখানি বৃহৎ কম্বল পাতা, তাহাতে ব্রাহ্মণ সভ্যগণ বসিলেন। বেদীর সম্মুখে একখানি কম্বলে বৈদ্য ও কায়স্থ সভ্যগণ এবং বামভাগের কম্বলখানিতে অন্যান্য জাতিগণ আসন গ্রহণ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় একটি সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেক্রেটারি মহাশয় তাঁহার খাতাখানি খুলিয়া কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে এবারকার প্রবন্ধ-রচয়িতা বিপিনচন্দ্রবাবু নিজ প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রবন্ধের

বিষয়টি—'ভারতবর্ষ একমাত্র কর্ম্মভূমি কেন?' বিপিনবাবু পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফটির ভাষা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর—অক্ষয় দত্ত বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে লিখিত। বিপিনবাবু এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন—

"রজতকিরীটশালী অভ্রচুম্বি ভূভৃদ্রাজ হিমাচল যে ভারতবর্ষের মৌলিদেশ সমলঙ্কৃত করিয়া যুগযুগান্ত হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, নবীনজলদকান্তি-নীলাটবিপরিকীর্ণ সিংহশার্দ্দূলব্যালভল্লুকোদ্বেজিত বিন্ধ্যগিরি যে মহাভূমির মেখলাভূষণ, কূলপ্লাবিনী হ্লাদিনী গঙ্গাগোদাবরীনর্ম্মদাযমুনাদি শততরঙ্গিনী যে দেশকে অহরহঃ পীযূষধারায় পরিসিঞ্চিত করিয়া কলকলস্বনে বিসর্পিতগমনে সরিৎপতির উদ্দেশে প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই ভারতবর্ষ জগতীতলে একমাত্র কর্ম্মভূমি কেন, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অতিজঘন্য জড়বুদ্ধি লইয়া আমি তাহার কি সদুত্তর দিব?"

দুই তিন প্যারাগ্রাফের পরই ভাষা অত্যন্ত লঘু হইয়া গেল। ক্রমে যখন প্রবন্ধপাঠক বিপক্ষদলের প্রতি অর্থাৎ একদিকে সাধারণ হিন্দুগণ যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ দেব ও ঋষিগণের লীলাভূমি এই কারণেই ইহা কর্ম্মভূমি ও অপরদিকে অবিশ্বাসীগণ যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশেও মানবের কর্ম্মভূমি হইতে পারে, তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের খেউড়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গণকে অনেক গালিমন্দ দিয়া অবশেষে প্রবন্ধপাঠক নিজ মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণ করিলেন—

"ভারতবর্ষই যে একমাত্র কর্ম্মভূমি, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে যে কর্ম্মভূমি হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ হে নবীনবাবু ও বান্ধবীগণ, তোমাদের ঐ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেই দেখাইয়া দিব। গ্যানো সাহেবের ফিজিক্সে লেখা আছে যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের অধ্যাপক সীবেক সাহেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে যদি দুইটি ধাতুখণ্ডের দ্বারা একটি সার্কিট প্রস্তুত করা যায় এবং তাহার একটা সংযোগস্থলে অগ্নির উত্তাপ দেওয়া যায় তবে বিদ্যুতের প্রবাহ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ এই যে ধাতুখণ্ডের উভয় প্রান্তে যদি উত্তাপের বৈষম্য জন্মে, তবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া থাকে। এখন, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা দেখুন, আমাদের এই ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ? দুইটি কেন, বহু

ধাতু এই ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় নিহিত রহিয়াছে। এদেশের শিরোভাগে চিরতুষারপুঞ্জ বিদ্যমান। পাদদেশ নিরক্ষবৃত্তের অর্থাৎ ইকোয়েটারের অতি সমীপবর্ত্তী। সুতরাং ফলে আমাদের দেশের মাথায় বরফ পায়ে আগুন। এই কারণে কুমারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিতেছে। এত অধিক বিদ্যুৎ আর কোন দেশে নাই। আপনারা সকলেই ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পৃথিবীর মানচিত্র দেখিয়াছেন, মাথায় বরফ পায়ে আগুন এমন আর একটা দেশ পৃথিবীর মধ্যে দেখান দেখি? এরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহের সুযোগ আর কোন দেশে আছে দেখান দেখি? সুতরাং ভারতভূমি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্মভূমি। পুরাণেও গল্পচ্ছলে এই তত্ত্ব প্রকটিত হইতেছে। হিন্দুর ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বর, বৈদ্যুতিকশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুগণ যাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করে—অর্থাৎ বিষ্ণু, সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি পজিটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটির আধার। মহেশ্বর অর্থাৎ সংহার কর্ত্তা, নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি ছাড়া আর কিছুই নহেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন জীরো পয়েণ্ট। মহেশ্বর অর্থাৎ নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি হিমালয় পর্ব্বতে বাস করেন। নারায়ণ অর্থাৎ পজিটিভ ইলেট্রিসিটি ভারত মহাসাগরে অনন্তশয্যা পাতিয়া শুইয়া আছেন। সুতরাং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবে না কেন? এই বিদ্যুতের বলে আমাদের আত্মা সদাসর্ব্বদা 'বৈদ্যুতিত' অর্থাৎ ইলেকট্রিফায়েড সুতরাং কবির ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি,

হোক বিদ্যুতের জয় জয় বিদ্যুতের জয়ঃ
গাও বিদ্যুতের জয়।
কি ভয় কি ভয়?
জয় বিদ্যুতের জয়।"

প্রবন্ধ শেষ হইবামাত্র সভাস্থল কম্পিত করিয়া ঘন করতালি পড়িল। সকলেই বিপিনবাবুর বুদ্ধিকৌশলের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "বিপিনবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যদি কারও কিছু বক্তব্য থাকে তিনি বলুন।"

কাহারও কিছু বক্তব্য ছিল না। তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয় নস্যাধার শম্বুকটি বামহস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া, নাসারন্ধ্রের নিম্নে কিয়দ্দূরে ধারণ করতঃ বলিলেন, "শ্রীমান

বিপিনচন্দ্র যা বলেছেন, তা প্রকৃত কথাই বটে। ইলেক্‌ট্রিরি ছাড়া অন্য আর কিছুই নয়। আসল জিনিষই হল ইলেক্‌ট্রিরি। ভারতভূমি হচ্ছেন কর্ম্মভূমি, অন্য সব দেশ হচ্ছে ভোগভূমি। বিষ্ণুপুরাণে তার প্রমাণ রয়েছে যথা—

তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূয়েষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥

বিপিনবাবু যে বললেন হিমালয়ে খুব বেশী ইলেক্‌ট্রিরি, সে কথা খুবই পাকা। সেইজন্যেই ত শাস্ত্রে উত্তর দিকে মাথা করে শয়ন নিষেধ। তস্য প্রমাণং যথা—

প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে।

অর্থাৎ কিনা উত্তরদিকে মাথা করে শুলে, মানুষের শরীরের ইলেক্‌ট্রিরি হিমালয় টেনে নেন, ক্রমেই মানুষ দুর্ব্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"

বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় দুই তিনবার প্রবলভাবে নস্য গ্রহণ করিলেন। তখন নস্যাধারটি নীবিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "বাবা বিপিন, তুমি আজ যে তত্ত্বকথা শোনালে তাতে বড় সুখী হলাম। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবি হও।"

বিপিনবাবু এই প্রশংসাবাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥ উৎসবের আয়োজন

সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া দিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এবার সায়ংসন্ধ্যাটা সেরে নেওয়া যাক।"

আদেশমত ভৃত্য বিদ্যুতের কলটি আনিয়া বেদীর উপরে রাখিল। সভাপতি মহাশয় অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণ সভ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। পরস্পর হস্তে হস্ত আবদ্ধ করিয়া, প্রথম ও শেষ ব্যক্তি নিজ নিজ মুক্ত হস্তে কলের পিত্তলদণ্ড ধারণ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় ধীরে ধীরে কল ঘুরাইতে লাগিলেন। প্রথম যখন কল আসিয়াছিল, একজন ভৃত্য কল ঘুরাইত,

বাচস্পতি মহাশয়ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সভ্যগণের সহিত চক্রস্থ হইয়া প্রবাহ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু হাত অত্যন্ত ঝিন্ ঝিন্ করে দেখিয়া, অব্যাহতি লাভের জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে আমার বিদ্যুৎ গ্রহণ করাটা ঠিক নয়। আমার অনেক বয়স হয়েছে, জপ তপ করে দেহে আমি অনেক ইলেক্‌টিরি সঞ্চয় করেছি। তোমাদের অল্প বয়স, আহারাদি সম্বন্ধে আমার মত অতটা ধরাকাট তোমরা করতে পার না। তোমাদের ইলেক্‌টিরি আমার চেয়ে অনেক কম। তোমাদের ইলেক্‌টিরি নিতে গেলে আমার শরীরের খানিকটে ইলেক্‌টিরি অপব্যয় হয়ে তোমাদের শরীরে চলে যাবে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই যে তোমরা সকলে চক্রস্থ হয়ে দাঁড়িও, আমি কল ঘোরাব এখন।"—সভাপতি মহাশয় এ যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন। সেই অবধি বাচস্পতি মহাশয় কল ঘুরাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণের সায়ংসন্ধ্যা সম্পন্ন হইলে, বৈদ্য ও কায়স্থগণ দাঁড়াইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পসময় কল ঘুরাইয়া বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাদের সন্ধ্যাক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। তাহার পর দুই চারি পাকে অপর জাতিগণেরও সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন সকলে যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "শ্যামাপূজা আসতে আর বেশী দেরী নেই। সেদিন আমাদের সভার বার্ষিক উৎসবের দিন। সুতরাং এ সম্বন্ধে পরামর্শ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা আবশ্যক।"

সভাপতি বলিলেন, "উৎসবের খরচের একটা ফর্দ্দ করেছেন কি ?"

সম্পাদক মহাশয় পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া ফর্দ্দ পাঠ করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রোগ্রাম ছাপাইবার ব্যয়, সভাস্থল সজ্জিত করা, লুচি সন্দেশ পাণ তামাক সিগারেটের মূল্য প্রভৃতি ধরিয়া প্রায় একশত টাকার হিসাব দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এই খরচ সভ্যগণ সকলে ভাগাভাগি করে দেবেন। এতে সকলের মত কি ?"

সভ্যগণ কেহই কোন মত প্রকাশ করিলেন না। সকলে বসিবার কম্বল-খানির প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি করিয়া যেন কত গভীর তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "সভার ফণ্ডে একটি পয়সাও জমা নেই বরং অনেকগুলি টাকা ফাজিল জমা আছে। অনেক সভ্যের কাছে মাসিক চাঁদার টাকা অনেক মাস ধরে অনাদায়। কারু কাছে দুই, কারু কাছে পাঁচ, কারু কাছে বা দশ টাকা বাকী পড়ে গেছে। গত বৎসর উৎসবের জন্যে যে চাঁদা ধরা হয়েছিল, কোন কোন সভ্য অদ্যাবধি তা পরিশোধ করেন নি। হাল বকেয়া সমস্ত টাকা সভ্যগণ শোধ করে না দিলে বার্ষিক উৎসব কি করে হতে পারে? সভাপতি মশায় অনুগ্রহ করে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে সভাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ বিষয়ে সভ্যগণ মনোযোগী না হলে কাযের বড়ই বিশৃঙ্খল হবে।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "মাসিক চাঁদা কাগজে কলমে যা আছে, তার অর্দ্ধেকও নিয়মিত আদায় হয় না। অথচ সভার খরচ মাসিক চাঁদার প্রায় সমান। আরও কিছু খরচ করতে পারলে ভাল হয়। বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ভাল ভাল ইংরাজী বই আমাদের কিনে রাখা উচিত। এই সভা থেকে একখানি মাসিকপত্র বের করা একান্ত আবশ্যক। এখানে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা হয়, যে সকল ভাল ভাল প্রবন্ধ পাঠ হয়, সে সকল আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, জগতের কোন উপকারে আসে না। একখানি মাসিকপত্র থাকলে এই সকল তত্ত্বকথা তাতে প্রকাশিত হয়ে জগতের অনেক কল্যাণসাধন করতে পারত। এ সকল কাযে অনেক টাকা ব্যয়, মাসিক আট আনা চাঁদা তাই আদায় হয় না। আমি একা আর কত টাকা যোগাব? এ সম্বন্ধে একটা উপায় স্থির করতে হচ্ছে।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "যখন আয় ব্যয়ের কথাই উঠলো, তখন আমার একটা কথা এই সময় জানিয়ে রাখি। আমাকে তোমরা মাসিক দশ টাকা করে যা বৃত্তি দাও তাতে কোন মতেই আর আমার চলে না। আতপ চাউলের দর দিন দিন যে রকম বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে বুঝি বা অবশেষে আমায় সিদ্ধ চাউল ধরতে হয়।"

কয়েকজন সভ্য সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! তা করবেন না বাচস্পতি মশায়, আপনার শরীরের ইলেকট্রিসিটি কমে যাবে।"

"ইলেকটিরি কমবার ভয়েই ত আলোচাল ছাড়তে পারিনে। আলোচাল, গব্যঘৃত আর কাঁচকলাতেই সবচেয়ে বেশী ইলেকটিরি। আলোচালের ত দর

বললাম। খাঁটি গব্যঘৃত পাওয়াই মুস্কিল, যদিও বা পাওয়া যায়, তার দু' টাকা করে সের। বাজারে এমনি আগুন লেগে গেছে যে পয়সায় এতটুকু এতটুকু দুটির বেশী কাঁচকলা পাওয়া যায় না। কি খেয়ে দেহের ইলেকৃটিরি বাড়াই বল দেখি? আমার বৃত্তিটি মাসে আর পাঁচ টাকা বাড়িয়ে না দিলে আমার আর উপায় নেই।"—বলিয়া বাচস্পতি মহাশয় ব্যাকুলভাবে সভাপতি মহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সভাপতি বলিলেন, "সে বিষয়েও বিবেচনা করতে হবে বইকি। যে রকম দেখছি, তাতে আরও জনকতক অর্থশালী সভ্য সংগ্রহ করতে না পারলে সভা ত চলে না। এই খুলনা জেলায় কত বড় বড় ধনী জমিদার রয়েছেন, তাঁদের বংশধরেরা ফিটন হাঁকিয়ে নানারকম নবাবী করে টাকা ওড়াচ্ছেন। তাঁরা যদি জনকতক এই সভার সভ্য হন, তা হলে অনায়াসেই সভার দারিদ্র্য ঘুচে যেতে পারে এবং কাযেরও অনেক সুবিধা হয়। সেই জন্যে আমার প্রস্তাব এই যে এবার বার্ষিক উৎসবে জনকতক বাছা বাছা বড়লোকের ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে, অনুরোধ উপরোধ করে, আনা হোক। এ সভার উপকারিতা বুঝতে পারলে অবশ্যই তাঁরা সভ্যপদ স্বীকার করবেন।"

সকলেই বলিল, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।"

সম্পাদক বলিলেন, "আসল কথা হচ্ছে কি জানেন? ধর্ম্মে মতি আজকাল অতি অল্প লোকেরই আছে। গভীর ভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করা, তা অল্প লোকেই করে থাকে। কেউ যদি তাদের কাছে তত্ত্বকথা বলে, তারা হেসেই উড়িয়ে দেয়। সেদিন আমাদের বাসায় কলকাতা থেকে দুটি বাবু এসেছিলেন, নিজেকে তাঁরা হিন্দু বলে গর্ব্ব করেন, অথচ আমাদের সভার ছাপা অনুষ্ঠান'পত্র পড়ে হেসেই আকুল। আমাকে বললেন—আচ্ছা মশাই, একটা বিদ্যুতের বাতি এনে তার দুটো প্রান্তে, আপনাদের সভার দু'জন বড় বড় সভ্যের টিকির সঙ্গে যদি সংযোগ করে দেওয়া যায়, তবে ত দপ্ করে বিদ্যুতের আলো বাতিটার ভিতর জ্বলে উঠতে পারে? আপনারা বিনা খরচে এখানে ইলেকৃট্রিক লাইট পেতে পারেন!"

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেরই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া হইয়া উঠিল। কেবল বাচস্পতি মহাশয়ের ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়াছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা দমন করিয়া ফেলিলেন।

স্থানীয় একজন উকিলের পুত্র শিশিরকুমারবাবু বলিলেন, "অবশ্য লঘু প্রকৃতির লোকের সংখ্যাই অধিক। তবে অনুসন্ধান করলে আমাদের সভাপতি মশায়ের মত দু'চারজন তত্ত্বজ্ঞানী অথচ ধনী সন্তান পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে একজন নূতন উকিল প্র্যাক্‌টিস্ করতে এসেছিলেন, তাঁর নাম মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকটি এম-এ পাস, মাছ মাংস খান না, বিবাহ করেননি, ধার্ম্মিক যতদূর হতে হয়। তিনি এখন প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে বাড়ীতে বসে কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা আর সন্ধ্যা আহ্নিক নিয়েই আছেন। রমণচন্দ্র ঘোষ বলে তাঁদের এক প্রজা মোকদ্দমা উপলক্ষে বাবার কাছে এসেছে। তার মুখে মোহিতবাবুর সমস্ত কথা শুনে লোকটাকে ঋষিতুল্য বলে মনে হল। এই রকম লোককে আমাদের সভার উপকারিতা যদি একবার বুঝিয়ে দিতে পারা যায় তবে নিশ্চয়ই তাঁরা মুক্তহস্তে সভাকে অর্থ সাহায্য করেন।"

সভাপতি বলিলেন, "হাঁ হাঁ, মোহিতলালবাবু যখন এখানে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বটে। লোকটি জ্ঞানী সন্দেহ নেই, তাঁকে ত আনাতেই হবে।"

সম্পাদক বলিলেন, "তাঁর ঠিকানাটা কি? একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দেব এখন।"

সভাপতি বলিলেন, "শুধু নিমন্ত্রণ-পত্রের কায নয়। আমি নিজে একখানা চিঠি লিখে দেব, আর শিশিরবাবু আপনি সেই রমণ ঘোষের হাতে চিঠিখানি তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, আর ঘোষকে বিশেষ করে বলে দেবেন যেন সে যে রকম করে হোক, শ্যামাপূজার দিন আমাদের উৎসবে মোহিতবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। রমণ ঘোষ কবে যাবে?"

শিশিরবাবু বলিলেন, "কালই সে চলে যাবে।"

সভাপতি বলিলেন, "তবে কাল সকালে আমি একখানা চিঠি লিখে আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দেব এখন, আপনি সেখানি রমণ ঘোষের হাতে দিয়ে তাকে ঐ রকম করে বলে দেবেন।"

অতঃপর আরও জনকয়েক জমিদারের পুত্রের নাম উত্থাপিত হইল এবং উৎসবের দিন তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হইল।

রাত্রি ক্রমে নয়টা বাজিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "অদ্যকার সভায় কোনও সভ্যের কিছু বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য আছে কি?"

ইন্দুবাবু নামক একজন সভ্য বলিলেন, "আছে।"

"কি?"

"একটা গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এই সভার মত যে ভূত নেই।"

সমস্বরে অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "নেই—ই ত! নেই—ই ত!—এই উনবিংশ শতাব্দীতে—বৈজ্ঞানিক যুগে—কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু আর বায়ুগ্রস্ত থিয়জফিষ্ট ছাড়া আর কে ভূতে বিশ্বাস করতে পারে?"

ইন্দুবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু কাল একটি ভদ্রলোকের মুখে যে রকম ব্যাপার শুনলাম তাতে বড়ই আশ্চর্য্য হতে হল। তিনি স্বয়ং একবার নয়, দু' দু' বার ভূতকে দেখেছেন। আর, লোকটিও নিতান্ত চাষাভূষো দলের নন। বি-এ পাস, সরকারী শিক্ষাবিভাগে বহুকাল চাকরি করে এখন পেন্সন নিয়েছেন। মিছে কথা বলে আমায় ঠকাবার কোন উদ্দেশ্যও তাঁর দেখতে পাইনে।—সুতরাং নিজে স্বচক্ষে তিনি যা দেখেছেন তা কেমন করে অবিশ্বাস করি?"

এই কথা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে শিরশ্চালনা করিতে করিতে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সভাস্থ সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। কেবল বাচস্পতি মহাশয় বক্তার প্রতি ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিলেন। হাসি থামিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "দেখাটা কি একটা প্রমাণের মধ্যেও গণ্য নাকি? মানুষের যত ইন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে চক্ষুই মানুষকে সবচেয়ে বেশী ঠকায় তা কি ইন্দুবাবু আপনি জানেন না?"

ইন্দুবাবু বেচারী একেবারে মুষড়িয়া গিয়াছিলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, অপরাধীর মত মাথাটি নীচু করিয়া বলিলেন, "তা ঠিক। সেইজন্যই ত সভার সমক্ষে কথাটা উত্থাপন করলাম যাতে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা এর হয়ে যায়।"

সম্পাদক মহাশয় খস্‌খস্‌ করিয়া কলম চালাইয়া ইন্দুবাবুর সন্দেহ ও প্রশ্ন তাঁহার পাকা খাতায় লিখিয়া ফেলিলেন। পরে ইন্দুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি সমস্ত ব্যাপারটি তাহলে খুলেই বলুন, সভা অবশ্যই তার একটা সুমীমাংসা করে দিতে পারবেন।"

ইন্দুবাবু তখন বলিলেন, "আমি ব্যাপারটি সেই ভদ্রলোকের মুখে যেমন শুনেছি, গল্পাকারে অবিকল কাগজে লিপিবদ্ধ করে ফেলেছি। লেখাটি সেই বাবুটিকে দেখিয়েছি, তিনি পড়ে বলেছেন সমস্তই ঠিক লেখা হয়েছে, এবং ঘটনাটি যে সত্য এই মর্ম্মে লেখাটির শেষে তিনি স্বাক্ষরও করে দিয়েছিলেন। যদি সভার অনুমতি হয় তবে সে লেখাটি পাঠ করি।"

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে নয়টা সময় নির্দ্দেশ করিতেছিল। বাহিরে অন্ধকার, গাছপালার মধ্য দিয়া সন্‌সন্‌ করিয়া বায়ু বহিতেছে। গৃহস্থিত ল্যাম্পটির শিখা সেই বায়ুবশে ঘন ঘন কাঁপিয়া ধূমোদ্গার করিতে লাগিল। মেঘ করিয়াছিল, বৃষ্টিও পড়ে বুঝি। মাঝে মাঝে গুরুগুরু শব্দে আকাশ ডাকিয়া উঠিতেছে। সভাপতি মহাশয়ের ইঙ্গিত ক্রমে ইন্দুবাবু মৃদুস্বরে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥ একটি ভৌতিক কাণ্ড

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া চাকরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনওরূপ ফল হইল না। অবশেষে শিউড়ি জেলাস্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহুলোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ি বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটা কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিষপত্র লইয়া আসিয়া দুইদিন পরে নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোটখাট সস্তা বাড়ী খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড-মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করি এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে সহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইলাম। বাড়ীটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে, স্থানে স্থানে ভগ্ন, তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক

পাঁচসিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়ীখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই বাড়ীটিতে ভূত আছে। তখন আমি নব্য কলেজের ছোকরা—ইয়ং বেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যামর্য্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ীটি লওয়াই স্থির করিলাম কিন্তু অতদূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে—চোর ডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়া গেলেন—তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি-এ পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়ীটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়ীতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাযকর্ম্ম সারিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্ত্তী রবিবার প্রাতে জিনিষপত্র লইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়ীটি বহুকালের নির্ম্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো মহিষাদি নিবারণ জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়ীটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়ীটি দ্বিতল, নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দুখানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ীর পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী, তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ীর অল্প দূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান রন্ধনের জন্য সেই জল ভৃত্য আনয়ন করিত। দুইখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেই সঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রভাতে পদব্রজে শিউড়ি যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের একক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতী বাঁধা থাকিত, হাতীশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং আপনার জপতপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "বাবা তুমি কোথা যাইতেছ ?"

আমি উত্তর করিলাম, "শিউড়ি স্কুলে আমার একটি মাষ্টারী চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয় ? আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম, "কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড় খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন, "তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ ?"

"সহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ী ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি এবং আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাষ্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় শিউড়ি পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময়ে দেখি আমাদের গ্রামের একজন কৈবর্ত্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে, তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে, মাঠাকরুণ এই চিঠি দিয়েছেন আর এই একটি

কবচ আপনার হাতে পরবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"—বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতাঠাকুরাণী লিখিতেছেন—'তুমি বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন একটি কবচ দিয়া বলিলেন—মা, তোমার ছেলে আজ প্রাতে শিউড়ি রওনা হইয়াছে, পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আরও লিখিয়া দাও যদি কোন রকম ভয় পায়, তবে যেন তারকব্রহ্মনাম জপ করে, এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।—সুতরাং আমি দীনু কৈবর্ত্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম: প্রাপ্তিমাত্র রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিবে।'

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এইখানেই থাকবি ত? তোর খাবার যোগাড় করি?"

সে বলিল, 'না, মাঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে আমার ছেলে কবচ পরিযাছে।'

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—'এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।'—তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দুজনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিভিয়া গিয়াছে

ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্পে অল্পে খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিনের রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথার সাদা ছোট চুলগুলা যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম, আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্ত্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল, মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রামকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্ত্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িত কণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম।

রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—'কি মহাশয়?'

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিয়ন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে :—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

পরম শুভাশীর্ব্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি

রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অগুই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অগুই নিশাগমের পূর্ব্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোন বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্মনাম জপ করিবে। সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—

নিয়ত আশীর্ব্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারী বাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ী গিয়া প্রথমে মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?'

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন, 'তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখন আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে। তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।'

আমি বলিলাম, 'মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনওরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়ীতে ছিলাম, আমার উপরই ভূতের এত আক্রোশ কেন?'

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে লোকটির নাম কি?'

'তাঁহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।'

'তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।'

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—'সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?'

'করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে। কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোনও বিপদ হইবে না।'

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়াছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্যস্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওযানা হইলাম। শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথমে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এপাশ ওপাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গোরু দুটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও বা দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গোরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না, বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম, আবার জাগিয়া

উঠিতে লাগিলাম। হঠাৎ গোরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকানি দিয়া গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্ত্তি! গোরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ীর জোয়ালের উপর দুইটা শীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্ম্মাবৃত বৃদ্ধ কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গোরু দুইটা তখন গাড়ী পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া মহাবেগে ছুটিতে লাগিল। যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথে দৌড়িতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল—'বাবু এ কি? গোরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?' আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলাম—'হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।' গাড়োয়ান তখন গাড়ী থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গোরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটা গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গোরুর গাড়ী দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গোরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—'থাক্, আজ আর কায নাই, গোরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।'

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব। আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

উপরে লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং অবিকল সত্য।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ
গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার
সাকিম টগরা, জেলা বীরভূম।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সভাস্থ সকলে কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"ইন্দুবাবু, সে চিঠি দু'খানি আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"সে ডাকের চিঠিখানির খাম আছে?"

"আছে।"

"ছাপ তারিখ ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তাইত!"—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। সভাস্থ অপর সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

তখন সভাপতি মহাশয়, গলা ঝাড়িয়া, বলিলেন, "এর জন্যে আপনারা এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? উপেন্দ্রবাবু যা বর্ণনা করেছেন তার প্রতি অক্ষর সত্য বলে মেনে নিলেও, ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।"

সভাস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন, "ভূত নয়, তবে কি?"

সভাপতি মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ইলেক্‌ট্রিসিটি।"

সভাস্থ সকলে আবার নীরবে বসিয়া রহিলেন। সভাপতি মহাশয় পুনরায় ধীরে ধীরে নিম্নলিখিত গবেষণাপূর্ণ বাক্যগুলি বলিলেন:—

"ভূত নয়, ইলেক্‌ট্রিসিটি। মানুষের আত্মা খানিকটা বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন কূল ছাপিয়েও অনেক দূর পর্য্যন্ত জল পৌঁছে যায়। গঙ্গা আবার যখন কমে, তখন কূলের বাইরে এখানে ওখানে জল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। সেটা গঙ্গার প্রবাহের অন্তর্গত না হলেও, গঙ্গারই

একটা ভূতপূর্ব্ব অংশ। সেইরকম মানুষের আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। কোন কারণে আত্মার বিদ্যুৎ বৃদ্ধি হলে মানুষের শরীর ছাপিয়ে বাইরেও খানিকটা এসে পড়ে। আবার যখন কমে তখন আত্মা অর্থাৎ বিদ্যুতের কতক অংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাইরে থেকে যায়। সেই বাইরের অংশ সর্ব্বদাই মানুষের পেছু পেছু ঘুরে বেড়ায়। সে মানুষ যদি কুসংস্কারাপন্ন হয় তবে তাই দেখে ভূত মনে করে এবং ভয়ও পায়।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "তবে তারকব্রহ্মনাম জপ করাতে সে—ভূতই বলুন আর ইলেক্ট্রিসিটিই বলুন—অদৃশ্য হল কেন?"

সভাপতি মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন, "এইটে আর বুঝতে পারলেন না? গঙ্গার জল আবার যখন বেড়ে উঠে তখন কি হয়? সেই পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন অংশ প্রবাহের সঙ্গে আবার মিলে যায়, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। সেই রকম, তারকব্রহ্মনাম জপ করাতে সেই বাবুটির আত্মা অর্থাৎ ইলেক্ট্রিসিটি হু হু করে বেড়ে উঠলো আর অমনি বাইরের সে বিচ্ছিন্ন অংশটুকু যাকে তিনি ভূত মনে করেছিলেন, ভিতরের অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে গেল।"

এই মীমাংসা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলের মুখে চক্ষে একটা বিস্ময় ও প্রশংসার ভাব দীপ্ত হইয়া উঠিল। অনুচ্চস্বরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল, "সভাপতি মশাই কি সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন, আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তবে সেই গোরু দু'টো ও রকম করলে কেন? যদি বাস্তবিকই তারা কিছু না দেখে থাকবে তবে ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল কেন?"

সভাপতি বলিলেন, "গোরুর দেহটি একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যুন্মান যন্ত্র অর্থাৎ গ্যালভ্যানোমিটার। অতি অল্প পরিমাণ ইলেক্ট্রিসিটি কাছে এলেও গোরু তৎক্ষণাৎ জানতে পারে। এই কারণেই গোরুকেই হিন্দুধর্ম্মে পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই কারণেই মহাদেব এত জন্তু থাকতেও গোরুকেই তাঁর বাহন স্বরূপ নিযুক্ত করেছেন।"

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "সে কথা খুবই ঠিক। গোরুই যে মহাদেবের বাহন তা শাস্ত্রেই লেখা আছে। তস্য প্রমাণং যথা—"

এমন সময় ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারটা বাজিল। বাচস্পতি মহাশয়ের

প্রমাণপ্রয়োগে বাধা দিয়া সভাপতি বলিলেন, "অনেক রাত্রি হয়েছে। এবার সভাভঙ্গ করা যাক।"

সভ্যগণ তখন উঠিয়া বাহিরে আসিতে লাগিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, "মোহিতবাবুকে সে চিঠিখানা লিখে পাঠাতে মনে থাকবে ত?"

সভাপতি বলিলেন, "নিশ্চয়। কাল সকালে উঠেই চিঠি লিখে শিশিরবাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

সভ্যগণ বাহিরে আসিলেন। অত্যন্ত অন্ধকার। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই জনশূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়া, সেই রাত্রে যাইতে অনেকেরই হৃদয়যন্ত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবশ্য ভূতের ভয়ে নহে, কারণ ভূত নাই। গাছপালায় যদি কোথাও বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎখণ্ড লুকাইয়া থাকে, এই মনে করিয়া মাত্র।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ মোহিতলাল

কাছারিবাড়ীর সন্নিহিত একটি অনতিপ্রশস্ত কক্ষে মোহিতলালের বৈঠকখানা। ভিত্তিগাত্রে হিন্দুদেবদেবীর কয়েকখানি সুরঞ্জিত চিত্র লম্বিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামমোহন রায়েরও আলোকচিত্র দেখা যায়। কক্ষটির একদেশে একটি কাচের আলমারি—তাহাতে ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ। জানালার নিকট একখানি টেবিল, তাহার সম্মুখে একখানি চেয়ারে একজন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত বসিয়া রহিয়াছেন। নিকটে একখানি তক্তপোষে শতরঞ্চের উপর মোহিতলাল এবং কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার একজন বাঙ্গালী বন্ধু উপবিষ্ট।

প্রভাতকাল। জানালা-পথে মৃদু মৃদু বাতাস আসিতেছে। অভ্যাগত বন্ধুটি, মোহিতের সঙ্গে বসিয়া তর্ক করিতেছিলেন—পণ্ডিতজী মাঝে মঝে টিপ্পনী কাটিতেছিলেন। শেষোক্তের নিবাস মিথিলা—বহুদিন কলিকাতায় আছেন;—বাঙ্গালা ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভাল কহিতে পারেন না। ইনি জ্যোতিষী। বড়বাজারে একজন মাড়োয়ারির আশ্রয়ে বাস করেন—ক্রয়বিক্রয়-কার্য্যের শুভক্ষণ গণনা করিয়া দেন। মাঝে মঝে বঙ্গদেশের নানাস্থানে

পর্য্যটনও করেন। অনেক জমিদারের গৃহে বার্ষিক বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। যে সকল গৃহে বাঁধা বৃত্তি নাই—সেখানেও যান। অনেক স্থলেই বলেন—বাবুজীর 'নচ্ছত্র' এখন বড়ই খারাপ যাইতেছে, কিন্তু অমুক তিথির পর একটি অত্যন্ত শুভ 'নচ্ছত্রের' উদয় হইবে। সেইদিন প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিবার পুর্ব্বে বাবুজী যেন একটি সবুজ ফল—ডাব হইলেই ভাল হয়—বরুণ দেবতার নাম স্মরণ করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন এবং স্নান করিয়া উঠিয়া যুগল কর্ণে যেন কোনও লালবর্ণের ফুল ধারণ করেন। পণ্ডিতজী সামুদ্রিক বিদ্যায়ও নিপুণ। লোকের হাত দেখিয়া বলেন—বাল্যকালে আপনার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, প্রাণের আশা ছিল না। একবার উচ্চস্থান হইতে আপনার পতন হইয়াছিল।—কথাগুলি অধিকাংশ স্থলে মিলিয়াও যায়। পূজার পর বাহির হইয়া দুই তিন মাস পর্য্যটন করিয়া, কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতজী আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যান। তাঁহার পায়ে নাগরা জুতা। পরিধানে থান ধুতি—অঙ্গে পুরাতন বিবর্ণ তসরের একটি আংরাখা এবং মস্তকে একটি প্রবলপ্রতাপান্বিত পাগড়ী। পণ্ডিতজীর গোঁফ আছে, দাড়ী কামানো। আংরাখার পকেটে দুইটি পিতলের কৌটা আছে। একটি বড়, একটি ছোট। বড়টিতে তামাকের পাতা এবং ছোটটিতে চুণ থাকে। মাঝে মাঝে পণ্ডিতজী তামাকের পাতার সহিত চুণ মিশাইয়া বাম হস্তের উপরে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া সবলে মর্দ্দন করিতেছেন, এবং সেই পদার্থটি গুটি পাকাইয়া, নিম্নের ওষ্ঠ আকর্ষণ পুর্ব্বক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন। তামাকুর তীব্রতা-বশতঃ মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীর হাই উঠিতেছে এবং হাই আসিলেই তুড়ি দিয়া বলিতেছেন—সীতারাম, সীতারাম।

মোহিতলালের অভ্যাগত বন্ধুটির নাম প্রমথবাবু। ইনি মোহিতলালের সহপাঠী ছিলেন। এম-এ পাস করিয়া এখন একটি ডেপুটিগিরির আশায় আছেন। নভেম্বর মাসে পরীক্ষা হইবে—তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। একটি নমিনেশন যোগাড় হইবার ভরসা পাওয়া গিয়াছে। পূজার সময় দার্জ্জিলিঙে গিয়া বহু টাকা ব্যয় করিয়া প্রমথবাবুর পিতা বড় বড় সাহেবসুবাকে ডালি দিয়া আসিয়াছেন। প্রমথবাবুর একটি বয়স্থা অবিবাহিতা ভগ্নী আছে—তাহার সহিত মোহিতের বিবাহ সম্বন্ধ করিলে সফলতার আশা আছে কিনা ইহাই নির্ণয় করিবার গোপন অভিসন্ধিতে প্রমথবাবুর আগমন।

ভিত্তিলগ্ন ঘড়ীতে সাতটা বাজিল। একজন ভৃত্য এক পেয়ালা গরম চা আনিয়া দাঁড়াইল। প্রমথবাবু তক্তপোষ হইতে উঠিয়া, টেবিলের পার্শ্বস্থ একখানি কাঠের বেঞ্চিতে বসিলেন এবং চা পান করিতে লাগিলেন। তক্তপোষে বসিয়া পান করিলেন না অথবা পেয়ালা পিরীচ টেবিলের উপরেও রাখিলেন না—মোহিতলাল সেটা অনাচার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে, প্রমথবাবুর মনে এ আশঙ্কা ছিল। চা পান করিয়া, ভৃত্যের আনীত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার তক্তপোষে উপবেশন করিলেন। স্বীয় নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রু কলাপে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন, "তার পরে—কি কথাটা হচ্ছিল? হঁ্যা—তুমি যে বললে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে, সংসারবন্ধনে থেকে হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে—সেটা কিন্তু তোমার মহা ভুল। মানুষ এই গৃহস্থাশ্রমে থেকেই ধর্ম্মচর্চ্চা করতে পারে, ভজনসাধন করতে পারে—নিজের মুক্তির উপায় করে নিতে পারে। তার জন্যে মানুষের বনে যাবার আবশ্যক হয় না। কি বলেন পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বলিলেন, "ঠিক বাত বাবুজী। খুব ঠিক। দেখিয়ে জনকজী মহারাজ কেত্তা ভারি মাহাৎমা থেঁ—রাজর্ষি থেঁ—গৃহী ভি থেঁ।"

মোহিত বলিলেন, "গৃহে থেকেও ধর্ম্মাচরণ করা যায় তা মেনে নিলাম। কিন্তু ধার্ম্মিক গৃহী ব্যক্তি যে গতিলাভ করে, সংসারত্যাগী তপস্বী কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গতিলাভ করে না? শাস্ত্রে দেখা যায়, তপস্যাপরায়ণ মুনিঋষিরা, সংসারের কোলাহল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করতেন।"

প্রমথবাবু বলিলেন, "তপস্যা করতে হলে বনেই যে যেতে হবে এমন কোন মানে নেই। আমি বলি, গৃহে বসেও তপস্যা হতে পারে—আর, সেই তপস্যাতেই বেশী ফল। সংসারের মোহ মায়া লোভ মদ মাৎসর্য্য এ সমস্ত কাটিয়ে উঠে যে তপস্যা, তাই প্রকৃত তপস্যা। বনে গিয়ে তপস্যা, সে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিলাভ।"

মোহিত বলিলেন, "দেখ তপস্যা জিনিষটে যে কি তা পূর্ব্বে বুঝতে হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে তপস্যা তিন প্রকার। শারীর, বাঙ্ময়, আর মানস। এই তিন প্রকার তপস্যা কি? না—

সুরবিপ্রগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজা পাবিত্র্যমার্জ্জবম্।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যং চ শারীরং বিদ্ধি তত্তপঃ॥

সত্যং প্রিয়ং হিতং বাক্যং যতো নোদ্বিজতে জনঃ।
বেদাদ্যভ্যসনং চাপি তপো বাঙ্‌ময়মুচ্যতে ॥
সৌম্যতা চেতসঃ শুদ্ধির্মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্বভাবস্থ পরাশুদ্ধিরুচ্যতে মানসং তপঃ ॥

অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বিদ্বানজনের পূজা, পবিত্রতা, সৎপথচারিতা অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্য এই শারীর তপ বলে জানবে। যাতে কারু মনে দুঃখ না হয় এই রকম সত্য প্রিয় এবং হিত বচন, বেদাদি শাস্ত্রের অভ্যাস—এই হল বাঙ্‌ময় তপ। সৌম্যভাব, চিত্তশুদ্ধি, মৌন অর্থাৎ ব্যর্থভাষণ না করা, ইন্দ্রিয় দমন, স্বভাবকে যারপরনাই শুদ্ধ রাখা—সেই মানস তপ।—এখন দেখ, গৃহী ব্যক্তি শারীর তপ পুরোমাত্রায় করতে পারে কিনা। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, বিদ্বানজনের পূজা না হয় করলে, কিন্তু সংসারাশ্রমে থেকে সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করা, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য পালন—এ সব কি সে পেরে উঠবে? সংসারে যে থাকবে, তাকে বিবাহ করতে হবে, তার সন্তানাদি হবে, তাদের ভরণপোষণের জন্যে তাকে অর্থ উপার্জ্জন করতে হবে—সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা, অহিংসা, স্বভাবের পরাশুদ্ধি তার দ্বারা কেমন করে সম্ভব? সংসারের চারিদিকে ঘোর অপবিত্রতা। মানুষ যতই সাবধান হোক, এত অপবিত্রতার মাঝখানে বাস করে নিজেকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।"

পণ্ডিতজী বলিলেন, "ঠিক বাবুজী। ঠিক ঠিক। প্রভু তুলসীদাসজী একটি দোঁহায় বলিয়াছেন—একটা ঘরের চারিদিকে দেওয়ালে যদি কালি মাখানো থাকে এবং একজন লোক সেই ঘরে নিয়ত বাস করে—তবে সে লোক যতই সাবধানে থাকুক, তাহার গায়ে কালি লাগিবেই লাগিবে।"

প্রমথবাবু বলিলেন, "দেখ, তোমার ও সব তপস্যা, মুক্তি টুক্তি মনের ভ্রম মাত্র। রবিবাবু লিখেছেন—

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি?
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পোরে
বাঁধা সবার কাছে।

দেখ ভাই, আমি তোমার মতন শাস্ত্র টাস্ত্র পড়িনি। আমার সহজ বুদ্ধিতে এই মনে হয়, যখন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছি, তখন মানুষের এই দুঃখ কষ্ট, পাপ

তাপ, যদি কিছুমাত্র কমাতে পারি, মানুষের স্বাস্থ্যের, জ্ঞানের, সুখের অংশ কিছুমাত্র যদি বাড়াতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক, তবেই আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হল।"

মোহিত বলিলেন, "তুমি হিন্দুসন্তান হয়ে মুক্তি স্বীকার কর না?—আত্মার অস্তিত্বও তা হলে স্বীকার কর না?"

"আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, মুক্তির আবশ্যকতা স্বীকার করা হল না। বনে গিয়ে গাছের পাতা খেয়ে, চারিদিক আগুন জ্বালিয়ে ঊর্দ্ধপদে হেঁট-মুণ্ডে তপস্যা করলে তবে আত্মার মুক্তি হবে, তা তো স্বীকার করিইনে।"

"তুমি খৃষ্টান মিশনারির যুক্তি অবলম্বন করছ। কেউ কি বলছে গাছের পাতা খাওয়া আর চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে ঝুলে থাকাই মুক্তির উপায়? নির্জ্জনে গিয়ে একমনে ঈশ্বরের ধ্যান করবার জন্যই মুনি ঋষিরা বনে যেতেন। মুক্তি জিনিষটে কিছু হাতী ঘোড়া নয়। শরীরেন্দ্রিয়াভ্যাং আত্মনো মুক্তত্বং মুক্তিঃ। বেদান্তের মতে নিত্যসুখাবাপ্তিই মুক্তি। নৈয়ায়িকদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। শেষ কথাটা একই দাঁড়াল। বেদান্ত-রামায়ণে লেখা আছে—

সমাধিস্থো হৃদি সুখী ক্রীড়তে যঃ প্রকাশতে।
ব্রহ্মভাবং স সম্প্রাপ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ যে সমাধিস্থ পুরুষ, মনে সুখী থাকে, মনে ক্রীড়া করে, মনেই প্রকাশিত থাকে, সেই পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে।"

প্রমথবাবু না দমিয়া বলিলেন, "ও ত হল আত্মসুখ। নিজের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, নিজের নিত্য সুখাবাপ্তি। একে কিন্তু আমি মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য বলিনে।"

"তবে তোমার মতে কি উচ্চতম লক্ষ্য?"

"লোকসেবা। যে দুঃখী, তার দুঃখমোচনের চেষ্টা। যে রোগী—তার রোগযন্ত্রণার উপশম করবার চেষ্টা। যে অজ্ঞান, তাকে জ্ঞানের আলো প্রদান করা। আমার মতে লোকসেবাই মানুষের পরম ধর্ম্ম।"

মোহিত বলিলেন, "লোকসেবা?—লোকসেবা সৎকার্য্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকসেবা মানুষের পরম ধর্ম্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিনে। এ কথা তুমি ইংরিজি পড়ে বলছ।"

পণ্ডিতজী বলিলেন, "হাঁ বাবুজী! ইহা অত্যন্ত ঠিক কথা। লোকসেবা হিন্দুর ধর্ম্ম, এ কথা কোন পুঁথিতে দেখি নাই। তবে যদি বলেন গো-সেবা—হাঁ, সেটা আলবৎ হিন্দুর ধর্ম্ম বটে। আমি একবার গোরক্ষিণী সভায় এ সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিয়াছিলাম। চাঁদা আদায়ের জন্য অনেক স্থানে ঘুরিয়াছিলাম—কিন্তু বেশী আদায় করিতে পারি নাই। ইংরাজী পড়িয়া আজকাল কেহই আর হিন্দুধর্ম্ম মানে না। আজকাল অনেক বড়লোক আছে, যাহারা বাড়ীতে সাধু সন্ন্যাসী আসিলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিলে একটা সিকি দেয় না—কিন্তু হাঁসপাতালে হাজার টাকা চাঁদা দেয়। বাপের শ্রাদ্ধ সংক্ষেপে সারে—কিন্তু কোথাও দুর্ভিক্ষ হইলে তাহার চতুর্গুণ খরচ করে। অন্নদান মহাদান বটে, কিন্তু সে কি ডোম চামার কুর্ম্মী কাহারকে অন্নদান?—সাধু সন্ন্যাসী পণ্ডিত জ্যোতিষীকে অন্নদানই পুণ্য।"

পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া মোহিতলাল ও প্রমথবাবু উভয়েই অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ তর্ক বিতর্কে বেলা নয়টা বাজিল। তখন একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "ছোটবাবু, একটি লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"কে?"

"সাজিয়াড়া গ্রামের একজন প্রজা।"

"আচ্ছা, আসতে বল।"

ক্ষণপরে নাতিস্থূল, মধ্যবয়স্ক একটি লোক প্রবেশ করিয়া, নতভাবে মোহিতলালকে প্রণাম করিল। তাহার গায়ে একটি চুড়িদার পিরিহান, গলদেশ বেষ্টন করিয়া একখানি আধময়লা উড়ানি।

মোহিতলাল লোকটিকে দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞে, শ্রীরমণচন্দ্র ঘোষ। সাজিয়াড়া গ্রামে নিবাস।"

"কি মনে করে এসেছ?"

রমণ ঘোষ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "আমি একটু কাযে সদরে গিয়েছিলাম—সেখানে আমার উকীলের ছেলে, শিশিরকুমার-বাবু, হুজুরের নামে এই চিঠিখানি দিয়েছেন।"—বলিয়া রমণ ঘোষ পত্রখানি মোহিতলালের হস্তে অর্পণ করিল।

মোহিত পত্র লইয়া, খালি বেঞ্চিখানি দেখাইয়া রমণ ঘোষকে বসিতে বলিলেন। রমণ উপবেশন করিল।

মোহিতলাল নীরবে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্র শেষ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ডাকে উত্তর দেব এখন।"

রমণ ঘোষ হাতটি যোড় করিয়া বলিল, "সে আজ্ঞা করবেন না। তাঁরা আমাকে বলে দিয়েছেন, কোন রকম ওজর আপত্তি তাঁরা শুনবেন না। শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিনে হুজুরকে সেখানে পৌঁছতেই হবে। নইলে তাঁরা সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হবেন। আমাকে তাঁরা বলে দিয়েছেন, নিমন্ত্রণস্বীকারপত্র নিয়ে তবে তুমি আসবে। আমাকে আবার পরশু খুলনায় যেতে হবে।"

একথা শুনিয়া মোহিতলাল একটু চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"এখন ত আমার চিঠি লেখবার সময় নেই। যেতে পারব কিনা, সেটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। তুমি তবে খুলনা যাবার আগে একবার এখানে হয়ে যেও। যা হয় একটা উত্তর লিখে দেব।"

রমণ ঘোষ দণ্ডায়মান হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "হুজুর—যা-হয়-একটা উত্তর লিখলে হবে না। আপনি যদি যেতে অস্বীকার করেন, তবে তাঁরা আমার উপর বড়ই অসন্তোষ হবেন। আমি কাল বৈকালে এসে হুজুরের চিঠি নিয়ে যাব।"

মোহিত বলিলেন, "আচ্ছা—তা কাল বৈকালেই এস। দেখা যাবে।"

রমণ ঘোষ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তখন আবার প্রমথবাবুর সহিত মোহিতলালের তর্ক আরম্ভ হইল।

প্রমথবাবু বলিলেন, "দেখ তুমি যে মুক্তি মুক্তি করে পাগল হচ্চ, এটা কেবল মরীচিকা। আত্মা থাকলে ত তার মুক্তি হবে ?—আত্মা যে আছে তার প্রমাণ পেয়েছ ?"

মোহিত বলিলেন, "কি প্রমাণের কথা বলছ ? চোখে অবশ্য দেখিনি—অন্য কেউও দেখেনি। তার প্রধান কারণ এই যে আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণের জিনিষ নয়।"

"অন্য কোনও রকম প্রমাণ পেয়েছ ?"

"প্রমাণ আপনার মনের মধ্যে। আদিকাল থেকে, সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস দেখা যায় যে মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র সত্বা থাকে। সত্য,

অসভ্য, সকল জাতির লোকের মনে, এই একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব শেষ হয়ে গেল তা নয়। মৃত্যুর পর যদি একটা কিছু না থাকবে, তা হলে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মনে এ বিশ্বাস কোথা থেকে এল? মানুষের যেমন পিপাসা আছে, তেমনি জল আছে; যেমন ক্ষুধা আছে, তেমনি খাদ্য আছে—সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি আছে। যদি পরলোক না থাকবে, তবে পরলোক সম্বন্ধে এমন আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে কেন?"

এই কথা শুনিয়া প্রমথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"অসভ্য জাতির মনে পরলোকের ধারণা কেমন করে হয়েছে, তা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, যে সকল কারণে মানুষ অধিক স্বপ্ন দেখে, অসভ্যদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সে সকল কারণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অত্যধিক ক্ষুধা আর অত্যধিক ভোজন তাদের সর্ব্বদাই হয়ে থাকে। হয়ত জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়েছে, দু'দিন খেতেই পেলে না। আবার যখন খেলে, দুদিনের খাওয়া খেয়ে নিলে। তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যা দিলে 'বাবা' স্বপ্ন দেন, তা নয়। তুমি দুদিন না খেয়ে এই ঘরে শুয়ে থাক, দেখ কেমন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন হয়। আবার, গুরুভোজনেও সেই রকম হয়। একজন অসভ্য, সমস্ত দিন না খেয়ে শিকার তাড়া করে বেড়িয়ে, রাত্রে এক জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখলে যেন সে শিকারে বেরিয়েছে, মস্ত একটা হরিণ মারলে, তাকে কেটে কুটে রান্না চড়িয়ে দিলে, খেতে আরম্ভ করবে এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল! কিম্বা হয়ত পরদিন আকণ্ঠ ভোজন করে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখলে যেন একটা ভালুক তাকে তাড়া করেছে। ভালুক এসে তাকে ধরলে। সে চীৎকার করে উঠল, ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলে—'কেন রে তুই চেঁচালি, তোর কি হয়েছে?'—অসভ্য, স্বপ্ন কাকে বলে জানে না। 'স্বপ্ন দেখেছি'—একথা সে ভাবতেই পারলে না। সে বললে 'আমি অমুক অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, এমন এমন হল, তার পর একটা ভালুক তাড়া করে এসে আমায় ধরলে।' সঙ্গীরা বললে—'দূর—তুই ত বরাবরই এইখানে শুয়ে ছিলি।'—প্রতিদিন এই রকম নানা লোকের নানা ঘটনা থেকে, অসভ্যদের মনে ক্রমে বিশ্বাস হল, এই 'আমি' ছাড়া 'আর একটা আমি' (Other self) আছে। সেই অন্য আমিটাকে ক্রমে আত্মা বলে ধারণা হল।"

মোহিতলাল বলিলেন, "তা হয়ই যদি—হতে বাধা কি ?"

প্রমথবাবু বলিলেন, "বিলক্ষণ !—তুমি বলতে চাও যে মানুষের আত্মা শিকার করে বেড়ায়, ভালুকে তাকে ধরতে পারে ? সে যদি তীর ধনুক ছুঁড়তে পারে এবং ভালুকে যদি তাকে ধরতে পারে, তাহলে ত সে আত্মা জড়দেহবিশিষ্ট। তুমি কি আত্মাকে জড়পদার্থ বলে স্বীকার কর ?"

"অবশ্যই না। কিন্তু অসভ্যদের ভ্রান্তধারণা থেকে ক্রমে সভ্যজাতির উন্নত সত্যধারণা উৎপন্ন হয়।"

প্রমথবাবু বলিলেন, "আমার বক্তব্য হচ্ছে এই। তুমি বললে, পরলোক এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা, একটা আকাঙ্ক্ষা, মনুষ্যসৃষ্টির আদিকালেও বর্ত্তমান ছিল। আমি দেখাচ্ছি—সেটা, আমরা আত্মা বলতে যা বুঝি, সে ধারণা মোটেই নয়। সেটা সম্পূর্ণ জড়বাদ। এখনও অনেক অসভ্য জাতি আছে, যারা বাপ মা মরলে, কবরের ভিতর খাবার, কাপড় এ সবও পুঁতে দেয়। তাদের ধারণা আমার মার আত্মা এই খাবার খাবে, এই কাপড় পরবে। বেশী দিনের কথা নয়, মাদাগাস্কারের রাণী মরে গেলে, কবরের ভিতর বিস্তর রেশমের পোষাক, অলঙ্কার, কাঁচের বাসন, টেবিল, চেয়ার, একটা বাক্স করে তেত্রিশ হাজার টাকা, রাণীর দেহের সঙ্গে পুঁতে দিয়েছিল।"

মোহিত বলিলেন, "ওটা ভুল, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখ, এ জীবনের পরে আরও একটা জীবন আছে, এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে এল ?"

"আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তার পরিতৃপ্তি আছে, এই তুমি বলতে চাও ? স্পেন্সারের সোসিওলজিতেই লেখা আছে, ভিন্ন ভিন্ন অসভ্যজাতির স্বর্গের 'প্রধল আকাঙ্ক্ষা' কিরূপ ভিন্ন। পাটাগোনিয়গণের 'প্রবল আকাঙ্ক্ষা', স্বর্গে গিয়ে তারা দিবারাত্রি এত মদ খেতে পাবে (to enjoy the happiness of being eternally drunk) যে, অনন্তকালেও সে নেশা ছুটবে না। তুমি কি বলতে চাও, তাদের জন্যে পরলোকে নিশ্চয়ই ঐ ব্যবস্থা আছে, তাই মনে এ-প্রবল আকাঙ্ক্ষা ?—তোমার এ প্রবল আকাঙ্ক্ষাবাদের উত্তর, জন ষ্টুয়ার্ট মিল বেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—একজন কেরাণী যখন ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢোকে, তখন তার মনে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে যে এককালে আমি এই আপিসের বড়বাবু হয়ে মাসে তিনশো টাকা রোজগার করব। অথচ দেখা যায় অধিকাংশ কেরাণীর জীবনে সে প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় না।"

"এ থেকে কি প্রমাণ হল ?"

"এ থেকে এই প্রমাণ হল যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তার যে একটা পরিতৃপ্তি নিশ্চয়ই আছে, সে ধারণা ভুল।"

এ কথা শুনিয়া মোহিত কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ, তর্কের দ্বারা এ সব জিনিষের মীমাংসা হয় না। চিরকাল এ-সকল বিষয়ে তর্ক চলে আসছে, আজও মীমাংসা হয়নি। কোন কালে যে হবে, এমন সম্ভাবনাও অল্প। তর্কের দ্বারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা আমি যে এ সব বুঝতে পেরেছি, তা নয়। আমাদের প্রণম্য প্রাচীন মুনি ঋষিরা বলে গেছেন, তাই আমি ভক্তিভরে তাঁদের কথায় বিশ্বাস করি।"

এইবার প্রমথবাবুও নিরুত্তর হইলেন। মোহিতলালের উক্তিতে এমন একটা সরলতা ও দৃঢ়তা ধ্বনিত হইয়া উঠিল যে তাহার কোনও রূপ প্রতিবাদ করিতে তিনি সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন।—তর্কের গতি অন্য পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে প্রমথবাবু পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "মহারাজ, আপলোক জ্যোতিস গণনা করকে যো সব বাৎ বোলতেহেঁ—কুছবাৎ ঠিক নেহি হোতা কেঁউ ?"

তখন পণ্ডিতজীর সঙ্গে প্রমথবাবুর তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ রত্নে রত্নে পরিচয়

যে সময় মোহিতলালের বৈঠকখানায় গত পরিচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বালোচনা চলিতেছিল, তৎকালে কক্ষান্তরে, গোপীকান্তবাবুর মস্তিষ্ক ভিন্ন প্রকার ভাবের দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। বাবু একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ফরাস বিছানার উপর বসিয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া, আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন—তাঁহার সম্মুখে একখানা খোলা চিঠি পড়িয়াছিল।

দুই তিন বার আলবোলার নলে জোরে সুখটান টানিয়া গোপীবাবু পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পাঠান্তে, সেখানি আবার ফেলিয়া দিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পত্রখানিতে বিশেষ এমন কিছু লেখা ছিল না—কেবল, দরিয়াপুরের নায়েব মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় দুই মাসের নিমিত্ত বিদায়ের প্রার্থনা করিয়াছিল।

মথুরানাথ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন আমলা, তাহার স্থানে কাহাকে নিয়োগ করিয়া পাঠাইবেন, ইহাই গোপীবাবুর চিন্তার বিষয়। দরিয়াপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বোপরি অত্যন্ত বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমন একটি লোক গোপীবাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, অথচ মথুরানাথের বিদায়ের আবেদন মঞ্জুর না করিলেই নয়—সে বড় বিপন্ন।

গদাধরের মানসী মূর্ত্তি গোপীবাবুর মনশ্চক্ষে সমুদিত হইল। এ কয়দিনে তিনি লোকটির সামান্য যাহা পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে চতুর ও বিশ্বাসী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তথাপি নূতন লোক। সে কি নির্ভরযোগ্য? একটা কথা এই যে, সে নূতন কর্ম্মে ভর্ত্তি হইয়াছে, নিজ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় বিশ্বাস রক্ষা করিতে যত্নবান হইতে পারে। লোকটি অত্যন্ত চাপা, কথা বেশী কহে না। এও একটা সদ্‌গুণের মধ্যে। তাহাকে ডাকিয়া একবার কথা পাড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

সুতরাং গোপীবাবু গদাই পালকে তলব করিলেন। গদাই সেরেস্তায় বসিয়া আপন কর্ম্ম করিতেছিল, বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া একটু শঙ্কিতপদে ধীরে ধীরে আসিয়া দর্শন দিল। অত্যন্ত নত হইয়া প্রণাম করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

আলবোলার নলে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে বাবু বলিলেন, "গদাধর, তুমি নায়েবী কর্ম্ম জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখনও করেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদরের নায়েবী, মফস্বলের নায়েবী, ও সব আমার করা আছে, জানা আছে।"

"পূর্ব্বে কোথায় কর্ম্ম করতে বলেছিলে?"

"আজ্ঞে, হুগলি জেলায় রমানাথ বসু মশায়ের ইষ্টেটে। তিনি এখন গত হয়েছেন। তাঁর পুত্র এখন গদি পেয়েছেন।"

বাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্যদিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গদাই পালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, জমিদারী কর্ম্মে সময় সময় অনেক রকম ছল চাতুরী করতে হয়। ঠিক যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে নিক্তির ওজনে ন্যায়মত কর্ম্ম করে জমিদারী চালানো, তা একালে অসম্ভব। সেটা জান ত?"

গদাধর উত্তর না করিয়া, ভূমিতলে দৃষ্টি করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দেখিয়া বাবু সন্তুষ্ট হইলেন। সে যদি লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বলিত—'হাঁ হুজুর—আমি তাতে পিছপাও নই'—তাহা হইলে গদাই পালের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধ হইতেন। বলিলেন—"তুমি প্রবীণ হয়েছ, এসব অবশ্যই তোমার জানা আছে। আজকাল ইংরেজের রাজ্য, আইন কানুন বড় শক্ত। বিষয় কার্য্যেরও ক্ষতি না হয়, মনিবেরও মান ইজ্জৎ বজায় থাকে, এই দুইদিক সামলে যে আমলা চলতে পারে, সেই দক্ষ বলে গণ্য হয়। তার উন্নতি হয়, পদবৃদ্ধি হয়।"

গদাই ধীরে ধীরে, অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল, "আজ্ঞে আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—তবে এইটে বুঝি, যার নুন খাচ্ছি, প্রাণ দিয়েও তার উপকার করতে হবে। হুজুর এখনি মনিবের মান ইজ্জত বাঁচিয়ে চলবার কথা বললেন। কথাটা যখন তুললেন তখন নিবেদন পাই—মনিবের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে, এ অধম ছ'টি বচ্ছর জেল খেটে এসেছে।"

গোপীবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি জেল খেটে এসেছ?"

গদাই সগর্ব্বে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন, ব্যাপার কি হয়েছিল?"

"আজ্ঞে, একটা দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল, খুন হয়ে গিয়েছিল। একেবারে সঙ্গীন মামলা। মনিবের দোষ আমি নিজের ঘাড়ে নিয়ে ছ' বচ্ছর জেল খেটে এসেছি। এতদিন এ কথা প্রকাশ করিনি—আজ কেবল হুজুর কথাটা তুললেন বলেই বললাম।"

গোপীবাবুর মন গদাধরের প্রতি অত্যন্ত ভাবসিক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন হাঁ—এই আদর্শ ভৃত্য বটে। এতক্ষণ গদাধর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। গদাই ফরাসের বাহিরে উপবেশন করিল। বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেল থেকে কতদিন হল বেরিয়েছ?"

"বেশী দিন না। গত ভাদ্র মাসে।"

"তুমি যখন জেলে, সেই সময় বুঝি তোমার পুরোণো মনিব মারা গেলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর শ্রীচরণ আর দেখতে পাইনি।"—বলিয়া গদাই মুখের ভাবটি অত্যন্ত কাঁদোকাঁদো রকম করিল।

গোপীবাবু বলিলেন, "বুঝেছি। নইলে আর তোমাকে অন্যত্র চাকরির

জন্যে আসতে হয়! তিনি বেঁচে থাকলে কি তোমার মত চাকরকে ছাড়েন?—তা, তাঁর ছেলে তোমার কদর বুঝলে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি আমায় রাখবার জন্যে খুব জেদাজেদি করেছিলেন। ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম কিনা—চাকর হলেও আমায় গদাইকাকা বলে ডাকেন। বললেন গদাইকাকা, তুমি না থাকলে আমার বিষয় সম্পত্তি লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে আমার আর মন টিকলো না। প্রথমত যে মনিবের জন্যে প্রাণ দিতেও কাতর ছিলাম না, সে মনিবই নেই। তার পর, জেলে থাকতে থাকতে আমার পরিবারেরও কাল হয়েছিল—জেল থেকে বেরিয়ে তাকেও দেখতে পাইনি। পৈত্রিক আমলের যে বাড়ীখানি ছিল, সেখানিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এই সব নানা কারণে সেখানে আর মন টিকলো না। তাই বেরিয়ে পড়লাম। একটা পেট বইতো নয়, যেখানে যাব, সেখানেই এক মুঠো ফেনেভাতে জুটবে। হুজুরের নাম শুনে এসেছিলাম—আসবা মাত্রই হুজুরের দয়াও হয়ে গেল—আশ্রয় পেলাম।"

গোপীবাবু অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার মতন একজন কর্ম্মচারী পাওয়া আমার পক্ষে খুবই লাভ, কিন্তু তোমায় অত সহজে ছেড়ে দেওয়া তোমার সে মনিবের ছেলের উচিত হয়নি।"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে সে রকম পীড়াপীড়ি যদি করতেন—যদি বলতেন আচ্ছা তোমার বাড়ী পড়ে গেছে, আমি নিজ ব্যয়ে তোমার বাড়ী তৈরি করে দিচ্ছি—কিম্বা যদি বলতেন, আহা, আমাদের জন্যে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আচ্ছা এই পাঁচশো টাকা নাও, তোমায় বখশিস করলাম—তা হলে কি করতাম বলা যায় না। আসল কথা কি জানেন হুজুর—সে সব পুরোণো আমলে দিন-কাল এক অন্য রকম গিয়েছে। মনে ভাবলাম, কর্ত্তার আমলে যে রকম মান ইজ্জতের সঙ্গে কাটিয়েছি, নূতন আমলে কি আর সে রকমটি হবে? আজকাল এই সব ইংরিজীনবীশ কালেজী ছোকরাদের আমি বড় ডরাই। সাপকে, বাঘকে, ক্ষ্যাপা শেয়ালকে যেমন ডরাই—এই অল্পবয়সে চোখে সোণার-চশমা-আঁটা ছোকরাদেরও সেই রকম ডরাই। কেন বলতে পারিনে, কিন্তু মনে মনে কেমন একটা আতঙ্ক আছে।"—বলিয়া গদাই চুপ করিল।

চশমাধারী কালেজীয় যুবকের প্রতি গদাই পালের এই অশ্রদ্ধায়, গোপীবাবুর মনোবীণায় একটি অনুকূল তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, গদাই

পালকেই দরিয়াপুরের নায়েবী কর্ম্মে একটিনি করিতে পাঠাইবেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে, আমাদের একটা বড় মৌজা আছে। সে গ্রামের নাম দরিয়াপুর। সে মহালে বছরে পাঁচ ছ' হাজার টাকা তসীল। সেখানকার নায়েব মথুর মুখুর্য্যে দু'মাসের বিদায়ের জন্যে আবেদন করেছে, তার ছেলের বড় পীড়া, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে চায়। তার সেই কাযটি তুমি দু'মাস কর।"

হাতদুটি যোড় করিয়া গদাধর বলিল, "হুজুর মা বাপ। যা আজ্ঞে করবেন, চাকর তাই করবে।

বাবু বলিলেন, "তুমি এখন বুঝি পনেরো টাকা বেতন পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যে দু'মাস তুমি একটিনি করবে, মথুর মুখুর্য্যের যা পুরো বেতন, মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে পাবে। তোমার কায কর্ম্মে আমি যদি সন্তুষ্ট হই, ক্রমে মফস্বলের কোন মহালের নায়েবী পদ খালি হলেই তোমায় পাকা করে দেওয়া যাবে।"

গদাধর হাতদুটি যোড় করিয়া নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে ধূমপান করিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ, সে মহাল সম্বন্ধে একটা গোপনীয় কথা আছে। দেখ দেখি, বাইরে কেউ নেই ত?"

গদাধর বাহিরে গিয়া, বারান্দায় একটু ঘুরিয়া আসিল। বলিল—"আজ্ঞে, কেউ নেই।"

"আচ্ছা, কাছে সরে এসে বস।"

বাবু যে জাজিমের উপর বসিয়া ছিলেন, তাহার বাহিরে শুধু চাদরের উপর গদাই সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিল। বাবু স্বর নামাইয়া বলিলেন, "দেখ, ঐ দরিয়াপুর মৌজাতে একঘর গোয়ালা আছে। তারা দুই ভাই ছিল, কেনারাম ঘোষ আর বেচারাম ঘোষ। ছোট ভাই বেচারাম একটি যুবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, সন্তানাদি কিছুই হয়নি। কেনারাম, ছোট ভাইয়ের জমি-জমাগুলি ভোগদখল করছে, অথচ সেই অনাথা বিধবা ভাজটাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিত। দুবেলা পেট ভরে খেতে দিত না, মারত, তার যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা ছিল না। কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। কোনও স্থানে এখন সে লুকোনো আছে। তুমি গিয়ে সে

কেনারামের উপর খুব খর নজর রাখবে। অথচ সে যেন জানতে না পারে। যদি দেখ সে থানা পুলিসে যাচ্ছে, কিম্বা সদরে যাচ্ছে—তৎক্ষণাৎ আমায় খবর দেবে। বুঝতে পেরেছ?

গদাই বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি। সে ঠিক হবে এখন। কোনও চিন্তা করবেন না। যাতে সে সাত জন্মে কোনও সন্ধান না পায় এমন উপায় আমি করব।"

এ কথা শুনিয়া গোপীকান্তবাবুর মনে একটু কৌতূহল জন্মিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপায় করবে?"

"আজ্ঞে, তার অনেক উপায হতে পারে। আপাততঃ একটা যা মাথায় আসছে, নিবেদন পাই। অপরাধ নেবেন না, সে স্ত্রীলোকটার নাম কি?"

গোপীবাবু বলিলেন, "নামে প্রয়োজন কি?"

"আজ্ঞে প্রয়োজন আছে, একখানা চিঠি তৈরি করব ভাবছি।"

"তার নাম গঙ্গামণি।"

"আজ্ঞে আপাততঃ মৎলব করছি, গঙ্গামণির নামে একখানা চিঠি আগে থেকে তৈরি করে রাখব। দরিয়াপুরে গিয়ে দু' চার দিন পরে, একদিন কেনারামকে ডেকে পাঠাব। এলে নির্জ্জনে তাকে বলব—'কেনারাম, তোমার কি এক ভাই ছিল, বেচারাম বলে?'—সে বলবে—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—আমি বলব—'ভাই তোমার মরেছে নাকি?'—সে বলবে—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—'সে ভাইয়ের ওয়ারিশ কে?'—খুব সম্ভব সে বলবে—'আজ্ঞে, ওয়ারিশ আমি।'—আমি বলব—'তার এক স্ত্রী আছে না?'—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—আমি তখন বলব—'তা হলে ওয়ারিশ তুমি কি করে? ওয়ারিশ হল সেই স্ত্রী। বেচারামের হিস্যায় যা কিছু জোৎ জমা আছে, জীবৎমানে সেই স্ত্রীই ভোগ করবে। সে মরে গেলে তুমি তার ওয়ারিশ। এই হচ্চে দায়ভাগের মত—গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও লেখা আছে।'—এই কথা শুনে সে একটু থতমত খেয়ে যাবে। আমি তখন হাতবাক্স থেকে সেই চিঠিখানি বের করে, চশমাটি চোখে দিয়ে মনে মনে পড়ব। শেষে বলব—'দেখ কাশী থেকে এই চিঠিখানি এসেছে। পড়ি শোন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ শরণং। মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, দরিয়াপুর কাছারির নায়েব মহাশয় প্রবলপ্রতাপেষু। পরে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল হয় বিশেষ। আমি অনাথা স্ত্রীলোক। দরিয়াপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়।

আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা হইয়া অবধি আমি আমার ভাসুর কেনারাম ঘোষের সংসারে ছিলাম। কিন্তু তাহারা আমায় খাইতে পরিতে দিত না, অধিকন্তু বিষ খাওয়াইয়া আমায় মারিয়া ফেলিবার মৎলব করিয়াছিল। সেই কারণে প্রাণভয়ে আমি গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। কাশীধামে আসিয়া দেবাদিদেব বাবা বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইয়াছি। নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেবদেবী দর্শন করিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমার খোরপোষের জন্য মাসে অন্ততঃ দশটি করিয়া টাকা প্রয়োজন। আমার মৃত স্বামীর হিস্যায় যে সকল জমিজমা আছে, তাহার সমস্ত উপসত্ব আমার ভাসুর কেনারাম ঘোষ লুটিয়া খাইতেছে। অথচ জীবৎমানে আমিই আমার স্বামীর হিস্যার মালিক। সেই জন্যই আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমি ইচ্ছা করিলে থানা পুলিশ করিতে পারিতাম, আদালত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা দেখি না। কোন মতে আমার খোরপোষ চলিলেই আমি নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিতে পারি। অতএব অধীনীর নিবেদন এই যে আমার নিজ হিস্যার উপসত্ব হইতে মাসে মাসে দশটি করিয়া টাকা উক্ত কেনারাম ঘোষের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইতে আজ্ঞা হয়। আপনি জমিদারের প্রতিনিধি, গ্রামের হর্তা কর্তা। আপনিই আমার থানা পুলিশ, আপনিই আমার মেজেষ্টার। এই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে দুঃখিনী বিধবার প্রাণরক্ষা হয়, কৃপাবলোকনে এমত উপায় করিবেন। ইতি শ্রীমত্যা গঙ্গামণি দাস্যা। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা শ্রীরামচন্দ্র হাজরা যাত্রীওয়ালা, কালীতলার মোড়, দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস সিটি।'—চিঠি শেষ করে বলব—'হ্যাঁরে বেটা—এই রকম তোর ব্যাভার? বিধবা ভাজটাকে খেতে না দিয়ে দেশছাড়া করেছিস? বিষ খাইয়ে তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টায় ছিলি? তুই ত দেখছি ভারী নরাধম! আমি যদি থানার দারোগাকে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিই, তবে তোর দশাটা কি হয় বল্ দেখি? এখনি কনেষ্টবল এসে, তোকে পিঠমোড়া করে বেঁধে, জুতো মারতে মারতে যে ধরে নিয়ে যায়। শেষে ৩০৭ ধারায় চালান হয়ে দশটি বচ্ছর শ্রীঘর।'—সে অবিশ্যি নিজের দোষ অস্বীকার করবে। তখন তাকে বলব—'যা, ঐ ঠিকানায় মাসে মাসে দশটি করে টাকা পাঠিয়ে দিস। সে যে লিখেছে, আমি যেন টাকা আদায় করে করে

পাঠাই, সে সব আমার দ্বারা হবে টবে না। আমার কি আর অন্য কায নেই? নিজের কাযই আমি করে উঠতে পারিনে—তা আবার পরের কায! আমি কি আদালতের পেয়াদা যে ডিক্রীজারি করে বেড়াব? তোর ভাজের হিস্সা থাকে সে আদালতে নালিস করুক গে।'—এই বলে চক্ষু গরম করে বসে থাকব। তার ভাজের সন্ধান কোন কালে ত পাবেই না, ৩০৭ ধারায় গ্রেপ্তার হাওয়ার ভয়ে থানা পুলিসেও যেতে পারবে না।"

গদাধর থামিল। গোপীকান্ত এতক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার আলবোলার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নল হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। গদাধরের উপস্থিতবুদ্ধি এবং তাহার চক্রান্তবিদ্যার পরিচয় পাইয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বাহ্যিক অত্যন্ত নিরীহ লোকটি—দেখা হইলেই প্রণাম করিয়া পাশ কাটাইয়া নতচক্ষে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার ভিতর যে এত চালাকি, গোপীকান্তবাবুর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। গদাধরের প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলেন, এটি একটি রত্নবিশেষ। ইহাকে কোন মতে হাতছাড়া করা হইবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন—"আচ্ছা গদাধর, যদি সত্যিই মণিঅর্ডার করে টাকা পাঠায়?"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে, তা সম্ভব নয়। টাকা জিনিষটে সহজে কেউ হাতছাড়া করে না। আর সেই জন্যেই তাকে বলে দেওয়া, ইচ্ছা হয় তুই পাঠাস, আমি ও সবের মধ্যে নেই। আর ধরুন যদি রামচন্দ্র হাজরার নামে টাকা পাঠায়ই—ঐ ঠিকানায় বাস্তবিকই রামচন্দ্র হাজরা বলে এক যাত্রীওয়ালা আছে সে সই করে টাকাগুলি আত্মসাৎ করে নেবে, তার জন্যে কোন চিন্তা নেই। রাম হাজরাকে আমি ভাল রকমই জানি।"

বাবু বলিলেন, "তা বেশ। তবে ঐ রকমই একটা কিছু ফিকির কোরো। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দেখে আমি খুব সন্তোষলাভ করেছি। শুধু দরিয়াপুরে একটিনি করবার দু'মাস নয়, আমি স্থায়ীভাবে তোমার বেতন মাসিক ৩০৲ ধার্য্য করে দিলাম। ভাল করে মন দিয়ে কায কর্ম্ম কর—তোমার আরও উন্নতি করে দেব।"

গদাধরের চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিল—"হুজুর মা বাপ, অধমের প্রতি এ স্নেহ যেন চিরদিন থাকে।"

"তা হলে পরশু তুমি দরিয়াপুর রওনা হও। মথুর মুখুর্য্যের কাছ থেকে

কাগজপত্র টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে কায সুরু করে দাও। পরশু থেকে তার ছুটি মঞ্জুর করলাম।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া গদাই প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল কাছারির বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দিয়া বগলে ছাতি রমণচন্দ্র ঘোষ বাহির হইয়া যাইতেছে। গদাই একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইল, যাহাতে রমণ ঘোষ তাহাকে দেখিতে না পায়।

রমণ সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে গদাই সেরেস্তায় গিয়া একজন সহকর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনি একটা লোক ছাতি বগলে বেরিয়ে গেল, কে হে?"

"সাজিয়াড়ার একজন প্রজা। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ।"

"খাজনা দিতে এসেছিল?"

"না। ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একটা দরকার ছিল বললে।"

"কি দরকার?"

"কি জানি, তা কিছু বললে না।"

"ওঃ"—বলিয়া গদাই নিজের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেদিন ক্রমাগত ভুল হইতে লাগিল, কারণ তখন তাহার মস্তিষ্কে ক্ষণে ক্ষণে নব নব কৌশলের আবির্ভাব হইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ গদাই পালের দুশ্চিন্তা

পরদিন বৈকালে গদাই পাল অন্য কর্ম্মচারীকে নিজ কাযকর্ম্ম, কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া, গোপীকান্তবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। বাবু তখন কয়েকজন বন্ধুসহ বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। গদাধর গিয়া দণ্ডায়মান হইল, তাহাকে দেখিয়াও প্রথমটা কিছু বলিলেন না। পাশার একটা চাল ভাবিতে ব্যস্ত ছিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া গদাই নিজেই বলিল, "হুজুরের হুকুম হয়েছিল কাল আমি দরিয়াপুর যাব।"

বাবু তখন তাহার প্রতি না চাহিয়াই বলিলেন, "কাল যাচ্ছ ?"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—কাল ভোরে রওনা হব।"

বাবু শুধু বলিলেন, "আচ্ছা—বেশ সাবধানে কাযকর্ম্ম কোরো"—বলিয়া পুনশ্চ পাশায় মনোনিবেশ করিলেন।

গদাই প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সদর রাস্তা হইতে নিজের বাসায় যাইবার পথে নামিবার সময় গদাই হঠাৎ দেখিতে পাইল, বগলে ছাতি রমণচন্দ্র ঘোষ কাছারি বাড়ীর অভিমুখে চলিয়াছে। রমণকে দেখিয়াই গদাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। সে চলিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গদাই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

বাসায় আসিয়া, হাত পা ধুইয়া, একছিলিম তামাক সাজিতে সাজিতে গদাই নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল—রমণ ঘোষ এমন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে কেন ? তাহার অভিপ্রায়টা কি ? কোনওরূপ গূঢ় অভিসন্ধি নাই ত ?

তামাক ধরিল। দুই চারি টান টানিয়া হুঁকাটি হাতে নামাইয়া, দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আবার সে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইল। ভাবিতে লাগিল—ঘোষের পোকে বিশ্বাস নাই। কি করিতে আসে ? কাল ছোটবাবুর কাছে গিয়া কি গোপন পরামর্শ করিতেছিল ? জোৎজমা খাজনাপত্র সম্বন্ধে কোনও কথা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ছোটবাবু সে সকল বিষয়ের কিছুই খবর রাখেন না। তিনি ত আপনার পূজা আহ্নিক আর পড়াশুনা লইয়াই আছেন। তবে কি রমণ ঘোষ হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল ? ছোটবাবুর কাছে ধর্ম্মের কথা শুনিতে আসে ? তাঁহাকে গুরু করিয়া শিষ্য হইবে ? কিন্তু ছোটবাবু যে রকম নিষ্ঠাবান, শূদ্রকে যে শিষ্য করিবেন এমন ত বোধ হয় না। নিশ্চয়ই রমণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। বোধ হয় সে কোনও সূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে গদাই এখানে চাকরি লইয়াছে। বোধ হয় ছোটবাবুর কাছে সে গদাধরের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছিল। মনে জানে ছোটবাবু লোকটা ভারি কড়াক্কড়। যদি শুনেন গদাধরের জেল হইয়াছিল—সে একজন পাকা জালিয়াৎ—তবে হয় ত তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিয়া গদাধরকে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু রমণ যদি সে আশা করিয়া থাকে, তবে তাহার দুরাশা—কারণ সৌভাগ্যবশতঃ বড়-

বাবু এমন নীতিবায়ুগ্রস্ত ননীর পুতুল নহেন যে এই সব শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

ভাবিতে ভাবিতে গদাধরের কলিকার আগুন নিবিয়া গেল। হুঁকাটি মুখে দিয়া দুই চারিবার কসিয়া টান দিয়া দেখিল—ধুম বাহির হয় না। তখন সে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল।—তাহার মনে হইল—আচ্ছা আজ আমি যখন বাবুর কাছে বিদায় নিতে গেলাম—তখন তিনি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না কেন? আমার মুখের পানে চাইলেন না পর্য্যন্ত। আমার উপর কি বিরক্ত হয়েছেন? হয় ত ছোটবাবু আমার নামে তাঁকে কিছু বলে থাকবেন। নইলে বাবুর ভাবটা অমন বদলে গেল কেন? আমার জেল হয়েছিল বলে অথবা আমি জাল করেছি শুনে বড়বাবু কখনই আমার উপর বিরক্ত হন নি। নিশ্চয়ই রমণ ঘোষ আমার নামে লাগিয়েছে যে আমি লোকটা অত্যন্ত নিমকহারাম—বিশ্বাসঘাতক। নইলে জেলের কথা শুনে ত বাবুর কাছে আমার কদর বেড়েই গিয়েছিল। এখনও বেশী দেরী হয়নি। এখন ছোটবাবুর আহ্নিক করবার সময়—হয় ত এখনও রমণ ঘোষ বসে আছে। বাবুর আহ্নিক শেষ হবার আগে যে সে তাঁর দেখা পায়, এমন ভরসা কম। যেতে হল—খবরটা নিতে হল। নইলে সমস্ত রাত্রি ছটফট করতে হবে—রাত্রে আমার নিদ্রে হবে না।

এই ভাবিয়া গদাধর উঠিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—বেশ অন্ধকার। ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া গদাই বাহির হইয়া গেল। কাছারিবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অন্য সকল আমলারা প্রস্থান করিয়াছে—কাছারিতে তালা বন্ধ। প্রাঙ্গণ জনশূন্য—কেবল দুই একজন দরোয়ান সদর দরজায় বসিয়া আছে। একজন দরোয়ান বলিল—"বাবু আবার আসিলেন যে?"

গদাই বলিল, "একখানা জরুরি কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম—সেখানা দরিয়াপুর নিয়ে যেতে হবে—তাই একবার এসেছিলাম। কাছারি ত দেখছি বন্ধ হয়ে গেছে।"—বলিয়া গদাধর মোহিতলালের বৈঠকখানার দিকে চাহিল। দেখিল একটি খোলা জানালা দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে। ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল। সে জানালাটা পশ্চাৎদিকের দেওয়ালের ভূমি হইতে কিছু উচ্চ। জানালার নিম্নে কতকগুলা শেওলা-ধরা ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়া আছে, তাহা ছাড়া সেখানে কচুবন ও আগাছার জঙ্গল। গদাই পা টিপিয়া টিপিয়া সেই

জানালার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা উচ্চ হওয়াতে ভিতরের কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল বুঝিতে পারিল দুইজন লোক কথা কহিতেছে। কণ্ঠস্বরে বুঝিল ছোটবাবু ও রমণ ঘোষ—কিন্তু সকল কথা ধরিতে পারিল না। দুই একটা কথা যাহা কাণে গেল তাহা এই :—

ছোটবাবু বলিলেন, "কবে উৎসব ?"

রমণ বলিল, "শ্যামাপূজার দিন। কিন্তু তাঁরা অনেক করে বলে দিয়েছেন শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিনে হুজুরকে সেখানে পৌঁছতেই হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "আচ্ছা যাব। কাল তুমি যখন এসেছিলে, প্রমথবাবু বলে আমার একটি বন্ধু এখানে বসেছিলেন। তাঁদেরও বাড়ী খুলনার কাছেই। অনেক করে বলে গেছেন যেন আমি তাঁদের ওখানে গিয়ে দিন পাঁচ সাত থাকি। খুলনায় শ্যামাপূজার দিন তাঁদের উৎসব দেখে—পরদিন প্রমথবাবুদের বাড়ী যাব এখন। কবে যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে, আমি কাল সকালেই রওনা হব। শ্যামাপূজা বাদ একেবারে ফিরব।"

"আচ্ছা—তুমি যাও। চিঠির জবাব লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। তাঁদের বোলো এখন, শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন আমি গিয়ে পৌঁছব।"

তাহার পর অনুচ্চ স্বরে দুইজনে আরও কি কি কথা হইল, গদাধর ধরিতে পারিল না। কচুবনের মধ্যে খড় খড় করিয়া কি একটা নড়িতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। সর্প না কি ঠিক নাই—গদাধর আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। 'হে মা মনসা, রক্ষা কর'—এই কথা মনে মনে বলিতে বলিতে পা টিপিয়া টিপিয়া সে সরিয়া পড়িল। কাছারির প্রাঙ্গণ পার হইয়া, ফটক পার হইয়া, স্বীয় বাসগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর যাইতেই একজন পেয়াদা তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কে ও, নাজির মশাই ?"

গদাধরের বুকটা চমকিয়া উঠিল। এইমাত্র জানালার নিম্নে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চোরের মত সে আড়ি পাতিয়া আসিয়াছে, তাই কি ছোটবাবু তাহাকে ধরিবার জন্ত লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন ? শঙ্কিত স্বরে গদাই উত্তর করিল—"হ্যাঁ—কেন ?"

"বাবু আপনাকে তলব করেছেন।"

"কোন্ বাবু ?"

"কোন্ বাবু আবার ?—জমিদার—মালিক—বড়বাবু।"

"বড়বাবু তলব করেছেন ?—কেন রে ?"

"কি জানি মশাই—তা ত বলতে পারিনে। আমায় শুধু হুকুম দিলেন—যা নাজিরকে ডেকে আন্।"

গদাই পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৈঠকখানা ঘরের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাবু একাকী সেখানে বসিযা একখানি বহি পড়িতেছেন।

গদাই প্রণাম করিয়া বলিল, "হুজুর কি আমাকে স্মরণ করেছেন ?"

"হ্যাঁ। কাল দরিয়াপুর রওনা হচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভোরে উঠে যাব স্থির করেছি।"

"যাবার কি বন্দোবস্ত করেছ ?"

"আজ্ঞে, চলেই যেতাম। কিন্তু দু' চারটে মোট-মাটারি আছে কিনা, থালাটা-ঘটিটে, দুই একটা ভাঙ্গা ফুটো বাক্স, তাই একটা গোরুর গাড়ী বলে রেখেছি।"

বাবু বলিলেন, "জিনিষ-পত্র গোরুর গাড়ীতেই রওনা করে দিও। কিন্তু তুমি জমিদারের নায়েব হয়ে যাচ্ছ, তোমার গোরুর গাড়ীতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না;—ওতে ইজ্জতের হানি আছে। আমি পাল্কী বলে দেব এখন, পাল্কী করে যেও।"

এতক্ষণে গদাধরের মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা ও সংশয় দূরীভূত হইল। তবে বাবু তাহার উপর রুষ্ট হন নাই। কেহ তাঁহার কাছে কিছু শোনায় নাই। হাত দুইটি যোড় করিয়া গদাই উত্তর করিল, "যে আজ্ঞে হুজুর।"

একটু পরে বাবু বলিলেন, "আর একটা কথা। সেদিন সেই যে একটা স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলাম।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন আপাততঃ কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়ে কিছু বলবার দরকার নেই। তবে তার প্রতি নজরটা রেখ। যদি দেখ থানায় টানায় যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমায় সংবাদ দিও।"

"যে আজ্ঞা।"

"সে স্ত্রীলোকটা এক মাসের উপর বাড়ী ছেড়েছে। যদি থানা পুলিশ করবার হত, এতদিন কেনরাম নিশ্চয়ই করত। তা যখন করেনি, বোধ হয় আর করবেও না। বিষয়ের ভাগীদার, আপদ গেলেই বাঁচে। এখন আর খুঁচিয়ে সে কথা তোলবার দরকার নেই।"

"যে আজ্ঞে।"

"পরে যদি কোনও রকম কিছু করবার প্রয়োজন হয়, তোমাকে জানাব। মাঝে মাঝে তুমি এখানে এসে আমায় খবরাখবর দেবে। সপ্তাহে একদিন হোক, দুদিন হোক।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসব বইকি। যেমন যেমন হয় জানাব।"

"বেশ তা হলে এসো এখন।"

বাবুর পাদবন্দনা করিয়া গদাধর দ্বিতীয়বার বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ স্ত্রী-চরিত্র

বাহির হইয়া, অন্ধকার পথে ধীরে গদাই আপন বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দুর্ভাবনাটা তিরোহিত হওয়াতে তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়াছে। আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিল।

সদর রাস্তা হইতে, পুষ্করিণীর তীরস্থিত নিজ বাসার পথে নামিবার সময় গদাই নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইল, তাহার নিকট হইতে পাঁচ হাতের মধ্যে, আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত এক নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই গদাধরের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিল, দৌড় দিই—নিশ্চয়ই ইহা পেতনী। কিন্তু ভয়ে তাহার পা এমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পলাইবারও সামর্থ্য নাই।

ইতিমধ্যে সে নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া ভীতস্বরে বলিল, "কে গা?"

গদাধরের দেহে প্রাণ আসিল—বুঝিল ইহা হরিদাসীর কণ্ঠস্বর। কাছে সরিয়া গিয়া বলিল, "কে ও, হরিদাসী?"

হরিদাসী বলিল, "এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

"রাত কোথায় হরিদাসী—এই ত সন্ধ্যে হয়েছে। তুমি কোথা থেকে ?"

হরিদাসী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "বলি হ্যাঁগো, তুমি নাকি কাল ভোরে দরিয়াপুর যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ। তোমায় কে বললে ?"

"আমায় কে বললে ! না বলে কয়ে এই রকম করে চলে যাচ্ছ যে ?"

গদাধর বুঝিল, হরিদাসীর অভিমান হইয়াছে। অনুমান করিল, সে বোধ হয় তাহার বাসাতেই গিয়াছিল, দরজায় তালাবন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাই উপস্থিত-বুদ্ধিবশে বলিল, "তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই ত তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি হরিদাসী।—নইলে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—কোলের মানুষ চেনা যায় না—আমি কখনও বাড়ী থেকে বেরুই ?"

"আমায় খুঁজছিলে ?"—হরিদাসী যেন একটু মোলায়েম হইল।

গদাই কাতর স্বরে বলিল, "তোমায় নয় ত কাকে খুঁজব হরিদাসী ? ত্রিসংসারে আমার আর কে আছে ? এস, এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে ? আমার বাসায় এস—অনেক কথা আছে।"—বলিয়া গদাধর অগ্রসর হইল, হরিদাসীও তাহার অনুসরণ করিল।

বাসায় গিয়া, সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া রোয়াকে একখানি মাদুর পাতিয়া গদাই বসিল এবং হরিদাসীকে বসিতে অনুরোধ করিল। হরিদাসী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া মাদুরে বসিতে আপত্তি জানাইল—কিয়দ্দূরে ধরা-তলেই উপবেশন করিল।

গদাই বলিল, "তার পর হরিদাসী ?"

হরিদাসী বলিল, "তার পর হরিদাসী ? তোমার আর ন্যাকামি করতে হবে না, রাখ। তুমি যেমন মানুষ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। তুমি নাকি দরিয়াপুরের নায়েব হয়েছ ? নায়েব বাহাদুর ?"

গদাই বলিল, "এখনও পাকা নয়—একটিনি।"

"পাকা ডাঁসা আমি বুঝিনে। বড়লোক হয়েছ তাই বুঝি আর মাটীতে পা পড়ছে না ?"

গদাই একটু রসিকতায় চেষ্টা করিয়া বলিল, "বড়লোক আর হলাম কই ? কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। তুমি যদি আমায় বিয়ে কর—তবে দেখ বড়লোক হই কিনা। তোমার ত দয়া হচ্ছে না।"

হরিদাসী বলিল, "দয়া হচ্ছে না আবার কি ?—কেন, আমি সেদিন কি বলে গেলাম ? আমি ত নিজ মুখে বলে গেলাম আমি রাজি আছি। তুমি বললে এইবার তবে একদিন দুজনে বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। তারপর কথা নেই বাত্রা নেই চম্পট দেবার উয্যুগ করেছ ?"

গদাই বলিল, "স্ত্রীচরিত্র এই রকমই বটে! বলি হ্যাঁগো হরিদাসী, তার পর থেকে তুমি কি একদিনও এসেছিলে ?—এমুখো হয়েছিলে যে দুজনে বসে পাকাপাকি স্থির করব ?—আমি কোথা রোজ সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ভাবছি, আজ হরিদাসী আসবে, আজ যখন এল না তখন কাল নিশ্চয়ই আসবে—কোথায় বা হরিদাসী, আর কোথায় বা কে! আর এখন কিনা উল্টে আমার দোষ ?"

কথাটা শুনিয়া হরিদাসী একটু অপ্রতিভ হইল। মনে মনে বুঝিল, গদাই যাহা বলিতেছে তাহা ত সত্যই বটে। আজ হঠাৎ যখন সে শুনিল, গদাধর নায়েব হইয়া দরিয়াপুর চলিয়া যাইতেছে—তখনই তাহার মনে আগুন লাগিয়া গেল। ভাবিল গদাধর তাহাকে বিবাহ করিব ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিল তাহা ছলনা মাত্র—অবোধ স্ত্রীলোক পাইয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তাই সে রাগে দিশাহারা হইয়া সন্ধ্যার পর গদাধরের অন্বেষণে আসিয়াছিল।

হরিদাসীকে নীরব দেখিয়া গদাই বলিল, "এ দিকে আর আসা হয় না কেন ? সেই রেঁধে খাইয়ে গেলে, বলে গেলে সুবিধে পেলেই আসব, তারপর আর দেখা নেই।"

হরিদাসী বলিল, "কি করে আসি বল না ? আসা কি সহজ ? আমরা হলাম বড়লোকের বাড়ীর চাকরাণী, পথে পথে কি বেড়াতে পারি ? আজ গিন্নীর কাছে কত বাহানা করে তবে এসেছি।"

"তবু ভাল। আমি মনে করলাম বুঝি, পাছে আমায় বিয়ে করতে হয়, এই ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।"

হরিদাসী বলিল, "পালাচ্ছি আমি, না, তুমি পালাচ্ছ ? দরিয়াপুর চলে যাচ্ছ, বিয়ের একটা ঠিকঠাক, একটা দিনস্থির, কি করে হবে ?"

গদাই বলিল, "হবে বইকি। ক্রমে একটা দিনস্থির করতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাসী আবার আগুন হইয়া উঠিল। বলিল—"এমন বেগারঠেলা ভাবে বলছ যে ?"

"বেগারঠেলা কিসে বুঝলে হরিদাসী? স্ত্রীলোকের মন কিনা—সকল বিষয়েই অবিশ্বাস।"

হরিদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল. "দেখ, আমায় বিয়ে করতে যদি সত্যিই তোমার মন থাকে, তবে একটা ঠিকঠাক করে ফেল। এখানে আর আমার মন টিকছে না। যদি বিয়ে না করবার হয়, তাও খোলসা করে বল। আমার সেই যে মাসী ছিল, সে মরে গেছে—আমায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে। ভাবছি না হয় কাশী চলে যাই—আমার টাকাকড়ি নিজের যা ছিল আর মাসীর যা পেয়েছি, সব মিলিয়ে গুছিয়ে কাশীতে আমার বেশ চলে যাবে। হরিনাম করব, গঙ্গাস্নান করব, মনের সুখে থাকব। আর দাসীবৃত্তি করতে আমার মন নেই।"

এই কথাগুলি শুনিয়া গদাধরের মস্তকে চট্ করিয়া একটা ফন্দি আসিল। ভাবিল, সেদিনত হিসাব করিলাম ইহার নিজের প্রায় আড়াই শত টাকা আছে। আবার মাসীর টাকা পাইয়াছে বলিতেছে। সে কত টাকা, তাই বা কে জানে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেও না—অধিকন্তু আমার উপর সন্দেহ হইতে পারে। হরিদাসীর টাকাগুলি হস্তগত করিবার উপায় তখনি তখনি গদাধর একটা স্থির করিয়া ফেলিল।

গদাধর তখন বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল—"হরিদাসী, তুমি কি মনে করেছ, যদি তোমায় আমি আজ বিয়ে করতে পাই, তাহলে কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরি? আসল কথাটা কি জান, এ ত সধবা-বিয়ে নয়, এ বিধবা-বিয়ে। বিধবা-বিয়েতে হাঙ্গাম কত! কুমারী-বিয়ে হত—দুটো মন্তর বলে আগুনে একটু ঘি ফেলে দিলেই হয়ে যেত। বিয়ের মন্তর বলাতে পারে এমন হুঁসিয়ার পুরুতই এ সব পাড়াগাঁয়ে পাওয়া মুস্কিল, কলকাতা ভিন্ন সে দরের পুরুত পাওয়া যাবে না। কলকাতা না গেলে বিয়ে হবে না। কলকাতায় যাওয়া, সেখানে একটা বাসা ভাড়া করা—ধর, অনেক টাকা ব্যয়। আমার কাছে তিন কুড়ি টাকা আছে। তাতে যে সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হয়, এমন ভরসা নেই। সেই জন্তেই একটু গড়িমসি করছি বই ত নয়। তা, ভগবানের কৃপায় একটা উপায়ও হয়েছে।"

হরিদাসী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "কি উপায় হয়েছে?"

গদাই বলিল, "এক মস্ত সাধুপুরুষের দর্শন পেয়েছি। কিছু টাকা আমায় পাইয়ে দেবার উপায় তিনি করেছেন।"

হরিদাসীর কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিল—“কি উপায় হয়েছে বল না গো!”

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল, “মেয়েমানুষের সে কথা শুনে কায নেই।”

হরিদাসী মিনতি করিয়া বলিল, “না গো, বল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

গদাই তখন অনুচ্চস্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল:—

“কালকে সন্ধ্যের পর নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা অশ্বথ গাছের তলায়, ধুনী জ্বালিয়ে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর মাথার জটা কি! একেবারে মাটীতে লতিয়ে পড়ছে। ইয়া হাতের গুলি, ইয়া বুকের ছাতি, টকটক করছে রঙ—তার উপর বিভূতি মাখা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একটা বোতলে মদ রয়েছে, একটা মড়ার মাথার খুলিতে তাই ঢেলে খাচ্ছেন। নেশায় দুই চক্ষু যেন একেবারে জবার ফুল—দেখে ভক্তি হল। কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে, যোড়হস্ত হয়ে বসে রইলাম। আমাকে দেখে বাবা বললেন—‘ক্যারে বাচ্চা?—তেরা মুখ অ্যাসা মলিন কাহে?’—আমি বললাম—‘বাবা—আমি বড় গরীব। বিবাহ করবার ইচ্ছে হয়েছে—পাত্রীও ঠিক, কিন্তু কেবল টাকার অভাবে বিয়ে করতে পারছিনে। তাই ভেবে ভেবে আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বাবা।’—এই কথা শুনে বাবা খল খল করে হাসতে লাগলেন। বললেন—‘রূপিয়া তো খোলামকুচি হায়। কেত্তা রূপিয়া তেরা চাই?’—আমি হাতযোড় করে বললাম—‘বাবা, শ’ দুই টাকা হলেই আমার বিয়েটি হয়।’ শুনে বাবা বললেন—‘তেরা পাশ কেত্তা রূপিয়া হায়?’ আমি বললাম—‘বাবা—বড় জোর পঞ্চাশ কি ষাট। গরীব মানুষ, কোথা পাব টাকা?’—বাবা বললেন—‘আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই—হাম তুঝে একঠো মন্তর শিখা দেগা—মন্তরকা চোটসে তেরা এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো যাগা।’—আমি বললাম—‘বাবা মন্তরটি তাহলে বলে দিন।’—বাবা বললেন—‘যাও, নদীমে আসনান করকে আও।’—আমি গিয়ে নদীতে চান করে এলাম। ভিজে কাপড়ে এসে বাবার কাছে বসলাম। বাবা বললেন—‘হাম যো যো বাৎ বোলতা হায়, মন দেকে শুনো। তেরা যেত্তা রূপিয়া হায়, একঠো লকড়িকা বাকসমে বন্দ করনা। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী রাতমে, কোই বিধবা আওরৎকো কহনা কি তুম চুল এলো করকে, মাটিমে উবুড় হয়ে পড়কে, আপনা দাঁতসে একঠো ঘলঘসে গাছকা শিকড় উপড়ায়কে লাও। ঐ শিকড় লাল সুতাসে বাকসমে বাঁধ দেনা। বাকসমে

পিতলকা তালা বন্ধ করকে, চাভি ঐ বিধবা আওরাৎকো দে দেনা। রোজ রাত দুপুরমে বাকসকে উপর একশো আট বার মন্তরকো জপ করনা। এক মাহিনা বাদ ফিন্ যব কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশীকা রাত আওয়েগা—আওরাৎকো বোলায়কে চাভি খোলনা। তব দেখোগে কি এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো গিয়া।'—বলে, বাবা আমার কাণে মন্তরটি দিলেন। বেশী নয়, কেবল তিনটি অক্ষর।"

হরিদাসী গালে হাত দিয়া, অবাক হইয়া গদাধরের কথাগুলি শুনিতেছিল। গদাই থামিলে পরও কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অবশেষে রুদ্ধশ্বাসে হরিদাসী বলিল, "হ্যাঁ গো—সত্যি?"

গদাই বলিল, "সত্যি কিনা পরীক্ষে করে না দেখলে ত বলা যায় না। বাবা যেমন বলেছেন, সেই রকম করে দেখব, টাকা চারগুণ হয় ভালই—না হয়, আমার আসল টাকাটা ত কোথাও যাচ্ছে না।"

"কবে পরীক্ষে করবে?"

গদাই চিন্তিত হইয়া বলিল, "তাই ত ভাবছি। এখন যাচ্ছি দরিয়াপুরে দু'মাসের জন্যে একটিনি করতে—এখন এ দু'মাস ত হবে না। আসি দরিয়াপুর থেকে—তার পর বাবুর কাছে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাব। সেখানে আমার পিসী আছে—সে বিধবা—তাকে দিয়েই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রে শিকড় তোলাব। কিন্তু পিসীর অনেক বয়স হয়েছে কিনা, তার আবার দাঁত নেই, এই হয়েছে মুস্কিল।"

গদাধর মনে করিতেছিল, হরিদাসী নিশ্চয়ই বলিবে, আগামী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রিতে এইখানেই পরীক্ষা আরম্ভ হউক। পরীক্ষার ফলাফল জানিতে হরিদাসীর ঔৎসুক্য কিরূপ প্রবল তাহা উহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

গদাই যাহা ভাবিতেছিল, ঠিক তাহাই হইল। পরক্ষণেই হরিদাসী বলিল—"আচ্ছা দেখ, চতুর্দ্দশীর আর ত বেশী দেরী নেই, তা তুমি কেন সেই রাত্রে দরিয়াপুর থেকে এখানে এস না?"

গদাই বলিল, "এলাম না হয়, কিন্তু বিধবা কোথা পাব। যে সে বিধবা হলে হবে না, দাঁতওয়ালা বিধবা চাই।"

"আমি ত রয়েছি। আমিই না হয় ধলঘসের শিকড় তুলে দেব।"

গদাই যেন পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "আহা, তা যদি তুমি স্বীকার কর

গদাই নতমস্তকে বলিল, "হুজুরের দয়া হলে সবই হতে পারে।"

জমিদারী সংক্রান্ত আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর বাবু বলিলেন, "তার পর, সে বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করলে ?"

"আজ্ঞে, হুজুরের যে রকম হুকুম ছিল, কেবল নজরটা মাত্র রেখেছিলাম—তাও অতি সাবধানে, কেউ সন্দেহটি না করতে পারে। কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে সর্ব্বদা যাতায়াত করতাম। মফস্বল পরিদর্শন শেষ হয়ে গেলে, একটু অসুবিধা হবে—কারণ বিনা ওজরে সর্ব্বদা কি করে যাব। তাই একটা উপায় ঠাউরেছি—কিন্তু হুজুরের অনুমতি সাপেক্ষ।"

বাবু বলিলেন, "কি উপায়, বল।"

"আজ্ঞে, ঐ কেনারামের বাড়ীর কাছেই, খানিকটে জায়গা পড়ে আছে। একঘর প্রজা ছিল, ফৌত হয়েছে, ওয়ারিশানও কেউ নেই, সরকারেই অর্শেছে। তাই মনে করেছি, সেইখানটা পরিষ্কার করিয়ে একটা ফলের বাগান তৈরী করতে সুরু করি। চারিদিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরিয়ে, আতা, নেবু, কিছু কলা, গোলাপজাম, নারকুলে কুল—এই সব লাগিয়ে দিই, সেই উপলক্ষ্য করে সর্ব্বদাই ওদিকে যাতায়াত হবে—কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।"

বাবু বলিলেন, "এ উত্তম প্রস্তাব। আমি মঞ্জুর করলাম। মাঝখানে একটা আটচালা গোছ তুলে নিও। মেঝেটা আধ হাত আন্দাজ উঁচু করে পাকা করে গাঁথিয়ে নিও। এমন কি মাঝে মাঝে সেখানে বসে কাছারিও করতে পারবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হলে ত খুব ভালই হয়। ফলের চারার কি করি তাই ভাবছি।"

বাবু বলিলেন, "তার জন্যে চিন্তা কি ? বাগানবাড়ীতে ফলের অনেক চারা আছে কতকগুলো চারা তুলিয়ে খানদুই গোরুর গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যেও।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব। একটা কথা নিবেদন পাবার ছিল। একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি ?"

"ঐ কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে, একদিন দেখলাম একজন লোক, ওর বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। লোকটি দেখতে নিতান্ত চাষাভুষো দলের মত নয়। তাই আমার মনে হঠাৎ কেমন একটু সন্দেহ হল। বগলে

ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, গলায় উড়ানি জড়ান—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। কেনারামের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'নিবাস কোথা?'—সে বললে—'আমার বাড়ী সাজিয়াড়া গ্রামে।' 'তোমার নাম কি?'—'শ্রীরমণচন্দ্র ঘোষ।' 'আপনারা?'—'আমরা গোয়ালা।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমায় কোথা যেন দেখেছি দেখেছি না?'—সে বললে—'কোথা?'—'এই দিন আষ্টেক হল—বাবুদের বাড়ী, কমলপুরে?'—কথাটা শুনে লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। তাই দেখে আমার আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলাম—'এখানে কি মনে করে আসা হয়েছিল?' বললে—'একটু বরাৎ ছিল।'—বলে লোকটা চলে গেল। আজ আবার আসার সময় পথে দেখি লোকটা দরিয়াপুরের দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'কি ঘোষের পো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'—বললে 'যাচ্চি খাজনা সাধতে হরবোলায়।'—ফিরে গিয়ে খবর নিতে হবে দরিয়াপুরে গিয়েছিল কিনা।"

এই কথা বলিয়া গদাই পাল নীরব হইল। গোপীকান্তবাবু একটু চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "সাজিয়াড়ার রমণ ঘোষ?"

"আজ্ঞে, তাই ত বললে।"

"কই সম্প্রতি ত তাকে এখানে দেখিনি।"

"আজ্ঞে, আমি ত দুদিন উপরি উপরি এখানে তাকে দেখেছি। হয়ত দেওয়ানজির কাছে কোন কাযে এসেছিল।"

বাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিয়া বলিল রমণ ঘোষ দুদিন আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কাছারিতে আসে নাই। ছোটবাবু মহাশয়ের বৈঠকখানায় গিয়াছিল। বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল।

বাবু বলিলেন, "দেখ গদাই—তুমি গিয়ে গোপনে খবর নিও, রমণ ঘোষের সঙ্গে কেনারামের কোন রকম আত্মীয়তা আছে কিনা। আর, আজকালই যাতায়াত আরম্ভ করেছে, না পূর্ব্বে থেকে যাতায়াত ছিল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গিয়েই অনুসন্ধান করব। যে রকম হয় আপনাকে জানাব।"—বলিয়া গদাই বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কাছারিবাড়ীর প্রাঙ্গণ পার হইয়া, ছোটবাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে গদাই দেখিল, বারান্দার নিম্নে সিঁড়ির পার্শ্বে কতকগুলা ঝাড়ু দেওয়া ময়লা জমা রহিয়াছে—তাহার সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড। কৌতূহল-

বশতঃ গদাই সেখানা উঠাইয়া লইল। দেখিল একখানা পুরাতন চিঠি, মোহিতলালবাবুর নামে ঠিকানা রহিয়াছে। আশে পাশে, কেহ কোথাও নাই দেখিয়া গদাই সেখানি নিজের পকেটে রাখিয়া দিল।

বাসায় গিয়া, আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈকালে উঠিয়া গদাই অশ্বারোহণে বাগানবাড়ীতে গিয়া দর্শন দিল। ফটক পার হইয়া, বরাবর মালীর কুটীরের নিকট গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। নিকটে একটা পেয়ারাগাছ ছিল, মালী তাহাতেই অশ্বকে বাঁধিয়া দিল।

গদাই বলিল, "কি মালী, ভাল আছ ত ?"

"আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"বাবু কিছু হুকুম পাঠিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ—একজন দরোয়ান এসে বলে গেছে যে দরিয়াপুরের কাছারিতে কিছু ফলের চারা পাঠাতে হবে।"

"হ্যাঁ—তাই আমি এসেছি। চল বাগানে, কতকগুলো চারা ঠিক করা যাক।—উঃ, এখনও যে বেজায় রোদ্দুর হে।—ততক্ষণ বরং এক ছিলিম তামাক সাজ—রোদ্দুরটা পড়ুক।"

মালী তামাক সাজিতে গেল। ইতিমধ্যে তাহার পুত্র রামদাসোয়া নৃত্য করিতে করিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাই পালের গোঁফ নাই দেখিয়া প্রথমটা সে চিনিতে পারে নাই। গদাই তাহার নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল—বলিল—"কি রে বদ্‌মাসোয়া।"—তখন বালক আসিয়া গদাধরের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিল এবং দুইটি পয়সা আদায় করিয়া মনের আনন্দে ঘুরপাক দিতে দিতে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তামাক সাজিয়া আসিয়া মালী বলিল, "আমার মাইনে বাড়াবার কথা বাবুর কাছে কিছু বলেছিলেন ?"

"না মালী—এখনও কথা পাড়বার সুযোগ পাইনি। এই যে দরিয়াপুরের বাগানখানা করছি—এই সুযোগে বাবুকে বলব। একটা কোনও সূত্র না পেলে বলি কি করে ? দেখ, দরিয়াপুরের এই বাগানের জন্যে একজন ভাল মালী আবশ্যক। বাবুকে যদি বলি, তবে তিনি কি তোমায় ছেড়ে দেবেন মনে কর ? তা হলে দরিয়াপুরে নিয়ে গিয়ে তোমার মোটা মাইনে করে দিতে পারি। সে ত আমারই হাতে কিনা। বাবু যে তোমায় ছাড়েন এমন ত বোধ হয় না।"

মালী বলিল, "কি জানি বাবু।"

গদাই মাথাটি নাড়িয়া বলিল, "উঁহু! তোমায় ছাড়বেন না। তুমি গেলে গঙ্গামণির খবরদারী করবে কে? তোমার মতন আর একটি বিশ্বাসী লোক কোথায় পাবেন?"

মালী সন্দিগ্ধভাবে গদাধরের পানে চাহিয়া বলিল, "গঙ্গামণি কে বাবু?"

গদাই মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "বেশ, বেশ! এই রকম সাবধান হয়ে থাকাই ত চাই! গঙ্গামণি কে এখনও জানতে পারনি? দরিয়াপুরের কেনারাম গয়লার ভাই-বৌ—তোমরা যাকে ভৌজি বল।"

মালী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনাকে কে বললে?"

"আর কে বলবে?—খোদ বাবুই বলেছেন। তুমি কি ভাব তাঁর কোন কথা আমার কাছে গোপন আছে? আমার সঙ্গে বাবুর একবারে হরিহর এক আত্মা—এমন কি একত্রে বসে (গদাই কাল্পনিক গেলাস হাতে ধরিয়া পান করিবার ইসারা করিল)—এও হয়েছে। নইলে এত লোক থাকতে আমাকেই দরিয়াপুরের নায়েব করে পাঠাবেন কেন? শুদ্ধ কেনারাম ঘোষকে শাসনে রাখবার জন্যে। এ সব কায, ধর, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন আর ত কারু হাতে দিতে পারেন না। আমলাদের মধ্যে এক আমার উপর, আর চাকরবাকরের মধ্যে তোমার উপর—এই দুজনের উপর তাঁর বিশ্বাস। নইলে দেখ, আমি ক'দিনই বা বাবুর চাকরি নিয়েছি। এখনও তিনমাস পুরো হয়নি। পনেরো টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলাম—দু মাস পরে ত্রিশ টাকা মাইনেতে নায়েবী পদে বাহাল হলাম। কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তা বাবু বিলক্ষণ জানেন।"

মালী দুঃখিতস্বরে বলিল, "বিশ্বাসী চাকর বলে আপনার ত ভাল হল বাবু—আমার কি হল?"

"হবে—হবে—মালী তোমারও হবে। সবুর কর। আমি বাবুকে বলে তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। বেশ মন দিয়ে কাযকর্ম্ম করে যাও—আর ও বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার থাকবে—বুঝেছ?"

"আজ্ঞে, তা আমায় বলতে হবে না।"

"আচ্ছা, এখনও কি গঙ্গামণি কাঁদাকাটা করে?"

"করে বইকি।"

"একটু ফাঁক পেলেই তা হলে পালাবে বল?"

"পালাবে বইকি।"

"চাবিটে খুব সাবধান। সে বুড়ী তোমার শাশুড়ী হয় বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবু তাই বলছিলেন। তাকে বেশ করে বলে দিও যে নদীতে যখন জল আনতে যাবে, পেছনের দরজাটায় চাবিটি বন্ধ করে তবে যেন যায়। এ রকম যেন মনে না করে, এই ত কাছেই নদী, চট্ করে আসব এখনি, তালা না-ই বন্ধ করলাম।"

"তাই ত করা হয়, বাবুর হুকুমই তাই।"

"তা জানি, তবু সাবধান করে দিচ্ছি। জান ত, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। চাবিটে তোমারই কাছে রাখ ত? যখন বুড়ীর দরকার হবে, তখন সে যেন চেয়ে নেয়। আবার কায হয়ে গেলেই তোমায় ফিরে দেবে। নইলে বুড়োমানুষ, অসাবধান, কোথায় ফেলে দেবে বলা যায় কি?"

"চাবি আমিই রাখি।"

"কোথায় রাখ? ঘরে অমনি এক জায়গায় ফেলে রেখ না যেন। নিজের কোমরের ঘুন্সীতে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই ত বেঁধে রাখি।"—বলিয়া মালী কোমর হইতে চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল।

গদাই বলিল, "চাবিটি ত তেমন মজবুত বোধ হচ্ছে না। দেখি?"

মালী চাবিটি খুলিয়া দিল। গদাই সেটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "না, নিতান্ত খেলো নয়। এইতেই এখন কায চলুক। পরে, বাবুকে বলে একটা বিলিতী তালা পাঠিয়ে দেব এখন। আর যদি এর মধ্যে পোষ মানে, তা হলে আর তালা চাবির দরকারও হবে না।"

মালী বলিল, "পোষ মানবার লক্ষণ নয়। একদিন বাবুকে বলেছিল, তুমি যদি আমায় বিরক্ত করবে—আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।"

গদাই শিহরিয়া বলিল, "ইস্—কি সর্ব্বনাশ!—আচ্ছা, বাবুর নামটাম সে জানে?"

মালী হাসিয়া বলিল, "না। প্রথম থেকেই বাবু বুড়ীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি জিজ্ঞাসা করে এ কোন্ গাঁ, ত বলিস বকুলগঞ্জ—আর আমি কে যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলিস বকুলগঞ্জের মেজবাবু।"

শুনিয়া গদাধর হাসিতে লাগিল। বলিল, "বাবু ফন্দি করেছেন ভাল। বকুলগঞ্জের মেজবাবু! হা হা হাঃ—কোথায় বকুলগঞ্জ কোথায় কমলপুর!—রোদ্দুরও পড়ে এল। চল কতকগুলো চারা দেখিয়ে দিই।"

উভয়ে তখন উঠিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। নানা ফলের বহুসংখ্যক চারাগাছ গদাই মালীকে দেখাইয়া দিল। অবশেষে বলিল—"কাল গোরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব—এগুলো বোঝাই করে দিও।"

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছিল। গদাই বলিল, "আজ তবে চললাম। সমুখ অন্ধকার—অনেক দূর যেতে হবে। আর একদিন এসে আরও কিছু চারা দেখিয়ে দেব।"

"আপনি আবার কবে আসবেন বাবু?"

"কালীপুজোর দিন। সে দিন কাছারি বন্ধ কিনা। পারি যদি ত তার আগের দিনই আসব।"—বলিয়া গদাই অশ্বারোহণ করিল। অগ্রসর হইয়া, ঘোড়া থামাইয়া, মালীকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "ওহে শোন—একটা কায করতে পার? কালীপুজোর সময় বাবুর বাড়ী থেকে মাংস পাওয়া যাবে। আমরা শাক্ত কিনা, কালীপুজোর রাত্রে আমাদের একটু ইয়ে খেতে হয়। তোমরা কি তাকে বল ভাল, আমার আবার হিন্দি মিন্দি ভাল আসে না—দারু দারু। বেশ ভাল এক বোতল—বুঝেছ—দোয়াস্তা, এক টাকা দিয়ে কিনে এনে রাখতে পার? সেই একটা, আর দু বোতল আট আনা ওয়ালা, বুঝেছ—যদি এনে রাখ, বড় ভাল হয়!"

মালী স্বীকৃত হইল। গদাই তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ

প্রেতচতুর্দ্দশীর দিন বৈকালে, পদব্রজে গদাই পাল আবার বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি মাঝারি আকারের ক্যাম্বিসের ব্যাগ। মালী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "বাবু আসুন।"

"তামাক তৈরি যে"—বলিয়া গদাই ব্যাগটি খাটিয়ার উপর রাখিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মালী বলিল, "একটা কলার ডাঁটা কেটে আনি ?"

"না—আমার সঙ্গেই হুঁকো আছে।"—বলিয়া গদাই ব্যাগটি হইতে একটি হুঁকা বাহির করিল। দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"হ্যাঁহে—রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কাউকে জান ?"

মালী চিন্তা করিয়া বলিল, "রমণচন্দ্র ঘোষ ? কই না—মনে ত পড়ছে না। কেন বাবু ?"

"আমি যখন এইমাত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে আসছি, তখন দেখি, বগলে ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, একখানা চাদর গলায় জড়ান, একটা আধবয়সী লোক, আমবাগানে দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ীর পানে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভাবলাম কে লোকটা ? আমি পেছন থেকে আসছি, চৈতন্যই নেই। কাছে এসে চোখোচোখি হতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কে হে তুমি ?'—সে থতমত খেযে বললে—'আমার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ।'—আমি বললাম—'এখানে কি করছ ?'—'আজ্ঞে কিছু নয়'—বলে লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল।"

মালী বলিল, "কি জানি বাবু—কাউকে কখনও ত এ রকম দেখিনি। কি মৎলবে এসেছিল কে জানে।"

গদাই গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার কিন্তু ভারি সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল—তার বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসা করলাম না। খোঁজ নাও দিকিন, আশে পাশে কোনও গাঁয়ে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কেউ আছে কিনা।"

"আজ্ঞে তা খোঁজ নেব বইকি। এ খবরটা ত বাবুকে দেওয়া উচিত।"

"উচিত্‌-ই ত। কিন্তু আমি ত কাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে। আজ আমি এসেছি নিজের একটু কাযে। আবার ভোর বেলা চলে যাব। এক রকম লুকিয়ে এসেছি বললেই হয়। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর। কাল তুমি সকাল বেলা যেও। বাবুকে বোলো। আমার নাম করবার দরকার নেই—তুমি বোলো যেন তুমিই দেখেছ। তা হলে তোমার হুঁসিয়ারিতে বাবু খুসীও হবেন। বলবে, আমবাগানের ভিতর দিয়ে তুমি আসছিলে, এমন সময়

তুমিই যেন দেখলে—বুঝেছ—আমি যা যা দেখেছি তুমি সেইগুলো সব নিজের করে বলবে।"

মালী বলিল, "বলব, নাম জিজ্ঞাসা করতে বললে রমণচন্দ্র ঘোষ। আর কি বলব? বগলে চাদর—"

গদাই বলিল, "আরে না না। বলবে বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ। আধবয়সী লোক। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ। মনে থাকবে ত?"

"তা মনে থাকবে।"

গদাধর তখন মালীকে উত্তমরূপে তালিম দিল। সাক্ষীকে তালিম দেওয়া তাহার বহুদিনের অভ্যাস।

অবশেষে গদাই বলিল, "ভাল কথা—যা আনতে বলেছিলাম তা এনে রেখেছ মালী?"

"আজ্ঞে হাঁা।"—বলিয়া মালী বোতল তিনটি আনিয়া দিল।

গদাই বলিল, "এর কোন্‌টি এক টাকা ওয়ালা?"

"যেটিতে গালার শীলমোহর রয়েছে—এইটিই দোয়াস্তা—এক টাকা ওয়ালা। আর যে দুটিতে শুধু কাগজ আঁটা, সেই দুটি আট আনা বোতলের।"

গদাই শীল করা বোতলটি ব্যাগে পুরিল। বাকী দুইটি মালীকে দিয়া বলিল, "এ দুটি তুমি নাও।"

এই অপ্রত্যাশিত উপহারে মালীর দুইপাটি দন্তই বাহির হইয়া পড়িল। বলিল, "দুনো বোতল?"

"হ্যাঁ। দু' বোতলই তোমার জন্যে। তোমার স্ত্রী আছে—শাশুড়ী আছে—তারাও ত খায় টায়? তার আর লজ্জা কি? তোমাদের দেশে এ রকম চলন আছে তা কি আমি জানিনে? তোমরা ত মালী—পশ্চিমে, কায়েথরা পর্য্যন্ত—ভদ্র ঘরের কায়স্থ—কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হলে স্ত্রী-পুরুষে মদ খায়।"

মালী বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, তাই এ সম্বন্ধে তাহার সংস্কার কিছু উন্নত হইয়াছিল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবু—আমাদের দেশে এ রকম চলন আছে বটে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মালী আর এক ছিলিম তামাক সাজিবার জন্য ভিতরে গেল। বোতল দুইটিও লইয়া গেল। গদাই বাহিরে বসিয়া শুনিতে

পাইল—বৃদ্ধা বলিতেছে—হাঁ, তুমি একলা দু বোতল খাইবে বইকি! তুমি এক বোতল খাইও—আমরা মা বেটিতে এক বোতল খাইব।

দ্বিতীয় ছিলিম তামাক খাইয়া গদাই বিদায় গ্রহণ করিল। মালী বলিল, "কাল আপনি তবে কখন আসবেন বাবু?"

গদাই বলিল, "আজ রাত ত কমলপুরে থাকব। কাল ভোরে ভোরে উঠে চম্পট—কাল শ' তিনেক টাকা খাজনা আদায় হবার কথা আছে দরিয়াপুরে। সেই টাকাগুলো আদায় করে—ঘোড়াটি চড়ে—বেলা দুপুর একটা আন্দাজ মনিববাড়ী পৌঁছে যাব। কালীর প্রসাদটা ফাঁক যাবে না।"

মালী বলিল, "আমিও যাব। ফি বছরই যাই। কাল সকালেই যাব—বাবুকে সেই রমণ ঘোষের কথাটা বলিতে হবে কিনা। তারপর প্রসাদ পেয়ে বাড়ী আসব।"

"যাবে বইকি। বরং রামদাসোয়াকে নিয়ে যেও, বাঙ্গালীর পুজো ত কখনও দেখেনি, দেখে আসবে।"—বলিয়া গদাই হুঁকায় দুইটি 'সুখটান' টানিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ জয় মা কালী

কমলপুরে নিজ বাসায় পৌঁছিয়া গদাই প্রদীপ জ্বালিল। তাহার পর, দীঘি হইতে জল আনিয়া, উনান জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। অধিক কিছু নয়, কেবল ভাতেভাত। আজ রাত্রে গদাই পালের অনেক কায—বিপজ্জনক কায করিতে হইবে।

রাত্রি আন্দাজ নয়টা বাজিলে, হরিদাসী আসিয়া দর্শন দিল। গদাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "এসেছ হরিদাসী? আমি ভাবছিলাম—তোমার মনে আছে কি না আছে।"

হরিদাসী বলিল, "আমার মন তেমন নয়।"

"বস বস। বাড়ীর সব ভাল? বড়বাবু, ছোটবাবু সবাই ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে। ছোটবাবু এখানে নেই—আজ খাওয়া দাওয়া করে কোথায় গেছেন।"

"কোথায় গেলেন ?"

"বাড়ীতে কিছু বলে যান নি। আজ কর্ত্তা গিন্নীতে বৈকালে সেই কথা হচ্ছিল কিনা! বাবু বললেন—এমন ভাই—বিছানা বাক্স বেঁধে কোথায় চলে গেল—একবার জিজ্ঞাসাও করলে না। বলেও গেল না কতদিনে ফিরবে, কোথায় যাচ্ছে!"

গদাই বলিল, "তাই ত! ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও ভাব হল না।"

হরিদাসী হাসিয়া হলিল, "ভাব একেবারে আদায় কাঁচকলায়।"

"বড়লোকের সবই শোভা পায়। তোমার আমার ঘরে এ রকম হলে কত নিন্দে হ'ত।"—বলিয়া গদাই ভাতের হাঁড়িতে কাঠি ঘুরাইতে লাগিল।

হরিদাসী একটু মৃদু হাস্য করিল। বলিল, "সেই যা বলেছিলে, তা আজ হবে ত ?"

"হবে বইকি। সেই জন্যেই ত আজ আসা।"

"দেরী কত ? আমি কিন্তু বেশী রাত অবধি থাকতে পারব না।"

"দেরী কিছু নেই। তুমি এক কায কর দিকিন হরিদাসী। ঐ রোয়াকটায়, বেশ করে জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে ফেল। ঘরে একখানি কুশাসন আছে, সেইখানি বিছিয়ে দাও। ধুনুচিটে নিয়ে এস, আগুন দিচ্ছি। শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে একটা বার্লির টিনে ধুনো আছে। আসনখানির কাছে ধুনো দাও। আমি ততক্ষণ ভাতের ফ্যানটা গেলে ফেলি। ভাল কথা—দরজার দোরে খিল দিয়ে এসেছ ত ? কেউ এসে না পড়ে!"

"খিল দিয়েছি।"—বলিয়া হরিদাসী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে গেল।

ইতিমধ্যে গদাই ভাতের হাঁড়ি নামাইল। সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া হরিদাসী আসিয়া বলিল, "হয়েছে।"

"হয়েছে ? আচ্ছা বেশ। তা, তুমি বেশ শুদ্ধ হয়ে, কাপড় ছেড়ে এসেছ ত হরিদাসী ?"

"কাপড় ছেড়েছি।"

গদাই উঠিয়া গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানি লাল চেলির কাপড় পরিধান করিল। পঞ্চপাত্র হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া, নিজের ও হরিদাসীর গাত্রে ছিটাইয়া দিল। শেষে বলিল, "চল, এইবার ঘলঘসের শিকড় একটা তুলতে হবে।"

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। উঠানের কোণে দুই জনে গিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসী চুল খুলিয়া দিয়া মাটিতে পড়িয়া একটা ঘলঘসের ডাঁটায় আঁচল জড়াইয়া, কামড় দিয়া একটা গাছ উঠাইয়া ফেলিল।

গদাই বলিল, "জয় মা কালী। দেখিস মা মুখ রাখিস।"

হরিদাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গাছটি হাতে করিয়া, কাপড় দিয়া নিজের মুখের ধুলা মাটী ঝাড়িয়া ফেলিল। দুইজনে আবার রোয়াকে ফিরিয়া আসিল। গদাই একটি কাঠের হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল। পিতলের তালা আনিল। সিন্দুক খুলিয়া, টাকাভরা একটি খেরোর থলি বাহির করিল। খানিকটা লালসূতাও আনিল।

তখন আসনে উপবেশন করিয়া, ধুনাচিতে আরও কিঞ্চিৎ ধুনা নিক্ষেপ করিল। চক্ষু বুজিয়া উর্দ্ধমুখ হইযা, বুকের কাছে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে কালীনাম জপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া, কাঠের বাক্সটি খুলিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহার মধ্যে গঙ্গাজলের ছিটা দিল। থলি হইতে টাকাগুলি ঢালিযা, কুড়ি টাকার করিয়া তিনটি থাক সাজাইল। বলিল—"দেখ হরিদাসী, একটা বিষম সমিস্যেয় পড়েছি।"

"কি বল দেখি?"

"এই ত ষাটটি টাকা আছে। ভাবছি সব টাকাই কি বাক্সে দেব—না গোটাকতক বাইরে থাকবে?"

"কেন, যত বেশী টাকা দেব—আরও তত বেশী হবে।"

"তুমি বোঝ না হরিদাসী। এসব ভূত প্রেতের কাণ্ড কারখানা কিনা। কি জানি বলাই যায় কি, যদি সব টাকাগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন কি বুক চাপড়ে মরব? তার চেয়ে বরং পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে দিই, দশটা টাকা বাইরে থাক্। সন্ন্যাসী বাবা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়, তবে এই পঞ্চাশ টাকাতে আমার দুশো টাকা হবে। তখন বাকী দশ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে নিলেই হবে। কি বল, তোমার কি মত?"

"আচ্ছা, আবার দুশো টাকা বাড়িয়ে আটশো টাকা করা যাবে?"

গদাই হাসিয়া বলিল, "তা কি হয় ক্ষেপি! এ টাকা উচ্ছুগ্‌গু হয়ে গেল কিনা—এতে আর হবে না। আবার নতুন টাকা দিতে হবে।"

"তবে তাই কর। দশটি টাকা বাইরে রাখ।"

গদাই তখন গণিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে ভরিল। বন্ধ করিতে যাইতেছে, এমন সময় হরিদাসী বলিল, "থাম, থাম।"

গদাই বিস্মিত হইয়া, চক্ষু তুলিয়া বলিল, "কি ?"

হরিদাসী আঁচলের গিরো খুলিয়া, দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিল, "আমার এ দুটিও রেখে দাও। আমার আট টাকা হবে ত ?"

"তা আমি কি করে বলব ? আমার হয়, তোমারও হবে। আর, আমার টাকাগুলি যদি উড়ে যায়, তোমারও যাবে। তখন আমায় দোষ দিতে পাবে না—বলে রাখছি কিন্তু।"

"না, দোষ দেব না।"—বলিয়া হরিদাসী টাকা দুইটি দিল।

সে দুইটি টাকাও বাক্সে রাখিয়া গদাই তালা বন্ধ করিতে যাইতেছিল। হরিদাসী বলিল, "আমি একটা ভাল তালা এনেছি—খুব মজবুদ। এইটিই লাগাও।"

মুহূর্ত্তের জন্য গদাধরের মুখ বিপন্নের মত দেখাইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "তা বেশ ত। তোমার তালাই দাও।"

তালা বন্ধ হইলে হরিদাসী চাবিটি লইয়া আপনার আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল। তখন লাল স্থতা দিয়া, শিকড়টি বাক্সের গায়ে বাঁধিয়া গদাই বলিল, "জয় মা কালী, মুখ তুলে চাস মা।"

হরিদাসী বলিল, "রাত হল। এখন তবে আমি উঠি।"

"এস। রাত দুপুরে বাক্সের উপর একশো আট বার মন্তর জপ করতে হবে। একমাস পরে, চতুর্দ্দশীর রাত্রে আবার আসব। খুলে দেখতে হবে মা কালী কি করলেন। তুমি আসতে ভুলো না যেন।"

"না, ভুলব না।"—বলিয়া হরিদাসী চলিল।

দ্বার অবধি তাহার সঙ্গে আসিয়া গদাই বলিল, "আজ ভূতচতুর্দ্দশীর রাত্রি। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আজ রাতে বেরুবে। সাবধানে যেও।"

হরিদাসী চলিয়া গেলে, সদর দরজায় খিল দিয়া গদাই আসিয়া বসিল। বোতলটি খুলিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—মাগী কি সেয়ানা! নিজের তালাটি এনেছে। আমি যেন আর এ বাক্স খুলতে পারব না। আমার কাছে একশো চাবি আছে—একটা না একটা কি লাগবে না ?

আরও দুই এক পাত্র পান করিতে করিতে রাত্রি দশটা বাজিল। গদাই তখন ভাত বাড়িয়া আহার করিল।

এক ছিলিম তামাক খাইতে খাইতে, গদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গদাই তখন উঠিয়া, লাল চেলিখানি শাড়ীর মত করিয়া পরিল। সিন্দুক হইতে একটা লম্বা লম্বা জটাওয়ালা পরচুল বাহির করিয়া মাথায় দিল। একটা ত্রিশূল বাহির করিয়া, তাহার অগ্রভাগে তৈলাক্ত সিন্দুর লেপিয়া দিল। তাহার পর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ ছদ্মবেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইল। আর একপাত্র মদ্য পান করিয়া, একশত চাবির গুচ্ছটি নিজের কোমরে বাঁধিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সদর দরজায় তালা বন্ধ করিতে করিতে মনে মনে হাসিয়া বলিল, 'হরিদাসীকে বলছিলাম—আজ রাতে অনেক ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী বেরুবে। অনেক না বেরুক, একজন ডাকিনী ত বেরুল। মালী বেটা সপরিবারে এতক্ষণ নেশায় ভোঁ হয়ে পড়ে আছে। যাই, নদীর ধারে গিয়ে দেখি আমার খাবার উপযুক্ত মড়াটড়া এক আধটা মেলে কিনা।'—বলিয়া সে ক্ষিপ্রগতিতে অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গঙ্গামণির মুক্তি

গদাই পাল চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে মালী আপনার কুটীরের সম্মুখস্থিত চারপাইখানিতে বসিয়া গদাই-প্রদত্ত একটি বোতল খুলিল। মালীবধূ একটা পিতলের ছিপায় খানকতক টেংরামাছ ভাজা ও কিছু বেসমের ফুলুরী দিয়া গেল। তৎসংযোগে মালী বসিয়া বসিয়া বোতলটির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল।

মালীর শাশুড়ী সেই পথে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সে বলিল, "মাঈ, ভিতরে বন্ধ করিয়া আসিয়াছিস ?"

বৃদ্ধা বলিল, "না বেটা, জল দিয়া আসিয়াছি, এখনও চুলায় আগুন দেওয়া হয় নাই।"

"তবে বেশী দেরী করিস না। সব কায করিয়া, চাবি আনিয়া আমাকে দে।"

বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে বাটীর পশ্চাৎদিকে পূর্ব্ববর্ণিত দ্বারের তালাটি খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই তালাটি আবার ভিতরের দিকের কড়ায় লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দিল। সেখানটায় বিষম অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে হাৎড়াইয়া, একটা কুলুঙ্গি হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বালিল। তখন দেখা গেল, সেটি একটি অল্প পরিসর কক্ষ বা চলন-ঘর। তাহার একপ্রান্তে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রদীপটি হাতে করিয়া সেই সিঁড়ি দিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেল।

দ্বিতলের উপর একটি লম্বা সরু বারান্দা। তাহার একদিকে সমস্তটা কাঠের ঝিলমিল দিয়া আবদ্ধ। অপর প্রান্তে একটি দ্বার, তাহার শিকল লাগান রহিয়াছে। শিকল খুলিয়া বৃদ্ধা ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে স্থানে খানিকটা আবরণশূন্য ছাদ—উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে ওখানে দুই তিনটি কক্ষের দ্বার দেখা যাইতেছে। তাহার একটি তখন খোলা ছিল, ভিতর হইতে অল্প আলোক বাহির হইতেছিল। বৃদ্ধা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষখানি সুন্দরভাবে সজ্জিত—টেবিল, চৌকি, ছবি, কাঁচের পুতুল প্রভৃতি ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভাল খাট বিছানা রহিয়াছে, তথাপি একটি কৃশাঙ্গী যুবতী একখানি মাদুর পাতিয়া মেঝের উপর শয়ান ছিল। একস্থানে টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ আয়না এবং নানাবর্ণের কেশতৈল সাজান রহিয়াছে, কিন্তু এই রমণীয় কেশরাশি রুক্ষ, আলুলায়িত। মাদুর-খানির উপর স্বীয় বাম করকে উপাধান করিয়া গঙ্গামণি শুইয়া ছিল।

বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গঙ্গামণি চকিতভাবে উঠিয়া বসিল। প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। তখন সেই আলোকে দেখা গেল, অভাগিনী পরমা সুন্দরী। বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও কোমল। মুখখানি বড় বিষণ্ণ।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া গঙ্গামণি বলিল, "কি মাঈ, আজ যে এত দেরী?"

"কাল আমাদের পরব্ কিনা, তাই খাবার প্রস্তুত করিতেছিলাম!"

"পরব?—পরব্ কি?"

"পরব্ এই যাকে বলে তেহওয়ার। কাল দেওয়ালী।"

"কি হয় ?"

"খানাপিনা হয়। রাত্রে সবাই ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়। তোদের বাঙ্গালীদের পূজা হয়—কালীমাঈর পূজা—জানিস না ?"

"ওঃ—কাল বুঝি কালীপুজো ? আজ চতুর্দ্দশী—তাই এত অন্ধকার।"

"হ্যাঁ বেটি, কাল কালীপূজা। বাবুর বাড়ীতে পূজা হয়। অনেক পাঁঠা বলি হয়। কাল সেখান থেকে পরসাদি আসবে—তুই খাবি ত ?"

"মাংস ?"

"হ্যাঁ—পাঁঠার মাংস।"

"আমায় কি মাছ মাংস খেতে আছে ? আমি যে বিধবা।"

"হলেই বা বিধবা। তুই ত বামুন কায়েথের মেয়ে নস্। আমাদের দেশে গোয়ালা জাতের মেয়ে বিধবা হলেও মাছ মাংস সব খায়।"

"আমাদের খেতে নেই। পাপ হয়।"

"তোদের দেশের দস্তুর ভারি খারাপ। আমাদের মুলুকে গোয়ালার মেয়ে বেওয়া হলে আবার তার সাদি হয়। একবার ছেড়ে পাঁচবার হয়। কেমন ভাল ! তুই যদি বাঙ্গালী না হতিস ত তোরও সাদি হত। তোর এই কাঁচা বয়স, এমন খাপসুরত চেহারা, কত লোকে তোকে সাদি করবার জন্য পাগল হত।"

"গঙ্গামণি শিহরিয়া বলিল, "না—না—ছি—ছি। ও কথা বলিসনে।"

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গঙ্গামণি বলিল, "মাঈ—এ বকুলগঞ্জ থেকে আমাদের দরিয়াপুর কতদূর ?"

"অনেকদূর। সাত আট কোশ হবে।"

"বকুলগঞ্জের বাবু আমায় কতদিন আর আটকে রাখবে ? আমায় ছেড়ে দিক না এখন।"

বৃদ্ধা বলিল, "যদি ছেড়ে দেয় ত তুই কোথা যাবি ?"

"কেন, আমার শ্বশুরবাড়ী রয়েছে—বাপের বাড়ী রয়েছে—এক জায়গায় যাব।"

"তারা কি আর তোকে ঘরে নেবে ?"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পালাইবার কোনও ভরসা না থাকিলেও, সে মাঝে মাঝে মনে করিত, যদি কোনদিন কোনও

সুযোগে পলাইতে পারি, তবে কোথায় যাইব—আমার আশ্রয় কোথায়? কে বিশ্বাস করিবে যে আমি নিষ্কলঙ্ক? আজ বৃদ্ধার মুখেও এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণির মনে দারুণ নৈরাশ্য উপস্থিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা বলিল, "রাত হল। আয়, ময়দা মেখে নে—আমি উনান জ্বেলে দিই।"

গঙ্গামণি বলিল, "না মাঈ—থাক্। আজ আর উনান জ্বালতে হবে না।"

"খাবিনে?"

"না, আজ আর কিছু খাব না।"

"কিছু খাবিনে?"

"দুটো পেয়ারা আছে তাই খাব এখন।"

বৃদ্ধা বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। তাহার কতকটা মেহনৎ বাঁচিয়া গেল—তাহাতে সে খুসীই হইল। কুটীরে সেই অনাস্বাদিত বোতলটির কাছে বুড়ীর মনটি পড়িয়া ছিল তাই সে বিদায় চাহিল।

গঙ্গামণি বলিল, "একটু বোস্ না—যাবি এখন এত তাড়াতাড়ি কি? তোর হুঁকোটা কোথায় গেল, তামাক খাবিনে?"

বৃদ্ধা বলিল, "আচ্ছা—এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। তুই তোর শ্বশুরবাড়ীর কথা বল।"

বৃদ্ধা তামাক সাজিতে বসিল।

গঙ্গামণি বলিল, "আমার শ্বশুরবাড়ীর কি গল্প শুনবি?"

"সেখানে কে কে আছে?"

"আমার ভাসুর আছে, জা আছে, দুটি ভাসুরপো আছে।"

"ভাসুরপো দুটি কত বড়?"

"একটির বয়স দশ—একটি চার বছরের। আমি বিধবা হয়ে গেলাম—আমার ত ছেলেপিলে হল না—তাই ছোট ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগলাম। সে আমার কাছে থাকত, আমার কাছে শুতো, আমায় মা বলত।"—বলিতে বলিতে গঙ্গামণির চক্ষু দুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বলিল, "এরা তোকে কি করে ধরে আনলে?"

"আমার বুদ্ধির দোষে। ছোট ছেলেটি আমায় নেওটো—আমায় মা বলত বলে—আমার জা আমায় দুচক্ষে দেখতে পারত না। আমার ভাসুর—সেও

যখন তখন আমায় গালমন্দ দিত। আমার কোনও কাযে একতিল দোষ পেলে আমার ভাশুর আমার জা—দুজনেই রেগে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করত। অনেক দিন ধরে এই রকম জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে করে, ক্রমে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের বললাম—আমি বাপের বাড়ী যাব—এখানে থাকব না। তা শুনে তারা আমার উপর আরও রেগে উঠল, আমাকে বেশী করে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগল। শেষে যখন আমার অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ভাবলাম এখান থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাই। কে আমায় পৌঁছে দেবে? সঙ্গী কোথা পাব? গ্রামে একজন বুড়ী ছিল—সদ্‌গোপের মেয়ে—তারই সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমায় এখানে এনে ফেললে। যে যন্ত্রণার হাত এড়াবার জন্যে পালিয়েছিলাম, তার দশগুণ যন্ত্রণা এখানে এসে আরম্ভ হল। ভগবান এ পর্য্যন্ত আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছেন—এখন কোন রকমে এখান থেকে উদ্ধার হতে পারলে বাঁচি।”

গঙ্গামণি যে সময় কথা শেষ করিল, তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতেছে।

বৃদ্ধা বলিল, “বেটী—কাঁদিস না—কাঁদিস না। কালী মাঈ তোর ভাল করবেন।”

তাহার পর নিস্তব্ধ হইয়া বৃদ্ধা ধূমপান শেষ করিল। তখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের দ্বারে তালাটি উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দুই তিন বার সেটিকে টানিয়া দেখিল। কুটীরে গিয়া চাবিটি জামাতার হস্তে দিয়া রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ অবধি গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার শেষ কথাগুলি—‘কালী মাঈ তোর ভাল করবেন’—তাহার মনে বারম্বার ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে বিষম অন্ধকার। জঙ্গলের মধ্যে অবিশ্রাম ঝিল্লিধ্বনি হইতেছে। ঝোপে ঝোপে অসংখ্য জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে। জানালার কাছে—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গঙ্গামণি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সেই অগাধ অন্ধকারের মধ্যে সজল নেত্রযুগল ডুবাইয়া দিয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—‘মা কালী—আমি ছেলেবেলা থেকে তোমায় কত প্রণাম করেছি—কত ভক্তি করেছি। কাল

তোমার পুজো হবে—তাই আজ রাতে তুমি অন্ধকারের বেশ ধরে এসে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে ফেলেছ। মা, আমি ত কোনও অপরাধ করিনি—তবে এত কেন কষ্ট পাচ্ছি? অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিলে—যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম—সেখান থেকেও আমায় তাড়ালে। মা, যদি আমি দোষ করে থাকি—তবে আমায় ক্ষমা কর। এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার কর। যাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এমন কর। আর তা যদি না কর—তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীদের বলে দাও আজ রাতেই যেন তারা এসে আমায় মেরে ফেলে—তা হলেও আমি পরিত্রাণ পাই। মা রক্ষাকালী—আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর মা!'

এইরূপে প্রার্থনা করার পর অভাগিনীর হৃদয়ভার অনেকটা লাঘব হইল। তখন সে জানালাটি বন্ধ করিয়া, মাদুরখানিতে আবার শয়ন করিল। প্রদীপটি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল—কপাট খোলাই রহিল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গঙ্গামণি মনে মনে বলিতে লাগিল—'মা কালী, আমায় রক্ষা কর মা—আমায় রক্ষা কর।'—এইরূপ মানসিক প্রার্থনার অবস্থায়, নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহার চেতনা হরণ করিলেন।

রাত্রি গভীর হইল। গঙ্গামণি সেই অবস্থায় নিদ্রিত। হঠাৎ যেন মস্তকে কি একটা কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করিল—তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, প্রদীপের আলোক খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। রক্তাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার হস্তের ত্রিশূল মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। গঙ্গামণি দেখিল, সেই ত্রিশূলের অগ্রভাগ যেন শোণিতরঞ্জিত। মুহূর্ত্তকাল মাত্র এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া, আবার সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভয়ে তাহার সকল অঙ্গ হিম হইয়া গেল। সে বাস্তবিক জাগিয়াছে অথবা স্বপ্নে একটা বিভীষিকা দেখিতেছে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অস্বাভাবিক বিকৃত বিকট কণ্ঠে কে যেন বলিল—"ভয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। ছদ্মবেশী গদাধর তখন ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বলিল—"ভয় নাই। আমি—মা—কালীর—ডাকিনী। ভয় নাই।"

শয়নের পূর্ব্বের প্রার্থনা তখন গঙ্গামণির মনে পড়িল। মনে পড়িল সে বলিয়াছিল, মা হয় আমায় উদ্ধার কর নয় ত তোমার ডাকিনী যোগিনী কেহ আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলুক। তাই গঙ্গামণি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। হাত যোড় করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল, "মা, আমায় মেরে ফেলো না।"

এই কথা শুনিয়া ডাকিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ভয় নাই—আমি তোকে মারব না। কাল মা কালীর পুজো। আজ রাত্রে তিনি কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। মা আমায় জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন—তুই কাঁদিস কেন? তোর কান্নায় মার আসন টলেছে। বল্ তুই কাঁদিস কেন?"

সেইরূপ হাতযোড় অবস্থায় গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—"মা, আমি গরীব গৃহস্থের ঘরের বিধবা। আমাকে এরা ধরে এনে এখানে বন্ধ করে রেখেছে।"

"কে বন্ধ করে রেখেছে?"

"বকুলগঞ্জের মেজবাবু।"

"বকুলগঞ্জের মেজবাবু মা কালীর পরম ভক্ত। অনেক মদ—অনেক মাংস দিয়ে ফি বছর মায়ের পুজো করে। আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই এক প্রতিজ্ঞা কর্।"

মুক্তির আশ্বাসে গঙ্গামণির ভয় দূরে গেল। যুক্তকরে সে বলিল, "কি প্রতিজ্ঞা, মা?"

"তুই যত দিন বেঁচে থাকবি—কখনও কারুর কাছে বকুলগঞ্জের মেজবাবুর নাম করবিনে।"

গঙ্গামণি বলিল, "প্রতিজ্ঞা করছি—কারু কাছে নাম করব না।"

"যদি নাম করিস তবে আমি এসে ত্রিশূল তোর বুকে বিঁধে দেব।"

"না মা—আমি প্রাণ থাকতে কারু কাছে মেজবাবুর নাম করব না। আমায় উদ্ধার কর।"

"তবে আয়"—বলিয়া গদাই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কম্পিতপদে গঙ্গামণিও তাহার অনুসরণ করিল।

ঝিলিমিল-বদ্ধ বারান্দায় আসিয়া গদাই বলিল, "প্রদীপটা নিয়ে আসি।" ফিরিয়া আসিয়া প্রদীপ লইল এবং নিজ বস্ত্র হইতে, মোহিতের নামে ঠিকানা-লেখা সেই কুড়াইয়া পাওয়া পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া, গঙ্গামণির মাদুরের উপর রাখিয়া দিল।

গৃহের বাহির হইয়া গদাই প্রদীপটা ফেলিয়া দিল। ত্রিশূলের পশ্চাৎভাগ গঙ্গামণির হাতে দিয়া বলিল, "শক্ত করে ধর্। আমার পিছু পিছু আয়।"

তখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দুইজনে মিলাইয়া গেল।

বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া গঙ্গামণি যেন নবজীবন পাইল। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন নববলের সঞ্চার হইল। ত্রিশূল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, ত্বরিত পদক্ষেপে সে অনেক পথ অতিবাহন করিল। পথশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে ক্লান্তি অনুভব করিল না।

এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া, পথের ধারে একটা মন্দির দেখা গেল। গদাই বলিল, "এই ঘণ্টেশ্বরের মন্দির, চিনিস ?"

গঙ্গামণি বলিল, "মহাদেবপুরের ঘণ্টেশ্বর ?"

"হ্যাঁ। মহাদেবপুর গ্রাম ঐ দূরে আছে—এখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। এ মন্দিরে কখনও এসেছিলি ?"

"হ্যাঁ—কতবার এসেছি পূজো দিতে। এখান থেকে আমাদের গাঁ দু' কোশ।"

"আমি ত আর থাকতে পারিনে—আর বেশী রাত নেই। ভোর বেলাই মার বোধন বসবে। আমরা সবাই ডাকিনী যোগিনী মিলে মাকে সাজিয়ে দেবো। আমি এখন চললাম। এই সোজা রাস্তা ধরে চলে যা। দু ক্রোশ পরে দরিয়াপুর গ্রাম। ভোরে ভোরে বাড়ী পৌঁছে যাবি।"

গঙ্গামণি তখন ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া, ডাকিনীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, "মা—আমায় যদি তারা বাড়ীতে না নেয়, কি উপায় হবে ?"

গদাই বলিল, "তারা লোককে বলেছে—তুই বাপের বাড়ী গিয়েছিস। কোন কলঙ্কের ভয় নেই। তবু যদি না নেয়—তুই বলিস, তবে আমার স্বামীর জোৎজমি অর্দ্ধেক আমায় ভাগ করে দাও—আমি গিয়ে কাশীবাস করি।"

"তবু যদি মা, তারা না শোনে ? আমায় যদি বাড়ীতে স্থান না দেয় ?"

"না দেয়, তোদের গাঁয়ের নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করবি। নায়েব গদাধর পাল অতি সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি—মা কালীর একজন প্রধান ভক্ত। সে তোর ভাসুরকে ডাকিয়ে এনে জুতিয়ে সোজা করে দেবে। এখন যা।"

গঙ্গামণি তাহাকে প্রণাম করিয়া দরিয়াপুর অভিমুখে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গদাই গাত্রোত্থান করিল। মনে মনে বলিল, 'কাণ্ডটি করলাম, মন্দ নয়।

তবু যদি যৌবনের সে বল গায়ে থাকত। রাত আর বেশী নেই—বোধ হয় আড়াইটা বেজে গিয়েছে। দু ঘণ্টার মধ্যে কমলপুরে পৌঁছান চাই। ভোরের বেলা গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এ ডাকিনীর মূর্ত্তি দেখে মূর্চ্ছা না যায়। পা চালিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে বাড়ী পৌঁছব এখন।'—বলিযা গদাই ক্ষিপ্রপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গোপীকান্তবাবুর দুশ্চিন্তা

রাত্রি প্রভাত হইল। গত রজনীর 'খানাপিনা'র প্রভাবে মালী-পরিবারের কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই—কেবল রামদাসোয়া উঠিযা বাগানে গিয়া বাঁশের লগী হস্তে নিজ প্রাতরাশের উপযুক্ত সুস্বাদু ফল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

ক্রমে রৌদ্র দেখা দিল। বেশ বেলা হইল। তখন মালীর কুটীরে বয়স্ক লোকের কণ্ঠস্বর একটু আধটু শুনা যাইতে লাগিল। মালীর স্ত্রী উঠিয়া দুই ছিলিম তামাক সাজিয়া—এক ছিলিম স্বামীকে ও এক ছিলিম মাতাকে দিল। বৃদ্ধা নিজ চাটাইয়ের উপর বসিয়া, দুই একবার হাই তুলিয়া, দুই একবার চক্ষু রগড়াইযা, কিঞ্চিৎ কাসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান আরম্ভ করিল।

মালী বলিল, "মাঈ—আজ বাবুর বাড়ী কালীপূজা। একটু বেলা হইলেই স্নান করিয়া খরাই মারিয়া, আমি সেখানে যাইব।"

পেয়ারা চর্ব্বণ করিতে করিতে, বোঁ করিয়া একপাক ঘুরিয়া, রামদাসোয়া বল্লিল, "হামু যায়ব।"

মালী বলিল, "তুই যাইবি, তোকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবে কে?"

আর একটা ঘুরপাক দিয়া রামদাসোয়া বলিল, "তোরা কান্ধাপর চড়কে যায়ব।"

বৃদ্ধা বলিল, "আহা লইয়া যাইও। ছেলেমানুষ, পূজা দেখিবে না?"

মালী বলিল, "তবে তুইও চল মাঈ। রামদাসোয়াকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবি।"

"দুজনেই গেলে 'উহার' খবরদারী করিবে কে? বাবু যদি রাগ করেন?"

"সে কথা ঠিক।"—বলিয়া মালী নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। অবশেষে

স্থির হইল, বৃদ্ধা প্রথমে রামদাসোয়াকে লইয়া গিয়া পূজা দেখিয়া আসিবে—দ্বিপ্রহরে সে ফিরিলে তখন মালী যাইবে।

পূজা দেখিতে যাইবে বলিয়া রামদাসোয়ার মাতা তাহার বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মেরজাই প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া, এক ছটাক পরিমাণ সর্ষপ তৈল তাহার ধূলিধূসর কেশবহুল মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া যখন দুই হাতে সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসোয়া বিশেষ আপত্তি করে নাই। উঠানের কোণে এক কলসী জল রাখা ছিল। জ্ঞানোদয়ের পর দুইবার তাহাকে স্নান করিতে হইয়াছে। মাতা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ছড় ছড় করিয়া টানিয়া সেই কলসীর নিকটবর্ত্তী করিবামাত্র তাই সে তারস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সজলনেত্রে বারম্বার আবেদন করিতে লাগিল, পূজা দেখিবার জন্য সে কিছুমাত্র উৎসুক নহে—এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচে। কিন্তু তাহার এ 'এজিটেশনে' কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। ঘটী ঘটী শীতল জল তাহার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্নানান্তে মাতা তাহার চুল আঁচড়াইয়া কাজল দিয়া, একখানি হলুদে ছোপান ধুতি এবং একটি ছিটের কুর্ত্তা পরাইয়া দিল। তখন আবার রামদাসোয়ার মুখে হাসি ফুটিল। মনের আনন্দে রৌদ্রে খেলা করিতে লাগিল।

ক্রমে বৃদ্ধা মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, বেশমের বাসি ফুলুরি খাইয়া 'খরাই মারিল'। বলিল—"তবে ওখানে জল দিয়া, উনুন ধরাইয়া আসি। আসিয়াই বাহির হইব।"

বৃদ্ধা তখন জামাতার নিকট হইতে চাবিটি লইয়া ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে চলিল। পৌঁছিয়া দেখিল দরজা খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! দুয়ার খোলা কেন? গঙ্গামণি আছে ত?

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বৃদ্ধা উপরে গেল। দেখিল কেহ কোথাও নাই।

প্রত্যেক ঘর দুই তিন বার করিয়া খুঁজিল—কেহ কোথাও নাই! 'গঙ্গামণি'—'গঙ্গামণি'—বলিয়া বার বার চীৎকার করিল, কেহ উত্তর দিল না। তখন বৃদ্ধা হতাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জামাতাকে গিয়া সংবাদ দিল।

শুনিয়া মালী আকাশ হইতে পড়িল। তাহার চক্ষু বসিয়া গেল। গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বলিল—"চল্—দেখি গিয়া।"

দুইজনে তখন ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাতে উপস্থিত হইল। বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, মালীর মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, বৃদ্ধার কেশ সবলে ধারণ করিয়া বলিল, "হারামজাদি, তোরই দোষে এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বৃদ্ধা এই আকস্মিক অপমানে আগুন হইয়া বলিল, "কেন রে ছোঁড়াপুতা—আমার কি দোষ? পাজি—আমার চুল ছাড়্।"

"তোর দোষ নয়? নিশ্চয় তোর দোষ। কাল সরাপের নেশায় ছিলি, তালাবন্ধ করিস নাই। এই দেখ্, একটা কড়ায় তালাবন্ধ রহিয়াছে। দুয়ার খোলা পাইয়া গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

বৃদ্ধা দেখিল, তালাটা একটা কড়ায় বন্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। বলিল, "কখনও নয়, আমি দুইটা কড়ায় ঠিক তালাবন্ধ করিয়াছিলাম। আর, সে সময় আমি সরাপ ছুঁইও নাই। তুই নেশায় ভোঁ হইয়া পড়িয়া ছিলি—চাবি কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলি, কে লইয়া তালা খুলিয়াছে।"

মালী চুল ছাড়িয়া দিল। তখন দুইজনে উপরে গেল। গঙ্গামণির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, মালী দেখিল মাদুরের উপর পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া বলিল—"এখানা কি? এ চিঠি কোথা হইতে আসিল? এ যে ডাকের চিঠি দেখিতেছি।"

বৃদ্ধা বলিল, "গঙ্গামণিকে কেহ চিঠি লিখিয়াছিল বোধ হয়। এই চিঠি পড়াইলেই, কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে কিনারা হইবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "দূর বেকুব। গঙ্গামণিকে চিঠি দিয়া যাইবে কে? এ বোধ হয়, যাহারা তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছে।"

মালী পোষ্টকার্ডখানি লইয়া সযত্নে নিজের কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। বলিল, "বড়ই সর্ব্বনাশ হইল। এতদিন এখানে চাকরি করিয়া খাইতেছি—এইবার চাকরিটি গেল। আর কি বাবু আমায় রাখিবে—এখনি তাড়াইয়া দিবে। এখন এ বৃদ্ধ বয়সে, কাচ্ছা বাচ্চা লইয়া যাই কোথায়?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বুড়ী বলিল, "পলাইয়া হয় ত এখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে। একবার খুঁজিয়া দেখ্।"

দুইজনে আবার বাহির হইল। তালাটি বন্ধ করিয়া বিষণ্ণ বদনে মালী বলিল, "তবে যাই। খুঁজিয়া দেখি।"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, মালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কোথাও তাহাকে পাইলাম না। এখন যাই—বাবুর নিকট সংবাদ দিই।"

বুড়ী বলিল, "কি বলিবি ?"

"বলিব—কোন দুষ্ট লোক, অন্য চাবি দিয়া তালা খুলিয়া, গঙ্গামণিকে লইয়া গিযাছে।"

বৃদ্ধা বলিল, "তোর যেমন বুদ্ধি! ও কথা বলিলে বাবু কি বিশ্বাস করিবে ? বলিবে আমরা তালা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তবে কি বলিব ?"

"একটা কিছু আনিয়া, তালাটি ভাঙ্গিয়া ফেল্। সেই ভাঙ্গা তালা হাতে করিয়া লইয়া যাইবি। বলিবি কল্য রাত্রে কে তালা ভাঙ্গিয়া গঙ্গামণিকে লইয়া গিয়াছে।"

মালী বলিল, "এই পরামর্শই ঠিক।"

তখন নিজ কুটীর হইতে দুইটা লোহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। সেই লোহার সাহায্যে অনেক কষ্টে এক দণ্ড ধরিয়া তালাটা ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, বেলা যখন তৃতীয় প্রহর সেই সময় কাঁদ কাঁদ মুখে বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মধ্যাহ্ন-পূজা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ-ভোজনও সমাপ্ত। কাঙ্গালী ভোজন হইতেছে—কর্ম্মচারীরা পরিবেষণ করিতেছে। গদাই এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তদারক ও হুকুম করিতেছে। মালী তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল, "কি হে মালীর পো—এত দেরী করে এলে ?"

মালী চুপি চুপি বলিল, "আজ্ঞে বাবু সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এইরূপভাবে গদাই বলিল, "কেন রামদাসোয়া ভাল আছে ত ?"

"সে ভাল আছে। গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

"অ্যাঁ! বল কি!—কেমন করিয়া পলাইল ?"

"কল্য রাত্রে কোনও দুষ্টলোক তালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

গদাই বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? কে এমন কার্য্য করিল?"

"কি জানি বাবু, তা ত জানি না। তবে গঙ্গামণির ঘরে এই চিঠিখানা কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।"—বলিয়া মালী চিঠি দিল।

গদাই সেখানি উল্টাইয়া দেখিয়া মালীকে ফিরাইয়া দিল। বলিল—"চশমা সঙ্গে নেই। পড়তে পারলাম না। কে এ কায করলে তাই ভাবছি। আচ্ছা সেই যে লোকটা, যার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ, বাড়ীর পানে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল—সে ত নয়?"

"কি জানি বাবু। এখন কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে খবর ত দিতে হয়।"

"তা দিতে হবে বইকি। বাবু যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন কারু উপর তোমার সন্দেহ হয় কিনা, তুমি সাফ বলে দিও, হুজুর কাল বৈকালে একজন আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, গলায় চাদর জড়ানো, বগলে ছাতি, বাগানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাড়ীর পানে চেয়ে ছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বললে রমণচন্দ্র ঘোষ—তারই উপর আমার সন্দেহ হয়। তা না বললে বাবু হয়ত মনে করতে পারেন তুমিই টাকা খেয়ে গঙ্গামণিকে ছেড়ে দিয়েছ।"

মালী বলিল, "আমি হলে তালা ভাঙ্গিব কেন? চাবি ত আমারই কাছে ছিল।"—বলিয়া মালী ভাঙ্গা তালাটি দেখাইল।

মালীর বুদ্ধি দেখিয়া গদাই মনে মনে হাস্য করিল। বলিল—"ঠিক কথাই ত। আচ্ছা তা আমি গিয়ে দেখি, বাবু কি করছেন কোথায় আছেন। তারপর তোমায় নিয়ে যাব। একটু নিরিবিলি না হলে ত বলা যাবে না। তুমি এইখানে দাঁড়াও।"

মালী বলিল, "বাবু গরীবের চাকরিটি থাকবে ত?"

"চাকরি? এ অবস্থায় চাকরি থাকা শক্ত বটে। আমি বলে কয়ে দেখব। আমি তোমার জন্যে বিশেষ করেই বলব। তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি বাবুর সন্ধান করে আসি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গদাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এস। এইটে বেশ করে মনে করে রেখ—রমণচন্দ্র ঘোষ, আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো—বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছ। ভাঙ্গা তালাটা আর চিঠিখানাও বাবুকে দিয়ে এস।"

বৈঠকখানার পাশে একটি ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে বাবু ছিলেন। গদাই মালীকে

লইয়া গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিল। নিজে বৈঠকখানার বাহিরে বসিয়া রহিল।

দশ মিনিট পরে মালী বাহির হইয়া আসিল। গদাই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে—কি হল ?"

"সব কথা বললাম।"

"বাবু কি খুব রেগেছেন ?"

"আজ্ঞে না। বললেন—তুই বেটা ভারি অসাবধান—আচ্ছা এখন যা, পরে যা হয় করব।"

"তুমি যাও। প্রসাদ পাওগে। যাতে তোমার চাকরি থাকে, বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি সেই বন্দোবস্ত করছি।"

মালী চলিয়া গেল। গদাই তখন গোপীকান্তবাবুর নিকট গিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিযাই বাবু বলিলেন, "গদাই, দুয়ারটা বন্ধ করে দাও।"

গদাই দ্বার বন্ধ করিল। বাবুর পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বলিলেন—"তোমার কথা মত, মালীর সমুখে কোনও উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ করলাম না। কিন্তু আমার মন বড় উতলা হয়েছে। কি করি ?"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে, উতলা হবার ত কথাই বটে। যদি থানায় যায়, তা হয়ে সঙ্গীন মোকর্দ্দমা হয়ে দাঁড়াবে। একবারে দায়রার মোকর্দ্দমা।"

"থানায় যাবে কি ?"

"আজ্ঞে—কারা এর ভিতর আছে—কারা তাকে নিয়ে গেল, সেটা না জানতে পারলে বলা শক্ত।"

"আমি তা জেনেছি। রমণ ঘোষ আর আমার ভাই।"

"আপনার ভাই ? ছোটবাবু ? আজ্ঞে, তাও কি সম্ভব হয় ?"

"সম্ভব ছেড়ে নিশ্চয়। গঙ্গামণির ঘরে, মোহিতের নামেই এই পোষ্টকার্ড-খানা মালী কুড়িয়ে পেয়েছে। আর, কাল বৈকালে, মালী দেখেছিল, বাগানে রমণ ঘোষ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে গঙ্গামণির ঘরের পানে চেয়ে রয়েছে।"—বলিয়া বাবু পোষ্টকার্ডখানি গদাধরের হস্তে দিলেন।

গদাধর সেখানি দেখিয়া, বাবুকে ফিরাইয়া দিল। বলিল—"তবে

এই মৎলবেই রমণ ঘোষ ঘন ঘন ছোটবাবুর কাছে আসত। এখন বোঝা গেল।"

বাবু বলিলেন, "নিশ্চয়। আর কাল এমনি সময় মোহিতও বাক্স বিছানা বেঁধে কোথায় চলে গেছে—কাউকে বলেও যায়নি।"

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বলিল, "ভাই হয়ে কি আর ভাইয়ের হাতে দড়ি দেবে? থানায় যাবে?"

"তুমি তাকে জান না গদাই। সে সর্ব্বনেশে লোক—কিছু আশ্চর্য্য নয়। আর, সেও নিজে যদি না খবর দেয়, গঙ্গামণির আত্মীয় স্বজন খবর দিতে পারে। কি করি বল দেখি?"

গদাই বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আজ খবর দিয়েছে বলে বোধ হয় না। তা হলে এতক্ষণ থানা পুলিস এসে পড়তো। কিম্বা এও হতে পারে, দারোগা থানায় নেই, জমাদার এজেহার লিখে নিয়েছে, দারোগা এসে তদন্ত আরম্ভ করবে।"

"এখন উপায়?"

গদাধর আবার চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"এ অধমকে যদি উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা হয় নিবেদন করি। আজ রাত্রেই এ স্থান আপনার পরিত্যাগ করা উচিত। চাই কি কাল সকালেই দলবল নিয়ে দারোগা এসে হাজির হতে পারে। আপনি মানী লোক—তারা একটা উঁচু কথা বললেই মরমে মরে যাবেন। আজ রাত্রেই আপনি স্থানান্তরে যান। আমায় কিছু টাকা দিয়ে যান, আমি কাল সকালেই থানায় গিয়ে দারোগাকে ঠিক করে নেব। পৃথিবী টাকার বশ। পুলিশ ত কথাই নেই। আপনি এখানে প্রচার করে দিন যে আপনি কলকাতা রওনা হলেন। ষ্টেশনে গিয়ে কলকাতার একখানা সেকেন কেলাস টিকিট কিনে, শেয়ালদহে নেবেই, প্রথম গাড়ীতে হাওড়া থেকে পশ্চিম রওনা হন। একখানা লম্বা রকম টিকিট কিনবেন—যেমন কাশী কি এলাহাবাদ। কিন্তু রাস্তায় কোনও এক জায়গায় নেমে পড়বেন। টিকিটখানা ষ্টেশনে দেবেন না। বলবেন আমি এখানে ব্রেকজর্ণি করলাম। তা হলেই আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। তার পর এদিকে সব ঠিকঠাক হলে, সমস্ত চুকে বুকে গেলে তখন আসবেন। এখানে যা কিছু করতে কর্ম্মাতে হয়, সব আমি করব।"

বাবু বলিলেন, "দেখ, সে স্ত্রীলোকটা জানে, বকুলগঞ্জের মেজবাবু, বকুলগঞ্জে তাকে বন্ধ করে রেখেছে।"

গদাই বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু রমণ ঘোষ আর ছোটবাবু—"

"ঠিক বলেছ। ওটা আমার মনে আসেনি। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি যা বলছ তাই করব। আজ রাত্রেই রওনা হব। এখন, কত টাকা চাই বল দেখি?"

গদাই বলিল, "সঙ্গীন মোকর্দ্দমা—বড়লোক আসামী। পুলিশ একেবারে পেয়ে বসবে। শ' পাঁচেক দিয়ে যান।"

সেই কক্ষে দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুক ছিল। বাবু উঠিয়া, চাবি খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া আনিলেন। একশো খানি দশটাকার নোট গণিয়া গদাধরকে দিয়া বলিলেন, "এই হাজার টাকা রাখ। যা দরকার হয় খরচ করবে। আমাকে এ যাত্রা বাঁচাও। তুমি আমার চাকর নও—তুমি আমার সহোদর ভাই।"

গদাই বলিল, "আমি হুজুরের দাসানুদাস। হুজুরের নিমক খেয়েছি। প্রাণ থাকতে নিমকহারামী করব না।"—বলিয়া সে বাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। বাবু গদাইকে উঠাইয়া বলিলেন, "আমি যেখানে থাকব, সেখান থেকে, তোমায় চিঠি লিখব। আর যদি টাকাকড়ি দরকার হয়, আমায় লিখো—আমি তার বন্দোবস্ত করব। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই—তোমার উপকার ভুলব না। এর পুরস্কার তুমি পাবে।"

গদাই বলিল, "হুজুরের স্নেহই আমার পুরস্কার। অন্য পুরস্কার তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

বাবু তখন গদাইকে বিদায় দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ স্বামী ও স্ত্রী

খুলনা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে, সাগরদীঘি নামক একখানি গ্রাম আছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, ডেপুটি পদাকাঙ্ক্ষী, প্রমথনাথের পিতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের জমিদার। গুরুদাসবাবুরা দুই ভাই ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ হরিদাসবাবু জমিদারী দেখিতেন, কনিষ্ঠ ডেপুটিগিরি চাকরি করিতেন। এক বৎসর হইল হরিদাসবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি নাবালক পুত্র আছে। জমিদারী দেখে কে?—এই কারণে বাধ্য হইয়া গুরুদাসবাবু, ত্রিশ বৎসর চাকরি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

গুরুদাসবাবুর দুইটি পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ। কনিষ্ঠের নাম বসন্ত। তাহার বয়স একাদশ বর্ষ। কন্যা সরোজিনী, বসন্ত অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। ইহারই বিবাহের জন্য প্রমথনাথের পিতা কিছু উদ্বিগ্ন আছেন। সরোজিনীর আসল নামটি, বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে সকলে 'চিনি' বলিয়া ডাকে। সরোজিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া কে কবে 'জিনি' বলিয়াছিল—'জিনি' হইতে শীঘ্রই চিনি হইয়া দাঁড়াইল।

গুরুদাসবাবু যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ইহাও একপ্রকার স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইল—হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই কারণে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিরত রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় উক্ত সম্প্রদায়ের সহিতই রহিল। মিশনারি মেম স্ত্রীকে লেখাপড়া ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপ চলিলে, অল্পে অল্পে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এখন তাঁহার টিকি আছে—মাছ মাংস ছাড়িয়াছেন এবং চৈতন্যভাগবত প্রতিদিন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।—মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই—তবে সে মার কাছে লেখাপড়া এবং দাদার কাছে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে শিখিতেছে। তাহাতে গুরুদাসবাবু আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

প্রমথবাবুর স্ত্রীর নাম সুশীলা। সুশীলার পিতামাতাও নব্যতন্ত্রের লোক। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে একটু বেশী বয়স অবধি মেয়েকে তাঁহারা অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ে না পাঠাইলেও, বাড়ীতে তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। সুশীলা মেয়েটি সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহার বয়স এখন সতেরো বৎসর।

প্রমথবাবু যেদিন কমলপুর হইতে ফিরিলেন, সেদিন বৈকালে তাঁহার স্ত্রী সুশীলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধুবরের খবর কি?"

"খবর ভাল।"

"বিয়ের কথাবার্ত্তা কিছু হল ?"

"কিছু না।"

"সে কি গো! তুমি তবে গিয়েছিলে কি জন্যে ?"

"শুধু তার মন বুঝে দেখবার জন্যে।"

"মন বোঝা গেল ?"

"গেল। বিয়ে করার গতিক নয়।"

"গতিক নয় ? বল কি! চিরকাল কি আইবুড় থাকবে নাকি ?"

"সেই রকমই ত তার ভাবখানা। সে বলে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে।"

শুনিয়া সুশীলা আপন মনে বলিতে লাগিল, 'নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে! আচ্ছা, আধ্যাত্মিক উন্নতি কি ?'

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিল, "আমি কি তোমার অভিধান নাকি ? যাও অভিধান দেখ গে!"

সুশীলা বলিল, "আধ্যাত্মিক কথাটার মানে কি আর আমি জানিনে মশাই, তা জানি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাপারটা কি। যেমন শারীরিক উন্নতি বললে বোঝা যায় যে তার গায়ে খুব জোর হয়েছে, সে খুব কুস্তী লড়তে পারে ইত্যাদি, মানসিক উন্নতি বললে বোঝা যায় যে তার খুব বুদ্ধি হয়েছে, খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারে, খুব শক্ত শক্ত বিষয় পড়ে সহজেই বুঝতে পারে, ভাল ভাল বই লিখতে পারে, নৈতিক উন্নতি বললে যেমন বোঝা যায় সর্ব্বদা সত্য কথা কয়, কারও অনিষ্ট করে না, কোনও রকম পাপকার্য্য করে না, পাপচিন্তা মনে স্থান দেয় না—সেই রকম আমায় বলে দাও, আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে কি বোঝায়।"

প্রশ্নটি শুনিয়া প্রমথনাথ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"ওটা কি জান ?—এই ধর—যেমন সেকালের মুনি ঋষিরে, তাঁরা যে রকম নিজের উন্নতি করেছিলেন।"

সুশীলা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "নারদ ঋষি বীণা বাজাতে

বাজাতে আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পারতেন। মোহিতবাবু হার্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতে উড়তে চান ?"

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নারদ ঋষি শুধু যে উড়তে পারতেন না নয়—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতেন। তাঁর মত ঈশ্বরভক্ত খুব কম।"

সুশীলা বলিল, "তা হলে মোহিতবাবুর মত, বিবাহ করলে ঈশ্বরকে ভাল করে ভক্তি করা যায় না।"

"তাই। তার মত, সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে সংসারের বাইরে গিয়ে না বসলে, ভক্তির একাগ্রতা হয় না।"

সুশীলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল—"এ কি রকম জান ?"

"কি রকম ?"

"বই না পড়ে সমালোচনা।"

প্রমথবাবু একটু বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—"তোমার কথাটা বুঝলাম না।"

সুশীলা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"ঈশ্বরকে ভক্তি করবার মানে এ ত নয় যে রোজ একশো আটবার কি হাজারবার কি লক্ষবার তাঁর নাম জপ করতে হবে—কিম্বা ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে সন্দেশ মণ্ডা দিয়ে তাঁর পুজো করতে হবে ?"

প্রমথবাবু স্বীকার করিলেন, "তা ত নয়-ই।"

সুশীলা বলিল, "তিনি স্নেহ করে, করুণা করে, আমাদের যা কল্যাণ সাধন করেছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে নিত্য যে সকল সুখের সামগ্রী আমরা পাচ্ছি—সেই সকলের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁর সমস্ত বিধান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে উপলব্ধি করা—এরই নাম ত ভক্তি ?"

প্রমথনাথ বলিলেন, "অন্তত: আমি তাই মনে করি।"

"তবে দেখ, তুমি যদি বিবাহ না কর—স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রকন্যার স্নেহ—তোমার জন্যে এই সকল সুন্দর উপহারগুলি হাতে করে এসে তিনি দাঁড়ালেন—আর তুমি যদি তা গ্রহণ না করে, বিমুখ হয়ে বনে চলে যেতে চাও, আর সেখানে বসে তাঁকে ভক্তি কর—তাহলে বই না পড়ে সমালোচনা, রান্না না চেখে রাঁধুনির প্রশংসা করা হল না কি ?"

স্ত্রীর মুখের কথাগুলি শুনিয়া প্রমথনাথের চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি গভীর আনন্দে সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বড় সুন্দর উপমাটি দিয়েছ ত!—আমি ত এত পড়াশুনো করেছি, এ সকল বিষয়ে চিন্তাও করেছি, কিন্তু এমন সরল যুক্তিটি কখনও ত আমার মাথায় আসেনি।"

সুশীলা তাহার ক্ষণিক গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চপলহাস্যের সহিত বলিল, "আসবে কি করে—পুরুষের মাথা বই ত নয়।"

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে! আমি মোহিতের সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলাম, তখন এ উপমাটি জানা থাকলে এক মিনিটে ভায়াকে নিরুত্তর করে দিতে পারতাম। আচ্ছা সে ত আসছে, আবার তর্ক হবে।"

সুশীলা বলিল, "মোহিতবাবু আসছেন এখানে?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?—কবে গো?"

"তিন চার দিনের মধ্যেই।"

প্রায় একমিনিট সুশীলা নীরবে চিন্তা করিল।—তখন অল্পে অল্পে তাহার অধরযুগলে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"বেশ, বেশ!"

প্রমথনাথ স্ত্রীকে ভাল করিয়া চিনিতেন। বলিলেন—"কেন বল দেখি? তোমার মৎলবটা কি?"

"মৎলব আছে। এখন বলব না।"

"না, বলতে হবে।"

"এখন না। আঃ কি জ্বালা—আঁচল ছাড় না। আমি এখন একখানা বই খুঁজতে যাচ্চি।"

"কি বই?"

"Lamb's Tales from Shakespeare."

"হঠাৎ সেক্সপীয়রের উপর এত ভক্তি উথলে উঠল যে?"

"একটা গল্প এখনি আমার পড়া দরকার।"

"কোন গল্পটা?"

"Much Ado About Nothing"—বলিয়া সুশীলা ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ মোহিতের আগমন

অপরাহ্ণ কাল। গুরুদাসবাবু বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। চক্ষে সোণার চশমা রহিয়াছে। কক্ষে আর কেহ নাই।

গুরুদাসবাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর। বৃদ্ধ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যুবাকালে ইনি একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। এখন দেহখানি ঈষৎ স্থূল—কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মস্তকের কেশগুলি বিরল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু যাহা আছে তাহার অধিকাংশই শুভ্র। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও হাস্যবিভাসিত। ক্ষৌরিত চিক্কণ মুখমণ্ডল হইতে যেন একটা সহৃদয়তার দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গায়ে একটি পাতলা শাদা ফ্ল্যানেলের হাতকাটা পিরাণ। পার্শ্বে আলবোলায় তামাকু প্রস্তুত রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গম হইতেছে—কিন্তু বৃদ্ধের সেদিকে খেয়াল নাই। তামাকু মনের আক্ষেপে নিজে নিজেই পুড়িতেছে। গুরুদাসবাবু যখন পাঠে নিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার পার্শ্বে তামাকু সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। কখনও মাঝে মাঝে দুই-এক টান দেন মাত্র। যখন টানিয়া দেখেন তামাক পুড়িয়া গিয়াছে, তখন ছিলিম বদলাইয়া দিতে হুকুম করেন।—ভাল তামাক এমন করিয়া মাঠে মারা যায় দেখিয়া ভৃত্যেরা হা হুতাশ করে।

বৈঠকখানার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। বারান্দার নিম্নে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া শ-খানেক গোলাপ গাছ দেওয়া। সেখানে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের বিভিন্ন জাতীয় গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বেলা চারিটা বাজিল। তখন বাহিরে হুম্ হুম্ করিয়া পাল্কী-বেহারার শব্দ উত্থিত হইল। ক্রমে পাল্কীখানি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। গুরুদাসবাবু বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি অপরিচিত যুবাপুরুষ পাল্কী হইতে অবতরণ করিতেছে। বৈঠকখানার অপর অংশ হইতে প্রমথনাথ চটিজুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া, মোহিতলালকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল। পাল্কীর বিছানা এবং চামড়ার ব্যাগটি একজন ভৃত্যের জিম্মায় দিয়া, মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল। বলিল—"বাবা, এই আমার বন্ধু মোহিতলাল এসেছেন।"—সঙ্গে সঙ্গে মোহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদাসবাবুকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস—ভাল আছ ত ?"—বলিয়া গুরুদাসবাবু দণ্ডায়মান হইলেন। চশমাটি খুলিয়া পুস্তকের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ রাখিলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে ?"—বলিয়া মোহিত নতমস্তকে রহিল।

"হ্যাঁ—বেশ আছি! এস—বস।"—বলিয়া বৃদ্ধ কক্ষের মধ্যস্থিত, চৌকি-পরিবেষ্টিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, মোহিত ও প্রমথ উপবেশন করিল।

গুরুদাসবাবু সস্নেহে মোহিতের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে ?"

"শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন। দুদিন খুলনায় ছিলাম।"

প্রমথনাথ বলিলেন, "খুলনায় বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার বার্ষিক উৎসবে মোহিতের নিমন্ত্রণ ছিল।"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ। বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা থেকে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বটে। সভার নামটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি ?"

মোহিত অল্প হাসিয়া বলিল, "সে সভার সভ্যদের মত টত একটু অদ্ভুত রকমের। তারা বলে বিদ্যুৎই হচ্চে আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি।"

বিস্মিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "বিদ্যুৎ ? বিদ্যুৎ আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা আরও বলে, মানুষের আত্মা আর কিছুই নয়—খানিকটে বিদ্যুৎ মাত্র। পূজা, হোম, জপ, তপ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য, এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।"

শুনিয়া গুরুদাসবাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তাদের মাথার কোনও গোলমাল নেই ত ?—কারা এ সভা করেছে ?"

মোহিত বলিল, "সহরের নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা।"

"ওঃ—তাই বল। আমি ভেবেছি বুঝি বয়স্ক লোকেরা। ছেলেবুদ্ধি নইলে আর এমন হয়!"

প্রমথনাথ বলিল, "কেন বাবা—কোন কোন বয়স্ক লোকেও ত এ রকম মত

প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ ক্রিয়া কাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।"

মোহিত বলিল, "এ যুগে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের ঘোর যুদ্ধ চলছে। তাই কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন।"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "তা ঠিক নয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই—বিরোধ সম্ভবও নয়। আমি প্রকৃত সত্যধর্ম্মের কথা বলছি। ধর্ম্মের ডগ্‌মার কথা বলছিনে।"

প্রমথ বলিলেন, "কিন্তু সকল প্রচলিত ধর্ম্মই ত ডগমায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্ম—মহম্মদীয় ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম—"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের চেয়ে এ বিষয়ে নিষ্কণ্টক। যখন পিথাগোরাস এবং কোপর্ণিকস প্রচার করেছিলেন যে সূর্য্য স্থির, পৃথিবীই তার চারিদিকে ঘুরছে—তখন খৃষ্টীয় জগতে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। পাদ্রীরা বলেছিলেন এটা entirely opposed to Holy Writ—বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। পোপ পঞ্চম পল, হুকুম দিয়েছিলেন, 'In order that this opinion may not further spread, to the damage of Catholic Truth'—এই মত পাছে বিস্তৃত হয়ে সার্ব্বজনীন সত্যকে নষ্ট করে, তাই এ সম্বন্ধে সকল পুস্তকাদি suspended, forbidden and condemned হল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষীরা যখন এ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম তখন আর্ত্তনাদ করে ওঠেনি।"

প্রমথ বলিল, "আপনি উচ্চ অঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা বলছেন। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম—ক্রিয়াকাণ্ডমূলক যে হিন্দুধর্ম্ম, সেটা কি সব জায়গায় বিজ্ঞান-সম্মত? যেমন ধরুন মূর্ত্তিপূজা।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মানুষের মনে যে একটা ভক্তিবৃত্তি আছে, সেইটেকে চরিতার্থ করবার জন্যে যদি সে মূর্ত্তি গড়েই ঈশ্বরকে পূজা করে—তাতে ক্ষতি কি?"

প্রমথ বলিল, "মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আছেন কিনা সে ত অনেক দূরের কথা, ঈশ্বর মোটেই আছেন কিনা এর উত্তরই বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত দিতে পারেনি। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ নেই এ কথা কি করে স্বীকার করি?"

গুরুদাসবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আহা! ঈশ্বর নেই এ কথাও ত বিজ্ঞানে বলছে না গো। বিজ্ঞান শুধু বলছে—আমি জানি না। তুমি রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ খুলে দেখ, সব জায়গাতেই লেখা আছে তিনি অচিন্ত্য—বড় বড় মুনিঋষিরা ধ্যানেই তাঁকে পান না। তা হলেই ত হল স্পেন্সারের সেই unknowable—অজ্ঞেয়। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ নিয়ে তর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল।—মানুষের মনে ঈশ্বরের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা, এইটেই হল আসল কথা। এ বিষয়ে ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান দুই-ই একমত। এ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যে কেউ বা গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করে, কেউ বা মসজিদে গিয়ে করে, কেউ বা ব্রাহ্মসমাজে যায়, আর হিন্দু মাটীর কিম্বা পাথরের মূর্ত্তি গড়িযে পুজো করে। খৃষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কেউ এমন কথা বলতে পারে যে তার মনে ঈশ্বরের যে ধারণা হয়েছে—ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ তাই? কোনও বুদ্ধিমান এমন কথা বলবে না। আবার যারা ভক্ত—ব্রাহ্মই হোক, খৃষ্টানই হোক, মুসলমানই হোক—তারা বলবে, পাহাড়ের সঙ্গে বালুকণার যে পরিমাণ ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির এ ধারণার তার চেয়েও বেশী প্রভেদ। হিন্দু কি জানে না, আমি যাকে পূজা করছি এ মাটীর মূর্ত্তি মাত্র? তা সে খুব জানে। কিন্তু আসল দেবতা পাবে কোথা? অথচ ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি চাই। তাই সেই মূর্ত্তিকেই দেবতা মনে করে নিয়ে আকাঙ্ক্ষা মেটায়। এই যে ছোট ছোট মেয়েরা খেলার ঘর পাতে, ধুলোমাটী দিয়ে ভাত রাঁধে, পুতুল-খোকাকে খাওয়ায়, তারা কি জানেনা যে এ ঘরও নয়, এ ভাতও নয়, এ খোকাও নয়?—খুব জানে। তবে ও রকম কেন করে? কেউ কেউ বলেন, এটা শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তি—বাপ মার দেখে—তাই করে। সে কথাই নয়! বীজের মধ্যে যেমন গাছ থাকে, বালিকার মধ্যে সেই রকম একটি মা আছে। তার মনের মধ্যে গৃহস্থালী পাতবার, সন্তান পালন করবার একটি আকাঙ্ক্ষা আছে। ও বয়সে সে গৃহ পাবে কোথা? সন্তান পাবে কোথা? তাই সে খেলার ঘর পেতে পুতুলকে খোকা কল্পনা করে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করে।"

মোহিত বলিল, "সাধ্বী স্ত্রীলোক যেমন প্রবাসী স্বামীর ফোটোগ্রাফ দেখে সান্ত্বনা লাভ করে—এও কতকটা সেই রকম।"

প্রমথ বলিল, "সেই রকম কই হল? আসলের সঙ্গে নকলের সাদৃশ্য আছে। ফোটোগ্রাফ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মূর্ত্তির সঙ্গে দেবতার সাদৃশ্য

কোথায় ? মূর্ত্তিটা দেবতার তুলনায় কিছুই নয়—মূর্ত্তিকে দেবতা কল্পনা করে দেবতার অপমান করা হয় না কি ? এতে কি দেবতা সন্তুষ্ট হন ?”

গুরুদাসবাবু বলিলেন, “আচ্ছা, আমি একটা উপমা দিয়ে এ কথার উত্তর দিই। মনে কর একটি লোক যখন বিদেশে যায়, তখন তার ছেলেটির চার পাঁচ বছর বয়স। সেই ছেলে ক্রমে বড় হল। তার মনে সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ হয়, ‘সকল ছেলেই আপন আপন বাপের কাছে আছে—আমিই কেবল বাপের কাছে থাকতে পেলাম না।’ ক্রমে সে যুবাপুরুষ হল। দেখলে, তার সঙ্গীরা সকলেই নিজের নিজের বাপকে সেবা করে, যত্ন করে। তার মনে এই দুঃখ হতে লাগল—‘আমি আমার বাপের সেবা করতে পেলাম না।’ সে সামান্য রকমের ছবি আঁকতে জানত। ইচ্ছা হল, বাপের একখানি ছবি সে আঁকে। সেই পাঁচ বছরের বেলায় বাপকে দেখেছিল, আবছায়া মত একটু মনে ছিল। সেই স্মৃতির অনুসরণ করে, নিজের সামান্য চিত্রবিদ্যার সাহায্যে, বাপের একখানি ছবি আঁকলে। কিন্তু আসলে সে ছবিখানি বাপের সঙ্গে কিছুই মিললো না। সে সেই ছবিখানি সামনে রেখে রোজ প্রণাম করে, পুজো করে, এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে পুজো করছে, হঠাৎ তার বাপ এসে এই ব্যাপার দেখতে গেলে। তখন কি সে বাপ ছেলেকে জুতো নিয়ে মারতে যাবে, বলবে পাজি, এ রকম ছবি এঁকে কেন আমার মানহানি করেছিস ?—না, আনন্দে তার মন ভরে উঠবে—ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবে ?”

এই উপমাটি শুনিয়া প্রমথ ও মোহিত উভয়েই নিরুত্তর রহিল। উপমাটির সৌন্দর্য্য মোহিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

যুবকগণকে নীরব দেখিয়া গুরুদাসবাবু বলিলেন, “প্রমথ, ইনি শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, এঁকে নিয়ে যাও। যাও বাবাজী, হাত মুখ ধুয়ে, বাড়ীর মধ্যে আমার রাধাবল্লভজীউ আছেন, তাঁকে প্রণাম করে, জল টল খাওগে।”

প্রমথনাথ মোহিতকে লইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে মোহিত বলিল, “মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছি কিন্তু উনি আজ গল্পচ্ছলে যে যুক্তির অবতারণা করলেন, সেটি বড়ই সুন্দর।”

প্রমথনাথ বলিল, “বাবা এত জানেন যে তার সংখ্যা নেই। আমরা ওঁকে গল্পার্ণব উপাধি দিয়েছি—অবিশ্যি সেটা ওঁর অসাক্ষাতে।”

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বিলাতী চিনি

বৈঠকখানার পশ্চাতে বহির্ব্বাটী—তাহারই একটি সুসজ্জিত কক্ষ মোহিতলালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই কক্ষের সহিত স্নানাগার প্রভৃতি সংলগ্ন। প্রমথনাথ সেই কক্ষে মোহিতলালকে লইয়া গেল। সমস্ত দেখাইয়া দিয়া, কিছুক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মোহিতলাল হাত মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। আলমারি হইতে একখানি পুস্তক লইয়া, জানালার কাছে চেয়ারে টানিয়া বসিয়া পড়িতেছে।

প্রমথ বলিল, "কি পড়া হচ্ছে ?"

"হক্সলির প্রবন্ধাবলী।"

"পড়ো না পড়ো না—নাস্তিক হয়ে যাবে।"

মোহিত বহি রাখিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার আস্তিকতা তেমন ক্ষণভঙ্গুর নয়।"

প্রমথ বলিল, "বাড়ীর মধ্যে চল। ঠাকুর প্রণাম করবে, মাকে প্রণাম করবে এস।"

মোহিত উঠিয়া প্রমথনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। চকমিলানো দ্বিতল বাটী। উঠানে দাঁড়াইয়া একটি সাত বৎসরের বালক কলা খাইতেছে। ঝি চাকরেরা আপন আপন কার্য্য করিতেছে। সেই বালককে প্রমথনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথা রে ?"

আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল, "উপরে।"

প্রমথ তখন মোহিতকে লইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। সিংহাসনোপরি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত রাধাবল্লভজীউ বংশীহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পার্শ্বদেশে রাধিকা। মোহিতলাল বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর পার্শ্বের একটি কক্ষে মোহিতকে উপবেশন করাইয়া প্রমথ মাকে ডাকিতে গেল। মোহিত দেখিল, কক্ষখানিতে ইংরাজী ধরণের আসবাব। মধ্যস্থলে একখানি গোল টেবিল আছে—তাহার চারি পাশে চৌকি। চারিদিকে দেওয়ালের নিকট চারিখানি সোফা। টেবিলের উপর টানা পাখাও ঝুলিতেছে। মোহিত একখানি সোফায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমথনাথ জননীকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল। মোহিত বিস্মিত হইয়া দেখিল ইঁহার বেশভূষা সাধারণ হিন্দু গৃহস্থমহিলার মত নহে। ব্রাহ্মমহিলারই বেশ—কেবল পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ বলিল, "মা এই আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধু মোহিত এসেছেন।"

মোহিত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মা বলিলেন, "এস বাবা এস। দীর্ঘজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও।"

প্রমথ বলিল, "সে ত হবার যো নেই মা। মোহিত যে হবুসন্ন্যাসী।"

মা বলিলেন, "ও আবার কি কথা! বালাই—সন্ন্যাসী হতে যাবে কেন? এই কি সন্ন্যাসী হবার বয়েস?"

প্রমথ বলিল, "মোহিত আমাদের নবীন সন্ন্যাসী।"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালিকা আসিয়া গৃহিণীর কাছে দাঁড়াইল।

মোহিত দেখিল, বালিকারও বেশ মাতার ন্যায় নব্য-ধরণের। তাহার মুখশ্রী অতি পরিপাটী—বর্ণটিও সুন্দর। চুলগুলি খোঁপা বাঁধা নয়, খোলা অবস্থায় পিঠে পড়িয়া রহিযাছে—যেমন ও বয়সের ইংরাজ মেয়েদের থাকে। হিন্দুয়ানির মধ্যে, কপালে একটি খয়েরের টিপ আছে এবং পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ তাহাকে বলিল, "ইনি কে জানিস?"

বালিকা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

"আমার বন্ধু মোহিত—আমরা এক সঙ্গে কলকাতায় পড়তাম।"

এই কথা শুনিয়া বালিকা মোহিতলালকে নমস্কার করিল। প্রমথ মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল, "এটি আমার ছোট বোন চিনি।"

বালিকা একবার মার পানে একবার দাদার পানে চাহিয়া বলিল, "যাও দাদা, আমার নাম খারাপ করো না।"

"কেন, তোর নাম চিনি নয়?"

"না।"

"তবে কি, মিছরি?"

বালিকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

"তবে কি গুড়?"

বালিকা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঃ—দেখ না মা!"

গৃহিণী কন্যার মাথার সম্মুখস্থিত কেশগুলি হাতে করিয়া সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, "তা সত্যিই ত বাছা! চিনি বললে যদি ও রাগই করে, তবে কেন ওকে চিনি বলা? যখন ছেলেমানুষ ছিল তখন না হয় বলেছিস। তাই বলে কি চিরকালই বলবি?"—বলিয়া গৃহিণী কন্যাকে লইয়া নিকটস্থ সোফায় উপবেশন করিলেন। মোহিত ও প্রমথ টেবিলের পার্শ্বস্থ দুইখানি চেয়ারে বসিল।

প্রমথ বলিল, "কেন, এখন কি উনি আর ছেলেমানুষ নেই? ভারী বিজ্ঞ হয়েছেন? চোখে চালশে ধরেছে? চশমা কিনে দিতে হবে?"

চিনি মার একখানি হাত নিজ হস্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়া বলিল, "দাদা যখন তখন বলেন—চশমা কিনে দেব? চশমা কিনে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যা কিনে দিতে এতদিন ধরে বলছি, তা কিন্তু কিনে দেবার নামটি নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "কি ফরমাস হয়েছে আবার?"

"দাদাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

প্রমথ গম্ভীরভাবে বলিল, "একখানা নামাবলী।"

চিনি বলিল, "যাও—ভুলে গেলে?"

প্রমথ বলিল, "একটা হরিনামের মালা?"

"তোমার বেশ মনে আছে। তুমি শুধু আমায় রাগাচ্ছ। না মা—ও সব নয়।"

মা বলিলেন, "কি তবে তুই-ই বল্ না।"

চিনি মার কাণে কাণে বলিল, "গ্র্যামোফোন।"

গৃহিণী বলিলেন, "গ্র্যামোফোন? না বাছা—রক্ষে কর। গ্র্যামোফোনে কায নেই। কাণ ঝালাপালা। কলকাতায় যখন আমরা ছিলাম, আমাদের পাশের বাড়ীতেই সেই সোণার-বেণেরা ছিল। তাদের ছেলে একটা গ্র্যামোফোন কিনে এনেছিল। দিনরাত্রি সেটা বাজাত। আমাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিয়েছিল। যত গান ছিল, সবচেয়ে তার পছন্দ হয়েছিল একটা হতচ্ছাড়া গান। দিন নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই—সেইটে বাজাত। তার কেউ বন্ধুবান্ধব এলেই সেই গানটা শুনিয়ে দিত। ভাগ্যিস দিনকতক পরে তার কলটা ভেঙ্গে গেল, নইলে আমায় অন্য বাড়ী ভাড়া নিতে হত। তুই তখন দশ বছরের ছিলি—মনে নেই?"

চিনি বলিল, "মনে আছে বইকি। সে গানটা হচ্ছে—ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না।—গ্র্যামোফোনে ত কত ভাল ভাল গান আছে মা—সব ত আর এ রকম নয়।"

"তা থাক্ বাছা—গ্র্যামোফোনের ভাল গান গ্র্যামোফোনেই থাক্। আমার ঘরে তা সইতে পারব না। আমাদের বয়স হয়েছে—কাশী বৃন্দাবন চলে যাই—তখন তোরা বাড়ীতে গ্র্যামোফোন বাজাস, ঢাক বাজাস, যা খুসী বাজাস।"

এই কথা শুনিয়া চিনির চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। "আচ্ছা না দাও না দেবে"—বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন, "দেখলে একবার মেয়ের অভিমান! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, শ্বশুরঘর করতে যাবে, আজও এমন অবুঝ। মোহিত, তুমি বাবা অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। জল খাবার তৈরি। বস, আমি ঠিক করিগে—ঠিক করে ডেকে পাঠাব।"

প্রমথ বলিল, "মা, তুমি বোধ হয় মনে করেছ, আমি বাড়ীতে বসে আছি বলে আমার ক্ষিদে টিদে কিছুই পায়নি। কিন্তু সেটা তোমার ভুল।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "ভাগ্যিস ভুলটা সংশোধন করে দিলি—নইলে বোধ হয় আজ খাবার পেতিস নে।"—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গল্পার্ণবের চা পান

জলযোগের পর মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ বাগানে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইল। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে মোহিত বলিল, "এবার ফেরা যাক চল—সায়ংসন্ধ্যার সময় হল।"

দুজনে ফিরিল। পথে মোহিত বলিল, "তুমি সন্ধ্যা কর না কেন?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "পৈতের পর এক বৎসর করেছি। আবার চুল পাকলে, দাঁত নড়লে আরম্ভ করব।"

"তোমার বাবা কিছু বলেন না?"

"উনি কারু মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। বলেন, যখন ওর ক্ষিদে পাবে তখন আপনিই খাবে।"

"আধ্যাত্মিক ক্ষুধা?"

"অবশ্য।"

"তোমার বাবা এমন নিষ্ঠাবান, আর তুমি এমন কালাপাহাড় কেন?"

"একেবারে কালাপাহাড় নই। যখন বাড়ীতে থাকি, রোজ সন্ধ্যার পর, বাবা যখন সায়ংসন্ধ্যা সেরে রাধাবল্লভজীউর শীতল দেন, তখন আমাদের পুজোর ঘরে উপস্থিত থাকতে হয়—সকলে—বাড়ীশুদ্ধ—মায় ঝি চাকর পর্য্যন্ত। শীতল হয়ে গেলে বাবা রাধাবল্লভজীর স্তব করেন, আরতি করেন—সে সময়টা বেশ লাগে কিন্তু। আমি নিতান্ত কালাপাহাড় নই। আজ আরতির সময় বাবা তোমাকেও নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন।"

মোহিত বলিল, "বেশ ত। কিন্তু মেয়েরা থাকবেন—আমি যাব কি করে?"

"অত পর্দ্দা টর্দ্দা বাবা মানেন না। তবে অবশ্য তিনি এ ভালবাসেন না যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে, বলে নাচবে—কিম্বা সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে। যে সকল লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব—তাঁরা বাড়ীতে এলে বাবা অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাতে তিনি কোনও দোষ দেখেন না।"

মোহিত বলিল, "কথাটা ঠিক বটে। তবে, আমাদের অভ্যাসের সংস্কারের বিরুদ্ধে বলে বাধো বাধো ঠেকে।"

বলিতে বলিতে ইহারা বাড়ী পৌঁছিল। সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া মোহিত নিজ কক্ষটিতে আসিয়া বসিল। প্রমথ আসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কর্ত্তা দুইজনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মোহিত পূজার ঘরে গিয়া দেখিল, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে গুরুদাসবাবু বসিয়া আছেন। শীতল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি কম্বল বিছানো আছে। একখানিতে মেয়েরা বসিয়া আছেন। অপরখানি পুরুষদের জন্য। প্রমথ ও মোহিত সেখানে গিয়া উপবেশন করিল। দ্বারের নিকট ঝি চাকরেরা বসিয়া আছে।

গুরুদাসবাবু তখন করযোড় করিয়া রাধাবল্লভজীউর স্তবপাঠ আরম্ভ করিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ স্তব করিয়া, অবশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। সেই কক্ষস্থিত সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া সেই

সময় প্রণাম করিল। তখন গুরুদাসবাবু একহস্তে প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ অপর হস্তে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা ধারণ করিয়া আরতির জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কক্ষস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইল। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গুরুদাসবাবু আরতি করিতে লাগিলেন—দুইটি ছোট বালক কাঁসর বাজাইতে লাগিল। আরতি শেষে গুরুদাসবাবু আবার প্রণাম করিলেন—অপর সকলেও প্রণাম করিল। অবশেষে তিনি কুশাগ্রে গঙ্গাজল লইয়া, সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইহার পর সকলে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। গুরুদাসবাবু মোহিতের হাতখানি ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত সেই বসিবার কক্ষে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, "বস বাবা বস। আমি কাপড় ছেড়ে আসি—এইবার একটু চা খেতে হবে।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রমথ আসিয়া মোহিতের পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল—"সন্ধ্যার সময় বাবা এইখানেই বসেন। বৈঠকখানায় যান না। প্রথমে যখন পেন্সন নিয়ে বাবা বাড়ী এসেছিলেন, তখন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানাতেই বসতেন। কিন্তু পাড়ার যত সব বুড়োরা এসে তাস দাবা এই সব খেলবার প্রস্তাব করতে লাগল। রীতিমত একটি আড্ডা জমিয়ে তুললে। তাই বাবা সন্ধ্যার পর আর বাইরে যান না। এই ঘরটিতে বসে চা খান, আমরা সব এসে বসি, গল্পগুজব করেন—রামায়ণ কিম্বা মহাভারত পড়া হয়। কোনও দিন মা পড়েন, কোনও দিন আমার স্ত্রী পড়েন, কোনও দিন বা চিনি পড়ে।—যতক্ষণ খাওয়া দাওয়ার সময় না হয় ততক্ষণ এই রকম চলে।"

এই সময় একজন ভৃত্য, আলবোলায় একছিলিম তাওয়া সাজিয়া আনিয়া, টেবিলের কাছে একটি ছোট গোল চৌকির উপর রাখিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে গুরুদাসবাবুও প্রবেশ করিলেন।

চেয়ারে বসিয়া, আলবোলার নল মুখে দিয়া বলিলেন, "মোহিত, তোমার কখন চা খাওয়া অভ্যাস?—কেউ কেউ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চা খায়—আমরা বরাবর সন্ধ্যার পরেই খেয়ে থাকি।"

মোহিত বলিল, "আজ্ঞে, আমি চা খাইনে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "অ্যাঁ! বল কি! চা খাও না?"

"আজ্ঞে না।"

"কি ? কখনও খাও না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কখন কখনও খেয়েছি। শরীর অসুস্থ হলে—কিন্তু সেও খুব কালে ভদ্রে। জীবনে দু তিন বারের বেশী নয়।"

"বটে ? বেশ বেশ! ও অভ্যাস করনি ভালই করেছ। আমাদের এমন বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে—যথাসময়ে চা না পেলে কিছুই ভাল লাগে না। মাথা ধরে যায়। তা, শুধু আমি বলে না—গিন্নীশুদ্ধ, মেয়েরা পর্য্যন্ত। আমাদের বাড়ীর টিকটিকিটি পর্য্যন্ত চায়ের ভক্ত।"

এমন সময় চিনি, একটি থালায় করিয়া তিন পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "আমার এই যে মেয়েটি দেখছ—এর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কিনা বলতে পারিনে—এর নাম চিনি—এ বড় চমৎকার চা তৈরি করতে পারে। আর কারু হাতের চা আমার পছন্দই হয় না। ঠিক কয় মিনিট চা ভিজবে, ঠিক কতটুকু দুধ কতটুকু চিনি মেশাতে হবে—এ যেমন বোঝে, তেমন আর কেউ পারে না দেখেছি। ও চিনি, তিন পেয়ালা কেন এনেছিস মা ? মোহিত ত চা খান না।"

চিনি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনি চা খান না ?"—তাহার কণ্ঠস্বর হইতে এমন ভাবটা প্রকাশ পাইল যেন, কলিযুগে চা খায় না এমন মনুষ্য দর্শনীয় পদার্থ বটে।

মোহিত বলিল, "আমি চা খাইনে।"

গুরুদাসবাবু পেয়ালার মধ্যে চামচ সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "দেখলি ?—দ্যাখ্। দেখে শেখ্। উনি বললেন জীবনে দু তিনবার মাত্র চা খেয়েছেন—তাও শরীর অসুস্থ হওয়াতে। আর তোরা, মার দুধ ছেড়েই চা খেতে শিখেছিস। তোদের মত বয়সে চা জিনিষটাকে আমরা ওষুধ বলেই জানতাম। তোদের দেখতে পাই, ভাত না হলেও চলে, কিন্তু চা-টি চাই।"—বলিয়া তিনি পেয়ালাটি তুলিয়া মুখে দিলেন। এক চুমুক খাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিলেন—"আঃ।"

চিনি একটি পেয়ালা ভ্রাতাকে নামাইয়া দিয়াছিল। তৃতীয়টি সম্বন্ধে বলিল, "তবে এ পেয়ালাটি কি হবে ?"

গুরুদাসবাবু সেটির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাই ত—নষ্ট হবে ? তার চেয়ে বরং আমিই খেয়ে ফেলব না হয়—থাক্—রেখে দে।"—

চিনি তখন একটু মৃদু হাসিয়া, পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া দিয়া, শূন্য থালাটি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম পেয়ালাটি নিঃশেষে পান করিয়া, দ্বিতীয় পেয়ালাটি গ্রহণ করিয়া, গুরুদাসবাবু বলিলেন—"নেশা। এ একটা নেশার মধ্যেই গণ্য। যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। এক একজন এত চা খায় দেখেছি! দু পেয়ালা—তিন পেয়ালা—চার পেয়ালা—চলেইছে। আমি সকালে এক পেয়ালা, আর সন্ধ্যায় এক পেয়ালা খাই। বড় জোর এক পেয়ালার জায়গায় দু পেয়ালা হয়ে যায়। দ্বিজুরায়ের গানেই রয়েছে—

অসার সংসার কেহ নহে কার
ধন মান চাহিনা।
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই
ভাল এক পোয়ালা চা।

ওখানে দ্বিজুর একটু ভুল হয়েছে। লেখা উচিত ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়। ছন্দঃপতন হবার ভয়ে বোধ হয় লিখতে পারেনি। তবে যারা (এইখানে গুরুদাসবাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মেয়েরা কেউ আসিতেছে কিনা এবং স্বর নামাইয়া বলিলেন)—তবে যারা সন্ধ্যাবেলা চার চেয়ে তীব্রতর কিছু পান করে, তাদের হয়ত সে সময় চা না পেলেও চলে।—'ধন মান চাহিনা'—আহা, ঠিক লিখেছে। একেই ত বলে কবির অন্তর্দৃষ্টি। একটি বেশ গল্প মনে পড়ে গেল, বলি শোন।"—বলিয়া গুরুদাসবাবু পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া আলবোলার নলটি তুলিয়া লইলেন।

এমন সময় চিনি আসিয়া বলিল, "বাবা, মা জিজ্ঞাসা করলেন, আর এক পেয়ালা চা খাবেন কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আবার এক পেয়ালা কেন মা? দু পেয়ালা ত খেলাম। বেশী চা খাওয়া ভাল নয় ত।—হ্যাঁ কি বলছিলাম, সেই গল্পটা বলি শোন।"

গল্পের নাম শুনিয়া চিনি দ্বারের নিকটস্থিত একটি সোফায় উপবেশন করিল।

আলবোলার নলে গোটা দুই টান দিয়া, গুরুদাসবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আমি তখন বক্সারের সাবডিভিজনাল অফিসার। মফঃস্বলে টুরে

বেরিয়েছি। গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম পড়েছে—দিনের বেলায় লু চলে। দিনে যাতায়াত করা অসম্ভব। আমি তাই রাত্রে যাতায়াত করতাম। এক রাত্রে গঙ্গা দিয়ে যাচ্চি। দুখানা নৌকো আছে—একখানা আমার, এক-খানাতে আমলা, আর্দ্দালিরা আছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি। ফুরফুর করে বাতাস দিচ্ছে। রাত্রি তখন ১২টা—তীরের খুব কাছ দিয়ে নৌকো দাঁড় টেনে যাচ্ছে। একটা জায়গায় তীরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার কাছাকাছি আসতেই, মানুষের একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। নৌকো থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কোন্ হায়?'—কোনও উত্তর নেই। শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনি শুনতে পেলাম—'ইয়া আল্লা—জান গিয়া।'—ভাবলাম কি হয়েছে? কেউ একে কেটে কুটে ফেলে যায়নি ত? কোনও ব্যারামে এ মরছে না ত?—নৌকো তীরে লাগিয়ে আমরা নামলাম। লোকটার কাছে গিয়ে দেখি—একবার সে উঠে বসছে—একবার শুচ্ছে—আর কাতরাচ্ছে। মুসলমান ফকিরের বেশ। সেখানটা তেপান্তর মাঠ। কোথাও জনমনুষ্য নেই। ধু ধু করছে বালির চড়া। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?'—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর্দ্দালিরা জিজ্ঞাসা করলে, কোন উত্তর নেই। শুধু 'ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা'—বলে কাতরানি। বসন্ত কিম্বা কলেরার কোন চিহ্ন দেখলাম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা-ও শীতল, জ্বর নয়। আর্দ্দালিকে বললাম—একে একটু জল এনে দে দেখি—যদি জল খায়। সে জল এনে দিলে—কিন্তু ফকীর তার হাতের পেয়ালা ঠেলে দিলে। আমার সঙ্গে বুড়ো পেস্কার ভাগবৎ সহায় ছিল, সে আফিম খেত। সে বললে, 'হুজুর, এ বোধ হয় আফিমচী—আফিম না পেয়ে এর এ দশা হয়েছে।'—বলে সে নিজের পকেট থেকে আফিমের কৌটো বের করে, খানিকটে আফিম নিয়ে তার মুখের মধ্যে দিলে। আফিমের স্বাদ মুখে পাবামাত্র, সে দু হাত দিয়ে পেস্কারের হাতটি জড়িয়ে ধরলে। মুখের মধ্যে পেস্কারের সেই আফিম শুদ্ধ আঙুল দুটো প্রাণপণ বলে চুষতে লাগল, চুষে আফিমটে নিঃশেষ করে, চুপ করে এক মিনিট বসে রইল। আর তার কাতরানি নেই। উর্দ্দুতে শেষে বললে, 'বাবা—জিতা রও। আজ তুমি আমায় যে আনন্দ দিলে, দুনিয়ায় তার তুলনা নাই। আজ এখন আমায় যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসন দিতে চায়, আমি তা তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করি।'—আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলাম। তারপর সে উঠে, আমাদের সেলাম করে, মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।—মৌতাত এমনি জিনিসই বটে। 'ধনমান চাহিনা'—সে ফকির, দিল্লীর সিংহাসনও চায়নি।"

গল্পটি শুনিয়া মোহিত ও প্রমথ উভয়েই হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন সে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "চিনি—চিনি কোথায় গেলি?"

চিনি গল্প শুনিতে বসিযাছিল বটে—কিন্তু যখন দেখিল ইহা পুরাতন শোনা গল্প, তখন প্রস্থান করিয়াছিল। পিতার ডাকাডাকিতে পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি বাবা?"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—কি বলছিলি তখন?"

"কখন?"

"এই যে একটু আগে এসে কি বলছিলি? আমি আর চা খাব কি না জিজ্ঞাসা করছিলি বুঝি? তা থাকে যদি, তবে নিয়ে আয় না হয় আর এক পেয়ালা। যেন বেশী টং করিসনে।"

চিনি হাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

গুরুদাসবাবু মোহিতকে বলিলেন, "ঐ যে বললাম, বেশী টং করিসনে—ওর মানে কি বুঝতে পেরেছ?"

মোহিত বলিল, "আজ্ঞে না।"

"আমাদের একজন চাকর ছিল, সে রোজ চা তৈরি করত। চা বেশী কড়া হয়ে গেলে সে বলত, আজ বড় টং হয়ে গেছে। টং অর্থাৎ ষ্ট্রং। তাকে ঠাট্টা করে আমারও টং বলতে সুরু করেছিলাম, এখন অভ্যাসের বশে আমরাও বলি টং।"

চিনি আর এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "মা—আজ একটু মহাভারত পড়ে শোনাও দেখি।"

চিনি তখন মহাভারতখানি আনিয়া, পিতার কাছে বসিয়া, পাঠ আরম্ভ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ স্ত্রী-শিক্ষার পরিণাম

সে রাত্রে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রমথনাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মোহিতকে কেমন লাগল?"

সুশীলা গম্ভীরভাবে বলিল, "একটু ঝাল।"

প্রমথ সহসা মুখখানি শঙ্কাকুল করিয়া, পত্নীর চিবুক ধরিয়া, তাহার অধর-প্রান্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুশীলা বলিল, "কি দেখা হচ্ছে?"

স্ত্রীর চিবুক ছাড়িয়া একটু পিছু হটিয়া, মাথাটি বিষণ্ণভাবে ঝুঁকাইয়া বলিল, "খেয়ে ফেলেছ? এত লুচি পোলাও ক্ষীর সন্দেশ খেয়েও তৃপ্তি হল না? শেষে আমার বন্ধুটিকে খেয়ে ফেললে? এখনও দুই কসে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। হায় হায়!"

সুশীলা এ কথা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। চাবির গোছাশুদ্ধ অঞ্চলাগ্রভাগ তাহার স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত হইয়া চেয়ারের নিম্নে পড়িয়া গেল। বস্ত্র সম্বরণ করিয়া কোপযুক্ত স্বরে বলিল, "আমাকে রাক্ষসী বলা হল? আমি মানুষ খাই?"

"খাও না যদি তবে ঝাল কি মিষ্টি বুঝলে কি করে?"

"ঝাল বললেই কি লঙ্কার ঝাল বোঝায় নাকি মশাই? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডেপুটিগিরি করবে?"

প্রমথ যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আঃ বাঁচা গেল। তা হলে আমার বন্ধু বেঁচেই আছে। সে ঝাল নয় ত কি ঝাল বল দেখি?"

"তোমার বন্ধুটি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। যেন শুষ্কং কাষ্ঠং। নোট—এটা রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে।"

প্রমথনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ওর মনটি যে নীরস, এমন কথা বলতে পারিনে। বরং একটু ভাবপ্রবণ। কিন্তু ওর সে ভাবপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে। ওর মনটি কঠিনও নয়—তবে সবল বটে। ও যা কর্ত্তব্য বলে মনে করে, কিছুতেই তা থেকে বিচলিত হয় না।"

সুশীলা বলিল, "ওঁর ধারণা, বিবাহ করে সংসারী হলে সেটা অন্যায় কার্য্য হবে—এই ত?"

"তাই বটে।"

"কিন্তু উনি যদি কোনও কুমারীর রূপ গুণ দেখে মুগ্ধ হন ?"

"প্রমথতঃ—ওর প্রকৃতি যে রকম, তাতে ও যে কোনও মেয়েকে দেখে ভালবাসবে—তা খুব অসম্ভব মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ যদিই তা হয়, তা হলেও মনের সে ভাবকে ও একটা অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা জ্ঞান করবে, আর প্রাণপণ চেষ্টায় মন থেকে সে ভাবকে দূর করে দেবে।"

"যদি না পারেন ?"

"যদি তাতেও অকৃতকার্য্য হয়, তা হলে ও নিজেই দূরে চলে যাবে।"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ ?"

"আমার বিশ্বাস ও তাই করবে।"

সুশীলা আপন মনে হাসিতে লাগিল। শেষে মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল, "হুঁ।"

"একটা হুঁ দিয়েই আমার এতগুলো কথার প্রতিবাদ করলে ? আমার বন্ধু সম্বন্ধে আমি যা মত প্রকাশ করলাম, তোমার মঞ্জুর হল না ?"

"না। তুমি মনে কর, তোমার বন্ধুটি প্রেম নামক ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারেন। আমার বিশ্বাস, পারেন না।"

"পারেন না ?"

"না। এই ধর আমাদের চিনি। দেখতে শুনতেও ভাল, স্বভাবটিও বেশ স্নিগ্ধ। তুমি কি ভাব, মোহিত ওকে ভাল না বেসে থাকতে পারে ?"

প্রমথ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—"অসম্ভব। তোমাদের চিনি তোমাদের কাছে যতই মিষ্টি লাগুক—মোহিতের কাছে লাগবে না।"

"আচ্ছা, আমি যদি মিষ্টি লাগাতে পারি ?"

"পাগল !—তুমি কি করে মিষ্টি লাগাবে ?"

সুশীলা তাহার উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু দুইটি তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল, "পারি গো পারি—সে বিদ্যা আমার আছে।"

"তুমি কি যাদুকরী ?"

"আমি যাদুকরী কিনা আজও তুমি জানতে পারনি ?"

প্রমথনাথ স্ত্রীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "তুমি যাদুকরীই বটে !—কিন্তু মোহিতের প্রতি তোমার কোন যাদুই খাটবে না। সে যাদু-প্রুফ।"

"যাদু-প্রুফ কিনা দেখা যাবে। আমি যদি পারি ?"

"কখনই পারবে না। সে বড় কঠিন ঠাঁই।"

"আচ্ছা তুমি দেখো, চিনির প্রেমে তোমার বন্ধুকে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি কি না। অবিশ্যি তিনি যদি এখানে কিছুদিন থাকেন।"

"পারবে না।"

"আচ্ছা বাজি রাখ।"

"রাখ।"

"যদি পারি তবে আমায় একটি কটেজ পিয়ানো কিনে দেবে ?"

"দেব। যদি না পার, তুমি আমায় কি দেবে ?"

সুশীলা হাসিয়া হাসিয়া দুলিয়া দুলিয়া বলিল, "আমি তোমায় একখানি রেশমী রুমাল কিনে দেব।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "আহা তুমি কি দাতা! নেবার বেলায় পিয়ানো আর দেবার বেলায় শুধু একখানি রুমাল ?—আচ্ছা, সে রুমালে করে যদি একরাশ ভালবাসা বেঁধে দিতে পার, তবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

"তা দেব। কিন্তু আমার যাদুবিদ্যা প্রয়োগে, তোমায় সাহায্য করতে হবে।"

"আমি ? আমি কি সাহায্য করব ?"

"আর কিছু নয়, আমি যখন যা বলব, তোমায় তখন তা করতে হবে।"

"সুন্দরি, এ আর নূতন কথা কি! বিয়ে হয়ে অবধিই ত হুকুমে ওঠাচ্ছ বসাচ্ছ।"

"এবার শুধু ওঠা বসা নয়। বক্তৃতাও করতে হবে।"

"বক্তৃতা ? কি সর্ব্বনাশ!—ডেপুটিগিরি পাবার একটু যা আশা হয়েছে—বক্তৃতা করলেই সে আশা লোপ হয়ে যাবে।"

"এ রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়, প্রেমনৈতিক বক্তৃতা। তাতে হবুডেপুটি বাবুর কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আমি যা মৎলবটি করেছি—চমৎকার একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেক্সপিয়ারের যোগ্য।"

"কি মৎলব, শুনি।"

"আমি নানা উপায়ে মোহিতের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে চাই যে, চিনি মনে মনে গোপনে তাকে ভালবাসছে। তাতে ফল এই হবে যে মোহিতও চিনিকে ভালবাসতে আরম্ভ করবে। চুম্বক যে শুধু লোহাকে টানে তা নয়, লোহাও চুম্বককে আকর্ষণ করে।"

ইহা শুনিয়া প্রমথ কৌতূহলযুক্ত হইয়া বলিল, "কি করতে চাও ?"

"কাল তুমি গিয়ে মোহিতকে কথায় কথায় বলবে, চিনি যে চায়ের এত ভক্ত ছিল, কি কারণে বলা যায় না, সে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে চা আর খাবে না।"

প্রমথ শিহরিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!—তুমি আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাবে ? এ ত প্রেমনৈতিক বক্তৃতা নয়—এ যে একেবারে দুর্নৈতিক।"

"না গো, মিছে কথা হবে না। আজকে বাবার লেকচারে চিনি ভারি অভিমান করেছে। বলেছে, জন্মে আর চা খাবে না। অবিশ্যি মোহিতবাবু মনে করবেন, তাঁরই সদ্দৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করেছে।"

প্রমথ বলিল, "তাঁর মহদ্দৃষ্টান্তে চিনি চা পরিত্যাগ করুক, দুধ চা পরিত্যাগ করুক, ক্রমে কেটলি, চা-দান সকলেই চা পরিত্যাগ করুক, তা হলে চা বেচারি দাঁড়ায় কোথা ? সে যা হোক—আর কি কি ফন্দি করেছ শুনি।"

"দিন দুই পরে বলবে, চিনির কি হয়েছে বলতে পারিনে, রাতদিন কেবল অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে।"

"এও মিছে কথা হবে। চিনিকে এত শীগগির কাব্যরোগে ধরবে, এমন ত কোন লক্ষণই নেই।"

"মিছে কথা হবে না, আমি সেটা সত্যি করে দেব। আমি তাকে খুব শক্ত একটা হেঁয়ালি দিয়ে বলব, একদিনের মধ্যে যদি এর উত্তর বলতে পারিস, তবে একটা সেলাইয়ের বাক্স পাবি। তোমার কোন কথা মিথ্যা হবে না, সে জন্য ভেব না।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "উঃ রমণীর কি চাতুরী! এই—না আরও কিছু আছে ?"

"পরদিন তুমি নিতান্ত সরলভাবে মোহিতের কাছে গল্প করবে, হঠাৎ ছাদে গিয়ে দেখি, চিনি পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর কোলের উপর একখানি লাল চামড়ায় বাঁধান খাতা নিয়ে, পেন্সিল দিয়ে কবিতা লিখছে। এমনি ভাবে মগ্ন যে আমার পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত শুনতে পেলে না। পাছে তার চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে নেমে এলাম।"

"তুমি বোধ হয় এটা সত্যি করবার জন্যে তাকে বলবে, কথামালার ঐ বাঘ ও বকের গল্পটা পদ্যে লিখে ফেল ?"

"তোমার যেমন বুদ্ধি! বাঘ ও বকের কবিতা লিখলেই হয়েছে আর কি! তা নয়। আমি বলব, তিলোত্তমা যদি কবিতা লিখতে জানত, তা হলে সে রাত্রে মন্দির থেকে ফিরে এসে, ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় বসে বসে, কি লিখত বল্ দেখি? শুধু মনের ভাবটুকু লিখবি, মানুষের নাম কি স্থানের নাম কি ঘটনার কোন উল্লেখ, এ সব কিছু থাকবে না। যদি সেই রকম একপাতা কবিতা লিখতে পারিস তবে তোকে একখানা দুর্গেশনন্দিনী প্রাইজ দিই। এই রকম করে বঙ্কিমবাবুর সকল নায়িকার মুণ্ডপাত চিনিকে দিয়ে করাব। আর মাঝে মাঝে সে খাতাখানি 'ভ্রমক্রমে' যে মোহিতের হার্তে গিয়ে পৌঁছবে না, এমন কথাও বলতে পারিনে। কিন্তু তুমি লালচামড়ায় বাঁধা খাতা আর পেন্সিলের লেখা কবিতা, এ দুটো উল্লেখ করতে ভুলো না। আমার কাছে ঐ রকম একখানি শাদা খাতা আছে, সেইখানিই তাকে দেব। তা হলে সনাক্ত সম্বন্ধে মোহিতবাবুর কোন সন্দেহ থাকবে না।"

প্রমথনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "এই?—না আরও ফন্দি আছে?"

প্রমথনাথের কণ্ঠস্বরে সুশীলার উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হইল। তথাপি সে বলিল, "সময়মত আরও অনেক বের করা যাবে। একটা ফন্দি ভেবে রেখেছি, করব কি না এখনও স্থির করতে পারিনি। মনে করেছি কবিতা টবিতা মোহিতকে দেখানো হয়ে গেলে, চিনিকে কাণে কাণে বলব, মোহিতের সঙ্গে তোর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। তার ফল এই হবে, মোহিতের দেখা পেলেই চিনির চোখ দুটি নত হয়ে যাবে, গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠবে। চিনি যে মনে মনে মোহিতকে ভালবাসছে, এ কথা মোহিতের ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে যাবে। তুমি কি বল?"

প্রমথনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, ছি!"

"তোমার মনে হয়, আগে আমি যে সকল ফন্দির কথা বললাম, তাই যথেষ্ট?"

প্রমথ পূর্ব্ববৎ বলিল, "না।"

"তবে?"

প্রমথ নীরব। সুশীলা বুঝিল, তাহার এ সমস্ত কৌশলপ্রয়োগ স্বামী পছন্দ করিতেছেন না। তথাপি পরিহাস করিয়া বলিল, "হ্যাঁগা—তুমি মুখখানি অমন পেঁচার মত করে রইলে কেন?"

প্রমথনাথের মুখ হইতে অন্ধকার অল্পে অল্পে তিরোহিত হইল। স্নেহভরে পত্নীর করযুগল ধারণ করিয়া বলিল, "ছি সুশীলা, ও সব মৎলব ছেড়ে দাও।"

সুশীলা তাহার বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি নীরবে নত করিয়া রহিল।

প্রমথ বলিল, "না সুশীলা, সে কি ভাল হয়? আমাদের বোনটি কি বানের জলে ভেসে এসেছে যে তাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে এ রকম হীন কৌশল অবলম্বন করতে হবে? ছলনার আশ্রয় আমরা কেন নেব?"

সুশীলা বলিল, "চিনিকে পাত্রস্থ করবার হিসেবেই আমি যে এ ফন্দিটি করতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক নয়। বরং খেলার ছলেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এখন বললে বলে আমারও মনে হচ্ছে—এ খেলা ভাল নয়।"

প্রমথনাথ স্ত্রীর স্কন্ধে হস্তযুগল রক্ষা করিয়া বলিল, "খেলাচ্ছলে? না, সেক্সপিয়রের গল্প পড়ে, কার্য্যতঃ তার পরীক্ষা করবার জন্যে এ খেলা খেলতে চেয়েছিলে?"

"তাও কতকটা বটে।"

"উঃ—স্ত্রীশিক্ষার কি ভীষণ পরিণাম!"—বলিয়া প্রমথ হাসিতে লাগিল।

সুশীলা সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "যাও যাও—স্ত্রীশিক্ষার নিন্দে করতে হবে না। আমার এমন মজার খেলাটি তুমি মাটী করে দিলে। আমি বাস্তব জীবনে একটি উপন্যাসের লীলা দেখব মনে করেছিলাম—তোমার জ্বালায় শুধু হতে পেলে না। এমন ঠাণ্ডা-মাথা-ওয়ালা স্বামী নিয়ে ঘর করা এক বিষম দায়।"—বলিয়া সুশীলা হাসিতে হাসিতে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

প্রমথ বলিল, "দেখ, হয়ত ছলনার আশ্রয় না নিয়েও, উপন্যাসের লীলা দেখতে পাবে। যদিও তার আশা খুবই কম। বাস্তবিক চিনিকে দেখে মোহিতের মন যদি আকৃষ্ট হয়, তবে হয়ত সে বিবাহ করতে সম্মত হতেও পারে। কিন্তু একটা আশঙ্কা এই—আগেই বলেছি—যদি মনের মধ্যে ও সে রকম কোনও চাঞ্চল্য অনুভব করে—তবে হয়ত পালাবে।"

সুশীলা বলিল, "পালাবে কোথা? এ বাঁধনে যদি একবার পড়ে, তবে কি পালিয়ে নিষ্কৃতি আছে? আবার এসে ধরা দিতে হবে। আমি শ্রীমতী সুশীলা দেবী আশীর্ব্বাদ করছি, যেন পালাবার অবস্থাই ওর হয়।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ চিনি কাহাকেও ভয় করে না

পরদিন প্রভাতে মোহিত শুনিল, আগামী কল্য গুরুদাসবাবুর জন্মদিন। তদুপলক্ষে কিছু পারিবারিক আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে নদীর উপরেই একটি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঙ্গল আছে। সকলে সেইখানে গিয়া বনভোজন করিবেন। মোহিতকে সঙ্গে লইবার জন্য গুরুদাসবাবু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মোহিত সম্মত হইয়াছে—কিন্তু ব্যাপারটা তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না। সে ভাবিতেছে—এঁদের সবই দেখছি ইংরেজি কাণ্ড কারখানা।

বেলা ৮টার মধ্যেই দুইখানি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া তাম্বুর সরঞ্জাম ও খানকতক চৌকি টেবিল প্রেরিত হইল। ভৃত্যেরা সেখানে পৌঁছিয়াই তাম্বু খাটাইয়া ফেলিবে। তাম্বু সাজাইবার জন্য একটি সিন্দুক ভরিয়া নানাবর্ণের ধ্বজা পতাকা ও সূতালি দড়ি পাঠান হইল। ঝাউ ও দেবদারু পাতা সেখানেই যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। ওবেলা প্রমথনাথ স্বয়ং গিয়া তাম্বু সাজাইবে।

উভয় বন্ধুতে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ উপস্থিত হইলে মোহিত হাসিয়া প্রমথকে বলিল, "তোমাদের সব ইংরেজি কায়দা দেখছি।"

প্রমথ বলিল, "কতকটা ইংরেজদের অনুকরণ বইকি। উৎসব করতে ওরা বেশ জানে। বিশেষতঃ ওদের জন্মদিনের উৎসব প্রথাটি আমার বড় সুন্দর লাগে।"

"আমোদ প্রমোদ ছাড়া এ শ্রেণীর উৎসবের আর কোন সার্থকতা আছে?"

"আছে বইকি। প্রীতির বিনিময়। যদিও কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদটুকুও তুচ্ছ লাভ নয়।"

মোহিতলাল মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিল—প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। সে ভাবিল—এ মানব-জীবন তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে কাটান কি জীবনের অপব্যবহার করা নয়?

মোহিতকে নীরব দেখিয়া প্রমথ বলিল, "প্রীতির এই বিনিময় তোমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয় না?"

মোহিত বলিল, "উৎসব ভিন্ন কি প্রীতির বিনিময় সম্ভব নয়?"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, এ অনুভূতি—এ ধারণাই যথেষ্ট নয়। মানুষের মন কেবলমাত্র তাতেই

সন্তোষলাভ করে না। মাঝে মাঝে এমন একটা উপলক্ষ খোঁজে যাতে অন্তরের সেই ভালবাসাকে আকার দান করতে পারে। এ সকল উৎসব, প্রীতির সেই সাকার পূজা।"

মোহিত হাসিল। বলিল—"উত্তম। আমি সাকার পূজার বিরোধী নই।"

অন্যান্য আয়োজন করিতে করিতে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, প্রমথনাথ অশ্বারোহণে সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। তাম্বু খাটান এবং সাজান অদ্য সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে, কারণ কল্য প্রাতে চা পান করিয়াই নৌকাযোগে ইঁহারা যাত্রা করিবেন। সন্ধ্যার পর প্রমথনাথ ফিরিয়া আসিবে।

অপরাহ্নকালে চিনি ও তাহার ছোট ভাই বসন্ত উপরের ঘরে বসিয়া কাঁচি দিয়া রাশি রাশি রঙীন কাগজ কাটিতেছিল। লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের ঘুড়ির কাগজ—তাহাই কাটিয়া কাটিয়া, বলয়াকারে যুড়িয়া, শিকল প্রস্তুত হইবে। সেই শিকল তাম্বুর ভিতরে ও দ্বারদেশে টাঙাইয়া দিতে হইবে। সুশীলা বসিয়া শিকল নির্ম্মাণ করিতেছিল।

কাগজ কাটা শেষ হইলে কাঁচিখানি আঙ্গুলের মধ্যে দুলাইতে দুলাইতে চিনি বলিল, "আচ্ছা বউদিদি, একটা ইয়ে করলে হয় না?"

"কি?"

"একখানা লাল কি সবুজ কাপড়ে ফুলের মালা গেঁথে দিয়ে MANY HAPPY RETURNS এই অক্ষরগুলি রচনা করলে হয় না? সেখানি তাঁবুর দরজার সামনে ঝুলবে?"

সুশীলা বলিল, "ওঃ সে ত বড় চমৎকার হয়। লাল জমির উপর শাদা ফুল বড় সুন্দর মানাবে। তোর মাথায় বেশ বুদ্ধিটি এসেছে ত!"

"কি ফুলের মালা গাঁথা যায় বউদিদি?"

"বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথলে বেশ হয়। কাপড়খানি জলে ভিজিয়ে রাখলে রাত্রে কুঁড়িগুলি ফুটেও যাবে। কিন্তু একটা কথা হচ্চে—কাল দিনের বেলায় সে ফুল ত সজীব থাকবে না, তার পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়বে।"

চিনি চিন্তিত হইয়া বলিল, "তা হলে কি হয়?"

"তার চেয়ে এক কায কর্ না কেন। কচি কচি দেবদারু পাতা সেলাই

করে অক্ষর রচনা কর্ না। লাল জমির উপর মানাবেও বেশ—মেহনৎও কম—কাল সারাদিন সজীবও থাকবে।"

"তবে তাই করব বউদিদি। কাপড় কোথা পাই?"

"আমার কাছে লাল শালুর একটা টুকরো আছে। সেখানা নিয়ে আসি দাঁড়া।"—বলিয়া সুশীলা উঠিয়া গেল। ক্ষণপরে টুকরাটি হাতে করিয়া আনিয়া বলিল—"লম্বা চওড়া আছে—বেশ হবে এখন। এইতে পেন্সিল দিয়ে প্রথমে অক্ষরগুলো লিখে নে। আমি বাগানে কাউকে পাঠিয়ে এক ঝুড়ি কচি দেবদারু পাতা আনাই।"

চিনি বলিল, "আমি বরং দেবদারু পাতার চেষ্টা দেখি। তুমি অক্ষরগুলো লেখ। আমার লেখা ত ভাল হবে না—লাইন বেঁকে যাবে।"

বউদিদি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁঃ—তোর লেখা বেঁকে যাবে আর আমি বুঝি সোজা লিখতে পারি?"

চিনি আবদার ধরিল—"না বউদিদি—তোমার লাইন সোজা হবে—তুমি বেশ পারবে। তোমায় লিখতেই হবে।"

"না না—সে ছাই হবে। অক্ষর দেখে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বরং তোর দাদা আসুন তিনি লিখে দেবেন।"

"তিনি কখন আসবেন! তাঁর আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তখন লিখে দিলে কখন আমি পাতা সেলাই করব? আরও কত কায রয়েছে।"

সুশীলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা হলে আর হয় না দেখছি।—হ্যাঁ, ভাল কথা, একটা উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুই পারবি? তোর ভয় করবে!"

"কি উপায় বউদিদি?"

সুশীলা মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল, "তুই পারবিনে। তোর সাহস হবে না।"

"কেন পারব না বউদিদি। বলই না উপায়টা—দেখি পারি কি না।"

"মোহিতবাবু ত রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে যদি বলতে পারিস, তিনি এখনি লিখে দেন। কিন্তু তুই যে ভীতু!"

চিনি ওষ্ঠ ফুলাইয়া বলিল, "ওঃ—এ কথা এতক্ষণ বলনি কেন? এখনি গিয়ে লিখিয়ে আনছি। আমি কাউকে ভয় করিনে।"—বলিয়া চিনি গর্ব্বিত

ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। শালুর টুকরাটি হাতে লইয়া ভাইকে বলিল, "বসন্ত আয় ত।"

সুশীলা বলিল, "বসন্ত বরং আগে দেখে আসুক মোহিতবাবু কোথা আছেন, কি করছেন।"

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মোহিতবাবু লাইব্রেরি ঘরের পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া একখানা সংস্কৃত বহি পড়িতেছেন।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে আর কেউ আছে?"

"কেউ না।"

চিনি তখন বসন্তকে সঙ্গে লইয়া, অজ্ঞাতসারে কলির মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইল।

মোহিত যে বারন্দায় বসিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছিল, তাহার নিম্নে কিয়দ্দূরে কলধ্বনি করিয়া নদীটি বহিয়া যাইতেছে। জলের উপরে এক ঝাঁক সারস পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছিল। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া মোহিত বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের কঠোপনিষৎ পাঠ করিতেছিল।

চিনি ও বসন্ত যখন বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, মোহিত তখন এত নিবিষ্টচিত্ত যে তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইল না। মোহিতের সেই আনত চশমাবদ্ধ চক্ষু ও নিস্পন্দভাব দেখিয়া চিনির একটু একটু ভয় করিতে লাগিল। চিনি বুঝিল তাহার দাদার সঙ্গে এ লোকটির প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। তাহার দাদার প্রাণটি যেমন হাসি খুসিতে ভরা, এ লোকটি তেমন নয়। চিনির প্রস্তাব শুনিয়া ইনি নিশ্চয়ই সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া মনে করিবেন এবং অবজ্ঞাভরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। কি হয়? আসিয়া যখন পড়িয়াছে, ফিরিয়া গেলে বউদিদি বড় হাসিবেন। বলিবেন—'আমি সেইকালেই ত বলেছিলাম।'—ভীরু বলিয়া চিনির অপবাদ হইয়া যাইবে। সুতরাং সাহস করিয়া, কম্পিতস্বরে, সে বলিল, "মোহিতবাবু।"

বালিকার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া মোহিত পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইল।

চিনি চকিত হরিণীর মত চক্ষু দুইটি মোহিতের প্রতি স্থাপন করিয়া বলিল, "মোহিতবাবু, দাদা বাড়ী নেই বলে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি।"

মোহিত পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিল, "কি?"

কম্পিত হস্তে শালুর টুকরাটি তুলিয়া ধরিয়া চিনি বলিল, "এই কাপড়খানা এনেছি, এতে Many Happy Returns of the Day লিখে দিতে হবে।"

বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে, বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত ইংরাজী ভাষা মোহিত এই প্রথম শুনিল। শুনিয়া, তাহার মনে চকিতের মত একটা আনন্দ খেলিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কি করিতে হইবে স্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "তার আর কষ্ট কি? আমায় কি করতে হবে বল।"

চিনির মনে হইল, মোহিতের স্বর মোটেই হেডমাষ্টার মহাশয়ের মত কঠোর নহে; যেন তাহার দাদার কণ্ঠস্বরের মতই স্নেহজড়িত। তখন তাহার আশঙ্কা দূরে গেল। সাহস পাইয়া বলিল—"কাল বাবার জন্মদিন কিনা, আমরা সবাই নৌকো করে তাঁকে নিয়ে কাল বনভোজন করতে যাব। সেখানে তাঁবু খাটান হয়েছে। এই কাপড়খানাতে কচি দেবদারু পাতা সেলাই করে' লিখব—Many Happy Returns of the Day—লিখে এটা তাঁবুর দরজার উপর টাঙিয়ে দিতে হবে। পেন্সিল দিয়ে অক্ষরগুলো এঁকে নিলে, পাতা বসাবার বেশ সুবিধে হয়। বউদিদিকে বললাম—তিনি বললেন তাঁর লাইন সোজা হবে না। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

মোহিত বালিকার হস্ত হইতে কাপড়খানি লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তা বেশ, আমি লিখে দিচ্ছি। কিন্তু একটা রুল চাই যে।"

"আচ্ছা"—বলিয়া চিনি রুল আনিতে গেল।

রুল ও পেন্সিল আনিয়া চিনি মোহিতের হাতে দিল। তিনজনে তখন লাইব্রেরি-কক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিত শালুখানি টেবিলের উপর বিছাইয়া বলিল, "পিন আছে? পিন দিয়ে কাপড়খানা টেবিলের উপর এঁটে নিলে ভাল হত।"

"পিন দিচ্ছি।"—বলিয়া চিনি পিতার দেরাজ খুলিয়া পিনের কৌটা বাহির করিয়া দিল।

কাপড়খানি টেবিলে আঁটিতে আঁটিতে মোহিত বলিল, "দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। ইংরাজীতে না লিখলেই কি নয়?"

"তবে? বাঙ্গালায়?"

"তাই হলেই ভাল হয় না কি? আমাদের মাতৃভাষা ছেড়ে, বিদেশী ভাষায় কেন আমরা পিতা মাতার কুশল কামনা করব?"

"তা ঠিক। ওর কি বাঙ্গালা করা যায় বলুন দেখি? এ দিনের বহু বহু প্রত্যাগমন—না—না—এ ভারী অদ্ভুত শোনাচ্ছে।"

মোহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "কথা-কথার অনুবাদ করলে ও রকম হবেই ত। শুধু ভাবটা নিতে হবে। আচ্ছা—'বিধাতা করুন'—ঈশ্বরের নামটা বাদ দিয়ে কায নেই—কি বল?"

চিনি উৎসাহিত হইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। 'বিধাতা করুন, এই দিনটি যেন'—তার পর?"

মোহিত বলিল, "গদ্যের চেয়ে কবিতাই বোধ হয় শোনাবে ভাল। ধর যদি লেখা যায়—'বিধাতা করুন, এ দিন আবার'—কি মিল করা যায়?"

চিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বলিল, "ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—'ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার'—চমৎকার শোনাবে—

বিধাতা করুন, এ দিন আবার
ফিরিয়া আসুক বহু বহুবার।

আচ্ছা মোহিতবাবু, আপনি কি কবি?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "আমি কবি—না তুমি কবি! আমি ত মেলাতে পারিনি, তুমিই মিলিয়ে দিলে। কবিযশটুকু তোমারই প্রাপ্য।"

চিনি হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, তা নয়। প্রথম চরণটি আপনার কিনা—সবটাতেই আপনার দাবী।"

মোহিত তখন রুল ও পেন্সিলের সাহায্যে কাপড়ে অক্ষর রচনায় প্রবৃত্ত হইল। চিনি বলিল, "আপনি ততক্ষণ লিখুন, আমি বাগান থেকে দেবদারু-পাতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা দেখিগে।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার আসিয়া বলিল, "মোহিতবাবু যদি হঠাৎ দাদা এসে পড়েন তবে অনুগ্রহ করে ওটা ঢেকে ফেলবেন।"

"কেন?"

"কাল দাদাকে আশ্চর্য্য করে দিতে চাই। দাদা তাঁবু সাজাতে গেছেন কিনা, তিনি ত আমাদের এ সব মৎলব কিছুই জানেন না। বউদিদিকেও বলতে বারণ করে দেব। কাল নৌকো থেকে সেখানে নেমে, আমি তাড়াতাড়ি আগে আগে গিয়ে, তাঁবুর দরজায় এটা বেঁধে দেব। দাদা পৌঁছে, দেখে একেবারে অবা—ক্ হয়ে যাবেন। ভাববেন, এই কাল সন্ধ্যের সময় আমি

তাঁবু সাজিয়ে গেলাম, এটা কোথা থেকে এল?—আপনি তখন তাঁকে বলবেন—বোধ হয় বনদেবী রাত্রে এসে টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে চিনি পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই গৃহের সকলে জাগরিত হইলেন। একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই গুরুদাসবাবু ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়া ফেলিলেন। স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি রাধাবল্লভজীউর পূজায় বসিলেন। আজ তাঁহার জন্মদিনে প্রথমে ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া, আত্মীয়স্বজনের অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন না।

গুরুদাসবাবু পূজা ও স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন—তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আছে। ইতিমধ্যে প্রমথ গিয়া মোহিতলালকে ডাকিয়া আনিল। মোহিত মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াই আসিল। সে ভাবিতে লাগিল—ইংরাজী কায়দা অনুসারে Many Happy Returns of the Day বলিয়া গুরুদাসবাবুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে হইবে ত? সে তাহার বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। অথচ সে অতিথি, না করিলেও অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়। ভাল যন্ত্রণায় সে পড়িয়াছে।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মোহিত যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিরক্তি সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া, হৃদয়খানি পুলকে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

পূজা সমাপন হইলে, গুরুদাসবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে এস।"—তদনুসারে সকলে পূজার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গুরুদাসবাবু বলিলেন, "তোমরা সকলে প্রথমে নারায়ণ প্রণাম কর। মন্ত্র বল।"—বলিয়া গুরুদাসবাবু অল্পে অল্পে সকলকে বলাইতে লাগিলেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।"

মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সকলে মিলিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন।

তাহার পর অভিনন্দনের পালা। প্রথমে গৃহিণী ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন। 'হয়েছে হয়েছে'—বলিয়া গুরুদাসবাবু সাদরে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। দুই জনের মধ্যে আর কোনও বাক্য-বিনিময় হইল না।

কিন্তু উভয়ের নয়নের ভাষা উভয়ে বুঝিলেন। তাহার পর যথাক্রমে প্রমথনাথ, সুশীলা, চিনি ও বসন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল। পুত্রদ্বয়ের সহিত গুরুদাসবাবু নীরবে কোলাকুলি করিলেন। পুত্রবধূ ও কন্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সর্ব্বশেষে মোহিত গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া গুরুদাসবাবু বলিলেন—"বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

এতক্ষণে সূর্য্যোদয় হইল; সকলে বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। সুশীলা ও চিনি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দুইটি থালায় কয়েক পেয়ালা চা ও কয়েক রেকাবি মোহনভোগ সাজাইয়া আনিল। প্রত্যেককে চা ও মোহনভোগ পরিবেষণ করিয়া, মোহিতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুশীলা বলিল, "মোহিতবাবু—আজকের দিনটে এক পেয়ালা চা খাবেন না?"

সে কণ্ঠস্বর এমন মধুর, এমন চিত্তবিভ্রমকর, যে মোহিত আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। বলিল—"আচ্ছা দিন।"

প্রমথনাথ এই ব্যাপার দেখিয়া, প্রকাশ্যেই অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। আর মনে মনে ভাবিল—সুশীলা যাদুকরীই বটে।

চিনিও এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিল না—"চা কেমন লাগছে মোহিতবাবু?"

মোহিত স্মিতমুখে বলিল, "চমৎকার!"

চা পান শেষ হইলে মেয়েরা পাল্কাতে এবং পুরুষগণ পদব্রজে নদীতীরে গমন করিয়া, নৌকারোহণ করিলেন। দুইখানি নৌকা ছিল। একখানিতে মহিলারা এবং অপরখানিতে পুরুষগণ যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ নিরুদ্দেশ যাত্রা

গোপীকান্তবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে যখন শঙ্খঘণ্টার ভীষণ নিনাদের সহিত দেবীর আরতিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, তখন একবার তিনি মনে করিলেন, যাই প্রণাম করিয়া আসি। কিন্তু বহুলোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। যাই যাই করিয়া আর যাইতে পারিলেন না। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আরতি শেষ হইলে গোপীকান্তবাবু দেওয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন, "দেওয়ানজি, একটু বিশেষ কাযে আজই রাত্রে আমায় কলকাতা রওনা হতে হবে।"

শুনিয়া দেওয়ান বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আজই রাত্রে?"

"হ্যাঁ, আজই যেতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরুব। পাল্কী তৈরি করতে বলে দেবেন।"

দেওয়ান লোকটি বৃদ্ধ। অমাবস্যার দিন বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইবেন, ইহা শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা, আজকের দিনটে থেকে গেলে হত না? অমাবস্যার দিনটে—"

বাবু বলিলেন, "অমাবস্যা হলে কি হয়, দিনটে আজ ভাল—দেবীপক্ষ কিনা! পাঁজি দেখেছি। লেখা আছে আজ রাত্রি ন'টার পর যাত্রা শুভ, পশ্চিমে নাস্তি। তা কলকাতা ত ঠিক পশ্চিম নয়, পশ্চিম-দক্ষিণ। ভারী জরুরী কাযে যাচ্ছি। কলকাতার কাছে আমার এক বন্ধুর একখানি বাগানবাড়ী আছে, তার দাম অন্ততঃ দশ হাজার টাকা। সেখানা খুব সস্তায় বিক্রী হচ্ছে—বলতে গেলে জলের দামে। হাজার দুই টাকা হলেই বোধ হয় পাওয়া যায়। কলকাতায় যাওয়া আসা ত প্রায়ই আছে—সেখানে গেলে পরের বাড়ীতে গিয়েই উঠতে হয়, তাই অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা আছে সেখানে একটা দাঁড়াবার স্থান করি। তা এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তহবিল থেকে দু হাজার টাকা আমায় এনে দিন—দশ টাকার নোট হলেই ভাল হয়।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "যে আজ্ঞে, নোটই এনে দিচ্চি। সেখানে কি বেশী বিলম্ব হবে?"

"না—বেশী বিলম্ব হবে না।"

"চোরবাগানেই গিয়ে কি ওঠা হবে?"

"সেটা এখন ঠিক বলতে পারছিনে। আপনি টাকাগুলি প্রস্তুত রাখবেন। আমি আহারাদি করে রাত্রি নটার পরই যাত্রা করব। আমি বাড়ী থাকছিনে—মোহিতও নেই। কাল বৈকালে মার বিসর্জ্জন সম্বন্ধে যা কিছু করতে হয় আপনিই করবেন। সকল ভারই আপনার উপর।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া দেওয়ানজি প্রস্থান করিলেন।

তখন রাত্রি আটটা। গোপীকান্তবাবু আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে গেলেন না।

সেখানে স্থলোচনার সেই জেরা, কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছ ইত্যাদি, তিনি এখন সহ্য করিতে পারিবেন না। ক্ষুধাও কিছুমাত্র নাই, আহারের ভান করিতে হইবে মাত্র। তাই তিনি বাহিরের ঘরেই খাবার আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

আহার শেষ হইলে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অন্যান্যবার কলিকাতা যাইবার সময় যে ভৃত্যকে সঙ্গে লইতেন, সেও প্রস্তুত হইতেছিল কিন্তু বাবু তাহাকে বলিলেন, "তোকে এবার আর যেতে হবে না।"—শুনিয়া সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

কমলপুর হইতে রেল ষ্টেশন ছয় ক্রোশ পথ। ষোলজন বেহারা ও দুইজন মশালধারী সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্য দিয়া পাল্কী উড়াইয়া লইয়া চলিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল।

পাল্কী নামানো হইলে প্রায় পাঁচ মিনিট কাল গোপীকান্তবাবু বাহির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এমনও ঘটিয়া থাকিতে পারে, সন্ধ্যার পর পুলিস হয়ত আমাকে ধরিবার জন্য কমলপুরে আসিয়াছিল। সেখানে শুনিয়াছে, আমি ষ্টেশনে যাইতেছি। বাড়ীতে আমার লোকবল দেখিয়া এইখানেই গেরেপ্তার করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল।

অবশেষে তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া দেখিলেন, রাত্রি তখন এগারোটা। আর আধঘণ্টা পরেই গাড়ী আসিবে। তাঁহার সঙ্গে কেবলমাত্র একটি চামড়ার ব্যাগ ছিল। একজন বেহারা সেটা হাতে করিয়া লইল। গোপীকান্তবাবু তখন অন্ধকারপ্রায় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু ভয় কিছুতেই ছাড়ে না। ভাবিতে লাগিলেন, যদি ধরিতেই আসে, সঙ্গে ত টাকা রহিয়াছে, টাকা দিয়া মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। গদাই পাল বলিয়াছে, পৃথিবী টাকার বশ—পুলিসের ত কথাই নাই। অন্ধকারে জুতার শব্দ পাইলেই চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যমনস্ক হইবার জন্য ব্যাগ হইতে চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। গোপীকান্তবাবু তখন উঠিয়া, বুকিং আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন, ভাবিলেন, টিকিটের কেরাণীটি চেনা লোক না হইলেই মঙ্গল। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লোকটি অনুমান পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়

যুবা, বিবর্ণ কালো আলপাকার একটি কোট গায়ে দিয়া টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। মুখখানি দেখিয়া পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কাছে গিয়া বলিলেন—"আমায় একখানা কলকাতার সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিন।"

যুবকটি ফিরিয়া, দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন, "একি! বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কেমন আছেন? প্রাতঃপ্রণাম।"—বলিয়া নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ইহা দেখিয়া গোপীকান্তবাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। মনের বিরক্তি মনে চাপা দিয়া বলিলেন, "ভাল আছি। আপনার কুশল ত?"

"আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে। আমায় 'আপনি' বলে কথা কচ্ছেন, আমায় কি চিনতে পারছেন না?"

"কই, না।"

"আজ্ঞে, আমার নাম শিবু। শিবচন্দ্র সরকার। ছেলেবেলায় আপনার ছোট ভাই মোহিতের সঙ্গে একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম। মোহিতের সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে কত গিয়েছি, খেলা করেছি, খেয়েছি—হেঁ হেঁ।"—বলিয়া তিনি আবার দন্তবিকাশ করিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন, "তা হবে—অনেক দিনের কথা হল কিনা স্মরণ হচ্ছে না।"

"আমাদের বাড়ী হল গিয়ে মাঝেরগাঁ—বকুলগঞ্জের বাবুদের এলাকার মধ্যে। আপনার কমলপুর থেকে বেশী দূর নয়। অনেক ভাগ্যে আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গেল! সেই ছেলেবেলা দেখেছিলাম—সে কি আজকের কথা? আমি এই তিনমাস হল এখানে বদলি হয়ে এসেছি। আর মশাই—রেলের চাকরিতে আর সুখ নাই। ভূতগত খাটুনি। এক পা রেলে—এক পা জেলে, কখন কলিসন হয়ে যায় কিছুই বলা যায় না—হলে শ্রীঘর। যদি মাইনে বেশী হত—তা হলেও বা বুঝতাম, পেটে খেলে পিঠে সয়। এই ধরুন আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে চাকরি করছি—পঁচিশটি টাকা মাইনে। আজকাল বেটারা মাইনে বাড়াতেই চায় না। রাত জেগে জেগে হাড় কালি হয়ে গেল মশাই—হাড় কালি হয়ে গেল। আমাদের নতুন বড় সাহেবটি যে হয়েছেন—"

এতক্ষণ যাত্রিগণ অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে টাকা পয়সা মুঠা করিয়া, টিকিটের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার তাহারা কোলাহল করিতে আরম্ভ

করিল।—"বাবু—টিকিট ছান না—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ?"—"বাবু—গাড়ী যে এসে পড়ল"—বলিয়া যুগপৎ চীৎকার করিতে লাগিল।

"আঃ—চেঁচিয়ে যে মাথা ধরিয়ে দিলি বাপু!—দিচ্ছি, সবুর কর্ না"—বলিয়া যুবক আবার আরম্ভ করিলেন—"হাঁ। কি বলছিলাম? আমাদের এই নতুন বড়সাহেবটি একেবারে পাজির পাঝাড়া মশাই পাজির পাঝাড়া। গত মাসে আমার তিনদিনের মাইনে কেটে নিয়েছে! হয়েছিল কি জানেন?—"

যাত্রিগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্বর পঞ্চমে তুলিল। এদিকে বাহিরেও ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সিগন্যালম্যান দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ফুকারিল—"বাবু—গাড়ী ডাউন মাঙ্গতা।"

"ওঃ—ট্রেণ বুঝি এসে পড়ল! (উচ্চৈঃস্বরে) ডাউন দো।—আপনার কলকাতার একখানা সেকেণ্ড ক্লাস? সিঙ্গিল না রিটার্ণ? সিঙ্গিল?—আচ্ছা।"—বলিয়া বাবুটি গোপীকান্তবাবুকে টিকিট দিয়া, অন্যান্য যাত্রীর প্রতি মনোযোগ করিলেন। সকলের টিকিট পাইবার পূর্ব্বেই ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তখন বাবুটি বিস্তর দোহাই সত্ত্বেও সজোরে টিকিট জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া, টুপীটি মাথায় দিয়া, লণ্ঠনহস্তে ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া গোপীবাবু দেখিলেন, সে কামরায় আর কেহ নাই। দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। নিজেকে আপততঃ নিরাপদ মনে হইল।

বাহিরে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। তারাগুলি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া শীতল বায়ু আসিতে লাগিল। আলো ঢাকিয়া দিয়া, বেঞ্চের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া, বুকের উপর বাহুদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া গোপীকান্তবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে যেন তাঁহার বক্ষস্পন্দন কতকটা স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইল। ললাটের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন।

গোপীকান্তবাবু ভাবিতে লাগিলেন—আজ তাহারা কেহ থানায় যায় নাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। হয়ত আজ পরামর্শ ও উপায় চিন্তা করিতেই তাহাদের দিন গিয়াছে। সম্ভবতঃ কল্য প্রাতে থানায় যাইবে। তা, কল্য প্রাতে গদাই পালও থানায় উপস্থিত হইবে। টাকার জোরে গদাই নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। গদাই লোকটা খুব চালাক চতুর আছে—মামলা মোকর্দ্দমাও বেশ বোঝে। কিন্তু দারোগা যদি না শোনে? যদি টাকার

বশীভূত না হইতে চাহে ? তাহা হইলে কি হইবে ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই এজেহার লিখিয়া তদন্ত আরম্ভ করিবে। কমলপুরে আসিয়া শুনিবে আমি কলিকাতায় গিয়াছি। কলিকাতার ঠিকানা পাইবে না। অন্যান্যবার আমি কলিকাতায় গেলে কোথায় উঠি, আমার কর্ম্মচারীরা নিশ্চয়ই দারোগাকে বলিবে না। তবে একটা কথা—মোহিত যদি সন্ধান বলিয়া দেয়। যদি কেন, নিশ্চয়ই সে চোরবাগানের ঠিকানা বলিয়া দিবে। দারোগা হয়ত সন্ধ্যার গাড়ীতে, আমায় ধরিবার জন্য কলিকাতা রওযানা হইবে। সে যখন কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমি তখন বহুদূরে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, গাড়ীর আলোড়ন ও শীতল বায়ুর প্রভাবে, গোপীকান্তবাবুর নিদ্রাবেশ হইল। তখন তিনি ব্যাগটি মাথায দিয়া শয়ন করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ভয়বিহ্বল

নিদ্রাযোগে গোপীকান্তবাবু স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি কলিকাতা চৌরঙ্গির রাস্তায় অলসভাবে পদচারণা করিতেছেন। সারি সারি ইংরাজি দোকান-গুলিতে বিবিধ পণ্য দ্রব্য—দেখিলে অন্তঃকরণে ক্রয়-বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। একটা সোণা-রূপার দোকানের বিস্তৃত বহির্ভাগ স্ফটিকাবৃত—ভিতরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ঘড়ি, চেন, আংটি, ব্রোচ, নেকলেস্ প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা করিয়া বিদ্যুতের গোলক জ্বলিতেছে। দ্রব্য-গুলির গঠন ও পালিস দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গোপীকান্তবাবু সেইখানে দাঁড়াইয়া লুব্ধনেত্রে জিনিষগুলি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় নিজ পকেটের মধ্যে যেন কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, একজন গাঁটকাটা তাঁহার মনি-ব্যাগটি হাতে করিয়া ছুটিয়াছে। গোপীকান্তবাবু 'চোর চোর' করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহার পা যেন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। চৌরঙ্গির ফুটপাতে কে যেন রাশি রাশি বালি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে। ছুটিতে গেলে পা বসিয়া যায়। হঠাৎ দেখিলেন, যেন দুইদিক হইতে দুইজন পুলিস ইনস্পেক্টর আসিয়া তাঁহাকে

ধরিয়া ফেলিল। তিনি হতভম্ব হইয়া বলিলেন—'মহাশয় আমাকে ধরেন কেন? ঐ চোর পলাইতেছে উহাকে ধরুন।'—ইনস্পেক্টরদ্বয় যেন তাঁহাকে এক গুঁতা দিয়া বলিল—'কে চোর কে সাধু পরে প্রমাণ হইবে—এখন থানায় চল!' বলিয়া তাঁহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া, টানিতে টানিতে লালবাজার থানায় লইয়া গিয়া পুলিস কমিসনার সাহেবের নিকট হাজির করিল। সাহেবের সেই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, চক্ষু বুজিয়া হাই তুলিলেন, এবং তিনবার তুড়ি দিয়া বলিলেন—'যতক্ষণ না স্বীকারোক্তি করে—ইহাকে নাগরদোলায় চড়াইয়া দাও।' পুলিস-আপিসের উঠানে যেন একটা বৃহৎ নাগরদোলা ঘুলিতেছিল—তাহাতে সাহেব বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আরোহণ করিয়া আছে। যাহারা স্থান পাইয়াছে—তাহারা শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে—যাহাদের স্থানাভাব—তাহারা বসিয়া ঢুলিতেছে। গোপীকান্তবাবু যে বাক্সটায় উঠিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট গদি আঁটা স্থান থাকায় তিনি শয়ন করিলেন। অল্প নিদ্রাবেশ হইবামাত্র যেন নাগরদোলা হঠাৎ থামিয়ে গেল—ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সত্য সত্যই জাগিয়া শুনিলেন—বাহিরে ষ্টেশনের কুলিরা হাঁকিতেছে—'দমদমা।'

গোপীকান্তবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিয়া জানালা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের পানে চাহিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমটা মনে হইল—এ দুঃস্বপ্ন ভয়হেতুক। পুলিস পুলিস চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বোধোদয়ের মন্তব্য মনে পড়িল—স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র, আমরা জাগ্রতাবস্থায় যে সকল বিষয় চিন্তা করি, রাত্রে তাহাই স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।—ব্যাগটা খুলিয়া একটি চুরট বাহির করিয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন গোপীকান্তবাবুর মনে হইতে লাগিল, বোধোদয়ের কথা বাস্তবিকই কি ঠিক?—স্বপ্নে দেবতারা আমায় সাবধান করিয়া দিতেছেন ইহাও ত হইতে পারে। হয়ত বা সেখানকার পুলিস আমাকে গেরেপ্তার করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিসনারকে তার দিয়াছে—কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র আমার হাতে হাতকড়ি পড়িবে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হয়ত বা তাহারা আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহা যদি হয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ। কেন আমি দমদমায় নামিয়া পড়িলাম না? এখন ত আর

উপায় নাই। গাড়ী কয়েক মিনিট পরেই শিয়ালদহে পৌঁছিয়া যাইবে। সেখানে প্ল্যাটফর্ম্মে হয়ত সদ্য যমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুলিস সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়া আছে। আমার এই টিকিট দেখিলেই বুঝিতে পারিবে আমি সেখান হইতে আসিতেছি—অপর পরিচয়ের আবশ্যক হইবে না। কি করি, টিকিটখানা ফেলিয়া দিব? বলিব এখন যে, যশোর হইতে আসিতেছি—কিম্বা বনগ্রাম হইতে আসিতেছি—টিকিট হারাইয়া গিয়াছে। খুলনা হইতে ডবল ভাড়া লইবে—তা লউক। এই ভাবিয়া গোপীকান্তবাবু টিকিটখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া, জানালার বাহিরে সেখানি ধরিয়া হাত হইতে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় একটা দমকা বাতাস আসিয়া, টিকিটখানা ভিতর দিকে উড়াইয়া গোপীবাবুর পদতলে ফেলিল।

ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। ভাবিলেন—বুঝিয়াছি। পুলিস এখনও ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে নাই। বরং হারাণো টিকিটের দ্বিগুণ মাশুল জমা করিবার গোলমালে যে বিলম্ব হইত, সেই সময়ের মধ্যে পুলিস আসিয়া পড়িত। ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন। আমি ষ্টেশনে নামিয়াই কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া যাইব। হাওড়া ষ্টেশনেও যাইবার প্রয়োজন নাই। বরং দুই তিনটা ষ্টেশন পার হইয়া গিয়া, পশ্চিমের গাড়ীতে চড়া যাইবে।

দেখিতে দেখিতে খুলনা মেল আসিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে দাঁড়াইল। গোপীবাবু সভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহাকে ধরিবার কোনও উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। তখন নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

একজন গাড়োয়ান তাঁহাকে বলিল, "কোথা যাবেন বাবু?"

গোপীবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "শ্রীরামপুর।"

"আসুন বাবু—দেড় টাকা ভাড়া লাগবে। এখান থেকে হাওড়ার দেড় টাকা ভাড়া বাঁধা আছে সেকেন কেলাস গাড়ী বাবু—"

গোপীবাবু বলিলেন—"হাওড়া কেন? রেলে যাব না।"

এমন সময় আরও দুই তিনজন গাড়োয়ান আসিয়া—"কোথা যাবেন বাবু—ঐ আমার গাড়ীতে আসুন"—বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ান—"পাঁচসিকে দেবেন? এর কমে পাবেন না"—বলিয়া

তাঁহার হস্ত হইতে ব্যাগটা লইল। গোপীবাবু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িল।

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া একটিও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না। পথ-পার্শ্বস্থ গ্যাসের লণ্ঠনগুলি ভাল আর জ্বলিতেছে না—এখনি নিবিয়া যাইবে। গাড়ী ঠনঠনিয়ার মোড় পার হইতে না হইতেই ঝড় উঠিল। সে বিষম ঝড়—ঘোড়ার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। ধূলার চোটে গোপীকান্তবাবুর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি অনেক কষ্টে গাড়ীর জানালাগুলা তুলিয়া দিলেন। মিনিট পাঁচেক পরেই প্রবলবেগে বারিপতন আরম্ভ হইল। গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়া জলের ছাট আসিয়া গোপীকান্তবাবুর পিরাণ ভিজাইয়া দিল। ঘোড়া পায় পায় চলিতে লাগিল। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিলে, বৃষ্টিটা একটু কমিল। গোপীকান্তবাবু ভাবিলেন—এতক্ষণ হয় ত হাওড়ায় পৌঁছিয়াছি। একটা জানালা নামাইয়া দেখিলেন—বামদিকে সারি সারি কাঠের গোলা, তাহার পশ্চাতে রেল, তাহার পশ্চাতে গঙ্গা।

তখনও বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—"কোচম্যান—এ কোথা আনলে?"—জলে গোপীকান্তবাবুর মাথা ভিজিয়া গেল।

কোচম্যান কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। গোপীবাবুর স্বর সেই পুরু কম্বল ভেদ করিয়া তাহার কর্ণে পৌঁছিল না।

অর্দ্ধমিনিট পরে গোপীকান্তবাবু আবার মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, "কোচম্যান—ও কোচম্যান।"

কোচম্যান বলিল, "তাড়াহুড়ো করছেন কেন বাবু—এখনও ঢের সময় আছে।"—বলিয়া সে শ্রান্ত অশ্বযুগলকে চাবুক মারিল। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

গোপীকান্তবাবু ভাবিলেন—মাথা যাহা ভিজিবার তাহা ত ভিজিয়াছে। কোথায় লইয়া যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীরামপুর যাইতে হইলে বামদিকে গঙ্গা থাকিবার ত কথা নয়—দক্ষিণে থাকিবার কথা। তাই তিনি আবার মাথা বাড়াইয়া বলিলেন, "কোচম্যান—ও কোচম্যান—এ কোথা নিয়ে চললে?"

বলিতে বলিতে গাড়ী দাঁড়াইল। গোপীবাবু বলিলেন, "এ কোথায় আনলে ?"

"এই ত বাবু হাটখোলার ঘাট।"

"হাটখোলার ঘাট ?—হাটখোলার ঘাটে কেন আনলি ?"

"এইখান থেকেই ত ইষ্টিমার ছাড়ে।"

গোপীকান্তবাবু বলিলেন, "ইষ্টিমার ছাড়ে !—ইষ্টিমার কি ?"

গাড়োয়ান বলিল—"ইষ্টিমার, ইষ্টিমার ! কলের জাহাজ। আগিন্ বোট—ধুঁয়াকল।"

"কলের জাহাজ ছাড়ে ত আমার কি ? আমি যে শ্রীরামপুর ভাড়া করলাম ?"

"বাঃ—আপনি বললেন রেলে যাব না। মানুষ যদি রেলে না যায় তাহলে ইষ্টিমারে যায়। এইখান থেকে সাড়ে সাতটায় ইষ্টিমার ছাড়বে।"

গোপীবাবু রাগিয়া বলিলেন, "ওরে মুখ্যু !—রেলে যাব না বলেছিলাম—তার মানে সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে যাব।"

গাড়োয়ান জিহ্বা ও তালুতে ঘোড়া তাড়ান শব্দ করিয়া বলিল, "সমস্ত পথ ঘোড়ার গাড়ীতে শ্রীরামপুর যাবেন—পাঁচসিকে ভাড়ায় ! সত্যযুগ আর কি ! এখন নামবেন কিনা বলুন।"

এই সময়ই ষ্টিমার বংশীধ্বনি আরম্ভ করিল। গোপীকান্তবাবু নামিয়া পড়িয়া গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া, টিকিট আপিসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এ জাহাজ কোথা কোথা দিয়ে যাবে ?"

বাবু বলিলেন, "হুগলি হয়ে কালনা।"

"আচ্ছা—আমায় একখানা হুগলির টিকিট দিন।"

টিকিট লইয়া গোপীবাবু ষ্টিমারে আরোহণ করিলেন। এ জাহাজখানির নাম হংসেশ্বরী। আরও কয়েকবার বংশীধ্বনি করিয়া হংসেশ্বরী ছাড়িয়া দিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ সন্ন্যাসী ঠাকুর

গোপীবাবু দ্বিতীয় শ্রেণী ক্যাবিনের টিকিট লইয়াছিলেন। ক্যাবিনে গিয়া দেখিলেন, সেখানে অত্যন্ত গরম। তাই ব্যাগটি সেখানে রাখিয়া, উপর ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে দুইখানি বেঞ্চি পাতা আছে—তাহাই মধ্যম শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা ডেকের উপর কেহ শতরঞ্চ পাতিয়া, কেহ মাদুর বিছাইয়া, কেহ শুধু কাষ্ঠের উপর বসিয়া আছে। কেহ গল্প করিতেছে—কেহ তামাক খাইতেছে—কেহ বা শূন্যমনে তীরভূমির দিকে চাহিয়া আছে। মধ্যম শ্রেণীর দুইখানি বেঞ্চিতে সাত আট জন ভদ্রলোক বসিয়া।

গোপীকান্তবাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অর্দ্ধঘণ্টায় কলিকাতা শেষ হইয়া জাহাজ উত্তরপাড়ার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শ্রীরামপুর—শ্রীরামপুরের পর শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতে বেলা নয়টা বাজিল। গোপীকান্তবাবু এতক্ষণ মাঝে মাঝে উপর ডেকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, মাঝে মাঝে ক্যাবিনে গিয়া বসিতেছিলেন। এখন তাঁহার মন হইতে পুলিসভীতি অনেকটা তিরোহিত। ভাবিতেছিলেন—কলিকাতার কমিসনার আমার সম্বন্ধে যদি টেলিগ্রাম পাইয়াও থাকে, আর আমার সন্ধান করিতে পারিতেছে না। এখন হুগলিতে গিয়া রেলে চড়িতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

শেওড়াফুলি ঘাটে আসিয়া জাহাজ লাগিলে, গোপীবাবু রেলিং ধরিয়া যাত্রীদের নামা ওঠা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে—একজন সন্ন্যাসী উঠিতেছেন। তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জটা, বেণীর আকারে আবদ্ধ। মুখমণ্ডলের অধিকাংশই গুম্ফ ও শ্মশ্রুর জঙ্গলে আবৃত। অল্প যাহা দৃশ্যমান ছিল, সেটুকু ভস্মমাখা। বক্ষ পৃষ্ঠ ও বাহুযুগলও ভস্মাবৃত। বামস্কন্ধে একটা ঝুলি—বামহস্তে একটা চিমটা ও একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং দক্ষিণ হস্তে একটি তাম্রনির্ম্মিত কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর উপর ডেকে আসিয়া দর্শন দিলেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, যাত্রীগণের একটা সংক্ষিপ্ত চক্ষু-পরিচয় করিয়া লইলেন। পরে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া, পর্দ্দায় পর্দ্দায় স্বর তুলিয়া উর্দ্ধমুখে বলিলেন, "তারা—তারা—তারা।" তাঁহার স্বর যেন ক্রোধ-ব্যঞ্জক—শুনিলে হঠাৎ মনে হইতে পারে—বুঝি তারা মা সন্ন্যাসী ঠাকুরের

নিকট কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী—দেবী তজ্জন্য সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

জাহাজশুদ্ধ লোক সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল—কেবল মধ্যমশ্রেণীর বেঞ্চিতে উপবিষ্ট দুই তিনজন নব্য যুবক মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বক্রনয়নে একবার তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাদেরই অনতিদূরে বাঘছালখানি বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল—'ঠাকুর প্রণাম হই।'—'জিতা রও' বলিয়া বাবা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর ও চক্ষুর ভঙ্গি এ প্রকার যেন তাঁহার আন্তরিক কথা—'ভস্ম হও।'

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবার পর, সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলিটি হইতে কিঞ্চিৎ গাঁজা ও একটি ছোট কলিকা বাহির করিলেন। বাম করতলে গাঁজা-টুকু রাখিয়া, দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা সজোরে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে নব্যযুবক দুইটি সরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের আসনের অনতিদূরে বসিয়াছিল। এক-জন বলিল, "ঠাকুর, আপনি গাঁজা খান কেন?"

প্রথমে মনে হইল, কথাটা যেন ঠাকুরের কাণে যায় নাই—কারণ তিনি যুবকের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, আপন মনে গাঁজা ডলিয়া যাইতে লাগিলেন। অপর সকলে যুবকের প্রতি ভর্ৎসনাপূর্ণ কটাক্ষ করিল। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট পরে, প্রশ্নকারী যুবকের প্রতি নিজ রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল স্থাপন করিয়া, গম্ভীর চাপা গলায় ঠাকুর বলিলেন, "কি বল্লে?"

ঠাকুরের ভঙ্গি দেখিয়া যুবকের মনে একটু শঙ্কা উপস্থিত হইল। সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"জিজ্ঞাসা করছিলাম, গাঁজাটা কেন খাওয়া হয়—ওর কি কোনও বিশেষ গুণ আছে?"

যুবকের সন্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঠাকুরের বিরক্তি যেন কতকটা প্রশমিত হইল। পূর্ব্ববৎ চাপা গলায় বলিলেন, "মনস্থির হয়।"—বলিয়া, গাঁজাটুকু কলিকায় সাজিয়া, অগ্নিসংযোগ করিলেন। ঘন ঘন কয়েক টান টানিয়া—একটা লম্বা গোছের টান দিলেন—অবশেষে মুখগহ্বর হইতে অজস্র ধূমোদ্গার করিয়া কলিকাটি নামাইয়া বলিলেন, "কেউ প্রসাদ পাবে?"

গোপীকান্তবাবুর এ অভ্যাসটি ছিল—কিন্তু অত্যন্ত গোপনে এ কার্য্য করিতেন। প্রসাদ পাইবার লালসা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। আবার মনে হইল, এমন প্রকাশ্য স্থানে, এতলোকের সম্মুখে, গাঁজা খাইব? তাহার পর মনে হইল, তুমিও যেমন—এখানে কেই বা আমাকে চেনে? আমি যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক—জমিদার—তাহা কেই বা জানে? এই বিবেচনা করিয়া, অবনত মস্তকে তিনি ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া, গাঁজার কলিকাটি লইলেন।

গোপীবাবু প্রসাদ পাইতে লাগিলেন—আর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গোপীবাবু কয়েক টান টানিয়া কলিকাটি সন্ন্যাসীর হাতে দিবা মাত্র তিনি বলিলেন, "তোমার কপালে রাজদণ্ড দেখছি।"

কথাটা শুনিয়া গোপীবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এর অর্থ কি বাবা?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যে ব্যক্তির কপালে রাজদণ্ডের চিহ্ন থাকে, সে হয় জেলে যায়—নয় রাজা হয়—অর্থাৎ রাজসম্পদ পায়। তোমার হাতটা দেখি।"

ত্রস্তভাবে গোপীবাবু নিজের হাত বাড়াইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সেখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন—"তুমি বড়ই মনের কষ্টে আছ।"

গোপীবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হঁ্যা।" তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এত লোকের সম্মুখে সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশী কিছু বলিয়া না বসেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"ঠাকুর যা আজ্ঞা করেছেন—তা যথার্থ।"—বলিয়া নিজ হাতখানি সরাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন—

"ঠাকুরের এখন কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?"

"তারকেশ্বর—বাবা তারকনাথকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম।"

"কোথায় যাওয়া হবে?"

"হুগলি। সেখানে আমার একজন শিষ্য আছে। তাকে একবার দর্শন দিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরুব।"

"কোথা কোথা যাওয়া হবে?"

"বৈদ্যনাথ—গয়া—কাশী—প্রয়াগ। আরও পশ্চিমে যাব। তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে—আমিও ত তীর্থদর্শন করব বলেই বেরিয়েছি।"

"আর কখনও পশ্চিম গিয়েছ ?"

"আজ্ঞে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঝুলি হইতে একটু গাঁজা বাহির করিয়া গোপীবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "সাজ।"

গোপীবাবুর মনে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতি ভক্তি উছলিয়া উঠিতেছিল। এই আদেশে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া, গাঁজাটুকু লইয়া তাহা মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "আর কখনও পশ্চিম যাওনি ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে আমার সঙ্গে চল না কেন ?"

"ঠাকুরের যদি সে অনুমতি হয় তা হলে আমার বিশেষ সৌভাগ্য।"

"তুমিও কি হুগলি হয়ে যাবে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর গাঁজার কলিকাটি হাতে করিয়া বলিলেন, "আজই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই আমার না বেরুলেই নয়।"

ঠাকুর কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। দুই চারি টান টানিয়া বলিলেন, "তাই ত—আমি যে আজই রওয়ানা হতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আমার সে শিষ্যটি বাড়ী আছে কিনা তা জানিনে। তীর্থে যেতে হলে শুধু হাতে ত যাওয়া চলে না।"

গোপীবাবু বলিলেন, "এইমাত্র যদি বাধা হয়—তাহলে ঠাকুরের বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই।"—বলিয়া গোপীবাবু পকেট হইতে এক মুঠা টাকা বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর টাকাগুলি উঠাইয়া রাখিয়া, অস্ফুটস্বরে গোপীবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাঁজার কলিকাটি নিবিয়া গিয়াছিল। তাহা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দুই চারি টান দিয়া গোপীবাবুকে প্রসাদ দিলেন।

জাহাজের অন্যান্য যাত্রিগণ নিজ নিজ হাত দেখাইবার জন্য তখন ঠাকুরকে ঘিরিয়া ধরিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গদাই পালের বিচারকার্য্য

গদাই পাল নোটগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে দরিয়াপুর যাত্রা করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাছারিতে পৌঁছিয়া, কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কেনারাম যখন আসিল, তখন গদাই কাছারিবাড়ীর বারান্দায় বসিয়া, মুদ্রিত নয়নে হরিনামের মালাজপে নিযুক্ত। একবার মাত্র চক্ষু খুলিয়া, ইসারায় কেনারামকে বসিতে বলিয়া, চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া আপন মনে মালাজপ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় একদণ্ডকাল এইরূপ ভণ্ডামির পর, মালাশুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া, দুই মিনিট ধরিয়া প্রণাম করিল। তারপর বলিতে লাগিল—"জয়রাম শ্রীরাম সীতারাম। হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য, সকলি মিথ্যে—তারপর, ঘোষের পো, কি মনে করে ?"

কেনারাম বলিল, "আজ্ঞে, হুজুর ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন শুনলাম—তাই এসেছি।"

"হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য—ওহো তাই বটে। তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম বটে—ওটা ভুলেই গিয়েছিলাম। সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে। হ্যাঁ—দেখ, তোমার বাড়ীর কাছে ঐ যে খানিকটে পতিত জমি আছে না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাতে পূর্ব্বে চিনিবাস ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল—সে পলাতক। দু তিন বছর ধরে জমিটে পড়ে আছে।"

"তা শুনেছি। সে চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল ? আসল কথা তবে তোমায় খুলে বলি। আমার ইচ্ছে, ঐখানটায় একটা ফল ফুলের বাগান করি। ফুল দিয়ে ঠাকুরদেবতার পুজো করতে আমি বড় ভালবাসি। ফুল দিয়ে পুজো করলে মনের যেমন তৃপ্তি হয়, এ শুকনো হরিনামের মালা ঠক্‌ঠকালে তা হয় না। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করা যে সেই চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল। পাপী দুষ্ট লোকের ভিটেতে ফুলগাছ জন্মালে, সে ফুলে ঠাকুরদের পুজো করতে আমার মন সরবে না। সে ফুল অপবিত্র বলে মনে হবে। আর যদি এমন হয় যে সে লোকটা ধার্ম্মিক ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখত—তাহলেই আমার মনটি শুদ্ধ হয়। এই জন্যেই তোমায় ডাকা। তুমি ধর তার একেবারে লাগাও হামছায়া ছিলে। হাড়হদ্দ সকলই তুমি জান। কি রকম লোকটা ছিল বল দেখি ?"

কেনারাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তা, লোকটাকে ত ভাল বলেই জানতাম। কারু কখনও কিছু মন্দ করেনি। তবে একবার আমার গোরু তার ক্ষেতে পড়েছিল—গোরুটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়েছিল। ছ গণ্ডা পয়সা দণ্ড দিয়ে গোরুকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।"

"গ্রাম ছেড়ে সে পালাল কেন? তার নামে কোনও ওয়ারিন টোয়ারিন বেরিয়েছিল নাকি?"

"আজ্ঞে না, তার শ্বশুর একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ছিল, শ্বশুরের আর কেউ ছিল না। সেই শ্বশুর মরে যাওয়াতে তার সব জোৎ জমাগুলি পেলে কিনা, তাই এখান থেকে উঠে গেল। এখানে তার যা কিছু জমিজমা গোরুবাছুর সব বিক্রী করে ফেললে—করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। ওয়ারিন টোয়ারিন কিছু বেরোয়নি।"

গদাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তাহলে লোকটা ভাল। আচ্ছা, এখানকার থানার দারোগা কে?"

"আজ্ঞে, থানা এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দূর—ওদিকে যাওয়া আসা ত নেই। দারোগার নামটি বলতে পারলাম না। তবে শুনেছি কে একজন মুসলমান।"

"ও—মুসলমান? একদিন যেতে হবে থানায়—দারোগার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। জমিদারী রাখতে হলে দারোগার সঙ্গে একটু ভাবসাব রাখা দরকার। কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। কালই না হয় যাওয়া যাক। দিনটাও ভাল আছে। দারোগাকে কি নজর দেওয়া যায়? মুর্গি এণ্ডা এ সব ত আমার দ্বারা হবে না। বরং একটা বড় ভাঁড়ে করে সের পাঁচেক ঘি নিয়ে যাওয়া যাবে। তুমি ত গয়লার ছেলে, ঘি চেন। দাও দেখি কাল সকালে আমায় সের পাঁচেক ঘি সংগ্রহ করে। বেশ ভাল ঘি। যা উচিৎ মূল্য তা দিচ্ছি। জমিদারের নায়েব বলে যে আমি জোর জবরদস্তি করে আধা কড়িতে ঘি কিনব—সে রকম তন্ত্রের লোক আমি নই। সে আমার ধর্ম্মে সইবে না। গরীবের উপর অত্যাচার করার মত মহাপাপ আর নেই। কি বল, পারবে সের পাঁচেক ঘি কিনে দিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তার আর শক্ত কি? কখন চাই?"

"এই ধর কাল সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে বেরোন যাবে। তারই মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই।"

"তা পারব। এনে দেব।"

"বেশ। টাকাটা এখনি নিয়ে যাবে?"

"কাল নেব এখন। দেখি কি দরে পাই।"

"আচ্ছা তা কালই নিও। আর এক কায কর না।"

"আজ্ঞে করুন।"

"তুমিও আমার সঙ্গে চল না। আমি পাল্কীতে যাব এখন। তুমি ঘোড়ায় যেও।"

কেনারাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বেশ। তা যেমন আজ্ঞে করেন।"

গদাই কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমার যদি কাযের কোনও রকম অসুবিধে না হয়—ইচ্ছে সুখে আমার সঙ্গে যেতে পার, তবেই চল। নইলে আমি জমিদারের নায়েব আর তুমি ক্ষুদ্র প্রজা বলে আমি যে তোমার উপর হুকুমাৎ চালাচ্ছি—এ মনে করো না। আমি সে তন্ত্রের লোকই নই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই—কেবল আমি নতুন লোক, কখনও ওদিকে যাইনি, কাউকে চিনি শুনিনা, সঙ্গে একজন লোক থাকলে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে কইতেও যেতে পারব—এই জন্যেই আমার আকিঞ্চন।"

কেনারাম বলিল, "আজ্ঞে না—আমি ইচ্ছে সুখেই যাচ্ছি, আপনার মত এমন মনিবের সঙ্গে যাব না ত কার সঙ্গে যাব?"

গদাই বলিল, "মনিব কিসের? মনিব কিসের? তবে তোমার বিনয় দেখে খুসী হলাম। তুমি লোকটি অতি সজ্জন, তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা ক' ভাই?"

"আজ্ঞে, আমার দু'ভাই ছিলাম। তা আমার ছোট ভাই বেচারাম মরে গেছে।"

"আহা! মরে গেছে? তা আর কি করবে বল। ছেলেপিলে কিছু রেখে গেছে?"

"কিছু না। কেবল তার ইস্তিরী আছে।"

"তা, তোমার ভাদ্রবৌকে কি তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ, না সে তোমার সংসারেই আছে?"

কেনারাম একটু থতমত খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, ক'মাস থেকে সে নিজের বাপের বাড়ীতেই আছে।"

এ কথা শুনিয়া গদাধর বিস্মিত হইল। ভাবিল—তবে কি সে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই? গেল কোথা? কি হইল? সে নিজেই থানায় চলিয়া যায় নাই ত? কিন্তু বাহিরে এই দুশ্চিন্তার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিল, "তার বাপের বাড়ী কোন্ গ্রামে?"

"সে এখান থেকে দুদিনের পথ।"

"গ্রামটার নাম কি?"

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, ঢোক গিলিয়া কেনারাম বলিল, "কুমড়োডাঙ্গা।"

"আচ্ছা বেশ, তবে কাল বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে, ঘিটে নিয়ে এখানে এস"—বলিয়া গদাই কেনারামকে বিদায় করিয়া দিল। পরে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া, কমলপুর-ফেরৎ ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। তাহার পর হুঁকাটি হাতে করিয়া, তক্তপোষে বসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

গদাই ভাবিতে লাগিল—গঙ্গামণি গেল কোথা? ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরের কাছে যেখানে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে এ গ্রাম বড় জোর ক্রোশ দেড়েক পথ—সোজা রাস্তা—রাস্তা ভুলে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে তাও সম্ভব নয়। তাকে যে রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছি, তাতে সে যে থানায় গিয়ে নালিশ করবে, এও ত মনে হয় না। যা হোক কাল থানায় গেলেই জানতে পারব, নালিশ টালিশ কিছু হয়েছে কিনা। ভেবেছিলাম এ হাজার টাকা সাফ আমার লভ্য হল—সেটা ফস্কে না যায়। দেখা যাক শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। আচ্ছা—ইয়ে হয়নি ত? কেনারাম গঙ্গামণিকে নিজের বাড়ীর মধ্যেই লুকিয়ে রাখেনি ত? গঙ্গামণি ভোরের বেলা এসে পৌঁছেছে—ওরা যদিও লোকলজ্জা ভয়ে প্রচার করে দিয়েছিল সে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে—নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই এতদিন কোথা ছিলি, কি করছিলি। গঙ্গামণি নাম টাম কিছুই বলেনি। তাতে তাদের আরও সন্দেহ বেড়ে গিয়ে থাকবে। এ বিষয়ের একটা হেস্ত নেস্ত না হওয়া অবধি বোধ হয় গঙ্গামণিকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। তা হলে ত এ বিষয়ের সন্ধান নিতে হয়! এক কায করি। আর দুদণ্ড রাত্তির হোক্! ঘিয়ের টাকা দেবার নাম করে,

হঠাৎ তার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পড়ি। গঙ্গামণি যদি থাকে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সুলুক সন্ধান পাব।

এইরূপ স্থির করিয়া গদাই পাল প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিল। পরে গুটি পাঁচেক টাকা লইয়া অন্ধকারে বাহির হইল। হাতে একটি বাঁশের ছড়ি, চাদরখানা গলায় ফেলিয়া, নক্ষত্রালোকে গদাই নির্জ্জন গ্রামপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। কেনারামের বাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল ভিতরে কোনও কথাবার্ত্তা হইতেছে কি না। দুই তিন জনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝা গেল না। যেন কলহ ও ক্রন্দনের স্বর। গদাই তখন আস্তে আস্তে দরজাটি ঠেলিল—দরজা খুলিয়া গেল। অঙ্গন অন্ধকারময়, সেই অঙ্গনের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ রোয়াকের উপর তিন ব্যক্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই সামান্য আলোক রোয়াকে পৌঁছিতেছে—তাহাতে মানুষ চেনা যায় না।

গদাই শুনিল, একজন পুরুষকণ্ঠে বলিতেছে, "সত্যি যদি তোর কোন দোষ নেই, তা হলে পষ্ট বল্‌না কেন কে তোকে ধরে রেখেছিল?"—গদাই বুঝিল ইহা কেনারামের কণ্ঠস্বর।

গঙ্গামণি বলিল, "সে আমি বলতে পারব না।"

একটি স্ত্রীকণ্ঠ বলিল, "কেন বলতে পারবিনে হতভাগী? তা হলে নিশ্চয়ই তোর মনে পাপ আছে। ওগো ওর কথা বিশ্বাস কোরো না—ওর সব মিথ্যে কথা। বল্‌ বলছি, নইলে তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বের করে দেবো"—গদাধর অনুমান করিল, এ কেনারামের স্ত্রী হইবে।

গঙ্গামণি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি বলবার অসাধ? কিন্তু মা কালীর বারণ, তাই আমি বলব না।"

কেনারাম বলিল, "ইস্‌—তুই ভারি ধার্ম্মিক কিনা, মা কালী তোকে দর্শন দিয়েছে। আসল কথা যদি না বলিস তবে এখনি ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেব।"

গঙ্গামণি একটু ক্রোধস্বরে বলিল, "কেন গো আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? এ বাড়ী কি আমার নয়, তোমার শুধু একলার?"

কেনারামের স্ত্রী বলিল, "মর্‌ পোড়ারমুখী—ভাসুরের মুখের উপর জবাব!"

কেনারাম রাগিয়া বলিল, "বটে! যত বড় মুখ তত বড় কথা? আমাকে আইন দেখাচ্ছিস? বেরো এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে। বেরো বলছি— নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বিদেয় করে দেব।"

গঙ্গামণি বলিল, "খপর্দ্দার যদি আমার গায়ে হাত তুলবে ত ভাল হবে না বলছি। আমি এখনি গিয়ে নায়েব মশাইয়ের কাছে নালিশ করব।"

কেনারাম তাহাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, "নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করব! নায়েব মশাই ত আমার সব করবে! নায়েব মশাই জজ মেজেষ্টার কিনা! যা তোর বাবা নায়েব মশাইয়ের কাছে যা।"

এমন সময় গদাই পাল গলা খাঁকার দিয়া বলিল, "কেনারাম।"

সচকিত দৃষ্টিতে কেনারাম উঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেও?"

গদাই সক্রোধে বলিল, "কেনারাম, আমি মনে করেছিলাম তুই একজন ভাল লোক। তুই ত দেখছি বজ্জাতের ধাড়ী!"

কণ্ঠস্বরেই কেনারাম বুঝিল নায়েব মহাশয়। তথাপি সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রদীপটা আনিয়া উঠানে নামিয়া গদাইকে দেখিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "একি? নায়েব মশাই যে! প্রাতঃপ্রণাম।"

গদাই স্বর কাঁপাইয়া বলিল, "মিথ্যুক ভণ্ড চোর! এই না তুই আমার কাছে বলে এলি যে তোর বিধবা ভাজ তার বাপের বাড়ীতে আছে?"

কেনারাম বলিল, "আজ্ঞে, বাপের বাড়ীতেই ছিল ত। আজই ত এসেছে।"

"ওকে শাসাচ্ছিস ধমকাচ্ছিস কেন?"

কেনারাম বলিল, "আজ্ঞে—আজ্ঞে—এমন ত কিছু শাসাইনি!"

"শাসাসনি হারামজাদা? কোথা ওগো ভালমানুষের মেয়ে, এ দিকে এস ত।"

গঙ্গামণি উঠানে আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল, "কি হয়েছে বল ত মা।"

গঙ্গামণি বলিল, "আমার সোয়ামি যতদিন থেকে মরেছে, আমার ভাসুর, আমার জা সেই থেকে আমায় বড় জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, মারে, খেতে দেয় না— আর আজ বলছে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেন নায়েব মশাই, আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে কেন? বাড়ী কি ওর একলাকার? আপনি এর বিচার করুন।"

গদাই বলিল, "আমি জজও নই মেজেষ্টারও নই কিন্তু আমি জমিদারের প্রতিনিধি। আমি অবিশ্যি এর বিচার করব। আমি করব না ত কে করবে? আমি এর সূক্ষ্ম বিচার করে দিচ্ছি! হ্যাঁরে কেনারাম, তোরা দুই ভাই ছিলি বললি না?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা।"

"তা হলে তোদের এই বাড়ী জোৎজমি যা কিছু আছে, সমস্ত বিষয়ের আট আনা হিস্যা তোর এই ভাজের। এ আইনের কথা—গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও লেখা আছে।"

কেনারাম বলিল, "আর আমি যে একলা জমিদারের খাজনা গুণছি?"

"তা হলে কি হয়। খাজনার টাকা কি তোর বাবার ঘর থেকে দিচ্ছিস? জমির উপসত্ত্ব থেকেই ত দিচ্ছিস।"

"আর আমি যে এত মেহনৎ করছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চষছি, ফসল তৈরি করছি?"

গদাই দাঁত খিচাইয়া বলিল, "জমি তুই চষবিনে ত কি বাড়ীর বউকে দিয়ে চষাবি, নচ্ছার? ভারি যে আইনবাজ হয়েছিস দেখছি। যা বলি শোন্। তোর ভাজ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন জমির অর্দ্ধেক উপসত্ত্ব ওর। সেই ভাবে আদর যত্ন করে যদি তোর ভাজকে বাড়ীতে রাখতে চাস ত রাখ। নইলে বল কালই আমি জমি জমা ভাগ বাটোয়ারা করে, আট আনা হিস্যা তোর ভাজের নামে দাখিল খারিজ করে নেব। ও আপনার বাপের বাড়ী চলে যাক—আমি ওর জমি বিলি করিয়ে দিচ্ছি। বাপের বাড়ী বসে পায়ের উপরি পা দিয়ে সে জমির উপসত্ত্ব ভোগ করবে। কি বলিস?"

ইহা শুনিয়া কেনারাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল—"আমি ত ভাজের উপর কোন রকম অত্যাচার উপদ্রব করিনে। বলুক না ও কি অত্যাচার করেছি।"

গঙ্গামণি বলিল, "আমায় খেতে দেয়নি। উঠতে বসতে আমায় গাল মন্দ করেছে। আমাকে মেরেছে পর্য্যন্ত!"

গদাধর, হাতের লাঠিটা উঠানে আছড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁরে মহাপাপী! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছিস? স্ত্রীলোক যে আদ্যাশক্তি ভগবতী তা জানিস মুখ্যু? তোর যে নরকেও স্থান হবে না।"

কেনারাম বলিল, "কবে আবার মেলাম! ওর কথা শুনবেন না নায়েব মশাই।"

"ওর কথা শুনব না? এখনি আমি স্বকর্ণে যে শুনলাম তুই বলছিস বেরো আমার বাড়ী থেকে নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বের করে দেব। আ—রে গঙ্গাজলে বব্বলে!—আমি যে এই উঠোনে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি। মনে করেছিস বুঝি যে নায়েব মশাই অতি ভালমানুষ, ফোঁটা কাটে, হরিনাম করে, কাউকে উঁচু কথাটি বলে না, আমরা যা খুসী তাই করব?—ওরে, নায়েব মশাই ভালর কাছেই ভালমানুষ। কিন্তু বজ্জাৎ অধার্ম্মিকের পক্ষে মুগুর। আমার নিজমূর্ত্তি দেখিসনি এখনও তোরা। তোকে ভালমানুষ বলে মনে করেছিলাম বলেই তোর বাড়ী বয়ে এসেছি। কাছারিতে বসে হঠাৎ মনে হল কই কেনারাম ত ঘিয়ের টাকা কটা নিয়ে গেল না—তা না হয় নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। তাই পাঁচটা টাকা তোকে দিতে এসেছিলাম। এই দেখ্।"—বলিয়া গদাধর টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কেনারাম মত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাই বলিল, "তা হলে কি বলিস? জমিজমা ভাগ করে দিবি, না ভাজকে আদর যত্ন করে ঘরে রাখবি?"

কেনারাম বলিল, "কেন যত্ন করব না—কেন আদর করব না? ও কি আমার পর? আমার যে ভাই—আপন সহোদর—তারই ত ও ইস্তিরী! আমি কি ওকে অযত্ন করতে পারি? আজ যদি আমার ভাই বেঁচে থাকত।"—বলিতে বলিতে কেনারাম ক্রন্দনের উপক্রম করিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওরে আমার ভাইরে—বেচারাম রে—তুই কোথা গেলি রে।"

গদাই বলিল, "থাম্ থাম্, তোর আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যা বললাম তা করবি। যদি ভাজকে কোনও রকম জালা যন্ত্রণা দিচ্ছিস শুনতে পাই—তাহলে সেই দণ্ডে তোর অর্দ্ধেক জমিজমা কেড়ে নিয়ে এই ভালমানুষের মেয়েকে দেব। সাবধান! রাত হয়ে গেল, এখন আমি চললাম। হ্যাঁ—আর এই টাকা পাঁচটা রেখে দে। পাঁচ টাকার ঘি কাল দশটার মধ্যে কিনে কাছারিতে আনবি। বেশ ভাল ঘি হয় যেন। ওগো ভালমানুষের মেয়ে—তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। তোমার উপর যদি আর কোন উৎপীড়ন হয়,

তখনি এসে আমায় জানাবে। আমি জমিদারের প্রতিনিধি—গ্রামের লোকের মা বাপ। আমার রাজ্যে কোনও অত্যাচার—কোন অধর্ম্ম হতে দেব না। এখন চললাম তবে।"

কেনারাম করযোড়ে বলিল, "নায়েব মশাই, গরীবের ঘরে যদি পায়ের ধূলো দিলেন, একবার তামাক ইচ্ছে করবেন না?"

গদাই বলিল, "না—আর দাঁড়াব না। অনেক রাত হল। এখনো আমার একশো আট হরিনাম করতে বাকী আছে। একশো আট হরিনাম করে তবে খাব, শোব।"—বলিয়া গদাই প্রস্থান করিল।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি বাক্স হইতে গদাই গোপীকান্তবাবুর নোটের তাড়া বাহির করিল। চশমা চোখে দিয়া সেগুলি সহাস্যবদনে গণিতে লাগিল। ক্যাম্বিশের ব্যাগ হইতে বোতলটি পুনরায় বাহির করিয়া অবশিষ্ট মদ্যটুকু উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। ঈষৎ মত্ততা উপস্থিত হইলে, নোটগুলি সম্মুখে বিছাইয়া, স্নেহ-গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল—এ হাজার টাকা আমার হল। পুলিশকে দিতে হবে না, কাউকে দিতে হবে না। এ হাজার টাকা আমার—আমার—আমার। বুদ্ধি যার, টাকা তার—বুদ্ধি যার, টাকা তার।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ স্থানীয় হাকিম

পরদিন গদাই পাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শিবিকারোহণে থানার দারোগাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল। কেনারামও একটি টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া, নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একজন বরকন্দাজ ঘৃত লইয়া পূর্ব্বেই পদব্রজে রওনা হইয়াছিল।

দরিয়াপুর কাছারি হইতে থানা তিন ক্রোশ ব্যবধান। বেলা দুইটার সময় গদাই পাল সেখানে পৌঁছিল। থানার বাড়ীটি একটি দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। একটি বটগাছের তলে গদাই পালের পাল্কী নামিল। গদাই পাল্কী হইতে বাহির হইয়া দেখিল, খড়ম পায়ে দিয়া একটি লোক থানার বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। গদাই বারান্দায়

উঠিয়া নিজ পরিচয় দিয়া সে লোকটির পরিচয় গ্রহণ করিল। তিনি থানার হেড কনেষ্টবল। হেড কনেষ্টবলকে সচরাচর লোকে জমাদার বলিয়া থাকে—কিন্তু গদাই বলিয়া উঠিল—"ওঃ আপনি এখানকার হেড কনেষ্টবল—ছোট দারোগাবাবু? বেশ বেশ। আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হলাম। বড় দারোগা মশায়ের নাম কি?"

"শেখ শেফায়েৎ হোসেন।"

"তাঁর বাড়ী কোথা?"

"বগুড়া জেলা।"

"দারোগা সাহেব এখন কোথা?"

"ঘুমুচ্চেন।"

"কখন উঠবেন?"

"বেশী দেরী নেই। কেন, কোনও মারপিট খুন জখম হয়েছে নাকি?"

গদাই বলিল, "না—না—সে সব কিছু নয়। আমি নূতন এসেছি—দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে—তাই মনে করলাম একবার এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। সেই মনে করে আসা।"

জমাদারবাবু কেনারামের হস্তস্থিত ঘৃতভাণ্ডের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"ওটাতে কি আছে?"

গদাই যেন বুঝিতেই পারে নাই এই ভাবে বলিল, "আজ্ঞে?"

জমাদারবাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ও ভাঁড়ে কি?"

"ভাঁড়ে?—ভাঁড়ে করে সামান্য একটু ঘি এনেছিলাম দারোগা সাহেবের জন্যে। জমিদারীর খাঁটি ঘি—বেশ তাজাও বটে।"

জমাদারবাবু বলিলেন, "খাঁটি ঘি? বটে?—আহা খাঁটি ঘি এখানে আমরা একটু চক্ষেও দেখতে পাইনে। শুনতে পাই নাকি মশায়—ঘিয়ে চর্ব্বি ভেজাল দেয়। সেই শুনে অবধি আমার পিসিমা ঠাকরুণ ঘি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন বাবা, আমি বিধবা মানুষ, শেষে কি চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেয়ে পরকাল খোয়াব? রাত্রে খানকতক করে লুচি খেতেন তাও গেছে—এখন শুধু দুধ—আর ফলটা পাকড়টা খান। হিঁদুরই মুস্কিল। দারোগা সাহেব মুসলমান—ওঁর ত চর্ব্বি দেওয়া ঘি খেলে জাত যাবে না।"

গদাই জমাদারবাবুর মনের ভাব বুঝিল। পাছে ইঙ্গিত ছাড়িয়া স্পষ্টই

ঘৃতটুকু চাহিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বলিল, "আহা আপনি এখানে আছেন তা ত জানতাম না। জানলে আপনার জন্যেও এক ভাঁড় নিয়ে আসতাম। তাই ত!—আপনার পিসিমার ত ভারি কষ্ট হচ্ছে।"

"কষ্ট হচ্ছে বইকি। আচ্ছা—আপনি না হয় গিয়ে এক ভাঁড় পাঠিয়ে দেবেন। যাবার সময় আপনার সঙ্গে একজন চৌকিদার দিয়ে দেব এখন। এই সের পাঁচেক হলেই হবে—বেশী না। আপনার আগে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। ও অঞ্চলে কোনও তদন্ত করতে গেলেই—দরিয়াপুরের কাছারিতেই আমার আড্ডা হত। মথুর মুখুর্য্যে অমনি পুকুরে জাল ফেলিয়ে বড় বড় মাছ ধরিয়ে আনাত—খাসি কাটত—কালিয়া পোলাও—খুব খাওয়াত।"

গদাই বলিল, "তা হবেই ত—তা হবেই ত! আপনাদের মতন লোকের খাতির করবে না ত কার খাতির করবে? আমারও বলা রইল—যখন ও দিকে যাবেন টাবেন—গরীবের কাছারিতে পায়ের ধুলো দিতে ভুলবেন না।"

জমাদারবাবু বলিলেন, "বেশ বেশ। আপনিও দেখছি একজন সজ্জন লোক।"

ইহার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমে দারোগা সাহেব বাহির হইলেন। দিবানিদ্রার প্রভাবে তাহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্য—তাঁহার হস্তে একটি হুইলযুক্ত ছিপ। প্রত্যহ অপরাহ্ণে দারোগা সাহেব দীর্ঘিকায় মৎস্য ধরিয়া থাকেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র জমাদারবাবু বলিলেন, "এই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

দারোগা সাহেব শ্লেষ্মাজড়িত চাপা গলায় বলিলেন, "ইনি কে?"

"ইনি দরিয়াপুরের নায়েব হয়ে এসেছেন। পূর্ব্বে যে মথুর মুখুর্য্যে ছিলেন, তাঁরই জায়গায় একটিনি করছেন।"

দারোগা সাহেব বলিলেন, "গোপীকান্তবাবুর নায়েব?"

গদাধর বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ী কোথা আপনার?"

"হুগলি জেলায়।"

"ওঃ—হুগলি থেকে এত দূর এসেছেন?"

গদাধর নিজ উদরদেশ বামহস্তে চাপড়াইয়া বলিল, "এরই জন্যে।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিল, "ঠিক। আমরাও সেইজন্যে নিজের মুলুক ছেড়ে এ দেশে এসেছি। এখন কি মনে করে আসা হয়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়। নূতন এসেছি, তাই মনে করলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাই। আমার মনিবের হুকুম হচ্ছে—'দারোগা স্থানীয় হাকিম, সদাসর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে, কোন রকমে তাঁদের অসন্তোষ না হয়—কারণ তাঁদের হাতেই সব।'—তাই কিঞ্চিৎ খাঁটি ঘি ভেট নিয়ে হুজুরের কাছে উপস্থিত হয়েছি।"

দারোগা সাহেবের মুখখানি হাস্যবিভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন—"বেশ বেশ—আপনার মনিব গোপীকান্তবাবু অতি উপযুক্ত লোক। তাঁর ব্যবহারে ভারি খুসী হলাম। তাঁকে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম বলবেন। ওরে কে আছিস রে—যা, ঘিয়ের ভাঁড়টা বাড়ীর মধ্যে দিয়ে আয়। নায়েববাবু, আপনার মাছ ধরার বাতিক আছে?"

গদাই বলিল, "বাতিক এক সময় খুবই ছিল। এখন নানা রকম কাযকর্ম্মের ভিড়ে মাছ ধরার সময় পাইনে। বয়সও হয়ে পড়েছে, আপনাদের বয়স যখন ছিল, তখন ও বাতিক খুবই ছিল। দিনে রেতে মাছ ধরতাম।"

দারোগা সাহেব গদাধরের অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মৃদু হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, 'লোকটা আমায় ছোকরা মনে করেছে—আমি যে খেজাব মেখে শাদা গোঁফ কালো করেছি তা ধরতে পারেনি।'—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার আর কি এমন বয়স হয়েছে! আমরা বোধ হয় একবয়সীই হব। তা চলুন, আমি মাছ ধরব, আপনি বসে দেখবেন। সেইখানেই কথাবার্ত্তা হবে।"

দীর্ঘিকার পশ্চিম পাড়ে, বৃক্ষের ছায়ায়, খানিকটা স্থান সমতল করিয়া কাটা ছিল। সেইখানে কম্বল বিছাইয়া দারোগা সাহেব মাছ ধরিতে বসিলেন। ভৃত্য ছিপ প্রভৃতি রাখিয়া, গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। ছিপ ফেলিয়া দারোগা সাহেব ধূমপান করিতে লাগিলেন। গদাধরকে একটা কলার ডাঁটা আনাইয়া দিলেন—মধ্যে মধ্যে কলিকা লইয়া গদাধরও ধূমপান করিতে লাগিল।

গোপীকান্তবাবুর জমিদারীর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ

দারোগা সাহেব বলিলেন, "আপনার মনিবকে বলবেন, যদি কোনও অবাধ্য প্রজাকে শাসন করবার—জব্দ করবার—দরকার হয়, তবে যেন আমাকে জানান।"

গদাধর বলিল, "তা জানাব বইকি। আপনারাই ত হলেন আমাদের ভরসা। আপনাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের কি এক পাও চলবার যো আছে?—একজন প্রজাকে জব্দ করা ভারি দরকার হয়ে পড়েছে। হুজুর নিজমুখেই যখন কথাটা পাড়লেন—তখন নিবেদন পাই। আমাদের এলাকায় সাজিয়াড়া বলে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে একটা প্রজা বাস করে—জেতে গয়লা। তার দেমাক্ যদি দেখেন! ছোটলোকের ছেলে দুকলম লেখা পড়া শিখেছে কিনা—ধরাকে সরাজ্ঞান করে।"

এই সময় দারোগা সাহেবের ছিপের ফাৎনা নড়িতে লাগিল। ইসারায় গদাধরকে চুপ করিতে বলিয়া, দারোগা ছিপের বাঁট মুঠা করিয়া ধরিলেন। ফাৎনাটি ডুবিবামাত্র, ছিপ সজোরে টানিয়া ফেলিলেন। শূন্য বঁড়শী উঠিয়া আসিল। "এঃ—পালিয়েছে"—বলিয়া দারোগা সাহেব বঁড়শীতে আবার টোপ গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছিপ আবার ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নামটা বললেন?"

"রমণচন্দ্র ঘোষ। সাজিয়াড়ার রমণচন্দ্র ঘোষ।"

"বেটা বড় পাজি নাকি?"

"মহা পাজি—মহা পাজি। স্ত্রীলোকঘটিত কোন ব্যাপার নিয়ে, বাবু তার উপর ভয়ানক চটেছেন। আমাকে বললেন—কোন গতিকে বেটাকে যদি একবার শ্রীঘর দেখাতে পার, তবে আমার মনের রাগ যায়। আমি বললাম—সে আর বিচিত্র কি হুজুর—কিছু টাকা খরচ করলেই তা হতে পারে। বলেন ত থানায় গিয়ে দারোগা মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি। বাবু বললেন, বেশ ত—যাও। দারোগা মশায়কে আমার নাম করে বোলো, যদি তিনি এ কাযটি উদ্ধার করতে পারেন, তবে তাঁকে পাণ খাবার জন্যে দুশো টাকা দেব। বরং এখন নগদ একশো নিয়ে যাও।"

দারোগা সাহেবের ফাৎনা আবার নড়িতে লাগিল—কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন, "টাকাটা এনেছেন নাকি?"

"না, সঙ্গে করে আনিনি—কাছারিতেই রয়েছে। হুজুরের সঙ্গে ত আলাপ

পরিচয় ছিল না। কি জানি আবার এ কথা পেড়ে শেষে নিজেই বিপদে পড়ে যাব! এক একজন অকালকুষ্মাণ্ড দারোগা আছেন কিনা—এ সবের মধ্যে থাকেন না—নিজেকে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বলে প্রচার করেন। তা এখন আলাপ পরিচয় হল—এখন সাহস পেলাম। টাকাটা বলেন ত কালই এনে হাজির করি।"

"হ্যাঁ, কাল নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার মনিবকে বলবেন, এ সব কায অত সস্তায় হয় না। একজন লোককে ফাঁসানো—দুঃসাহসের কায। সমস্ত সাক্ষী ঠিক থাকা চাই—ডেপুটি যদি সাজা করলে তার উপর জজ রয়েছে—তার উপর হাইকোর্ট বসে রয়েছে। কি জানেন—পুলিশের চাকরি সর্ব্বনেশে চাকরি। কখন কোন্ সূত্রে কি বিপদ ঘটে কিছু বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে—দুশো টাকার জন্যে অতটা ঝুঁকি মাথায় নিতে পারব না, বাবুকে বলবেন। যদি পাঁচশো টাকা খরচ করতে পারেন—তা হলে চেষ্টা করি।"

গদাই বলিল, "হুজুর যা বলেছেন, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। দুশো টাকাটা অত্যন্ত কম বইকি। তা, বাবুকে আমি বলেও ছিলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা যদি দুশোতে দারোগা সাহেব রাজি না হন, তবে আরও কিছু দেওয়া যাবে। বাবুকে আমি বলব এখন—যা বাড়াতে পারি। আপনার বাড়লেই ত আমার লাভ! আপনাদের এ দিকে কি রকম বন্দোবস্ত বলতে পারিনে, আমাদের ওদিকে, জমিদারের আমলারা শতকরা পঁচিশ টাকা করে কমিশন পায়।"

দারোগা সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "যদি আমায় পাঁচশো দেওয়াতে পারেন, তবে একশো আপনার। তার কম হলে শতকরা দশ টাকা করে পাবেন। আমাদের এ অঞ্চলে এই হারেই কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে।"

গদাই বলিল, "আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন কি উপায়ে বেটাকে ফাঁসানো যায় বলুন দেখি?"

দারোগা বলিলেন, "অনেক রকম উপায় আছে। তার বাড়ীটা দেখেছেন?"

"না।"

"তার বাড়ীটা দেখা দরকার। কোনও জিনিষ সুবিধে মত তার বাড়ীতে রেখে, তার পর খানাতল্লাসী করা। চোরাই মাল হোক্, বন্দুক হোক্, মদ চোয়ানোর সরঞ্জাম হোক্, মেকি টাকা তৈরি করবার যন্ত্র হোক্। কিম্বা—কারু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে—তাকে আসামী করা যেতে পারে, কিন্তু

তাতে, যার বাড়ী তাকে হাত করতে হয়। সে গ্রামে কে তার দুষমন আছে, সেটা সন্ধান করতে পারলে, তাকে হাত করা দরকার। আমার বিবেচনায়, তার বাড়ীতে কিছু রেখে খানাতল্লাসী করাই সব চেয়ে সুবিধা হবে।"

গদাই বলিল, "আপনি যেমন উপদেশ দেবেন, তাই করতে প্রস্তুত আছি।"

দারোগা সাহেব বলিলেন, "বেশ। তবে কাল ঐ একশো টাকাটা নিয়ে আসবেন। কাল নিরিবিলিতে বসে সব পরামর্শ করে ফেলা যাবে।"

"আসব। কাল এই সময় এলে দেখা পাব ত?"

"আমাদের কি জানেন, দারোগা মানুষ—কখন কোথায় খুন হয়—কোথায় ডাকাতি হয়—কোথায় কি হয়—কিছুই ত ঠিক নেই। খবর পেলেই বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে, আপাততঃ যতদূর বুঝছি—কাল সকালে থানাতেই থাকব।"

গদাধর তখন আদাব্ আরজ্ করিয়া বিদায় হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ কেনারামের বিপদ

পরদিন যথাসময়ে গিয়া গদাই পাল দারোগা সাহেবকে একশত টাকা দিল। দুইজনে নিভৃতে বসিয়া মৃদুস্বরে অনেক পরামর্শ হইল। অবশেষে রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার একটা পাকাপাকি মৎলব স্থির হইয়া গেল।

দারোগা সাহেব বলিলেন, "এ দিকের ত সমস্তই ঠিক হল—বাকী টাকাটা?"

গদাই বলিল, "আমার বাবু এখন বাড়ী নেই, কলকাতা গেছেন। তিনি এলেই ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচশো পুরো নাও হোক্, শ'চারেক টাকা দেওয়াতে পারব, এ ভরসা খুব আছে।"

"চেষ্টা করবেন যদি বাড়াতে পারেন।"

"আজ্ঞে হেঁহেঁ—সে আর বলতে হবে না। চেষ্টার ত্রুটি হবে না, দেখি কতদূর কি হয়।"

"বেশ। তা হলে, আজ সন্ধ্যেবেলা গিয়েই সে বিষয়টা ঠিক করুন। ব্যাটা রাজি হবে ত?"

"সে রাজি হবে, তার বাবা রাজি হবে, তার চৌদ্দপুরুষ রাজি হবে। সে

বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"—বলিয়া গদাই টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া দরিয়াপুর অভিমুখে রওনা হইল।

সন্ধ্যার পর কাছারিতে পৌঁছিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, গদাই হরিনামের মালা লইয়া জপে বসিল। ঝুলির ভিতর অঙ্গুলি নড়িতেছে, মালা খড় খড় করিতেছে, মুখেও মৃদুস্বরে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' যেন শুনা যাইতেছে—কিন্তু তাহার মনে নিম্নলিখিত প্রকারের ভাবতরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল—

'মনে করেছিলাম, বাবুর ও হাজার টাকা আমারই হল, কিন্তু ও থেকে চারশো টাকা বোধ হয় বের করতে হল। একশো ত আজ দিয়েই এলাম—আর তিনশো নেবে—না নিয়ে ছাড়বে না। তবে চল্লিশটে টাকা কমিশন বলে ফিরিয়ে পাব—তিনশো ষাট টাকা গেল। কিন্তু করি কি? টাকার মায়া করলে শত্রু দমন করা হয় না—শত্রু দমন করতে হলে টাকা চাই। তবে ও টাকাটা কোন কৌশলে বাবুর কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে। বাবু কোথায় যে গেলেন, এখনও ত কিছু জানতে পারলাম না। যেখানেই যান, চিঠি একখানা নিশ্চয়ই লিখবেন—খবরাখবরের জন্যে তাঁর প্রাণটি ধুক্‌পুক্‌ করছে। চিঠি একখানা পেলেই, টাকাটা আদায় করবার ফন্দি করতে পারি। রমণ ঘোষ! রমণ ঘোষ! যেদিন যতীনবাবু বলবেন সেদিনই নাকি তুমি গিয়ে আমার নামে জালের নালিশ করবে? নালিশ করাচ্ছি এবার—ভাল করে। তুমি নাকি আমায় জেলে দেবে? কে কাকে জেলে দেয় দেখাই যাক। এখন কেনারামকে ফরিয়াদী হতে রাজি করাতে পারলে হয়। ডেকে পাঠিয়েছি, এখনও ত এল না। এলে, ভয় দেখিয়ে কায হাঁসিল করতে হবে।'

গদাধর এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কেনারাম আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"নায়েব মশায় ডেকেছিলেন?"

গদাধর ইসারায় তাহাকে বসিতে বলিয়া, হরিনামের ঝুলিটি বক্ষের কাছে ধারণ করিয়া, চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইল। প্রায় তিন মিনিট কাল এইরূপ থাকিয়া, ঝুলিটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে করিতে, বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল। শেষে কেনারামের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ আবার থানায় গিয়েছিলাম।"

"থানায়? কি করতে?"

"দারোগা ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কেন নায়েব মশাই ?"

"বলছি। তাই বলতেই ত তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। বড় বিপদ !"

কেনারাম চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন ? কার ?"

"তোমার আমার দুজনেরই। বুঝি দুজনকেই জেলে যেতে হয়।"

কেনারামের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া বলিল—"কি সর্ব্বনাশ ! কি হয়েছে বলুন—বলুন।"

"আঃ—চেঁচাচ্চ কেন ? চুপি চুপি কথা কও। দেখ দেখি বাইরে কেউ আছে কিনা ?"

কেনারাম উঠিয়া দেখিয়া আসিল, বাহিরে কেহ নাই। গদাই তখন তাহাকে নিকটে বসাইয়া বলিল, "আজ বেলা তিনটের সময়ে ঘুমিয়ে উঠে, বসে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় থানা থেকে একজন লোক এসে বললে, দারোগা সাহেব এখনি আপনাকে ডাকছেন। ভাবলাম, দারোগা হঠাৎ ডেকে পাঠালে কেন ? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, ঘোড়া ছুটিয়ে থানায় গেলাম। গিয়ে দেখি, দারোগা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বসে আছে। একখানা ছোট জলচৌকির উপর শাদা কালো রঙের একটা মরা বেড়াল। আমাকে দেখেই কনেষ্টবলকে হুকুম দিলে বাঁধো শালাকো। দুটো কনেষ্টবল অমনি আমার হাত দুটো দড়ি দিয়ে কড়াক্কড় করে বেঁধে ফেললে। তখন দারোগা আমায় যাচ্ছেতাই করে গাল দিতে লাগল। আমি ত একেবারে অবাক—ভেবেই ঠিক করতে পারিনে ব্যাপারখানা কি। শেষে দারোগা বললে, 'তুমি আর একটু হলেই আমাদের সকলকে খুন করেছিলে।' আমি বললাম, 'সে কি হুজুর—এ কি কথা বলেন ?' দারোগা বললে, 'কাল যে ঘি দিয়ে গিয়েছিলে, তাতে বিষ ছিল—গোখুর সাপের বিষ। আমার বাবুর্চ্চি তাই দিয়ে আজ হালুয়া তৈরি করেছিল—হালুয়া নামিয়ে রেখে কোথায় কোন কাযে গিয়েছিল, এমন সময় ঐ বেড়ালটা এসে হালুয়া খেতে আরম্ভ করে। বাবুর্চ্চি এসে পড়ল—বেড়ালকে তাড়াতে গেল—কিন্তু বেড়াল পালাতে পারলে না। ম্যা—ও করে একবার ডেকে, ঘুরপাক দিতে লাগল। খানিক ঘুরপাক দিয়ে ধপাস করে পড়ে মরে গেল।—তারপর সেই হালুয়া আমরা কাগকে খেতে দিলাম, কাগ মরে গেল—কুকুরকে খেতে দিলাম, কুকুর মরে গেল—মুর্গিকে খেতে দিলাম, মুর্গি মরে গেল। তুমি আমাদের খুন করবার জন্যে এই বিষাক্ত ঘি দিয়ে গেছ—তিনশো সাত ধারায়

তোমার দশ বছর জেল হবে।'—এই কথা শুনে আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম—বললাম 'দোহাই খোদাবন্দ—আমার কিছু দোষ নেই—আমি টাকা দিয়ে ঘি কিনে এনেছি, আমি কি করে জানব যে বিষাক্ত ঘি ? দারোগা তখন জিজ্ঞাসা করলে—'ঘি কে এনে দিয়েছিল ?' আমি তোমার নাম করলাম।"

কেনারাম শুনিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কোন ক্রমে বলিল, "আমার নাম করে দিলেন ?"

"কি করব বাপু—'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' কথাই ত আছে জান। আর, কিছু মিথ্যে কথাও ত বলিনি। শুনে দারোগা বললে, 'তবে তুমি ও কেনারাম দুজনেই আসামী হলে। দুজনকেই চালান দেব।'—তখন আমি অনেক করে দারোগার হাতে পায়ে ধরলাম।—শেষে পাঁচশো টাকা কবুল করলাম।—তখন দারোগা বললে, 'আচ্ছা তোমায় খালাস দিচ্ছি, কিন্তু কেনারামকে ছাড়ব না।' তখন আমি আবার বলতে লাগলাম, 'আহা সে গরীব নির্দ্দোষী—পাঁচ জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ঘি নিয়ে এসেছে—কোথায় কোন্ গয়লার বাড়ীতে ঘিয়ে সাপে মুখ দিয়েছিল, সেই বা কেমন করে জানবে ? তাকেও খালাস দিতে আজ্ঞে হোক।' দারোগা কিছুতেই শোনে না। শেষে বললে, 'কেনারাম যদি আমার একটা কায করতে পারে, তবে তাকে মাফ্ করতে পারি।' আমি বললাম, 'হুজুর, যা হুকুম করবেন তাই সে করবে—তার বাপ করবে, তার চৌদ্দ পুরুষ করবে।' তখন দারোগা বললে, 'একটা গাঁয়ে আমার এক শত্রু আছে, তার নামে একটা চোরাই মাল রাখার মিথ্যে মোকর্দ্দমা করতে চাই, কেনারাম যদি ফরিয়াদী হয়, তবেই তাকে খালাস দিই—নইলে চালান করে দেব।' আমি বললাম, 'সে অবিশ্যি ফরিয়াদী হবে—আপনি যা বলবেন তাই করবে।' দারোগা বললে, 'আচ্ছা আমি যেদিন বলব, সেই দিন রাত্রে যেন সে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন গোপনে এনে আমায় দিয়ে যায়, আর বাড়ী গিয়ে নিজের শোবার ঘরে একটা সিঁধ কেটে রাখে, আর পরদিন সকালে এসে এজেহার লিখিয়ে যায়। সেই বাসন সেই শত্রুর বাড়ীতে রাখিয়ে আমি তাকে চোরাই মাল রাখার অপরাধে চালান করে দেব।' আমি বললাম, 'তা নিশ্চয়ই সে করবে, এ আর বিচিত্র কথা কি ?' দারোগা তখন আমার বাঁধন খুলে দিলে, বললে, 'যাও তাকে জিজ্ঞাসা করগে—সে রাজি হয় উত্তম, রাজি না হয়, তোমাকে তাকে দুজনকেই চালান করে দেব। আর সে যদি রাজি

হয়, আর তুমি পাঁচশো টাকা দাও, তবে দুজনকেই মাফ করতে পারি।'—এই অবস্থা—এখন কি বল ?"

কেনারাম কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, কর্ত্তা যা হুকুম করবেন সে কি আমি অমান্য করতে পারি ?"

"তা হলে ঐ কথা কাল গিয়ে দারোগাকে বলিগে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ—আর একটা কথা দারোগা বলে দিয়েছে। তোমার বাড়ীতে কিছু ভাঙ্গা ফুটো বাসন আছে ?"

"আছে বইকি। একখানা বক্‌নো আছে তার কাঁধাটা ভাঙ্গা, একটা ঘটী আছে তার পেটটা ফুটো।"

"বেশ। সেই বক্‌নো আর সেই ঘটী কালই কাঁসারি বাড়ী গিয়ে রাংঝাল দিয়ে মেরামত করিয়ে নাও। কালই—বুঝলে ? দেরী না হয়।"

"কেন নায়েব মশাই ?"

"আঃ, এইটে আর বুঝতে পারলে না ? এজেহার লেখবার সময় দারোগা তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, তোমার বাসনাদি সেনাক্ত করবার কিছু বিশেষ চিহ্ন আছে ? তুমি লিখিয়ে দেবে আজ্ঞে হ্যাঁ—বক্‌নোটার কাঁধা আর ঘটীটার পেট শ্রীঅমুক কাঁসারির দ্বারা সম্প্রতি রাংঝাল প্রদানে মেরামৎ করাইয়াছিলাম। তার পর, সেই লোকের বাড়ী থেকে যখন ঐ সব বাসন বেরুবে—তুমি ঐ চিহ্ন দেখে সেনাক্ত করবে, আদালতে ঐ চিহ্ন দেখাবে, কাঁসারিও গিয়ে সাক্ষী দেবে, 'হ্যাঁ, এই বক্‌নো এই ঘটী আমি মেরামৎ করেছিলাম—এই চিহ্ন রয়েছে।' দুই একটা বাসনে ও রকম চিহ্ন না থাকলে সেনাক্ত হবে কি করে ? এক রকমের ঘটী এক রকমের বক্‌নো পাঁচশো আছে। এখন বুঝলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হলে কালই আমি কাঁসারিবাড়ী গিয়ে ও দুটো মেরামৎ করিয়ে নিই। আপনি দারোগাকে গিয়ে বলুন, তিনি যা বলবেন, তাতেই এ গোলাম রাজি আছে।"—বলিয়া কেনারাম, গদাইপালের পদদ্বয় ধারণ করিয়া ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম

ষ্টীমার যখন হুগলিতে পৌঁছিল, তখন বেলা এগারোটা। গোপীকান্তবাবু ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘাটে অবতরণ করিলেন।

গোপীকান্তবাবু বলিলেন, "ঠাকুর কি এখন শিষ্যবাড়ী যাবেন ?—তা যদি না হয় তবে সোজাসুজি ষ্টেশনে গেলে একটার প্যাসেঞ্জার ধরা যেত।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তারা—তারা—তারা। একটার প্যাসেঞ্জার ? একটার প্যাসেঞ্জারে কেমন করে যাওয়া হতে পারে ? এখনও ঠাকুরসেবা হল না। রন্ধনাদি করা আবশ্যক। তার উপযুক্ত স্থানও ত এখানে দেখছিনে।"

গোপীবাবু বলিলেন, "তবে ঠাকুর শিষ্যবাড়ী গমন করুন। ঠাকুরসেবা প্রভৃতি সেরে আসবেন, না হয় সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া যাবে।"

"আর তুমি ?"

"আমি এইখানে স্নানটা করে নিয়ে, ময়রার দোকানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করব। বৈকালে আপনি ষ্টেশনে যাবেন, সেইখানেই আমি থাকব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন, এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ যুক্তিসঙ্গত নহে—বিশেষ যখন ভক্তটি অর্থশালী। তাঁহার স্থানীয় শিষ্যটিও অর্থশালী বটে—কিন্তু বড় কৃপণ। সেখানে টাকাটা সিকিটার লোভে গিয়া শেষে কি এমন শিকারটা হাতছাড়া হইয়া যাইবে ? তাই ঠাকুর বলিলেন, "না না, সে কি হয় ? তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমার শিষ্যটি অতি সজ্জন ব্যক্তি। আমার সঙ্গে গেলে তোমায় যথেষ্ট আদর করবে।"

গোপীকান্তবাবুর ইচ্ছা নয় যে তিনি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া উঠেন। সেখানে কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, কে চিনিয়া ফেলিবে, তাহার স্থিরতা কি ? আর কোন ওজর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "আমাকে সে আজ্ঞা করবেন না। আমি পরান্ন গ্রহণ করিনে।"

"তাতে দোষ কি ? শাস্ত্রে আছে, প্রবাসে নিয়মং নাস্তি।"

"আজ্ঞে না, এইখানেই লুচি সন্দেশ খেয়ে নেব এখন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "বাসি লুচি সন্দেশ খেয়ে কেন কষ্ট করবে ? দিন সময়ও ভাল নয়। বাসি লুচিং চ সন্দেশং অম্লোদ্গারঞ্চ কারয়েৎ।"

কিন্তু গোপীকান্তবাবু তথাপি সম্মত হন না। অবশেষে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক্—আমারও যাওয়া হল না। এইখানেই কোথাও

পাকাদির বন্দোবস্ত করা যাক। নিজেরা না হয় একবেলা আহার নাই করতাম, কিন্তু সঙ্গে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁকে ত উপবাসী রাখতে পারিনে! এখন একটু স্থান কোথায় পাওয়া যায়?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একজন বৃদ্ধ, গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া, সিক্তবস্ত্রে সেইখানে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের শেষ কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, প্রণাম হই। যদি দয়া করেন, এ অধমের কুটীরে আসুন, আমি আপনাদের পাকাদির জন্যে উত্তম স্থান দিতে পারি।"

সন্ন্যাসী প্রসন্ন দৃষ্টিতে বলিলেন, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীমাধবচন্দ্র দাস ঘোষ।"

"কোথায় থাকেন?"

"অতি নিকটেই। ঐ গঙ্গাতীরে আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

"কি করেন?"

"আজ্ঞে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এখানে ওকালতী ব্যবসা করে।"

"আপনার ছেলে উকীল?—বেশ বেশ। কি বল হে?"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গোপীবাবুর পানে চাহিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন, "তা, উনি যখন স্থান দিতে চাচ্ছেন—ভালই হল।"

বৃদ্ধটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নাম কি?"

"শ্রীরাধামোহন গোস্বামী।"

"ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই। আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আসতে আজ্ঞে হোক।"

গোপীবাবু বলিলেন, "স্নানটা এইখান থেকেই সেরে যাই। আপনি ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?—আপনি অগ্রসর হোন। বাড়ী ত দেখা যাচ্ছে—স্নান করে আমরা আসছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "উত্তম কথা। আমি ততক্ষণ ওদিককার সব যোগাড় যন্ত্র করে রাখিগে।"—বলিয়া হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "আসবেন তা হলে। আশা দিয়ে নৈরাশ করবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমরা স্নান করেই আসছি।"

বৃদ্ধ তখন ক্ষিপ্রপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গোপীবাবু বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি প্রথমে স্নান করে নিন, আমি জিনিষ আগলাই।"

"বেশ।"—বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নানে নামিলেন।

গোপীবাবু তখন গঙ্গার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া, রুমালে বাঁধা একতাড়া নোট বাহির করিয়া লইলেন। তাড়াটি নিজের পেট কাপড়ে বাঁধিয়া, জামার পকেট হইতে খুচরা টাকাকড়ি প্রভৃতি ব্যাগের মধ্যে ফেলিয়া একখানি ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া লইলেন। স্নান করিতে করিতে সন্ন্যাসী ঠাকুর এ সমস্ত ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর স্নান করিয়া উঠিলে, গোপীবাবু জলে নামিলেন। স্নানান্তে উঠিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, সিক্ত বস্ত্র হইতে বাণ্ডিলটি কৌশলে খুলিয়া আবার ব্যাগে নিক্ষেপ করিলেন। এটুকুও সন্ন্যাসী ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াইল না।

তখন দুইজনে মাধববাবুর গৃহ লক্ষ্য করিয়া পদচালনা করিলেন। মাধববাবু বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। বারান্দার প্রান্তে দুইখানি জলচৌকি রাখা ছিল। আদর অভ্যর্থনা করিয়া তিনি অভ্যাগতদ্বয়কে সেই জলচৌকিতে বসাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদ স্বয়ং ধৌত করাইয়া দিলেন। একজন ভৃত্য গোপীকান্তবাবুর পদ ধৌত করিয়া দিল।

বৈঠকখানার পশ্চাতের বারান্দায় একখানি কম্বল বিছান ছিল। এক কোণে নূতন ইষ্টক সাজাইয়া চুল্লী প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাষ্ঠ, নূতন হাঁড়ি, মালসা, একটা পিতলের ঘড়ায় গঙ্গাজল প্রভৃতিও সজ্জিত ছিল। বাটীর ব্রাহ্মণ ঠাকুর দুইটা বৃহৎ থালা করিয়া সিধা আনিয়া উপস্থিত করিল।

গোপীবাবু বলিলেন, "আবার এ সব কেন? বাজার ত নিকটেই—আমি সব কিনে কেটে আনছি।"

মাধববাবু বলিলেন, "তাও কি হয়? যখন দয়া করে এ অধমের কুটীরে আতিথ্য স্বীকার করেছেন, নিজের খরচ করে খাবেন তা কি হতে পারে?"

গোপীবাবু বলিলেন, "আপনি আমাদের স্থান দিয়েই যথেষ্ট উপকার করেছেন—আপনাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিনে। সঙ্গে টাকাকড়ি রয়েছে, যাই বাজারে গিয়ে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনে একটা ঝাঁকা মুটে করে নিয়ে আসি।"—বলিয়া গোপীকান্তবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "না না, এমন আজ্ঞা করবেন না। আমার অনেক পুণ্য

ছিল, তাই ঠাকুরের মত সাধুপুরুষ আর আপনার মত একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়েছে। যদি এ গরীবের সেবা গ্রহণ না করেন, তা হলে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হব।"—বলিয়া বৃদ্ধ হাত দুইটি যোড় করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ওহে রাধামোহন, আর আপত্তি কোরো না। শাস্ত্রে আছে—'মনঃক্ষুণ্ণং ন কর্ত্তব্যো ভক্তেষু সেবকেষু চ।' ভক্ত আর সেবককে মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই। আর, উনি ত আমাদের দিচ্ছেন না—উনি দিচ্ছেন আমার ইষ্টদেবতাকে। তাঁর ভোগ হবে, তার পর সেই প্রসাদ আমরা পাব।"

গোপীকান্তবাবু আর আপত্তি করিলেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বহস্তে ভোগ রাঁধিলেন। ঠাকুর সেবা হইলে, উভয়ে প্রসাদ পাইলেন। মাধববাবু তখন উভয়ের জন্য বৈঠকখানায় চৌকির উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, ইঁহাদের অনুমতি হইয়া আহার ও বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী শয্যায় বসিয়া বলিলেন, "তারা মা'র কি অনুগ্রহ! যেখানে যাই—কোন কষ্ট হয় না। ভাবছিলাম, পথে আজ আহার জোটে কি না জোটে, তা মা ভাল রকমই জুটিয়ে দিলেন। একছিলিম সাজ।"

গোপীবাবু গাঁজা সাজিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে দিলেন। পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া, শয়ন করিলেন। পথশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন। ঘুমে তাঁহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিযা উঠিলেন, "তারা—তারা—তারা। আজ একটার প্যাসেঞ্জারে গেলে বড়ই কষ্ট পেতে হত। দেওঘর অতি সুন্দর স্থান—পবিত্র স্থান। দেবগৃহ—দেবতাদের আবাস। বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলে সেখানে থেকে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। তারা—তারা—তারা। আচ্ছা রাধামোহন, সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারে উঠলে ক'টার সময় আমরা সেখানে পৌঁছব?"

কোনও উত্তর নাই।

"রাধামোহন—ও রাধামোহন!"

'রাধামোহন' তখন নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। ক্রমে গোপীকান্তবাবুর নাসিকাধ্বনি গভীরতর হইল। তান-লয়ের সহিত যেন বাদ্য বাজিতেছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোথাও নাই। ভৃত্যেরাও নিদ্রিত। ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া, গোপীকান্তবাবুর ব্যাগটি প্রান্ত হইতে প্রান্ত অবধি নিমেষের মধ্যে চিরিয়া ফেলিলেন। ভিজা রুমালে বাঁধা তাড়াটি এবং খুচরা টাকাপয়সা যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বাহির করিয়া নিজের ঝুলির মধ্যে ভরিলেন। ব্যাগের কাটা দিকটা দেওয়ালের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ॥ অতিথি দেবতা

বেলা চারিটার পর উকীলবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বৈঠকখানার গৃহে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক নিদ্রা যাইতেছেন। উকীলবাবুর পিতাও সেই সময় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। উকীলবাবুর নাম দেবেন্দ্রনাথ। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

"একটি ব্রাহ্মণ—অতিথি।"

"কোথা থেকে এলেন?"

"যশোর জেলায় বাড়ী। ইনি, আর একজন সন্ন্যাসী, দুজনে ষ্টীমার থেকে নেমেছিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায় গেলেন, কই দেখতে পাচ্ছিনে ত।"

ইঁহাদের কথোপকথনের শব্দে গোপীকান্তবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া উকীলবাবুটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

"কি রাধামোহনবাবু, নিদ্রাভঙ্গ হল?"—বলিয়া বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—বলিয়া গোপীকান্তবাবু উঠিয়া বসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর কই?"

গোপীকান্তবাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা গেলেন? এইখানেই ত শুয়ে ছিলেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাই ত! ঠাকুর কোথায় গেলেন? কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

"আমাদের যে সন্ধ্যার গাড়ীতে যেতে হবে। ক'টা বাজল?"—বলিয়া গোপীকান্ত ঘড়ি দেখিবার জন্য ব্যাগটি সরাইয়া লইলেন।

ব্যাগ কাটা দেখিয়া গোপীকান্তবাবু চমকিয়া বলিলেন, "এ কি!—আমার ব্যাগ কাটলে কে?"

বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র ঝুঁকিয়া ব্যাগটি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত!—এ কি হল?"

গোপীবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাগ হইতে সমস্ত দ্রব্য টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। কাপড়, জামা, গেঞ্জি, তোয়ালে—দুই হস্তে পাগলের মত ঝাড়া দিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

"কি গেছে?"

"যা কিছু ছিল—যথাসর্ব্বস্ব।"

উকীলবাবু বলিলেন, "কি ছিল?"

"নোট ছিল। খুচরো কিছু ছিল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কত টাকার নোট?"

"ছিল যৎসামান্য। তীর্থ করতে বেরিয়েছিলাম—খুব তীর্থ হল! এমন একটা পয়সা নেই যে একখানা পোষ্টকার্ড কিনে বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনাই।"

সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে গৃহস্বামী বলিলেন, "সে সন্ন্যাসীটি কে?"

"তা ত জানিনে মশাই। ষ্টীমারেই তার সঙ্গে দেখা। সেও বললে আমি নানা তীর্থ ভ্রমণ করব। মনে করলাম আমি নতুন মানুষ, কখনও বেরুইনি—লোকটাও সাধু পুরুষ, তাই তার সঙ্গ নিয়েছিলাম। সেই কি শেষে আমায় এ বিপদে ফেললে?"

উকীলবাবু বলিলেন, "নিশ্চয় তারই কায।"

বৃদ্ধের তাহা বিশ্বাস হইল না। বলিলেন—"না না, তিনি কখনও নেন নি। তিনি বোধ হয় কাছেই কোথাও বেড়াতে টেড়াতে গিয়েছেন। এখনি আসবেন। ঘর খোলা দেখে কোনও চোর এসে এ কায করেছে।"—বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের অন্বেষণে বাহিরে গেলেন।

উকীলবাবু বলিলেন, "বাবা যাই বলুন—সেই সন্ন্যাসীরই এ কায। বাবা যেমন ভালমানুষ—মাথায় জটা পরণে গেরুয়া কাপড় দেখলেই তাকে একজন সিদ্ধ পুরুষ বলে ঠাউরে নেন। সন্ন্যাসীর কোনও জিনিষ ত এখানে দেখছিনে।"

"তার মস্ত একটা ঝুলি ছিল, একখানা বাঘছাল ছিল, একটা চিমটে ছিল, কমণ্ডলু ছিল। যদি কাছে কোথাও বেড়াতে যেত, সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে যেত না। সট্‌কেছে।"—বলিয়া গোপীবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উকীলবাবু বলিলেন, "তা আপনি অত ভাবছেন কেন? বাড়ীতে চিঠি লিখে টাকা আনিয়ে নিন—যতদিন টাকা না আসে ততদিন এইখানে স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমি আপনাকে খাম পোষ্টকার্ড সব দিচ্ছি।"

গোপীবাবু কোন কথাই কহিলেন না। উকীলবাবু বলিলেন, "পুলিসেও একটা খবর দেওয়া উচিত। নম্বরী নোট ছিল কি?"

"আজ্ঞে না। দশ টাকার নোট ছিল মাত্র। যা হবার তা ত হল। এখন থানা পুলিসে খবর দিলে মহা ফেসাদে পড়ে যাব।"

ইতিমধ্যে বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—"কই, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ত কোথাও দেখতে পেলাম না।"

পুত্র বলিলেন, "তিনি এতক্ষণ অনেক দূরে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আসবেন বোধ হয়। কোনও মন্দিরে দর্শন টর্শন করতে গিয়ে থাকবেন।"

"না বাবা, দর্শন করতে যান নি। দর্শন করতে গেলে তাঁর ঝুলি চিম্‌টে বাঘছাল সব নিয়ে যাবেন কেন?"

বৃদ্ধ তখন আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

সে রাত্রি গোপীকান্তবাবু সেইখানেই যাপন করিলেন। পরদিন উকীলবাবুকে বলিলেন, "আমার এই ঘড়িটের দাম ৫০৲—এটা বন্ধক রেখে আমায় গোটা দশেক টাকা ধার দিন। আপনারা আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। কতদিনে আমার বাড়ী থেকে টাকা আসবে, ততদিন পর্য্যন্ত এখানে থেকে, আপনাদের ওপর জুলুম করা আমার উচিত হবে না।"

উকীলবাবু ও তাঁহার পিতা এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন—"একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে যদি আমরা দুদিন দু মুঠো খেতে দিতেই না পারলাম, তবে আমাদের সংসার ধর্ম্ম করে ফল কি? ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে না, আপনার হাত খরচের জন্যে যা দরকার দিচ্ছি, এইখানেই থাকুন। আপনার টাকা এলে তখন পরিশোধ করে দেবেন।"

ইঁহাদের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে গোপীকান্তবাবু অগত্যা সম্মত হইলেন। সেইদিনই গদাই পালকে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন :—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত গদাধরচন্দ্র পাল পত্রদ্বারায় আমার বহু বহু আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এখানে অবস্থান করিতেছি। আমার ব্যাগ হইতে টাকা কড়ি সমস্তই চুরি হইয়া যাওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছি। সত্বর তহবিল হইতে একশত টাকা মনিঅর্ডার যোগে আমার নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। ওখানকার সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং ফেরৎ ডাকে উত্তর দিতে ভুলিবে না। অত্র কুশল। তোমাদের মঙ্গল নিয়ত ৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি। ইতি তারিখ ২৯শে কার্ত্তিক।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরাধামোহন গোস্বামী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ উকীল বাবুর বাটী, হুগলি।

চারিদিন পরে পত্রের উত্তর আসিল। গদাই পত্র মধ্যে দুইখানি মাত্র দশ টাকার নোট পাঠাইয়াছে। লিখিয়াছে, গোপীকান্তবাবুর কমলপুর ত্যাগের পর দিন প্রত্যুষেই গদাই থানায় গিযাছিল। গিয়া দেখে, রমণ ঘোষ সেই স্ত্রীলোকটাকে সঙ্গে লইয়া, নালিশ করিবার জন্য বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। গদাই তখন তাড়াতাড়ি দারোগার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে নগদ ৫০০৲, হেড কনেষ্টবলকে ১০০৲, রাইটার কনেষ্টবলকে ৫০৲ এবং অপরাপর কনেষ্টবলগণকে ৫০৲ একুনে ৭০০৲ দিয়া, সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। দারোগা এজেহার না লইয়া, তাহাদিগকে মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করার অপরাধে চালান দেওয়ার ভয় দেখাইয়া, থানা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু অদ্য এই মাত্র গদাই সংবাদ পাইল রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে লইয়া সদরে ম্যাজেষ্টার সাহেবের নিকট নালিশ করিতে গিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে উপযুক্ত তদ্বির করিবার জন্য এখনি গদাইকে খুলনা যাত্রা করিতে হইবে—পাল্কী প্রস্তুত। 'হুজুরের' হাজার টাকার মধ্যে ৩০০৲ মাত্র আছে। তহবিল হইতে আর ২০০৲ একুনে ৫০০৲ লইয়া গদাই খুলনা যাইতেছে। তহবিলে আর টাকা না থাকা বিধায় অত্র পত্র মধ্যে ২০৲ মাত্র গদাই পাঠাইল। খুলনায় যেরূপ হয়

সেইখান হইতেই সংবাদ লিখিবে। 'হুজুরের' আপাততঃ দেশে আসার আবশ্যকতা নাই, কারণ খুলনা হইতে 'ওয়ারিন' বাহির হইতে পারে।

এই পত্র পাঠ করিয়া গোপীবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল।

মাধববাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর খবর ভাল ত?"

বিকৃত স্বরে গোপীকান্তবাবু উত্তর করিলেন, "খবর ভাল, কিন্তু ছেলে লিখেছে টাকাকড়ি এখন কিছুই হাতে নেই, শীগগির টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা বেশ ত, দিনকতক এখানে থাকুনই না। টাকা এলে তখন বাড়ী যাবেন।"

গোপীবাবু বলিলেন, "কাযেই তাই হল। কিন্তু আপনাদের উপর আর অত্যাচার করতে মন সরছে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "রাধামোহনবাবু, ও কথাটি বলবেন না। আপনি অতিথি—দেবতা। তার উপর আবার ব্রাহ্মণ। দিনকতক আপনার সেবা করতে পাব—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, দেবতা ব্রাহ্মণে যেন আমার ভক্তি থাকে; তাঁদের দুমুঠো প্রসাদ যেন ছেলেপিলে নিয়ে খেতে পাই।"

গোপীবাবু গদাই পালের দ্বিতীয় পত্রের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ গদাই পালের পত্র

একদিন যায়—দুইদিন যায়—তিনদিন যায়, তবু খুলনা হইতে প্রত্যাশিত পত্র আসে না। গোপীকান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। কি হইল? গদাই কি করিল? ওয়ারেণ্ট বাহির হইল নাকি? এইসকল চিন্তা গোপীবাবুকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ডাকপিয়ন আসিবার সময় তিনি রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যতদুর দৃষ্টি চলে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন।

সঙ্গে টাকা যাহা আছে তাহা এত অল্প যে সাহস করিয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। তাহাও প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সম্পূর্ণ

অনাত্মীয় অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুইবেলা অন্নধ্বংস করিতে তাঁহার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। তাই টাকা আসিবার পরদিন প্রভাতে, বেড়াইতে যাইবার ছল করিয়া তিনি বাজারে গেলেন এবং একটা পাঁচ ছয় সের পরিমাণ রুইমাছ কিনিয়া, মুটিয়ার মাথায় দিয়া লইয়া আসিলেন।

বৃদ্ধ গৃহস্বামী মাছ দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কেন মাছ কিনে আনলেন ?"

"মাছটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেল—আর, একেবারে টাটকা, দেখুন না এখনও ধড়ফড় করছে। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না, কিনে ফেললাম।"

"তা বেশ করেছেন, কিন্তু দামটা আপনাকে নিতে হচ্ছে। কত দাম লেগেছে বলুন।"

গোপীবাবু বলিলেন, "দাম অতি যৎসামান্য। সে আর আপনাকে দিতে হবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি কথা! আপনি অতিথি—অভ্যাগত। নিজের পয়সা খরচ করে আপনি আনবেন কেন ?"

গোপীবাবুও দাম বলিবেন না, বৃদ্ধও ছাড়িবেন না। শেষে বৃদ্ধ রাগ করিতে লাগিলেন।

গোপীবাবু তখন হাসিয়া বলিলেন, "এই ত ঘোষজা মশাই!—আপনার ত ভেদবুদ্ধি গেল না! এই মাছটি যদি আপনার ছেলে দেবেনবাবু কিনে আনতেন, তা হলে মাছ দেখে আপনি কত আহ্লাদ করতেন। আমি কিনে এনেছি বলে রাগ করছেন কেন ?"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"অন্যায় করেছেন কিন্তু। আচ্ছা, এর সাজা আপনাকে দেওয়াচ্ছি। মুড়োটা আপনাকেই খেতে হবে।"

পরদিন আবার গোপীকান্তবাবু বাজারে গিয়া এক টুকরী নূতন পাটনাই কপি কিনিয়া আনিলেন। তৎপর দিন দেবেন্দ্রবাবুর পুত্রটিকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন, ফিরিবার সময় বালক একটা টানা বাজনা হাতে করিয়া বাড়ী আসিল, এবং বাজনা বাজাইয়া বাজাইয়া বাড়ীর লোকের কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠ দিন অপরাহ্ণকালে বৈঠকখানায় বসিয়া গোপীকান্তবাবু ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি রেজিষ্টারি

চিঠি দিল। সেই মাত্র চারিটা বাজিয়াছে—উকীলবাবু তখনও কাছারী হইতে ফেরেন নাই। বৈঠকখানায় আর কেহ ছিল না। দুরু দুরু হৃদয়ে গোপীকান্ত-বাবু পত্র খুলিলেন। একখানি একশত টাকার নোট তাহা হইতে বাহির হইল। গদাই পাল একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে। সেই পত্রখানি আধুনিক ভাষা ও বানানে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নে তাহার একটি নকল দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় আশ্রিতজন-প্রতিপালকেষু। পত্র দ্বারায় ভৃত্যের বহু বহু প্রণাম জানিবেন। পরে মহাশয়কে শেষ পত্র লিখনান্তে আমি মোকাম খুলনা যাত্রা করি। তথায় গিয়া জনৈক মোক্তারের মুহুরির প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম, সেই দিবসই রমণ ঘোষ গঙ্গামণিকে লইয়া, নালিস করিবার জন্য কাছারিতে গিয়া ক্ষুদিরাম মজুমদারকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিল। নালিসী দরখাস্ত মোক্তার-লাইব্রেরির বারান্দায় বসিয়া লেখা হইতেছিল কিন্তু নালিস দায়ের হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার ফল কি হইয়াছে তাহা সে ব্যক্তি কিছুই বলিতে পারিল না। ইহা শুনিয়া আমি গভীর রাত্রে উক্ত মোক্তারের বাসায় গিয়া তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইলাম। ক্ষুদিরাম বলিলেন, 'আমায় কি করিতে বলেন?' আমি বলিলাম, 'বেশী কিছুই নয়, মোকর্দ্দমাটা যাহাতে ফাঁসিয়া যায় ইহাই আপনাকে করিতে হইবে।' তিনি বলিলেন, 'কথাটা বড় বিপজ্জনক—শেষে নিজে কি ফেসাদে পড়িয়া যাইব?' বহুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর তিনি বলিলেন, 'আমায় যদি হাজার টাকা দিতে পারেন তবে আমি মোকর্দ্দমাটা ডিসমিস করাইয়া দিব।' অনেক কসামাজা দরদস্তুরের পর পাঁচশত টাকায় ঠিক হইল—তাহার ২৫০৲ তখনি দাখিল করিলাম এবং বক্রী টাকা কার্য্য উদ্ধার হইলে দিব বলিলাম। ক্ষুদিরাম মোক্তার তখন বলিলেন, 'অদ্য কাছারিতে উহারা আসিয়া যখন আমায় নিযুক্ত করিল, বেলা তখন পৌনে বারোটা, ফৌজদারী দরখাস্তের ডাক হইয়া গিয়াছে। দরখাস্ত লইয়া যখন আমি এজলাসে গেলাম তখন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কারণে হাকিম দরখাস্ত লইলেন না। কল্য ইহা দাখিল হইবার কথা।' ইহা শুনিয়া আমি মূল দরখাস্তখানা চাহিয়া লইয়া পড়িলাম। তাহাতে সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে লেখা আছে। রমণ ঘোষ সে স্ত্রীলোকটাকে গভীর রাত্রে

বাগানবাড়ীর তালা ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিয়াছে লেখা আছে, কিন্তু ছোটবাবু মহাশয়ের কোনও উল্লেখ নাই। সাক্ষীর তালিকাতেও তাঁহার নাম নাই। সম্ভবতঃ তিনি লোকলজ্জা ভয়ে ভ্রাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় রমণ ঘোষ তাঁহার কথা চাপিয়া গিয়াছে। দরখাস্ত পড়িয়া আমি নিজহস্তে সেখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মোক্তারকে বলিলাম, 'অন্য একখানি দরখাস্ত এরূপ লিখুন যে পড়িবামাত্র হাকিম ডিসমিস করিয়া দেয়। কল্য কৌশলে সেই দরখাস্তে বাদিনীর বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি লইয়া দাখিল করিয়া দিবেন।' মোক্তার বলিল, 'সে জন্য চিন্তা নাই। অদ্য কাছারিতে দুইখানা কার্ত্তিজ কাগজে বাদিনীর টিপসহি লইয়াছিলাম। এক-খানাতেই দরখাস্ত সংকুলন হইয়া গেল বলিয়া দ্বিতীয়খানা আবশ্যক হয় নাই। সেইখানায় দরখাস্ত লিখিতে পারি। কিন্তু কি লেখা যায়?' তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া এই প্রকার দরখাস্ত লেখা হইল—

'আমার নাম শ্রীমত্যা গঙ্গামণি বেওয়া। আমার নালিস এই যে আমি কমলপুরের জমিদার বাবু গোপীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কয়েক মাস যাবৎ চাকরি করি। বাবু মহাশয় অতি উগ্র প্রকৃতির লোক এবং আমার সহিত সর্ব্বদা অসদ্ব্যবহার করিতেন। বাবুর কামিজের সোণার বোতাম চুরি যাওয়াতে আমাকে অন্যায়রূপে সন্দেহ করেন এবং থানায় দিবার ভয় দেখান। এ কারণ আমি চাকরিতে জবাব দিয়া প্রাপ্য বেতন চাহি। কিন্তু বাবু মহাশয় আমায় বেতন না দিয়া গালাগালি করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। চারি মাসের বেতন নগদ ৩৲ হিসাবে মবলগে ১২৲ আমার পাওনা আছে। আমি থানায় নালিস করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু দারোগা আমার নালিস লয় নাই। অতএব প্রার্থনা বে-আইনি ভাবে ভয়প্রদর্শন ও গালি দেওয়া অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৬ এবং ৫০৪ ধারা অনুসারে সমন বা ওয়ারেণ্ট যোগে আসামী তলব করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।'

অতঃপর মোক্তারবাবু বলিলেন, 'এমন দুই তিনজন সাক্ষীর নাম লেখাইয়া দিন যে যদিও বা প্রমাণ তলব হয় তবে সেই সাক্ষিগণ আপনার প্রভুর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।' আমি মহাশয়ের দুইজন ভৃত্য ও একজন দাসীর নাম লেখাইয়া দিলাম। মোক্তারবাবু বলিলেন, 'কল্য এই দরখাস্ত দাখিল করিয়া স্ত্রীলোকটার হলফান্ জবানবন্দী করাইতে হইবে। কিন্তু আমি

এরূপভাবে প্রশ্ন করিব যে আসল কথা কিছুই প্রকাশ হইবে না এবং মোকর্দ্দমা সদ্য ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যাইবে।'

পরদিন আমি ছদ্মবেশে আদালতে উপস্থিত হইলাম। দরখাস্ত পেশ হইলে গঙ্গামণি সাক্ষীমঞ্চে উঠিল। মোক্তারবাবু এইরূপ সওয়াল করিতে লাগিলেন—

প্রশ্ন। কার নামে নালিস করিস?

উত্তর। গোপীবাবুর নামে।

প্র। গোপীবাবু কে? কোথাকার গোপীবাবু?

উ। কমলপুরের জমিদার গোপীকান্ত বাঁড়ুয্যে।

প্র। কতদিন তাঁর বাড়ীতে ছিলি?

উ। তিন চার মাস।

প্র। তোর সঙ্গে বাবু কি রকম ব্যাভার করতেন?

উ। খারাপ।

প্র। টাকা দিয়েছিলেন?

উ। না।

প্র। কবে সে বাড়ী থেকে চলে এলি?

উ। কালীপুজোর রাত্রে।

প্র। কার সঙ্গে এলি?

উ। রমণ ঘোষ। সম্পর্কে আমার দেওর হয়।

প্র। থানায় গিয়েছিলি?

উ। হ্যাঁ।

প্র। দারোগা কি বললে?

উ। বললে তুই মিথ্যে নালিস করতে এসেছিস, তোকেই জেলে দেব।

প্র। তোর নালিস সত্যি না মিথ্যে?

উ। সত্যি।

প্র। এই দেখ্‌ দরখাস্ত। বুড়ো আঙ্গুলের এ টিপসহি তোর?

উ। হ্যাঁ।

জবানবন্দি শেষ হইলে হাকিম দরখাস্ত পড়িয়া মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন। বলিলেন—ফৌজদারীতে এ মোকর্দ্দমা চলিবে না—ইচ্ছা হয় ত দেওয়ানী করিতে পার।

আমি ভাবিলাম আপদ চুকিয়া গেল। কিন্তু রমণ ঘোষ বাহিরে আসিয়া মোক্তারবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। বলিল—'আসল কথা আপনি কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।' মোক্তার বলিলেন, 'আসল কথা সকলই দরখাস্তে লেখা রহিয়াছে।' তাঁহার ব্যবহারে রমণ ঘোষ সন্দিগ্ধ হইয়া অন্য মোক্তার নিযুক্ত করিয়া নকলাদি লইল। নকল পড়িয়া ক্ষুদিরাম মোক্তারের চাতুরী সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। পরদিন মোক্তারের বিরুদ্ধে এফিডেবিট করিয়া নূতন মোকর্দ্দমা দায়ের করিবার জন্য সকল মোক্তারের নিকট গিয়াছিল কিন্তু সকলেই বলিয়াছে, জান ত হে বাপু, কাকের মাংস কাকে খায় না। আমরা একজন মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিতে পারিব না।—পরে রমণ ঘোষ ছোট বড় অনেক উকীলের কাছেই যায় কিন্তু প্রত্যেক উকীলই বলিয়াছে, দেখ বাপু, মোক্তারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিলে সকল মোক্তার আমার উপর চটিয়া যাইবে, তাহাতে আমার ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি।—অবশেষে একজন নূতন উকীল এই সর্ত্তে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছে যে দরখাস্তে কেবল মাত্র লেখা হইবে যে প্রথম দিন ভুলক্রমে ওরূপ দরখাস্ত পড়িযাছিল, প্রকৃত ঘটনা এই এই; মোক্তারের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা বা বলা হইবে না। পরদিন সেই দরখাস্ত পড়িলে হাকিম প্রমাণ তলব করিয়াছেন। সাক্ষিগণের জবানবন্দি লইয়া যদি মোকর্দ্দমা সত্য বলিয়া হাকিমের বিশ্বাস হয়, তবেই আসামীর উপর সমন হইবে নচেৎ, মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে। আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ শুনানির দিন ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং এখনও দশদিন বাকী। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, এ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, রমণ ঘোষকে প্রথমে সরান আবশ্যক। সে-ই মোকর্দ্দমার একমাত্র তদ্বিরকারক, সে না থাকিলে মোকর্দ্দমা চালাইবার মত আর কেহ থাকিবে না। আপনার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মোকর্দ্দমায় কোনরূপ সাহায্য করিবেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার সে উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি স্বয়ং একজন সাক্ষী হইতেন সন্দেহ নাই। এখন রমণ ঘোষকে সরাইবার একমাত্র উপায়, তাহাকে কোনও মোকর্দ্দমায় ফাঁসাইয়া ফেলা। দারোগাকে টাকা দিয়া আমি সমস্ত ঠিক করিতে পারি। তদ্ভিন্ন, সেই স্ত্রীলোকটাকেও কোনও উপায়ে সরাইতে হইবে। হুজুর আমাকে যে হাজার টাকা দিয়াছিলেন, পুলিশকে দেওয়ার পর তাহার ৩০০৲ বাকী ছিল। সেই ৩০০৲ এবং সরকারী তহবিল হইতে ২০০৲ একুনে ৫০০৲

লইয়া আমি খুলনায় আসি। সে টাকার ২৫০৲ মোক্তারকে দিয়াছি, হুজুরকে ১০০৲ এই পত্র মধ্যে পাঠাইলাম এবং আমার খরচ ডাকমাশুল ইত্যাদি বাবদে ১০॥/১০ খরচ হইয়াছে। আমার হস্তে এখন ১৩৯।৵১০ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি অদ্যই দরিয়াপুর যাত্রা করিতেছি এবং দারোগাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া রমণ ঘোষকে ফাঁসাইবার বন্দোবস্ত করিব। কিন্তু দারোগা যেরূপ অর্থলোলুপ এবং হুজুরের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা যেরূপ সঙ্গিন, সে যে পাঁচ সাতশত টাকার কমে সম্মত হয় এমন আশা অল্প। গঙ্গামণিকে সরাইবার জন্য টাকা ব্যয় হইবে। আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ গঙ্গামণি কিম্বা রমণ ঘোষ আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মোকর্দ্দমা তৎক্ষণাৎ খারিজ হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে আর কোনও রূপ আশঙ্কা থাকিবে না, হুজুরও নিরাপদে গৃহে ফিরিতে পারিবেন। অতএব শ্রীচরণে নিবেদন আমাকে আটশত টাকা দিবার জন্য সদর কাছারির খাজাঞ্চির নামে ফেরৎ ডাকে হুকুমনামা প্রেরণ করা হউক। আমি প্রত্যেক পয়সাটির হিসাব রাখিতেছি। হুজুর নিরাপদে গৃহে ফিরিলে সে জমাখরচ হুজুরে দাখিল করিব। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে কার্য্য উদ্ধার করিতে সর্ব্বদাই এ ভৃত্য চেষ্টিত আছে। অত্র কুশল। আগামীতে শ্রীচরণ কুশল লিখিয়া সন্তোষ করিবেন। ইতি তারিখ ৫ই অগ্রহায়ণ মোং খুলনা। আজ্ঞাধীন

শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া গোপীবাবুর দুশ্চিন্তা কতকটা দূর হইল। যদিও বা মোকর্দ্দমা হয়, ক্ষুদিরাম মোক্তার তাঁহার পক্ষে এক প্রধান সাক্ষী। প্রথমে স্ত্রীলোকটা ক্ষুদিরামের নিকট সম্পূর্ণ অন্যরূপ উক্তি করিয়াছিল। পত্রখানি তিনি সযত্নে তাঁহার নবক্রীত টিনের বাক্সে রাখিয়া দিলেন।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিয়া গোপীকান্তবাবু তাহাকে পত্রোত্তর লিখিলেন। বলিলেন—'সদর খাজাঞ্চির নিকট হুকুমনামা পাঠাইলাম, সে তোমায় এক হাজার টাকা দিবে। মোকর্দ্দমা তদ্বিরের জন্য তুমি আটশত রাখিয়া, বাকী দুইশত রেজিষ্টারি পত্রযোগে আমায় পাঠাইয়া দিও। আগামী কল্য আমি ৺বৈদ্যনাথ যাত্রা করিব। পৌঁছিয়া তথাকার ঠিকানা তোমায় জানাইব। সেই ঠিকানায় তুমি টাকা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইবে, এবং অন্যান্য সংবাদও লিখিবে।' পত্রশেষে তিনি নিজের নূতন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ দেওঘর যাত্রা

বেলা পাঁচটা বাজিলে দেবেন্দ্রবাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। দেখিলেন বহির্ব্বাটীর বারান্দায় একজন জমিদারী পাইক বসিয়া আছে। দেবেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিল। দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসছ ?"

"এজ্ঞে বারুইপুর হতে।"

"বারুইপুর থেকে ? বেশ বেশ। কখন এলে ?"

"এজ্ঞে এই আসছি।"

"বাড়ীর খবর ভাল ? বাবু ভাল আছেন ?"

"এজ্ঞে। সবাই ভাল, কেবল পুঁটুদিদির ব্যামো। তাই তেনার শরীল সারাতে বাবু পচ্চিমে যাচ্ছেন। আজ রাতে এখানে এসে পোঁছবেন, কাল রেলে রওনা হবেন।"

"খুকীর অসুখ ? কি অসুখ ?"

"এজ্ঞে জ্বর হয়, পেট নামে। শরীর শুকিযে আধখানা হয়ে গেছে।"

"বটে !—তা, বাবু কখন এসে পোঁছবেন ?"

"তিন পহর বেলায় লৌকো ছাড়বার কথা। এখানে এই রাত লটা দশটার সময় এসে পোঁছবেন।"

"কে কে আসছেন ?"

"বাবু, মা ঠাকরুণ, পুঁটুদিদি আর ছোটখোকা। ঝি, চাকর, বামুন, তারা আর একখানা লৌকো করে আসছে।"

"বাড়ীতে বলেছিস ?"

"এজ্ঞে না।"

"আচ্ছা বস্।"—বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পিতা বাহির হইয়া আসিলেন। তিনিও পাইককে উপরোক্ত মত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। শেষে বলিলেন, "পশ্চিমে কোথায় যাবেন ?"

করযোড়ে পাইক বলিল, "এজ্ঞে সেটা বলতে লারলাম। শুনেছিলাম কিন্তু বিস্মরণ হয়ে গেছি।"

মাধবচন্দ্রবাবু বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া গোপীবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "রাধামোহন—আজ আমার ভাগনে আসছে।"

"কোথা থেকে আসছেন ?"

"বারুইপুর থেকে। সে সেখানকার জমিদার। তার মেয়েটির অসুখ, তাই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছে। কাল আহারাদি করে পশ্চিমের গাড়ীতে রওনা হবে বলেছে। যদিও আমি তাকে অত শীগগির ছাড়ছিনে।"

গোপীবাবু বলিলেন, "আমাকেও কাল রওনা হতে হবে। আজ আমার টাকা এসেছে।"

"বাড়ীর সব খবর ভাল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে।"

"তা, তোমাকেই কাল ছাড়ব মনে করেছ বুঝি ? দুদিন আরও থাকতে হবে। আমি একবার বাজারে যাই। কুটুম্বর ছেলে আসছে, একটু ভাল করে খাওয়াতে দাওয়াতে হবে ত!"—বলিয়া তিনি একজন ভৃত্য সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাজার হইতে নানাবিধ ফল, তরকারী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন।

সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রবাবু আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। গোপীবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি আসছেন, তিনি আপনার পিসতুতো ভাই হন বুঝি ?"

"হ্যাঁ। আমার পিসতুতো ভাই। বারুইপুরের জমিদার।"

"নাম কি ?"

"যতীন্দ্রনাথ বসু। জমিদারের ছেলে হলেও, বেশ লেখাপড়া শিখেছে, বি-এ পাস। সে আবার একজন মস্ত লেখক। মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লেখে। সেদিন ধূমকেতু কাগজে তার একটা লেখা দেখছিলাম—'প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল কিনা।' রামায়ণ টামায়ণ থেকে অনেক শ্লোক তুলে প্রমাণ করে দিয়েছে, রাজা দশরথের সময় অযোধ্যায় বন্দুক কামান এ সমস্তই ছিল।"

প্রাচীন ভারতে বন্দুকের ভাবনায় গোপীকান্তবাবুর কিছুমাত্র শিরঃপীড়া না থাকাতে, তিনি ও প্রসঙ্গে কাণ দিলেন না। কলেজের উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকগণকে তিনি বড় ডরাইতেন। গোপীকান্তবাবু দেওঘরে যাইবেন স্থির করিয়াছেন—সে লোকটিও বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যদি দেওঘরে যাইবে বলে, তাহা হইলে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে। আবার গৃহস্বামী শাসাইয়াছেন, কল্য তিনি গোপীকান্তবাবুকে ছাড়িবেন না। সে হইবে না, কল্য গোপীকান্তবাবুকে যাত্রা করিতেই হইবে।

গোপীবাবুকে নীরব দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা দশরথের কামান বন্দুক ছিল এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন ?"

গোপীবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ ? কি জিজ্ঞাসা করলেন ?"

এমন সময় মাধববাবু অন্তঃপুরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "দেবেন, ও দেবেন—একবার ভিতরে এস ত। কোন ঘরটায় যতীনের বিছানা হবে ঠিক করা যাক।"

"আসছি।"—বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং বন্দুকের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় যতীনবাবু সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে রাত্রে গোপীবাবুর সহিত তাঁহার সামান্য আলাপ হইল মাত্র। তাহাতেই গোপীবাবু বুঝিলেন, লোকটা শিক্ষিত হইলেও, ভয়ঙ্কর নহে।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় যতীন্দ্রবাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। যতীন্দ্রবাবুর চা আসিল। তিনি গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চা খান না ?"

গোপীবাবু চা জিনিষটার খুবই পক্ষপাতী। গৃহে তিনি প্রত্যহই প্রভাতে চা পান করিতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি 'সদ্‌ব্রাহ্মণ' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি জন্মিয়া যাওয়াতে, প্রাভাতিক চা পানের সুযোগ ঘটে নাই। বেলা নয়টার সময় বৃদ্ধের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। স্নানান্তে বৃদ্ধকে দেখাইবার জন্য ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক একটু ঘটা করিয়াই করিতে হইত। যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন সাড়ে দশটা—সুতরাং চা পানের কথাও কেহ বলিত না।

অদ্য এই ধূমায়মান পেয়ালাটি দেখিয়া তাঁহার বড়ই লোভ হইল। বিশেষতঃ বৃদ্ধও সেখানে উপস্থিত নাই। তাই গোপীকান্তবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ—খাই বইকি মাঝে মাঝে।"

যতীনবাবু পেয়ালাটি গোপীবাবুর দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই পেয়ালাটি আপনি নিন। আমি অন্য পেয়ালা আনাচ্ছি। ওরে যা, বাড়ীর ভিতর থেকে আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

গোপীবাবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলেন। আবার ইহাও ভাবিলেন, বুড়া আসিবার পূর্ব্বেই পেয়ালাটা শেষ করিয়া ফেলাই ভাল।

যতীনবাবু বলিলেন, "খান না মশায়, আর এক পেয়ালা ত আসছে এখনি।"

গোপীবাবু চা পান করিতে করিতে শঙ্কিত নেত্রে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভৃত্য দ্বিতীয় পেয়ালা চা আনিয়া দিল। চা পান করিতে করিতে যতীনবাবু বলিলেন, "কাল রাত্রে বাড়ীর মধ্যে আপনার সমস্ত ইতিহাস শুনলাম রাধামোহনবাবু। কি বদমায়েসের পাল্লাতেই পড়েছিলেন! কত বদমায়েস যে সন্ন্যাসী সেজে বেড়ায় তার ঠিকানা নেই। কেউ বা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে, কেউ বা খুন কি ডাকাতি করেছে, পুলিসের ভয়ে সন্ন্যাসী সেজে বেড়াচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই। আপনাকে খুব বিপদে ফেলেছিল ত!"

"বিপদে ফেলেছিল বইকি। যাচ্ছিলাম পশ্চিম, টাকার অভাবে এইখানেই সপ্তাহ কেটে গেল। কাল বাড়ী থেকে আমার টাকা এসেছে। আজই আমি রওনা হব। কিন্তু মাধববাবু শাসিয়েছেন, আজ আমায় যেতে দেবেন না। আপনাকেও আজ যেতে দেবেন না বলছিলেন।"

যতীনবাবু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "রাধামোহনবাবু—সে ঠিক হয়ে যাবে। আমি পাঁজি দেখেছি। কাল অশ্লেষা, পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন পূর্ণিমা, তার পরদিন প্রতিপদ। আজকে না গেলে পাঁচদিন এখন যাত্রা নাস্তি। এই বলে মামার কাছ থেকে অনুমতি নেব, আপনারও ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দেব। আপনি কোথা যাবেন?"

"আমি দেওঘর যাব মনে করেছি।"

"দেওঘর? আমিও ত দেওঘর যাচ্ছি। চমৎকার জায়গা মশাই শীতকালে। আমার মেয়েটির শরীর বড় ক্লাহিল, তাই তাকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছি। বেশ, তা হলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। কোন্ গাড়ীতে যাওয়া যায় বলুন দেখি?"

এমন সময় মাধববাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। শেষ কথাগুলি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এখনি গাড়ীর খোঁজ নেবার তাড়াতাড়ি কি? দুদিন থাক—তারপর যেও। রাধামোহনকেও আজ যেতে দিচ্ছিনে।"

যতীনবাবু ঘাড়টি হেঁট করিয়া গোপীবাবুর প্রতি বক্রনয়নে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, তাহলে ত বেশই হত। কিন্তু কাল আবার অশ্লেষা,

পরশু মঘা, তার পরদিন বৃহস্পতিবার, তার পরদিন পূর্ণিমা, তার পরদিন প্রতিপদ। আজ না বেরিয়ে পড়লে, পাঁচ ছ দিন দেরী হয়ে যায়। খুকীর শরীর বড় খারাপ—অতদিন দেরী করাটা ঠিক হবে কি ?"

"তুমি পাঁজি দেখেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শুনিয়া মাধববাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেবেন্দ্রবাবু আসিলে বলিলেন, "ওহে দেবেন, যতীন ত আজই যেতে চায়। বলছে পাঁচদিন আবার যাত্রা নেই।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হলে অবশ্য নাচার।"

গোপীবাবু বলিলেন, "অত দিন দেরী করা আমারও ত চলবে না। তীর্থ সেরে শীঘ্র আমার বাড়ী ফিরতে হবে।"

মাধববাবু বলিলেন, "কি বলব বলুন! তা, যতীন তুমি কোন্ গাড়ীতে যেতে চাও ?"

গোপীবাবু বলিলেন, "বেলা একটায় একখানা পশ্চিমের প্যাসেঞ্জার আছে। একখানা সন্ধ্যাবেলায়। আমি একটার গাড়ীতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি।"

যতীনবাবু বলিলেন, "আমিও একটার গাড়ীতে যেতাম। কিন্তু সে গাড়ীতে গেলে অনেক রাত্রে দেওঘরে পৌঁছতে হবে। খুকীর হিম লাগবে। সে পাহাড়ে দেশ, হিমটে কিছু বেশী। সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়াই আমার ভাল। তা রাধামোহনবাবু, আপনিও কেন সন্ধ্যার গাড়ীতে চলুন না ?"

"সন্ধ্যার গাড়ীতে ?"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সেই ভাল হবে। যতীন একলাটি, ছেলেপিলে নিয়ে যাচ্ছে। রাত্রিকাল—আজকাল ট্রেণে আবার বিপদ আপদ আছে। রাধামোহন তুমি যতীনের সঙ্গেই যাও। তা হলে আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

গোপীবাবু সম্মত হইলেন।

যতীনবাবু তখন বলিলেন, "রাধামোহনবাবু, দেওঘরে আপনি কতদিন থাকবেন ?"

"মাসখানেক বড় জোর।"

"বাড়ী টাড়ী ঠিক করেছেন ?"

"না, বাড়ী ঠিক করিনি। এখন গিয়ে পাণ্ডাদের বাড়ীতেই উঠব। তারপর একটা বাড়ী দেখে নেওয়া যাবে।"

"আমি একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। এক কায করুন না। পাণ্ডাদের বাড়ীতে উঠে কেন মিছে কষ্ট পাবেন? এখন আপাততঃ আমার বাড়ীতে গিয়েই উঠবেন। তারপর সুবিধা মত একটা বাড়ী আপনাকে ঠিক করে দেওয়া যাবে। আপনি ত সেখানে এক মাস থাকবেন? অবশ্য আপনাকে আমি অনুরোধ করতে সাহস করিনে। এক মাসের জন্যে একটা বাড়ী নেবারই বা প্রয়োজন কি? আপনি ত একলা মানুষ। এক মাস যদি আমার ওখানে থাকেন তা হলে আমি বড়ই খুসী হব। কি বলেন মামা?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে যদি হয় ত অতি উত্তম হয়। তাই কর রাধামোহন। যতীন ছেলেমানুষ, বউমাও ছেলেমানুষ, দুটি ছেলেমানুষ যাচ্ছে, দুটি শিশুকে নিয়ে, তার মধ্যে একটি আবার রুগ্ন। বিদেশ বিভুঁই, কোনও অভিবাবক নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। এ রকম অবস্থায় ওদের যেতে দিতে আমার ত মনই সরছিল না। তুমি ওদের সঙ্গে থাকলে তোমার কাছে ওরা অনেক সাহায্য পাবে।"

গোপীবাবু একটু চিন্তা করিলেন। এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, যতীন্দ্রবাবু লোকটি বেশ অমায়িক, নিরহঙ্কার, উচ্চ-শিক্ষিত হইলেও ঝাঁঝালো নহেন। উঁহার সঙ্গ অপ্রীতিকর হইবে না। সুতরাং বলিলেন—"তা বেশ, আমি ওঁর ওখানে গিয়েই উঠব। আমায় যদি কাছাকাছি একটা বাড়ী খুঁজে দেন, তা হলে আমি সর্ব্বদা ওঁদের দেখতে শুনতে পারব। যতীনবাবু ওঁর ওখানেই থাকবার জন্যে যে আমায় অনুরোধ করছেন তাতে ওঁর ভদ্রতা খুবই প্রকাশ পাচ্ছে। ওঁর সৌজন্যে আমি আপ্যায়িত হলাম। কিন্তু একমাস ধরে ওঁর উপর দৌরাত্ম্য করাটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। বিদেশ বিভুঁই বলে শুধু আমিই যে ওঁদের কাযে লাগতে পারি তা নয়। ওঁর দ্বারাও আমার অনেক উপকার হতে পারে।"

সকলের মনের মত সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতীনবাবু, দেওঘরে আপনার সে বাড়ীর ঠিকানাটা কি হবে? বাড়ীতে সে ঠিকানাটা আমার লেখা দরকার।"

যতীনবাবু বলিলেন, "আমার সে বাড়ীর নাম লালকুঠি। লালকুঠি—দেওঘর, এই ঠিকানা দিলেই চিঠি আসবে।"

গোপীবাবু গদাই পালকে চিঠি লিখিয়া দিলেন—'লালকুঠি—দেওঘর, এই ঠিকানায় আমায় টাকা পাঠাইবে এবং পত্রাদি লিখিবে।'

সন্ধ্যাকালে, দাসদাসীকে পুরস্কৃত করিয়া, যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে গোপীবাবু দেওঘর যাত্রা করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ পীড়িতা

গুরুদাসবাবুর জন্মদিন উপলক্ষে বনভোজন সম্পন্ন করিয়া সকলে যখন নৌকাযোগে গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহে পৌঁছিয়া, সেই বসিবার ঘরখানিতে চা পান করিবার জন্য সমবেত হইলেন। গুরুদাসবাবু আজ একটু গম্ভীর—গল্পার্ণবের গল্পতরঙ্গ আজ প্রশান্ত। সারাদিন আমোদ উৎসবে তাঁহাকে একটু শ্রান্ত করিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় মনে হইতেছে, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাও সন্নিকট। আত্মীয় পরিজনের একান্ত কামনা সত্ত্বেও, তাঁহার জন্মদিন আর অধিক বার ফিরিয়া আসিবে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে চিনি সকলের জন্য চা আনিল। প্রথমে পিতাকে দিয়া, তাহার পর মোহিতের কাছে পেযালা ধরিল।

মোহিত বলিল, "থাক্।"

চিনি বলিল, "কেন, ওবেলা ত খেলেন! বললেন, চমৎকার লাগছে!"

"সে কেবল এঁর জন্মদিন বলে এক পেয়ালা খেয়েছিলাম।"

"বাবার জন্মদিন এখনও রয়েছে। ধরুন।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তোমার বউদিদি ছাড়েন নি—তাই খেয়েছিলাম।"

চিনি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বউদিদির অনুরোধে খেতে পারেন, আর আমার অনুরোধে পারেন না?"

গুরুদাসবাবু ও তাঁহার পত্নী, প্রমথ ও সুশীলা, বসিয়া এই তামাসা দেখিয়া আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। মোহিত, চিনির মুখপানে চাহিয়া বুঝিল, চা গ্রহণ না করিলে বালিকা বাস্তবিকই দুঃখিত হইবে। তখন মৃদুহাস্যের সহিত হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাও।"

চা দিয়া, চিনি তাহার বাম হস্ত সুশীলার দিকে বাড়াইয়া বলিল, "বউদিদি, টাকা দাও।"

গৃহিণী বলিলেন, "টাকা কিসের ?"

চিনি বলিল, "বাজির টাকা। বউদিদি বলেছিলেন, আমি ওবেলা মোহিতবাবুকে চা খাইযেছি বলে কি তুই পারবি ? কখ্‌খনো পারবিনে। আমি বলেছিলাম, আমি নিশ্চয় পারব—নিশ্চয়। চার টাকা বাজি হয়েছিল। যে বাজি জিতবে সে বাজার থেকে ঐ টাকার বাজি কিনে আনিয়ে পোড়াবে। দাও বউদিদি—টাকা দাও।"

সুশীলা হাসিতে হাসিতে অঞ্চল হইতে চারিটি টাকা খুলিয়া চিনির হাতে দিলেন।

চিনি টাকা কয়টি প্রমথবাবুকে দিযা বলিল, "দাদা, বাজি আনিয়ে দাও।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখন বাজি কোথায় পাবি ? এ কি কলকাতা সহর ?"

চিনি বলিল, "বাজারে পাওয়া যাবে। কালীপুজোর সময় দোকানে যে সব বাজি এসেছিল—তার অনেক এখনও আছে। বসন্ত আমায় বলেছে।"

বসন্ত এ কথার সমর্থন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, অনেক বাজি আছে। ছুঁচোবাজি, হাউই, চরকিবাজি, তুবড়ী, রঙমশাল—"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "বাজি পুড়িয়ে কেন টাকা নষ্ট করা !"

চিনি বলিল, "মহারাণীর জুবিলির সময় কেন তবে বাজি পুড়েছিল ? আপনার জন্মদিনেও আমরা বাজি পোড়াব।"

গুরুদাসবাবু কন্যাকে নিকটে টানিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে বাজির টাকা বাজিতেই পুড়ুক।"

সকলের চা পান শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব করিতে করিতে, দুই ঝুড়ি বাজি আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে বারান্দার নিম্নে পুষ্করিণী আছে—তাহারই তীরে বাজি পুড়িবে। পরিবারস্থ সকলে গিয়া সেই বারান্দায় উপবেশন করিলেন। অত্যন্ত আমোদের মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া বাজি পুড়িল।

রাত্রে শয়ন করিয়া, যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল, ততক্ষণ মোহিতের মনে কাহার একখানি সুন্দর সুকুমার মুখ বারম্বার দেখা দিয়া দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল দুইটি বড় বড় চঞ্চল চক্ষু—তাহাতে আবেশের লেশ মাত্র নাই। সেই মুখখানি ও চক্ষু দুইটিকে মোহিত কিছুতেই মন হইতে

নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না। আজ সারাদিন ধরিয়া চিনি তাহার পরিজনগণের কাছে যত দুষ্টামি করিয়াছে, যত মিষ্ট কথা বলিয়াছে, সেই দৃশ্যগুলি, মোহিতের মনে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন নিদ্রার আবেশ তাহাকে অল্পে অল্পে বিহ্বল করিয়া ফেলিল, তখন মনে মনে বলিল, 'মেয়েটি বেশ মিষ্টি। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সে সুখী হবে।'

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া মোহিত ঘুমাইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিন মুক্ত বায়ুতে যাপন করিয়াছে, নিদ্রা বেশ গভীর হইল। রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিল, যেন সে বরবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহমণ্ডপে অবতীর্ণ। চারিদিকে লোকসমাগম—বিস্তর আলো জ্বলিতেছে—বাহিরে সানাই বাজিতেছে। যেন স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। মোহিত দেখিল, কন্যা আর কেহ নহে—চিনি।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত মোহিতের মনে হইল, সে যেন সুখের সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সুপ্তিজড়িমা তিরোহিত হইলে, সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে শয্যার উপর মোহিত উঠিয়া বসিল। ভাবিল, এ কি স্বপ্ন দেখিলাম! এই আমার পরিণাম নাকি? বিবাহ করিয়া, সংসারজালে জড়ীভূত হইয়া, বাসনাতৃপ্তি ও অর্থোপার্জ্জনই জীবনের সারভূত করিব নাকি? স্বপ্নের কথা মনে মনে পর্য্যালোচন করিয়া নিজের প্রতি একটু রাগও হইল। স্বপ্ন দেখা না দেখা অবশ্য কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু স্বপ্নে তাহার মন কেন আনন্দলাভ করিল? আনন্দের ত কথা নহে, বিরক্ত হইবার—ঘৃণাবোধ করিবার কথা। মননশক্তি নিদ্রিত ছিল, প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য হৃদয়, সংযম হারাইয়া নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করিয়াছে। এমন ভৃত্য ত ভাল নয়! যতক্ষণ প্রভুর চক্ষুর সম্মুখে রহিল ততক্ষণই সুবোধ শিষ্ট আজ্ঞাবহ—চোখের আড়াল হইলেই যথেচ্ছাচরণ? হৃদয়ের প্রতি চক্ষু রাঙাইয়া মোহিত তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিল।

প্রভাতে উঠিয়া মোহিত শুনিল, চিনির জ্বর হইয়াছে। গত কল্য বনভোজনে গিয়া, নদীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিফল। সামান্য জ্বর—কোনও চিন্তার কারণ নাই। সন্ধ্যার্চ্চনা সারিয়া মোহিত ভিতরে যখন জলযোগ করিতে গেল, তখন তাহার চক্ষু চিনিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। জ্বর ত বেশী হয় নাই—হয়ত এখনি দেখা যাইবে র‍্যাপার

গায়ে দিয়া চিনি বেড়াইতেছে। কিন্তু চিনিকে কোথাও দেখা গেল না। উষাকালের তর্জ্জন সত্ত্বেও তাহার হৃদয় নিরাশ হইল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, চা পানের সময়, চিনি নিশ্চয় আসিবে, মোহিতের মন সারাদিন এইরূপ আশা করিতে লাগিল। কিন্তু সে আশাও বিফল হইল। সুশীলা ও প্রমথবাবুর অনুরোধ সত্ত্বেও সে আজ চা পান করিল না। আজ এই সান্ধ্যসভা যেন তাহার কাছে নিরানন্দ—অঙ্গহীন। যেন গাছ আছে, ফুল নাই; আকাশ আছে, জ্যোৎস্না নাই।

রাত্রে শয্যাগ্রহণ করিয়া মোহিত চিন্তা করিতে লাগিল—রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণগুলি তাহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা দিয়াছে। উপন্যাসাদিতে যেরূপ পাঠ করা যায়, অবিকল সেইরূপ। এমনি করিয়াই অবোধ মানুষ এক পা এক পা অগ্রসর হয়—ক্রমে অগাধ জলে গিয়া পড়ে—শেষে ভাসিয়া যায়। না, এরূপ হইলে ত চলিবে না। সে যে এমন দুর্ব্বল, পূর্ব্বে মোহিত তাহা জানিত না। চিনি—চিনি—চিনি—তাহার মন কেন সারাদিন চিনি চিনি করিতেছে? কি আছে সে বালিকার, যাহাতে এত আকর্ষণ? কি জানে সে? দর্শন জানে না, বিজ্ঞান জানে না, শাস্ত্রচর্চ্চা করে নাই; গীতা, উপনিষদ্ তাহার অনধীত। মূর্খ বিচারশক্তিবিহীন ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা! তাহার মুখখানি বেশ সুন্দর, চক্ষু দুইটি বড় স্বচ্ছ, ওষ্ঠযুগলে দুষ্টামির হাসিটুকু নিয়তই নৃত্য করিতেছে, কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের কমনীয়তা—এই ত তাহার সম্পত্তি। তাহাতেই কি মোহিত পাগল হইবে? মোহিত?—না না—ইহা কল্পনার অতীত—নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা।

কিয়ৎক্ষণ আত্মানুসন্ধানের পর তাহার মনে হইল—তর্ক করিলে কি হইবে? পাগল হইতে কি বাকী আছে নাকি? স্বপ্ন যেন বড় অপরাধ করিয়াছিল! আজ সারাদিনের এ জাগরণ? চিনিকে একটিবার দেখিবার জন্য তাহার মন কি পিপাসায় ছট্‌ফট্ করে নাই? আত্ম-প্রবঞ্চনা করিলেই ত হয় না। রোগে ধরিবার পূর্ব্বলক্ষণ বইকি! এ ত স্বয়ং রোগেরই লক্ষণ জাজ্বল্যমান—একেবারে পূর্ণমাত্রা। তবে? তবে এখন উপায়? উপায়, পলায়ন ছাড়া আর কি হইতে পারে? কল্যই ইঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইতে হইবে। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।

সে রাত্রে মোহিত আর চিনিকে স্বপ্ন দেখিল না। ভোরে উঠিয়া তাহার মনের ভাবটা বিজয়ী বীরের মত হইল। ভাবিল, রোগের অঙ্কুর একটুখানি

মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তাহার সবল পদতলে সেটুকু মাড়াইয়া চাপিয়া পিষিয়া ফেলিয়াছে। সে কি আর কেহ? সে যে মোহিত! সংসারসুখ, মায়াবিনী মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল? মানুষ চেনে না?

প্রভাতে শুনিল, গতরাত্রে চিনির জ্বর বাড়িয়াছিল। সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে। শুনিবামাত্র মোহিতের বক্ষে বেদনা বাজিয়া উঠিল। প্রমথকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত ডিগ্রী জ্বর?"

"রাত্রে ১০৫ উঠেছিল—এখন ১০৪।"

"ডাক্তার কে?"

"এখানকার নেটিভ ডাক্তারটি রাত্রে এসেছিলেন। আবার এখন তাঁকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ত্রিশ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, জ্বর এখনও ছাড়ল না—বিকারে না দাঁড়ালে বাঁচি।"

সেদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় মোহিত ভাল করিয়া মন দিতে পারিল না। একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিল। প্রমথ, গুরুদাসবাবু ভিতরে। সংবাদ না পাইয়া তাহার চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুই একজন দাস দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—"খুব কাতর।"

এইরূপে অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত কাটিলে, মোহিতের বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। ভাবিল, যাই, অন্তঃপুরে গিয়া দেখি চিনি কেমন আছে। বাড়ীর মেয়েরা সকলেই ত আমার সাক্ষাতে বাহির হন, তবে আর সঙ্কোচ কিসের?

এই সিদ্ধান্ত করিয়া মোহিত অন্তঃপুরে চলিল। তাহার ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, 'বড় যে টান দেখছি! জ্বর কারও হয় না নাকি?' মোহিত মনকে উত্তর দিল, 'আমার বন্ধুর ভগ্নী পীড়িত—উৎকণ্ঠিত হব না?—আমার যদি বোন থাকত এবং তারই যদি এইরকম পীড়া হত!'

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনে সুশীলাকে দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"চিনি কেমন আছে?"

"খুব জ্বর। ১০৬ উঠেছে। মাথায় ওডিকলনের পটি দেওয়া হয়েছে আসুন না— দেখবেন।"—বলিয়া সুশীলা মোহিতকে উপরে লইয়া গেল।

চিনি পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু মুদ্রিত। মোহিতের পদশব্দে

একবার চক্ষু খুলিয়া চাহিল কিন্তু মানুষ চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে শয্যার নিকট বসিয়া।

চিনির রোগতপ্ত মলিন মুখখানি দেখিয়া মোহিতের যেন কান্না আসিতে লাগিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে আবার বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাত্রে মোহিত আহারে বসিল মাত্র—কিছুই খাইতে পারিল না। সারা-রাত্রি ঘোর দুশ্চিন্তায় কাটিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঠাকুরঘরের দ্বারের নিকট সুশীলা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। দেখিয়াই মোহিতের মন চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছে?"

সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এখনও ত আছে। কিন্তু রাখতে যে পারি এমন আশা কম।"

মোহিতের চক্ষু দিয়াও জল পড়িতে লাগিল—কিছুতেই বাধা মানিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন ভাল ডাক্তার খুলনা থেকে আনালে হত না?"

সুশীলা বলিলেন, "রাত্রি তিনটের সময় পাল্কী বেযারা নিয়ে সিভিল সার্জ্জনকে আনতে লোক গেছে।"

অবনত শিরে মোহিত বাহিরে চলিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় সিভিল সার্জ্জন আসিয়া পৌঁছিলেন। সারাদিন চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর জ্বর কমিতে আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যা হইতে মোহিত চিনির শয়নকক্ষের বাহিরেই বসিয়া ছিল। রাত্রি দশটা বাজিলে গুরুদাসবাবু বলিলেন, "বাবা—তুমি কেন কষ্ট করছ?—অনেক রাত্রি হল—যা হোক কিছু জলটল খেয়ে শোওগে।"

মোহিত বলিল, শুশ্রূষার জন্য পালাক্রমে যে রাত্রি জাগার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার একটা পাহারা সে জাগিতে চায়।

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "যদি আজ রাত্রি কাটে, তবে কাল থেকে তোমাকেও একটা পাহারা দেব। আজ আর আবশ্যক হবে না। যাও বাবা, কষ্ট করো না।"

"ডাক্তার সাহেব কি বলছেন?"

"বলছেন, আজ সারা রাত্রির মধ্যে জ্বর ত্যাগ হবে। কিন্তু রোগিণীর দেহ এত দুর্ব্বল যে ভোরের দিকটায় নাড়ী না ছেড়ে যায়। রাত্রি তিনটে থেকে

সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সবচেয়ে সাংঘাতিক সময়। সেইটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে আর ভাবনা নেই। নইলে—”

গুরুদাসবাবুর কথা অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। মোহিত ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিছু জলযোগ করিবার জন্য সুশীলা অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু মোহিত কিছুতেই সম্মত হইল না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ মোহিতের গৃহত্যাগ

শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিত শয়ন করিল না। একখানি চেয়ারে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। আহা এমন সুন্দর পবিত্র ফুলটি, চিরদিনের মত ইহজগৎ হইতে অপসৃত হইবে? মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, ভোরবেলা যেন অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সে যেন ছুটিয়া ভিতরে গেল। যেন চিনিকে বাহির করিয়া বারান্দায় নামানো হইয়াছে। যেন আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া চিনি এই পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই কল্পনা করিতে করিতে মোহিতের চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, মোহিত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ঘড়িতে দেখিল, বারোটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। দ্বার খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া, অন্তঃপুরের দ্বিতলস্থ কক্ষগুলির পানে চাহিয়া রহিল। দুইটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। একটিতে চিনি আছে—অপরটিতে ডাক্তার সাহেব শয়ন করিয়া আছেন। মোহিত বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের সেই আলোকিত কক্ষ দুইটির পানে, চাহিতেছে। ভাবিল, আমি যদি কেবল মাত্র বন্ধু না হইয়া আত্মীয় হইতাম, তাহা হইলে গুরুদাসবাবু আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহিত পায়চারি করিল। ক্রমে একটা বাজিল। তখন সে ভিতরে আসিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আলো নিবাইয়া শয্যায় প্রবেশ করিল।

কিন্তু যাহার মন এমন চিন্তাপীড়িত, তাহার চক্ষে নিদ্রা সহজে আসিবে কেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অবশেষে একটু লঘু তন্দ্রা আসিল।

কিয়ৎকাল পরে তন্দ্রাবেশে যেন শুনিল, অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। দুরু দুরু বক্ষে উঠিয়া পড়িল। কাণ পাতিয়া শুনিল—কই না, কিছু ত শুনা যায় না। ওটা বোধ হয় স্বপ্নে শুনিয়াছিল মাত্র।

আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিল, দুইটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে। দুয়ার খুলিয়া আবার বাহিরের বারান্দায় গেল। সেই কক্ষ দুইটিতে এখনও আলো জ্বলিতেছে। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ। না, এখনও তবে কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই।

বারান্দায় কিযৎক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে তাহার মনে প্রবল বাসনা হইল, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, উপরে গিয়া, চিনির রোগশয্যার নিকট একবার দণ্ডায়মান হয়। কি জানি, আর যদি দেখিতে না পায়—একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে না? তিনটা বাজিতে ত আর বেশী বিলম্ব নাই।

তখন আবার মনে হইল—আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি করিব? গুরুদাসবাবু, প্রমথ প্রভৃতি রহিয়াছেন।

আবার মনে হইল, তাঁহারাই বা কি করিবেন? যদি যায়—তবে কি ধরিয়া রাখিতে পারিবেন?

তখন ভাবিল—ডাক্তার সাহেব রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি বা কি করিবেন? হাঁ একজন আছেন, যিনি করিতে পারেন বটে। যিনি এই পৃথিবী, এই নক্ষত্র-খচিত আকাশ, এই অনন্ত বিশ্বজগৎ স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ফিরাইতে পারেন বটে। আমি আজ তাঁহাকেই ডাকিব—প্রাণপণে প্রার্থনা করিব—চিনির জীবন তাঁহার কাছে ভিক্ষা মাঙ্গিয়া লইব।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হইল না। এ কথা যে এতক্ষণ মনে পড়ে নাই—ইহাই মোহিতের আশ্চর্য্য বোধ হইল। সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছে—এই সমস্ত সময়টা বৃথায় গিয়াছে। এতক্ষণ সে ভগবানের পদে মন সমর্পণ করিয়া আপনার আকুল প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে পারিত! আর বিলম্ব নয়।

মোহিত তৎক্ষণাৎ পাদুকা ত্যাগ করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শয়নকক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধ্যা করিবার কুশাসন, গঙ্গাজল প্রভৃতি ছিল। কেবল আসনখানি লইল। কোষাকুষি, গঙ্গাজল, কিছুই লইল না। আজ তাহার চক্ষু দিয়া যে পূতধারা বহিতেছে, তাহা ভগবানের

নিকট গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্রতর। আসনখানি লইয়া পশ্চাতের বারান্দায় গিয়া বসিল। সেই বারান্দারই নিম্নে অনতিদূরে নদী প্রবাহিত। মনে পড়িল, কয়েকদিন পূর্ব্বে এই বারান্দায় বসিয়া সে উপনিষদ পড়িতেছিল, সেই সময় শালুর টুকরাখানি হাতে করিয়া চিনি তাহারই কাছে অক্ষর লেখাইতে আসিয়াছিল।

আসন পাতিয়া, পূর্ব্বমুখ হইয়া, যুক্তকরে মুদ্রিতনেত্রে মোহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘড়িতে তিনটা বাজিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। নদীটি অদৃশ্য—কেবল তীরভূমির কঙ্করগুলিতে ঢেউ লাগায় মৃদু মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে। আর কোথাও কোন শব্দ নাই। মোহিত এক একবার অস্পষ্টস্বরে প্রার্থনার ভাষা উচ্চারণ করিতেছে—আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিতেছে।

চারিটা বাজিল। অন্ধকার কমিয়া আসিতেছে। আকাশের তারার আর তেমন জ্যোতি নাই। মোহিত এক একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিতেছে—রাত্রি আর কত বাকী। আবার চক্ষু মুদিয়া গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হইতেছে।

রাত্রি আর নাই। পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল। দুই একটা পক্ষীর কলরব শোনা যাইতেছে। নদীর দিক হইতে মৃদুমন্দ ঊষা-সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল। মোহিত ক্ষণমাত্র পূর্ব্বাকাশ পানে চাহিয়া, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পূর্ব্বদিক লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। সহস্র পক্ষীর কলকূজনে নদীতীর মুখরিত। ক্রমে সে রক্তাভা গাঢ়তর—গাঢ়তম হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নবোদিত সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত ছুটিয়া আসিয়া ধ্যানরত মোহিতের ললাটদেশ স্পর্শ করিল। মোহিত তখন চক্ষু খুলিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।

কুশাসনখানি শয়নকক্ষে রাখিয়া, দ্রুতপদে মোহিত অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিল। ক্রন্দনের রোল ত উঠে নাই। অন্তঃপুর নিস্তব্ধ।

অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহিণী দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, চিনি ভাল আছে, জ্বর গিয়াছে, কথা কহিয়াছে। এখন সে নিদ্রিত।—বলিতে বলিতে গৃহিণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোহিতের পানে চাহিলেন। তখন মোহিতের স্মরণ হইল, চক্ষু ও কপোল হইতে অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া আসিতে তাহার মনে ছিল না। অবনত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। গিয়া আবার পূজায় বসিল।

চিনি ভাল হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। উপরেই থাকে—মোহিত এ তিনদিন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

চিনির প্রতি তাহার মনের ভাব যে কি জাতীয় তাহা মোহিত এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। এ কয়দিন সে লক্ষ্য করিয়াছে, কেহ কথাপ্রসঙ্গে তাহার সমক্ষে চিনির নামোল্লেখ মাত্র করিলে তাহার কাণে যেন বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। ইহার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত—কিন্তু কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। নিজ চিত্তদৌর্ব্বল্য সে ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছে। এই কারণে স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রম তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে। দাদার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়িতেছে, 'তুমি যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে সে অন্য কথা ছিল। গৃহস্থাশ্রমে থেকে তার নিয়ম প্রতিপালন করবে না—এর কুফল অবশ্যম্ভাবী।' দাদা অবশ্য অন্য ভাবে বলিয়াছিলেন—কিন্তু কথাটা খুবই পাকা বলিয়া মোহিতের মনে হইতে লাগিল। তাহার উপস্থিত মনের অবস্থাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এইরূপ নানাদিক পর্য্যালোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিয়াছে, সংসারাশ্রমে আর তাহার থাকা নয়। এবার সে রীতিমত সন্ন্যাসী হইবে। সংসারাশ্রমে থাকিলে নিজের সাধনভজনের পদে পদে বিঘ্ন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুরও আবশ্যক। বাহির হইয়া না পড়িলে সে গুরুই বা মিলিবে কোথা? যথাসম্ভব শীঘ্র এখান হইতে বাড়ী গিয়া, গৈরিক-বসন ধারণ করিয়া, লোটা কম্বল লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িবে। আঃ—সে কি আত্মগ্লানিশূন্য স্বাধীনতার জীবন! অখণ্ড অবসর—লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া একমনে একধ্যানে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে। এখানে বন্ধুর আতিথ্যে সপ্তাহের অধিক অতিবাহিত হইল। বিদায় গ্রহণে আর বিলম্ব কি? একটুমাত্র বিলম্ব আছে। চিনি নামিলে, তাহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া, চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে। এখন আর তাহার মনে আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। হৃদয়ের চাপল্যকে এখন সে ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে—হৃদয়কে এ কয়দিন ছুটি দিয়াছে। হৃদয়ও দিবানিশি প্রিয়চিন্তায় নিমগ্ন আছে। থাকুক—আর দুদিন বই ত নয়।

দুইদিন পরে, বৈকালে চিনি উপর হইতে নামিল। জলযোগ করিবার সময় অন্তঃপুরে গিয়া মোহিত তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানি দেখিয়া মোহিতের হৃদয় ভাবাবেগে উথলিয়া উঠিল। একখানি

ফিরোজা রঙের পাতলা শাল গায়ে দিয়া বারান্দায় চিনি বেড়াইতেছিল। মোহিত তাহার কাছে গিয়া কহিল, "কেমন আছ চিনি ?"

"ভাল আছি। আচ্ছা, আমি এত শীগগির কি করে ভাল হলাম বলুন দেখি মোহিতবাবু ?"

"জানি না ত। কি করে ?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। দাদা আপনাকে বলেন নি ?"

"কই, না।"

"অসুখের সময় আমার ডিলিরিয়ম হয়েছিল—আমি আবোল তাবোল বকছিলাম—তা শোনেন নি ?"

"শুনেছি।"

"সে সময় আমি বলেছিলাম—আমি ত জানিনে, সবাই বললেন—আমি খালি খালি বলেছিলাম, মা আমার গ্র্যামোফোনটা কোথা গেল ?—মা আমার গ্র্যামোফান কই ?—তাই আমি যখন একটু ভাল হলাম তখন দাদা আমায় বললেন—তুমি শীগগির ভাল হও দিদি—আমি তোমায় গ্র্যামোফোন আনিয়ে দিচ্ছি। সেই গ্র্যামোফোনের লোভে লোভে আমি এত শীগগির ভাল হয়ে উঠেছি।"

এই সময় সুশীলা সেখানে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"গ্র্যামোফোন গ্র্যামোফোন করে চিনির আর ঘুম হচ্ছে না।"

জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া মোহিত গুরুদাসবাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে আরও দুই চারিদিন থাকিবার জন্য সস্নেহ অনুরোধ করিলেন—কিন্তু মোহিত মিনতি করিয়া তাহা কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর চা পানের জন্য সকলে সমবেত হইলে চিনি বলিল, "মোহিতবাবু—কাল নাকি আপনি চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"না মোহিতবাবু, কাল যাবেন না। আমার গ্র্যামোফোনটা আসুক আগে। শুনে যাবেন।"

মোহিত সস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, অত বিলম্ব করিলে তাহার কোন মতেই চলিবে না। কল্য তাহাকে যাইতেই হইবে।

চিনি তখন পিতাকে বলিল, "বাবা, মোহিতবাবুকে থাকতে বলুন না। তিন চারদিনেই ত আমার গ্র্যামোফোন এসে যাবে।"

গুরুদাসবাবু বলিলেন, "আমি ত মোহিতকে অনেক বলেছি মা, উনি শুনছেন কই।"

মোহিত বলিল, "আচ্ছা তোমার গ্র্যামোফোন আসুক। এবার যখন আসব তখন শুনব।"

চিনি ইহাতে স্পষ্টই একটু নিরাশ হইল। ক্রমে গুরুদাসবাবু বলিলেন, "যাও মা, দেখ, চায়ের জলটা হল কিনা।"

"যাই"—বলিযা চিনি মোহিতের দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল। বলিল—"আপনার জন্যেও একপেযালা আনি?"

কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মোহিত বলিল, "আচ্ছা আন।"

গ্র্যামোফোন আসা পর্য্যন্ত থাকিতে মোহিত অস্বীকার করিয়া চিনির মনে দুঃখ দিয়াছে। চা অস্বীকার করিয়া আর দুঃখ দিতে তাহার মন সরিল না। ইহাও সে ভাবিল, আজই ত শেষ দিন। সব রকম অসংযম, আত্মপরায়ণতার আজ শেষ।

পরদিন আহারাদি করিযা, গৃহিণীর নিকট মোহিত বিদায লইতে গেল। তিন তখন একলা ছিলেন। মোহিত বসিলে, দুই চরিটি স্নেহগর্ভ কথার পর তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমায় একটি কথা বলব মনে করেছি, কিন্তু বলতে কিছু সঙ্কোচ হচ্ছে।"

মোহিত বলিল, "কি কথা মা? প্রমথ যেমন আপনার ছেলে, আমাকেও তেমনি মনে করুন। যা বলতে ইচ্ছে করেন বলুন—তার জন্যে সঙ্কোচ কেন?"

ইতিপূর্ব্বে মোহিত আর কখনও অন্যের মাকে মা বলে নাই।

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "প্রমথ যেমন আমার ছেলে, বাস্তবিক পক্ষে তুমিও আমার সন্তানস্থানীয় হও, এই আমার আকিঞ্চন। আমার বড় ইচ্ছা, চিনির সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তোমার মা নেই, আমি তোমার মা হই এই আমার মনের সাধ।"

মোহিত কিয়ৎক্ষণ নতশিরে নীরব থাকিয়া বলিল, "মা, তা হবার যো নেই। আমার জীবনের গতি আমি অন্য পথে স্থির করে রেখেছি। গৃহস্থাশ্রম আমার জন্যে নয়। আমি সন্ন্যাসী হব।"

"সে কি কথা বাবা? এই কি তোমার সন্ন্যাসী হবার বয়স? অমন কথা বোলো না। আমার মেয়েকে তুমি বিবাহ না কর, না করবে—কিন্তু সন্ন্যাসী

হবার কথা মুখে এন না। যদি অন্য কোথাও একটি সৎপাত্রী দেখে বিবাহ করেও সংসারী হও—তাতেও আমি সুখী হব।"

মোহিত বলিল, "মা, আমি যদি বিবাহ করতাম, তা হ'লে আপনাকে মাতৃপদে বরণ করবার গৌরব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতাম না।"

গৃহিণী প্রায় মিনতির স্বরে বলিলেন, "তবে বাবা অমত কোরো না। ওঁকে বলি তোমার দাদাকে চিঠি লিখুন। মাঘ মাসে ভাল দিন আছে—শুভকর্ম্ম হয়ে যাক।"

মোহিতের চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া সে বলিল, "মা, আমায় প্রলোভনে ফেলবেন না।"—বলিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদধূলি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গৃহে পৌঁছিয়া, দুই দিন থাকিয়া, তৃতীয় দিন উষাকালে গৈরিক বসনে, লোটা-কম্বল লইয়া, কপর্দ্দকবিহীন অবস্থায় মোহিত গৃহত্যাগ করিল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ শত্রুদমনের ষড়যন্ত্র

প্রভাতে উঠিয়া গদাই পাল হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া একখানি তসরের ধুতি পরিধান করিল। খড়ম পায়ে দিয়া, সাজি হস্তে বাগানে পূজার্থ পুষ্পচয়ন করিতে বাহির হইল।

অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ, অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। কোঁচাটি খুলিয়া গদাই গায়ে জড়াইল। গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। ফুলে ফুলে বুকভরা শিশির। একটি একটি গাছের ডাল ধরিয়া, বেশ করিয়া নাড়া দিয়া ফুল হইতে শিশির ঝাড়িয়া গদাই চয়ন করিতে লাগিল। শ্বেত ও রক্তকরবী, কৃষ্ণকলি, টগর, জবা প্রভৃতি নানা ফুলে গদাধরের সাজি ভরিয়া উঠিল। ফুল তুলিতে তুলিতে গদাই মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে পথের পানে চাহিতেছে। বৃক্ষ লতা গুল্মে গ্রামপথ সমাকীর্ণ, অধিক দূর দৃষ্টি চলে না। তথাপি গদাই বারম্বার পথপানে চাহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে, গাছপালার অন্তরাল হইতে কাহার যেন আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। গদাই উৎকর্ণ হইয়া রহিল। শব্দটা কাছে আসিলে বুঝা গেল, কে যেন বলিতেছে,

'ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে!—আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে রে!'—শুনিয়া গদাধরের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

শব্দ ক্রমে নিকটতর হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আশপাশের গৃহস্থগণ ঔৎসুক্যবশে বাহির হইয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, বাঁশঝাড়ের আড়াল হইতে কেনারাম গোপ বাহির হইল। সে বুক চাপড়াইতেছে ও বলিতেছে, 'সর্ব্বস্ব গেল রে—সর্ব্বস্ব গেল।'—তাহার সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলে—দুই চারিজন বয়স্ক লোকও আছে।

গদাই পালকে দেখিবামাত্র কেনারাম বলিতে লাগিল, "ওগো নায়েব মশাই গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে গো!"

গদাই সাজি হস্তে দ্রুতপদে বাগানের প্রান্তদেশে অগ্রসর হইয়া বলিল, "কেন ঘোষের পো? কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে গো, সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে নায়েব মশাই।"

"কে নিয়ে গেছে?"

"চোর গো নায়েব মশাই।"

"চুরি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করে চুরি হল রে?"

"আজ্ঞে আমার বাড়ীর পিছনে, বক্সীদের আমবাগান আছে, সেই আম-বাগানে বসে আমার বড়ঘরে সিঁদ কেটেছে।"

সমবেত অনেকে বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! সিঁদ কেটেছে?"

"বললে না পিত্যয় যাবে মশাই, পেল্লায় এতখানি সিঁদ!"

গদাই বলিল, "তোরা কোন্ ঘরে ছিলি?"

"আমি আর আমার ইস্তিরী সেই ঘরেই শুয়েছিলাম নায়েব মশাই। আমার ছেলে দুটো আমার ভাইবউয়ের কাছে ছোট ঘরে শুয়েছিল।"

গদাই মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ঘরে সিঁদ কাটলে, চুরি করলে, ঘুম ভাঙ্গল না?"

"কিছু জানতে পারিনি নায়েব মশাই—কিছু জানতে পারিনি। সকাল হলে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সিঁদের পথে ঘরে আলো আসছে; দেখেই আমার প্রাণটা

চমকে উঠল। গা ঠেলে আমার ইস্তিরীকে বললাম, খোকার মা, ও খোকার মা, উঠে দেখ্ দেখি দেয়ালে ফুটো হল কেন ?—আমার ইস্তিরী উঠে, সিঁদ দেখে, বুক চাপড়াতে লাগলো। তারপর দুয়োর খুলে দেখলাম, ঘরে থালা ঘটি বাসন যা ছিল সব নিয়ে গেছে! বেতের ঝাঁপিতে বারো আনা পয়সা ছিল, ছোট বউয়ের হাতের একযোড়া পৈঁচে ছিল, খোকার কোমরের পাটা ছিল, সব নিয়ে গেছে নায়েব মশাই সব নিয়ে গেছে। আমায় ফকির করে গেছে গো—হো হো হো।"—বলিয়া কেনারাম কাঁদিতে লাগিল।

উপস্থিত সকলেই কেনারামের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

গদাই বলিল, "যা, এখনি থানায় গিয়ে এজেহার লিখিয়ে দিয়ে আয়।"

কেনারাম বলিল, "এজেহার লেখালে আমার জিনিষগুলি পাব নায়েব মশাই ?"

"তা এখন কি করে বলব ? পুলিসের লোকেরা যদি চোর ধরতে পারে, মাল আস্কারা করতে পারে, তবে অবিশ্যি পাবি। যে ঘরে চুরি হয়েছে সেখানে যা যেমন আছে তেমনি রেখে থানায় যা। একটি জিনিষ এদিক ওদিক না হয়। দারোগা এসে সব দেখবে। চল্ বরং আমি এইবেলা সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসি। কি জানি যদি সাক্ষীই দিতে হয়। চল হে—তোমরাও সব চল।"

ইহা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ ত্রস্তভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ভাবিল, দেখিতে গিযা শেষে কি ফৌজদারী মোকর্দ্দমার সাক্ষীর ফেসাদে পড়িয়া যাইতে হইবে!—তাই কেহ বলিল, 'আপনি এগুন নায়েব মশাই—আমি মুখ হাত ধুয়েই আসছি।'—কেহ বলিল, 'ছেলেটার বড় জ্বর, একবার বদ্যিবাড়ী যেতে হবে।'—কেহ বা বলিল, 'আমার এখনও গাই দোয়া হয়নি, গাই দুয়েই আসছি।'—এইরূপ নানা প্রকার অছিলা করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল।

সমস্ত পথ গদাই নীরব গম্ভীরমুখে কেনারামের সঙ্গে সঙ্গে গেল। অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র একমুখ হাসিয়া কেনারামের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "সাবাস কেনারাম, সাবাস ভাই। আজ তুই যা নকল করেছিস, একবারে আসল বীররস—কলকাতায় থিয়েটারে গিয়ে যদি একটোরো চাকরি নিস ত এখনি তোর ত্রিশ টাকা মাইনে হয়।"

কেনারাম হাস্যমুখে বলিল, "সে কি নায়েব মশাই ?—ছিয়াচার কি ?"

"থিয়েটার জানিস নে ?—এই যাত্রা শুনেছিস ত ? কলকাতায় আজকাল সেই রকম থিয়েটার হয়েছে। বিলিতী যাত্রা আর কি! সেখানে যত সব একটোরো সেজে বীররসের সঙ দেয়।"

বলিতে বলিতে উভয়ের বড়ঘরে বারান্দায় আসিয়া উঠিল। গদাই পালকে দেখিয়া গঙ্গামণি ঘোমটা দিয়া গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; বড়বউ আধঘোমটা দিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিঁদ দেখিয়া গদাই বলিয়া উঠিল, "এই বুঝি তোর বুদ্ধি!—ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম—নইলে এখনি ত মোকর্দ্দমা ফেঁসে যেত!"

কেনারাম ভীত হইয়া বলিল, "কেন নায়েব মশাই ?"

"কেন নাযেব মশাই! ওরে গন্ধব—চোর বাইরে বসে সিঁদ কাটলে, আর মাটী সব তোর ঘরের মেজেতে এসে জমলো কি করে ? এ যে দেখবে সেই বলবে ঘরের মধ্যে বসে সিঁদ কাটা হয়েছে। সরা সরা—মাটি সরা এই বেলা। পায়ে করে ঠেলে ঠেলে সিঁদের পথে মাটিগুলো বাইরে ফেল্।"

কেনারাম তাহাই করিতে লাগিল। শেষ হইলে গদাই বলিল, "আমি কাছারি চললাম। তুই শীগগির জল খেয়ে নে, নিয়ে কাছারিতে আয়। একজন কাউকে সঙ্গে দিয়ে তোকে থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

যথাসময়ে কেনারাম থানায় গিয়া এজেহার করিল। পাছে কেনারাম সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারে, বাসন মেরামতের চিহ্ন, মেরামতকারী কাঁসারীর নাম ইত্যাদি বলিতে ভুলিয়া যায়, তাই এজেহারের একটা মুসাবিদা গদাই পাল স্বয়ং লিখিয়া কেনারামের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

এজেহার লইয়া, দারোগা প্রথম তিন চারিদিন এলাকার সমস্ত কারামুক্ত দাগী চোরের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

চতুর্থ দিন গদাই হুকুমনামা দেখাইয়া, সদর কাছারি হইতে ১০০০৲ লইয়া আসিল। থানায় গিয়া দারোগাকে ২০০৲ দিয়া বলিল, "হুজুরের পাণ খাবার জন্যে এই ২০০৲ এনেছি। বাবু মহাশয় এ মোকর্দ্দমার জন্যে ৪০০৲ ছ্যাঁকসেন করেছেন। ১০০৲ সেদিন দাখিল করেছিলাম, এই ২০০৲ নিয়ে

৩০০৲ হল। বাবু বলেছেন, আসামীর যেদিন জেলের হুকুম হবে সেই দিন বাকী ১০০৲ দেবেন।"

দারোগা টাকা লইয়া বলিল, "মোটে ৪০০৲! তোমার বাবু ত বড় কৃপণ হে! ৫০০৲ পুরোপুরি দেওয়াতে পারলে না?"

"আজ্ঞে, অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বাবু বলেন, দারোগা সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলো যে একদিনের ত কারবার নয়, তাঁর সঙ্গে যখন হিদ্যতা হল, পাঁচবার পাঁচটা কায নিতে হবে। প্রথম কাযটা কেমন হয় দেখাই যাক।"

দারোগা কমিশনের ৩০৲ গদাই পালকে দিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ—বাবু দেখুন আমার কি রকম হাত সাফাই। কিন্তু খুসী করতে পারলে শুধু ১০০৲ টাকায় হবে না। বাবুকে গিয়ে বোলো।"

"বলব বইকি। আমি কি বলতে কসুর করি দারোগা সাহেব? অবিশ্যি বলব। বাসনগুলো এখন কি উপায়ে—"

কথা শেষ হইতে না দিয়া দারোগা বলিয়া উঠিল, "দারোগার আবার উপায়ের ভাবনা? আজ রাত্রেই বাসনগুলো রমণ ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। আমার পাল্লায় কত চোর বদমায়েস আছে জান? তাদের দুজনকে ঠিক করে রেখেছি। তারা গিয়ে রমণ ঘোষের বাড়ী দেখেও এসেছে। তার গোয়ালের পিছনদিকটার পাঁচিল খানিক ভাঙ্গা আছে। সেইখান দিয়ে ঢুকে, খড়ের পাঁজার ভিতরে বাসনগুলো লুকিয়ে রেখে আসবে। কাল বেলা ৮টার সময় আমি গিয়ে, খানাতল্লসী করে সে বাসন বের করে ফেলব। তারপর, ঘোষের পোর দুই হাত পিঠের দিকে টেনে বেঁধে, গুঁতো মারতে মারতে থানায় নিয়ে আসব। তারপর ৪১১ ধারায় চালান। একটি বছর ত বটেই—বেশী যা হয়।"

রমণ ঘোষের বন্ধনদশার ছবিখানি কল্পনানেত্রে অবলোকন করিয়া, গদাই পালের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—"দারোগা সাহেব, রুলের গুঁতো ছাড়া আর কিছু হবে না? থানায় এনে ঘা কতক বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলে ভাল হয়।"

দারোগা বলিল, "দিতে আর কতক্ষণ? কিন্তু ও টাকায় হয় না। দুধে যত চিনি দেবে তত মিষ্টি হবে—কথাই ত আছে জান।"

গদাই দারোগার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব—বেটাকে যদি থানায় এনে কসে জলবিছুটি লাগাতে পারেন, তবে বাবুর কাছ থেকে আরও ৫০৲ আমি আদায় করে দেব।"

"বেশ, তাই হবে"—বলিয়া দারোগা কার্য্যান্তরে গেল। গদাই পাল মনের আনন্দে কাছারিতে ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ সাধুসঙ্গ

মোহিত যখন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন সামান্য আলোক ফুটিয়াছে মাত্র। পৌরজন কিম্বা দাসদাসী কেহ তখনও জাগে নাই। নির্ব্বিঘ্নে ফটক পার হইয়া মোহিত গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। দুই চারিজন পরিচিত লোক পথে ছিল বটে, কিন্তু আলোকের অল্পতায়, এ ছদ্মবেশে কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

মোহিতের পরিধানে একখানি গৈরিক বসন, একখানি উত্তরীয়, তাহার উপর কম্বলখানি জড়ান। অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ—একটু বেশ শীতের আমেজ দিয়াছিল। গৈরিকবর্ণের মোটা কাপড়ের একটি ঝুলি তাহার দক্ষিণহস্তে ঝুলিতেছিল। তন্মধ্যে একখানি গীতা, একখানি সাংখ্যদর্শন এবং আরও চারি পাঁচখানি পুস্তক। একখানি বড় ছুরিও ছিল। বামহস্তে লোটাটি—বগলে একখানি মৃগচর্ম্ম। কোনওরূপ খাদ্যদ্রব্য কিম্বা অর্থ—এ সব কিছুই ছিল না। কেমন করিয়া তাহার চলিবে তাহা কি মোহিত ভাবে নাই? ভাবিয়াছিল বইকি। বাল্যকালাবধি তাহার মনটি ভক্তিপ্রবণ। তাহার বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর যখন জীব দিয়াছেন তখন আহার তিনিই যোগাইবেন। এই নির্ভরশীলতার ভাব তাহার মনে এখন অধিকতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছে।

কোন্ পথে, কোথায় যে মোহিত যাইবে তাহা কিছুই সে স্থির করিয়া বাহির হয় নাই। কমলপুর হইতে দুই ক্রোশ দূর একটি সরকারী পাকা রাস্তা আছে, সে রাস্তা বরাবর খুলনা গিয়াছে। যখন রেল খোলে নাই, তখন এই পথ দিয়াই লোক জেলায় যাইত। গ্রামপ্রান্তে পৌছিয়া সেই রাস্তার দিকেই মোহিত পদচালনা করিল। মাঠের মধ্যে দিয়া কাঁচা রাস্তা গিয়া সেই রাজপথে মিশিয়াছে।

মোহিত যখন গ্রাম হইতে অনুমান একক্রোশ আসিয়াছে, তখন বড় ঘটা

করিয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া, কয়েকদিন পূর্ব্বে শেষবার যে সূর্য্যোদয় মোহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাই তাহার স্মরণ হইল। মনে হইল, সে সূর্য্য তাহার আকুল প্রার্থনার পুরস্কারে, চিনির নবজীবনদাতা স্বরূপ আসিয়া উদিত হইয়াছিলেন। কি শান্তি—কি পুলকহিল্লোল তাহার অন্তঃকরণকে সেদিন পরিপ্লাবিত করিয়াছিল!—ভাবিতে লাগিল, চিনি এখন কেমন আছে?—কি করিতেছে? আহা, সে বালিকার জীবন সুখময় হউক।—এইরূপ চিন্তা-পরম্পরা মোহিতের মানসক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিতেই তাহার চৈতন্য হইল। পথের মধ্যে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিল, এ কি! আমি না গৃহ ছাড়িয়া গৈরিক বস্ত্র পরিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চলিয়াছি? কোথায় আমি ধর্ম্মচিন্তায় ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিব, তাহার পরিবর্ত্তে আমার মনে কামিনী-চিন্তাই আধিপত্য করিতেছে! ছি ছি ছি—ধিক আমাকে!—এইরূপ আত্মানুশোচনার পর, মনে মনে মোহমুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে সে পথ চলিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ চলিলে, সম্মুখরৌদ্রে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন কম্বলখানি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ঝুলির মধ্যে ভরিয়া লইল। দুই দিকের মাঠ পীত ধান্যে পরিপূর্ণ। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একখানি গো-শকট, বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আরোহিগণ কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিতেছে—কেহ কেহ প্রণামও করিতেছে।

মোহিত যখন পাকা রাস্তার উপর পৌঁছিল, তখন বেলা ৭টা হইবে। ইতিমধ্যেই সে একটু শ্রান্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ, গত রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, পথ চলাও কোনকালে অভ্যাস ছিল না। যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িত তখন বৈকালে একবার করিয়া গোলদীঘিতে বেড়াইতে যাইত মাত্র। রবিবার কিম্বা অন্য ছুটির দিনে আর একটু অগ্রসর হইয়া, বিডন বাগানে কিম্বা হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বেড়াইত।—কখনও বা ইডেন বাগানে অথবা গড়ের মাঠে যাইত—সেও কালেভদ্রে। কলেজ ছাড়িয়া অবধি প্রাত্যহিক ভ্রমণ আর নাই। কোন দিন ঝোঁক হইলেও তিন চারি মাইলও বেড়াইয়াছে বটে, কিন্তু সে কদাচিৎ।

সংযোগস্থলে বড় রাস্তার নিম্নে একটি সাঁকো ছিল। তাহারই একটি আলিসায়, গাছের ছায়ায় মোহিত উপবেশন করিল। ঝিরঝির করিয়া মৃদু হৈমন্তিক বায়ু বহিতেছে। মোহিতের ঘর্ম্ম ও শ্রান্তি শীঘ্রই অপনোদিত হইল। সেখানে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'এখন কোন্ দিকে যাই? খুলনার দিকে না বিপরীত দিকে?'—বিপরীত দিকে কোন্ স্থানে গিয়া যে রাস্তা শেষ হইয়াছে তাহা মোহিত জ্ঞাত ছিল না। ভাবিল, 'বরং খুলনার দিকেই যাই। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, সেখান হইতে রেলে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন চলিয়া যাইব।'

এখান হইতে খুলনা ছত্রিশ মাইল—দুইদিনের পথ। তিন ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ নামে একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। মোহিত উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে রৌদ্র ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, মোহিতের গতিবেগও হ্রাস প্রাপ্ত হইল। বেলা যখন দশটা হইবে, তখন পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পথচারী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এক ক্রোশ দূরে কাশিয়াদহ। আজ সেখানে হাট বসিবে—গোয়ালারা ঘৃত, দধি, দুগ্ধের ভার লইয়া ছুটিয়াছে। পথের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, জলপানার্থ মোহিত রাস্তা হইতে নামিয়া তাহার তীরে গিয়া দাঁড়াইল।

জলের নিকট পৌঁছিয়া হঠাৎ মোহিতের মনে হইল, আজ ত এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করা হয় নাই—তৎপূর্ব্বে জলপান করিবে কেমন করিয়া? তখন সে জলে নামিয়া মুখাদি ধৌত করিয়া লইল। দীর্ঘিকার তীরে তীরে আম্র, নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগান। সেই বাগানে প্রবেশ করিয়া, একটি পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া, মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া মোহিত উপবেশন করিল।

তাহার গলায় এখনও যজ্ঞোপবীত আছে। ইচ্ছা ছিল, কোনও সদ্গুরু সন্ন্যাসী পাইলে, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবে।

গায়ত্রী, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপন করিয়া মোহিত গীতাখানি খুলিল। কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিবার পর দেখিতে পাইল, বাগানের ভিতর কিছু দূরে তিন চারিজন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজনের হাতে ফল পাড়িবার একটা আকর্ষণী—অপর সকলের স্কন্ধে ধামা। লোকগুলি ক্রমশঃ মোহিতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অল্প দূরে কয়েকটা কাগজি লেবুর গাছ ছিল—যাহার হস্তে

আকর্ষণী সে পটাপট্ কাগজি লেবু ছিঁড়িয়া একজনের স্কন্ধস্থিত ধামায় ফেলিতে লাগিল। মোহিত বুঝিল, ইহারই বাগান।

লেবু তোলা শেষ হইলে সে লোকটির দৃষ্টি মোহিতের উপর পতিত হইল। তখন সে ধীরে ধীরে, যেন একটু ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূরে নিজ চটিজুতা পরিত্যাগ করিয়া, মোহিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

মোহিত পুস্তক হইতে মুখ উঠাইবামাত্র, লোকটি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরে করযোড়ে বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি এই দীঘির তিন দিককার বাগান, জমিদারের কাছে বছরে ১২০৲ খাজনায় জমা নিয়েছি। আজই প্রথম ফল পাড়তে এসেছি—কেশেদর হাটে নিযে গিয়ে বিক্রী করব। আজ বাগানে বাবার পা'র ধুলো পড়েছে—এটা বড় শুভলক্ষণ বলে আমার মনে হচ্ছে।"—বলিয়া ধামা হইতে একটি বাতাবী লেবু এবং একটি সুপক্ক বড় আতা লইয়া, মোহিতের সম্মুখে রাখিয়া, লোকটি আবার হাতযোড় করিল।

মোহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে বলিল, প্রভু, আমি ত জানিতাম, যখন তোমার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমার আর কোন বিষয় চিন্তা করিতে হইবে না। তোমার পদভরসা যেন আমার হৃদয়ে চিরদিন অচল থাকে, এই করিও দয়াময়।

মোহিত চক্ষু খুলিলে লোকটি বিনয় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ বাগানের ফল বেচে আমার দুপয়সা লাভ হয়।"

মোহিত বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার ভক্তিলাভ হোক। ভগবানের পায়ে যেন চিরদিন তোমার মতি থাকে।"

অর্থলাভের আশীর্ব্বাদ না পাইয়া লোকটা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। "তবে বিদায় হই ঠাকুর"—বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মোহিত পুনরায় গীতায় মনোনিবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিলে, লেবুটি ঝুলির মধ্যে রাখিয়া, আতাটি মোহিত ভক্ষণ করিল। দীর্ঘিকায় নামিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, দুই চারি গণ্ডূষ জলপান করিয়া, মোহিত আবার পথ চলিতে লাগিল।

যখন কাশিয়াদহ পৌঁছিল, তখন মধ্যাহ্নকাল। গ্রামের প্রান্তে হাট বসিয়াছে। রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মোহিত ভাবিল, কোথাও

বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া, স্নান করিয়া ফেলি। হাটের অনতিদূরেই একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখা যাইতেছিল।

বিশ্রামাশায় কিয়দ্দূরস্থিত একটি বটবৃক্ষের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, বৃক্ষতলে জটাজুটধারী ভস্মাবৃত-কলেবর একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—কয়েকজন নরনারী তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক বসিয়া হাত দেখাইতেছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পার্শ্বে একখানি গৈরিকবস্ত্র বিস্তৃত—তাহার উপর সিকি, দুয়ানি, পয়সা পড়িয়া আছে।

কৌতূহলবশতঃ একমিনিট কাল মোহিত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া, ক্রোধ ও বিরক্তিপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। মোহিত তখন অবস্থা বুঝিয়া মানে মানে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া মোহিত দেখিল—দুই তিনজন মাত্র লোক ঘাটে স্নান করিতেছে। সোপানের উপর ঝুলি প্রভৃতি এবং উত্তরীয়খানি রাখিয়া মোহিত জলে নামিল। কিছুক্ষণ অবগাহন করিয়া তাহার শরীর শীতল হইল। স্নানান্তে উঠিয়া উত্তরীয়খানি পরিধান করিয়া, তীরস্থিত একটি পরিচ্ছন্ন বৃক্ষতল নির্ব্বাচন করিয়া লইল। দুইটি নিম্নস্থ শাখায় সিক্ত বস্ত্রখানি বাঁধিয়া শুকাইতে দিয়া, মৃগচর্ম্ম পাতিয়া গীতাপাঠার্থ উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ পাঠ করিতে করিতে, মোহিতের অত্যন্ত ক্ষুধা উপস্থিত হইল। সেই উষাকাল হইতে পরিশ্রম—একটি আতা ভিন্ন আর কিছুই খায় নাই। ক্ষুধার অপরাধ কি? তথাপি মোহিত মনে মনে হাসিয়া নিজেকে বলিল, 'সাধু সন্ন্যাসী মানুষ—সারাদিন খাই খাই করিলে চলিবে কেন?'—আবার গীতায় মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু ক্ষুধা বড় বালাই। গীতা মানে না, উপনিষদ্ মানে না, বেদান্তদর্শন মানে না। মোহিত পাঠে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। তখন পুঁথি বন্ধ করিয়া, ঝুলি হইতে বাতাবী লেবুটি এবং ছুরিখানি বাহির করিল। গাছপাকা লেবুটি লাগিল—যেন অমৃত। আহারান্তে পুষ্করিণী হইতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া, বেদান্ত-রামায়ণখানি মোহিত খুলিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই ঘুমে তাহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল। গতরাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটিয়াছে বলিলেই হয়। তাহার পর রৌদ্রে ঝুলি

ঘাড়ে করিয়া এই ছয় ক্রোশ পথ হাঁটা। মোহিত বহি বন্ধ করিয়া, ঝুলিটি মাথায় দিয়া, কম্বলখানি গায়ে দিয়া, মৃগচর্ম্মের উপর গুটিসুটি হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

যখন জাগিল, তখন সূর্য্য অস্তমান। বস্ত্রখানি একটি শাখা হইতে গ্রন্থিচ্যুত হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে। মোহিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া, সেখানি খুলিয়া, বক্ষে ও পৃষ্ঠে উত্তরীয় স্বরূপ বাঁধিয়া লইল। তখন বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

সম্মুখে শীত-রজনী। এ বৃক্ষতলে কতক্ষণ থাকিবে? আশ্রয় অন্বেষণ আবশ্যক। ক্ষুধাও পাইয়াছে। তথাপি কিয়ৎক্ষণ অলসভাবে মোহিত সেখানে বসিয়া রহিল।

সূর্য্য অস্তমিত। মোহিত তখন উঠিয়া, যেখানে হাট বসিয়াছিল, সেই দিকে পদচালনা করিল। ভাবিল, সেখানে কোনস্থানে নিশ্চয়ই আশ্রয় মিলিবে।

বটবৃক্ষতলে আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী তখনও সেখানে বসিয়া। নিকটে আর কোনও লোক নাই। হাটও প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে।

মোহিতকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি স্মিতমুখে বলিল, "এস স্বাগত—বস।"—বলিয়া নিজের পার্শ্বস্থিত স্থান দেখাইল।

মোহিত মৃগচর্ম্মখানি বিছাইয়া বসিল।

সন্ন্যাসী তখন বলিল, "কোন্‌খানে ছিলে?"

কোথায় ছিল তাহা মোহিত বলিল।

"হল কি রকম বল।"

বুঝিতে না পারিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল, "এই—পাওনা থোওনা। রোজগার হে, রোজগার।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "সুবিধে নয়।"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমিও তেমন সুবিধে করতে পারিনি। এখানকার লোকগুলো ভারি ঠেঁটা হে ভারি ঠেঁটা। একেবারে কেপ্‌পনের শেষ। এক মাগীকে ছেলে হবার ওষুধ দিলাম, সে-ই আটগণ্ডা পয়সা দিয়েছে। বাকী সব, হাত দেখিয়ে, হাজার কথা বকিয়ে, দুটো চারটে পয়সা দিয়েছে। তুমি কাউকে ওষুধ বিষুধ দিলে নাকি?"

মোহিত বলিল, "ওষুধ জানিনে।"

"হাত্ দেখলে?"

"হাতও দেখতে জানিনে।"

"তবে কি জান? শুধু গাঁজা ভস্ম করতে জান বুঝি?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তাই বা জানি কই?"

"কি, এখনও গাঁজা খেতে শেখনি? নতুন ভর্ত্তি হয়েছ নাকি? তা আমি তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। পষ্ট কথা বলি ভাই—তুমি নেহাৎ আনাড়ি-রাম। মাথায় জটা কই? শুধু গেরুয়া পরলে আর কাঁধে ঝুলি নিলেই কি সন্ন্যাসী হয়? গায়ে ছাই মাখা চাই, মাথায় জটা চাই, ঘড়ি ঘড়ি গাঁজা খাওয়া চাই, চক্ষু রক্তবর্ণ হবে, তবে ত দেখে লোকের ভক্তি হবে। আমি যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, একবারে কলকাতা টেরিটিবাজার থেকে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে এতখানি এক পেল্লায় জটা কিনে মাথায় দিয়েছিলাম। ফাঁকি দিয়ে কি হয় স্যাঙাত?"—বলিযা সন্ন্যাসী ঠাকুর গাঁজা বাহির করিযা হস্তে ডলিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজা প্রস্তুত হইলে, কলিকায় ঠাসিযা বলিল, "কতদিন বেরিয়েছ?"

"বেশী দিন নয়।"

এদিক ওদিক চাহিযা, স্বর নামাইযা, মোহিতের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "বলি, কোন্ ধারা?"

মোহিত বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল, "ন্যাকামি কর কেন? যেন কিছুই জানেন না—নিরীহ ভাল মানুষটি! বলি, খুনী মোকদ্দমা, না ডাকাতি মোকদ্দমা, না জালের মোকদ্দমা—কিসে পড়েছিলে?"

মোহিত গম্ভীর ভাবে বলিল, "কোনও মোকদ্দমায় পড়িনি।"

সন্ন্যাসী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "ইলুলো!—দাঁত দেখি তোর বয়স কত? শুধু শুধু পালিয়েছ! তুমি তেমনি ইয়ার কিনা!"—বলিয়া সন্ন্যাসী গাঁজার ছিলিমে অগ্নি সংযোগ করিল।

মোহিত নীরব। সন্ন্যাসী দুই চারি টান টানিয়া বলিল, "সত্যি, বল না! আমার কাছে লুকোও কেন? আমি ডিটেকটিব নই—কোন্ শালা মিছে কথা কয়, তোমার দিব্যি।"

তথাপি মোহিত স্বীকার করে না যে সে ফৌজদারীতে পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী আরও দুই চারি টান টানিয়া, কলিকাটি নামাইয়া বলিল, "তুমি

বললেই আমি বিশ্বাস করব কিনা? এত লোকের হাত দেখে শুণে বলছি—কত কথা মিলছে কত কথা মিলছে না। কিন্তু বাবা তোমার হাত না দেখেই বলে দিচ্ছি, তুমি দায়রা মোকদ্দমার ফেরারী আসামী। কলকের মাথায় আগুন জ্বলছে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা—আচ্ছা, এইতে হাত দিয়ে বল দেখি যে তুমি ফেরারী আসামী নও।"

মোহিত সে পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হইল না।

শেষে সন্ন্যাসী গাঁজার কলিকা মোহিতের দিকে সরাইয়া বলিল, "খাবে?"

"না।"

সন্ন্যাসী তখন নিঃশেষে গাঁজাটুকু ভস্ম করিয়া বলিল, "ওঠ—চল।"

মোহিত বলিল, "কোথা?"

"ঠাকুরবাড়ী। এখানে ঠাকুরবাড়ী আছে জান না বুঝি?"

"না।"

"এ অঞ্চলে প্রথম এসেছ কিনা। গ্রামের ভিতর রাধাগোবিন্দজীর মন্দির আছে। রোজ মালপুয়া ভোগ হয়। সাধু সন্ন্যাসী এলে প্রসাদ পায়। আট খানা—দশ খানা—পনেরো খানা—যত খেতে পার, বেশ বড় বড় গরম গরম মালপুয়া, ঘিয়ে চব্ চব্ করছে—তোফা হে—অতি তোফা! আজ রাত্রে সেই-খানেই আমি থাকব। সাধু সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্যে পাকা ঘরও আছে—একবারে জামাই আদর—কেবল বউ নেই। যাবে ত আমার সঙ্গে এস।"—বলিয়া গাত্রোত্থান করিল।

এই ভণ্ডটার সাহচর্য্য মোহিতের কাছে মোটেই লোভনীয় মনে হইতেছিল না। তথাপি, আহার ও আশ্রয়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গ স্বীকার করিল। দুইজনে ধীরপদে ঠাকুরবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল!

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ সাধুসঙ্গ ঘনীভূত

পথে যাইতে যাইতে মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনার নাম কি?"

"আমার নাম ক্ষেমানন্দ ভারতী। যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন অবশ্য অন্য নাম ছিল। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম এখনও কিছু হয়নি, গৃহস্থ নামই এখনও আছে।"

"গৃহস্থ নাম বলতে নেই, কাউকে বোলো না। পুলিস জানতে পারলে খাতায় নাম লিখে নিয়ে তদন্ত করবে। আমায় চুপি চুপি বলতে পার ; আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না।"—বলিয়া সন্ন্যাসী হাসিতে লাগিল।

মোহিতকে নীরব দেখিয়া বলিল, "দেখ, একটা বিষয় সাবধান করে দিই। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে খুব ভারিক্কে হয়ে থাকবে, বুঝেছ ? এমন ভাবটা দেখাবে যেন সর্ব্বদাই মনে মনে পরমার্থ চিন্তা করছ। পৃথিবীর কিছু, যেমন টাকাকড়ি, লুচি, মালপুয়া—এ সব জিনিষের প্রতি যেন দৃক্‌পাতও নেই। আমরা যে সব মস্করা করি, তা গোপনে নিজেদের মধ্যে। ওদের সামনে একেবারে গম্ভীর বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি। এক কায কর না—তুমি বরং আমার চেলা সাজ। দুই একটা চেলা টেলা না থাকলে সাধু সন্ন্যাসীর কদর বাড়ে না। আর তোমার লাভ এই হবে, আমার সঙ্গে বেড়ালে, নানা রকম বুজরুকি, রোজগারের ফন্দি তোমায় বাৎলে দেব। আর, একটু বিজ্ঞানও শিখিয়ে দেব।"

মোহিত বলিল, "আপনি বিজ্ঞান পড়েছেন নাকি ?"

"পড়েছি বইকি। আজকাল সহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারী কদর। দু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক্ মাফিক্ ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লোক—ডেপুটি, মুন্সেফ তোমায় গুরু করে মন্তর নেবে। দিব্যি পাওনা থোওনা হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম। আমি রীতিমত লেখাপড়া জানি কিনা। সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখ্যু, তা নই। বললে না পিত্যয় যাবে—আমি ছাত্রবৃত্তি ফেল। একখানা বিজ্ঞানের বাঙ্গালা বই পেলে পড়ে বুঝতে পারি এটুকু জাঁক আমার মনে ছিল। একটা সুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড়লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি বাবুরা কেউ নেই। পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান রয়েছে। নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞানপ্রবেশ।' যাহা দেখা, বুঝলে কিনা, তাঁহা বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকা ধার্ম্মিকটির মত আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। অন্য বাড়ীতে অতিথি হলাম। সেই বইখানা পড়ে পড়ে, বিজ্ঞানটা রীতিমত আয়ত্ত করে নিয়েছি। যে পাতে ছেলেটার নাম লেখা ছিল, সে পাতটা ছিঁড়ে ফেলেছি। মধ্যে মধ্যে পড়ি। তুমি যদি চেলা হয়ে আমার

খুব সেবাশুশ্রূষা কর—আর, বইখানি নিয়ে চম্পট না দাও, তবে সেখানি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? পড়া-শুনো কতদূর হয়েছিল?"

মোহিত বলিল, "বেশী দূর নয়।"

"হেঁ হেঁ—ওদিকে বুঝি চু চু, ঘট উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমায় মুখে মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিছু ভেব না। সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে? ও কথা বললে চলবে কেন? আজকালকার বাজারে ছাত্রবৃত্তি ফেল সন্ন্যাসী ক'টা মেলে? চেলা হয়ে পড়, এমন সুবিধেটি হঠাৎ পাবে না কিন্তু।"

এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ঠাকুরবাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল। নাটমন্দিরের একদিকে বিগ্রহের মন্দির, অন্যদিকে অতিথিশালা। মোহিত প্রবেশ করিয়া দেখিল, অতিথিশালার বারান্দায় তিনজন প্রৌঢ়বয়স্ক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে—তন্মধ্যে একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল। তদ্ভিন্ন একজন বালক সন্ন্যাসী বসিয়া গাঁজা সাজিতেছে এবং একজন যুবক সন্ন্যাসী, বিল্বকাষ্ঠের বৃহৎ দণ্ড হাতে করিয়া একটা পাত্রস্থিত সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। মোহিত ও ক্ষেমানন্দকে দেখিয়াই সেই হৃষ্টপুষ্ট সন্ন্যাসীটি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—

"আরে—আওর দো মূরত সাধু আয়া। উসমে আওর দো ছটাক ভাঙ্গ ডাল্ দে।"—বলিয়া, উচ্চতর স্বরে হাঁকিতে লাগিল, "পুজেরীজি—এ পুজেরীজি!—বাবু—এ বাংগালী বাবু!"

স্বর শুনিয়া একজন কৃশকায় ভট্টাচার্য্য নামাবলী গায়ে দিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি বলছেন স্বামীজি?"

স্বামীজি বলিলেন, "পুজেরীজি—আওর দো মূরত সাধু আয়া। দো ছটাক কিসমিস, দো ছটাক চিনি, আওর আধাসের দুধ মাঙ্গা দো।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে মোহিত ও ক্ষেমানন্দ সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। স্বামীজি বলিলেন, "বৈঠো।"

দুইজনে উপবিষ্ট হইলে স্বামীজি মোহিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"তুঝ্‌নে নয়া ভেখ্‌ লিয়া?"

মোহিতের সঙ্গী বলিল, "একবারে নয়া।"

"তেরেহি চেলা হ্যায়?"

ক্ষেমানন্দ মোহিতের পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ—না—এখনও উস্কো চেলা নেহি কিয়া। লেকেন, হামরা চেলা হোনেকে বাস্তে উস্কো বহুৎ আকিঞ্চন।"

"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। দেখ্, হামারা দো চেলা। এক চেলা ভাঙ্গ পিষে, এক চেলা গাঁজা চড়ায়!"—বলিতে বলিতে বালক চেলাটি গাঁজার কলিকা গুরুহস্তে প্রদান করিল। অগ্নিসংযোগে তিনি কয়েক টান টানিয়া, ছিলিমটি ক্ষেমানন্দের হাতে দিলেন। ক্ষেমানন্দ প্রসাদ পাইয়া, অপর একজন সন্ন্যাসীকে দিল। সে ব্যক্তি দুই টান টানিয়া, মোহিতকে দিবে বলিয়া হাত বাড়াইল। এমন সময় স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, "ক্যারে—তুভি গাঁজা পীতা হ্যায়?"

মোহিত বলিল, "নেহি।"

"বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। মৎ পী—গাঁজা মৎ পী—তু আভি বাচ্চা হ্যায়। গাঁজা পিয়েগা তো পাগল হো যায়েগা—মর যাযেগা। ভাঙ্গ পী—গাঁজা মৎ পী। ভাঙ্গ আচ্ছা হ্যায়। 'ভাঙ্গ পিযে, মৌজ করে, বনা রহে অবধূত'—ইয়ে কবিৎ হ্যায়। যব তেরা চালিশ বরষ কা উমর হো—তব গাঁজা পী। আভি ভাঙ্গ পী।"

গাঁজার কলিকাটি নিয়মিত ভাবে বয়স্ক সন্ন্যাসীগণের মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

এদিকে একটা বৃহৎ পাত্রে যথেষ্ট চিনি ও দুগ্ধের সহিত কিসমিস মিশ্রিত সিদ্ধির বৃহৎ মণ্ডটি গোলা হইল। মন্দিরের পরিচারক সদ্যধৌত মাটীর নূতন ভাঁড় আনিয়া প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে একটা করিয়া দিয়া গেল। সেই ভাঁড়ে করিয়া সকলে সিদ্ধি পান আরম্ভ করিল।

দুই ভাঁড় সিদ্ধি পান করিবার পর স্বামীজি দেখিলেন, মোহিত পান করিতেছে না। বলিলেন—"ক্যারে, তু ভাঙ্গ ভি নেহি পীতা হ্যায়?"

মোহিত বলিল সে সিদ্ধি পান করে না।

"ভাঙ্গ নেহি পীতা হ্যায়! তব শুন্, এক কবিৎ শুন্—

জিস্‌নে ইস্ দুনিয়ামে আ-কর্, এক্‌দিনভি পিয়ে ন ভাঙ্গ,
উস্‌নে, সচ পুছোতো, ক্যা দেখা জাহানকা আব্রঙ্গ?

সমঝা? নেহি সমঝা? জিস্‌নে ইস্ দুনিয়ামে আ কর্, ইয়ানে জনম্ লে কর্, একদিনভি ভাঙ্গ নেহি পী লিয়া, উস্‌নে জাহান্‌কা—জাহান্ কহতেহেঁ দুনিয়াকো—ফার্সী হায়—উস্‌নে দুনিয়াকা রং ঢং ক্যা দেখা? কুছ নেই দেখা।"—বলিয়া স্বামীজি হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অপর সন্ন্যাসিগণ হাসিয়া লুটাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছ নেই দেখা।"

ক্ষেমানন্দ বলিয়া উঠিল, "বাহবা, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়, বহুৎ আচ্ছা কবিতা হায়।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। আরতির আর বিলম্ব নাই। একটি দুইটি করিয়া গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আরতি দর্শনের জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। সোণার চশমাধারী শাল গায়ে একটি স্থূলকায় বাবুও আসিয়াছেন। আরতির একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া তাঁহারা সন্ন্যাসীদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

স্বামীজি তখন চারি পাত্র ভাঙ্গ শেষ করিয়াছেন। পঞ্চম পাত্রটির কিয়দংশ-মাত্র পান করিয়া অবশিষ্ট বালক চেলাকে প্রদান করিলেন। সে তাহা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর স্বামিজী বলিলেন, "আরে বাচ্চা—থোড়া ভজন শুনা দে। বাবুলোগ, মায়িলোগ আয়ে হ্যঁায়, থোড়া নাম শুনা দে।"

বালকটি তখন দুইটা কাঠের খঞ্জনী বাহির করিল। কাঠের এক অংশ কাটা, সেখানে একযোড়া করতাল লাগান আছে। স্বামীজি একটা খঞ্জনী বাজাইতে লাগিলেন। বালক অপরটা বাজাইয়া, নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

"রামনাম লাড্‌ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিনাম মিশ্‌রি, ঘোর ঘোর পী।"

স্বামীজিও বাজাইতে বাজাইতে তালে তালে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে গান থামিল। শ্রোত্রীগণের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং অগ্রবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছেন, স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন—"হিন্দী গীত তুমি বুঝিয়েছে মায়ি?"

"হ্যাঁ বাবা, কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।"

স্বামীজি বলিলেন, "রামনাম লাড্‌ডু আছে (অঙ্গুলি সঙ্কেতে গোলাকার পদার্থ দেখাইয়া)—সনেশ—রসগুল্লা। গোপালনাম ঘিউ আছে, আর হরিনাম সেটা মিশ্‌রি আছে।"

বিধবাটি বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, রাম নাম সন্দেশের চেয়েও সুতার, হরিনাম মিছরির চেয়েও মিষ্টি।"

"হাঁ—বহুৎ মিষ্টি হ্যায়—বহুৎ মিষ্টি হ্যায়। এক সাধুনে বোলা—

ভরোসা দেহকা মৎ রাখো,
অমি-রস নামকা চাখো।

বুঝিয়েছে মায়ি? ইয়ে যো মানুষকা দেহ হ্যায়, ইস্‌কা কুছ্‌ ভরোসা নেহি হ্যায়। কুছ্‌ভি নেহি।"

অপর সন্ন্যাসিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কুছ্‌ভি নেহি—কুছ্‌ভি নেহি।"

বিধবাটি বলিলেন, "ঠিক কথাই ত বাবা। এ দেহের আর ভরসা কি? এই আছে এই নেই।"

স্বামীজি বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়েছে মায়ি, ঠিক বলিয়েছে। তাই সাধু কহিয়েছে—অমি-রস নামকা চাখো। হাঁ। হরিকা নাম যো হ্যায় উযহ ইমৃৎ হ্যায়—পীনেসে জীবকে মুক্তি হোতা হ্যায়।"

সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, 'লোকটি আসল তত্ত্বজ্ঞানী বটে। এমন সাধুদর্শনে পুণ্য আছে।'—কথাগুলি অবশ্য স্বামীজি বেশ শুনিতে পাইলেন।

স্থূলকায় বাবুটি বলিলেন, "ঠিক কথা বাবা। আমাদের বাঙ্গলাতেও গান আছে—'নামামৃত পান কর মন, এ সংসার মিছারি মায়া!'—ইয়ে সংসার কুছ চীজ নেহি হ্যায়।"

স্বামীজি তখন দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ভক্তি গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"সোঁয়াসা সোঁয়াসা কৃষ্ণ রট্, সোঁয়াসা বৃথা ন খো,
ন জানে ইয়হ সোঁয়াসকা এহি অন্ত ন হো।"

আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দর্শকগণ স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া কেহ সিকি কেহ দুয়ানি কেহ পয়সা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিলেন। স্থূলকায় বাবুটি ঠং করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন। সকলে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

আরতি শেষ হইলে, ভট্টাচার্য্য আসিয়া সন্ন্যাসিগণকে লুচি ও মালপুয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। মোহিতও হাত পাতিয়া লইল—কিন্তু তাহার মাথা যেন কাটা যাইতে লাগিল। এই ভণ্ডদের দলে মিশিয়া সেও যেন তাহাদেরই একজন হইয়া, মালপুয়া খাইতে আসিয়াছে—ইহা মনে করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় লজ্জা ও ক্ষোভে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে উপায় নাই। ক্ষুধায় তাহার নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছিল। একটি অন্ধকার কোণে বসিয়া, কোন মতে চোখের জল চোখে বাঁধিয়া রাখিয়া আহার শেষ করিল।

বিগ্রহের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজারী প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিয়াছে। আর যে দুইজন সন্ন্যাসী ছিল, তাহারা স্বামীজিকে বলিল, "প্রণামীতে আজ কত হইল?"

যুবক চেলা বলিল, "দুই টাকা হইয়াছে।"

একজন সন্ন্যাসী বলিল, "আমাদের ভাগ দিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া স্বামীজি বলিল, "কেন ? ভাগ কিসের ?"

"বাঙ্গালীরা যে প্রণামী দিয়া গিয়াছে, তাহা সকল সন্ন্যাসীকে দিয়া গিয়াছে। একলা তোমাকে দিয়া যায় নাই।"

স্বামীজি বলিল, "বটে !—আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পায়ের কাছে রাখিয়া গেল কেন তবে ? শ্লোক বলিলাম আমি। চেলা নাচিয়া গান গাহিল আমার। আমি তাহাদের খুসী করিয়াছি, তাহারা আমাকে টাকা দিয়াছে। তোমরা কি করিয়াছ যে বখরা চাহিতেছ ? লজ্জা করে না ?"

অপর সন্ন্যাসীদ্বয় বলিল, "আমরাও ত এইখানে বসিয়া ছিলাম। আমরা কি ঘাস কাটিতে আসিয়াছি ? দাও, ভাগ দিতে হইবে।"

তুমুল কলহ বাধিয়া উঠিল। তাহার পর গালাগালি। স্বামীজি এমন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ আরম্ভ করিল যে শুনিলে কাণে আঙুল দিতে হয়। অবশেষে সিদ্ধি ঘুঁটিবার সেই বিল্বদণ্ডটা হাতে করিয়া ঘুরাইয়া বলিল, 'কে ভাগ লয় দেখি। আজ খুনোখুনী হইবে।' যুবক চেলাটি গুরুর হইয়া খুব আস্ফালন করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ন্যাসীদ্বয় বেগতিক দেখিয়া নিরস্ত হইল।

স্বামীজি তখন চেলাদের লইয়া, ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। একজন সন্ন্যাসী ক্ষেমানন্দকে বলিতে লাগিল, "দেখিলে ? একবার অবিচার দেখিলে ? এই রকম করিয়া গরীবকে ফাঁকি দেওয়া ?"

অপর সন্ন্যাসী বলিল, "কেন উনি দুটা শ্লোক বলিয়াছেন এবং দুইজন চেলা সঙ্গে আনিয়াছেন বলিয়া কি সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবেন ? আমাদের হক মারা গেল—অপমানিতও হইলাম।"

মোহিত নীরবে এই অভিনয় দেখিতেছিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। পাষণ্ডগণের সহিত এক রাত্রি যাপন করিতে হইবে—এই কল্পনামাত্র তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল। অবশেষে মনের ধিক্কারে সে স্থির করিল—না—মাঠের মধ্যে গাছের তলায় শুইয়া থাকিতে হয় সেও ভাল—এই নরাধমদের সহিত রাত্রিবাস করিতেছি না। সে তখন নিজের ঝুলি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া ঠাকুরবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বিপত্নীকের কাহিনী

রাধাগোবিন্দজীর মন্দির হইতে বাহির হইযা মোহিত মনের আবেগে অনেকদূর পর্য্যন্ত হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। গ্রামপথ জনশূন্য। অধিকাংশ গৃহস্থই শয়ন করিয়াছে, ক্বচিৎ দুই একটা বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়া অল্প আলোক নির্গত হইতেছে।

দশমিনিট কাল এইরূপ যদৃচ্ছা চলিবার পর মোহিতের মন কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল। সে তখন চিন্তা করিবার অবসর পাইল। ভাবিল—এই রাত্রে কোথায় যাই? কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে যদি আশ্রয় প্রার্থনা করি—হয়ত আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে। 'সাধুসন্ন্যাসী' শ্রেণীর যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি, তাহাতে গৃহস্থের ওরূপ মনে করা কিছুই বিচিত্র নহে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মোহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুর তাহাকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিযা উঠিতেছে। কিয়দ্দূরে গিয়া মোহিত দেখিল অনেকটা স্থান খোলা, এখানে ওখানে কযেকটা চালা বাঁধা রহিয়াছে, অদূরে বৃহৎ বটবৃক্ষ। মোহিত বুঝিল, দিবসে যেখানে হাট বসিয়াছিল সেইখানেই আবার আসিয়া পড়িয়াছে।

মোহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল—হাটের দুইদিকে অনেকগুলি স্থায়ী দোকান। দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া শয়ন করিযাছে। চালাগুলির নিকট গিয়া দেখিল, দুই তিনখানায় মৎস্যের দুর্গন্ধ—হাটের সময় জেলেনীরা এই-গুলিতে বসিয়া মাছ বেচিয়া থাকে। দুই তিনখানা গন্ধহীন পাওয়া গেল বটে কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার। মেঝেটাও পার্শ্বস্থ ভূমির সমতল—এখানে শয়ন করিলে রাত্রে সর্পাদির আশঙ্কা। সুতরাং মোহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়া বড় রাস্তা ধরিয়া চলিল।

অধিকদূর যাইবার পূর্ব্বেই দেখিল, পথপার্শ্বে উচ্চ বারান্দাযুক্ত একখানা বাঙ্গলা ঘর। ভাবিল এই বারান্দায় নিরাপদে শুইয়া থাকা যাইতে পারে। রাস্তা হইতে নামিয়া, বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া মোহিত দাঁড়াইল। ভাবিল যাহার বাড়ী, তাহার অনুমতি লইয়া বারান্দায় শযন করাই ভাল। তাই সে অনতি-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "এখানে কে আছে?"

কোনও উত্তর নাই।

মোহিত গলা আর একটু চড়াইয়া ডাকিল, "এখানে কেউ আছ কি?"

কোনও উত্তর নাই। মোহিত ভাবিল, বাড়ীটা খালি নাকি? সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিল। অল্প যাহা আলোক ছিল, তাহাতে দেখিল সম্মুখের দরজাটি তালাবন্ধ। তখন সে ধীরে ধীরে বারান্দার প্রান্তে গিয়া দেখিল, পার্শ্ব দিয়াও বারান্দা চলিয়া গিয়াছে—বাড়ীটির চারিদিকেই বারান্দা। বারান্দা দিয়া গিয়া ক্রমে বাড়ীর পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি ঈষন্মুক্ত জানালা পথে আলোক নির্গত হইতেছে। জানালার কাছে গিয়া দেখিল ভিতরে কক্ষে মেঝের উপর আসন পাতিয়া, অনুমান ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক মুদ্রিত চক্ষে করযোড়ে বসিয়া আছেন। বুঝিল লোকটি উপাসনায় ব্যাপৃত। এখন ত উঁহাকে ডাকা যায় না। মোহিত চোরের মত কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, সেখান হইতে সরিয়া সেই কক্ষের দ্বারের কাছে আসিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শ্রান্ত হইয়াছে, ভাবিল ঝুলিটা মাটীতে রাখিয়া একটু বসি। বসিবার সময় ঝুলিটা মাটীতে পড়িয়া শব্দ হইল। তখন ভিতর হইতে শব্দ হইল—"কেও?"

মোহিত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

বলিতে বলিতে বাবুটি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন—"আপনি সন্ন্যাসী? আসুন, ভিতরে আসুন।"

মোহিত বলিল, "ভিতরে যাবার আবশ্যক নেই। আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম, তার জন্যে আমায় মাফ করবেন। আপনার বারান্দায় আমি রাত্রিটা শুয়ে থাকব, তাই আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "শোবেন? তা বারান্দায় কেন? এই অগ্রহায়ণের হিমে আপনার কষ্ট হবে। আমার এই ঘরেই শোবেন আসুন বাবাজী।"

মোহিত বলিল, "না, আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে ইচ্ছে করিনে। বারান্দাতে আমি শুতে পারব এখন।"

"বিলক্ষণ, তা কি হয়? আমি শোব ঘরে আর আপনি বারান্দায় থাকবেন?—আসুন আসুন। আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না—মস্ত ঘর।"

মোহিত তখন বাবুটির পশ্চাৎ ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, কক্ষখানি সুপরিসর বটে। এক স্থানে একখানা তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার পাশে একখানা বেঞ্চির উপর একটা ষ্টীলট্রাঙ্ক—তাহার পাশে একটা বিলাতী চুল্লী এবং এনামেলের কেটলি, পিরিচ, পেয়ালা প্রভৃতি চা

পানের সরঞ্জাম। তক্তপোষের শিরোদেশে একখানি টেবিলের উপর একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে—পার্শ্বে খানকতক মোটা মোটা পুস্তক সাজান। কক্ষটির অপর প্রান্তে দেওয়ালের গায়ে গুটান গুটান চারি পাঁচখানা মানচিত্র, দুইখানা বেঞ্চি এবং একটা অৰ্দ্ধভগ্ন কালো বোর্ড।

প্রবেশ করিয়া বাবুটি তক্তপোষে বসিয়া, পার্শ্বে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আসুন—বসুন।"

মোহিত বসিয়া, কক্ষতলস্থ আসনখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "আপনি উপাসনায় ছিলেন, আমি ব্যাঘাত করলাম, বড় অন্যায় হল।"

বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁঃ—আমার আবার উপাসনা! গৃহীর কি মনস্থির হয়? বসে একটু ভগবানকে ডাকতে চেষ্টা করি এই পর্য্যন্ত। আপনি এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য।

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে বাবুটি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, যদি অনুমতি করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

বাবুটি ভ্রূযুগল অঙ্গুলির দ্বারায় চাপিয়া বলিলেন, "মানুষের মৃত্যু হলে—আত্মা বলুন—যা বলুন, তার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল, "হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করতে হলে—"

লোকটি বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব আমি জানি—পড়েছি। আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার নিজের মনের—শাস্ত্র টাস্ত্র ছেড়ে দিন—নিজের মনের স্বাধীন বিশ্বাস কি তাই আমাকে বলুন।"

মোহিত বলিল, "আমার নিজের মনের বিশ্বাস, মানুষ মরে গেলেও তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে।"

বাবুটি একমিনিট কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "অস্তিত্ব থাকে। আমারও এই বিশ্বাস। বাবাজী, আর একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনি দয়া করে সেটা আমার অহমিকা বলে বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যে কিম্বা আপনাকে ঠকিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছি না। কোনও কারণে আমার মন বড় ব্যাকুল। ওটা অসংলগ্ন কথা হল—যাক। আপনি যে বললেন, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এই আপনার স্বাধীন বিশ্বাস—আচ্ছা, এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি?

কি থেকে অর্থাৎ কি বিবেচনা করে আপনি বিশ্বাস করেছেন যে মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে?"

মোহিত বলিল, "আমার বিশ্বাস a priori ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—"

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন, "আপনি ইংরাজী জানেন?"

"জানি।"

"পাশ্চাত্য দর্শন পড়েছেন?"

"কিছু কিছু।"

"ভালই হল। আমাদের চিন্তাপ্রণালী মিলবে। বলুন তার পর।"

মোহিত বলিতে লাগিল, "আমার বিশ্বাস—প্রথমতঃ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর সৃষ্টির অভিপ্রায় মঙ্গলময়। মানুষকে যে তিনি সৃষ্টি করেছেন—তা খামখেয়ালিভাবে করেন নি—তাকে ক্রমে পূর্ণ পরিণতি দেবার অভিপ্রায়েই করেছেন। সোপানের পর সোপানে উঠিয়ে তিনি মানুষকে সেই পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দেবেন। ইস্কুলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস থাকে, আমার মনে হয় মানুষের এক একটা জন্ম সেই রকম এক একটা ক্লাস। একটা জন্মে মানুষ নিজের কতটুকুই বা উন্নতি করতে পারে? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি সবই শেষ হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা যে নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ছেলেখেলার মত দাঁড়ায়। তাই আমি বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পরেও মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে—তাকে আত্মাই বলুন আর যাই বলুন। সেই আত্মা আবার নূতন করে মানবদেহ ধারণ করে। গত জন্মে যেখানে শেষ করেছিল, এ জন্মে সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।"

বাবুটি বলিলেন, "আমিও এক সময় তা ভাবতাম। আচ্ছা আমার একটা কথার উত্তর দিন। গাছের কি আত্মা আছে? গাছ মরে যাবার পর কি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এবং সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আবার নূতন গাছ হয়ে জন্মায়?"

মোহিত বলিল, "আমার তা মনে হয় না।"

"তা হলে ত গাছ সৃষ্টি করা ভগবানের উদ্দেশ্যহীন ছেলেখেলা?"

"তা কেন? গাছ মরে যায়, কিন্তু তার ফলের বীজ থেকে তার যে শত শত বংশধর জন্মগ্রহণ করেছিল—তারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে রইল।"

বাবুটি বলিলেন, "সেই রকম আমি যদি বলি, ভগবান পূর্ণ পরিণতির জন্যেই

মানুষ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ পরিণতি পাবে এ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পূর্ণ পরিণতির জন্যে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। বংশাবলীক্রমে মানবজাতি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—তাঁর অভিপ্রায় সফল করবে।"

মোহিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ—তর্কের এ দিকটা আমার মনে কখনও উদয় হয়নি। আমি ভেবে দেখব। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আপনার এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

বাবুটি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "অবশ্যই পারেন। দেখুন, আমি অল্প বয়সে খুব হিন্দু ছিলাম—সবাই যেমন থাকে। যখন প্রথম কলেজে ঢুকি, মনে আছে আমাদের বাসার একটি ছাত্র বলেছিল, গঙ্গা অন্য সকল নদীরই মত, তার বিশেষ কোন পবিত্রতা নেই—তখন একমাস ধরে তাকে নানারূপ বিদ্রূপ করেছিলাম। তারপর যখন বি-এ ক্লাশে পড়ি—বিজ্ঞানের আলোচনা করতে করতে, অল্পে অল্পে মনে হতে লাগল, আমাদের এই সব কালী দুর্গা, এ সব মুনি ঋষিদের কবিকল্পনা নয় ত ? ক্রমে যত আলোচনা করতে লাগলাম, ততই সংশয় বেড়ে যেতে লাগল। একদিন আমাদের বাসায় একটা ভোজ ছিল, ছেলেরা দুষ্টামি করে সাধারণ বরফি বলে আমায় সিদ্ধির বরফি খাইয়ে দিযেছিল। অল্পক্ষণ পরেই নেশায় একেবারে মাথা চম্ চম্ করে উঠল। সে রাত্রে সিদ্ধির নেশায় আমি চোখ বুজে কত রকম চমৎকার ছবি যে দেখতে লাগলাম—সে আর কি বলব! পরদিন প্রকৃতিস্থ হয়ে মনে মনে ভাবলাম, হিন্দুপুরাণের এই যে তেত্রিশকোটি দেবতা, এ সব বিলকুল মুনিঋষিদের স্বপ্ন। এম-এ ক্লাশে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার পড়ে পড়ে একেবারে ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠলাম। পাশ করে হেডমাষ্টারি করতে লাগলাম—যতই পড়ি ততই ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠি। এই রকম বছর কতক কাটলে, আমার—"

ভিতরে কোন একটা কক্ষে ঘড়িতে রাত্রি ১২টা বাজিল। বাবুটি ঘড়ি শুনিয়া, অর্দ্ধ মিনিট কাল যেন ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুতরস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল। সে শোকে আমি একবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। ছ মাস কেটে গেল—তবুও মনস্থির হল না। এক জায়গায় কোথাও থাকতে পারিনে—খালি ছটফট্ করে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলে এই ডেপুটি ইন্সপেক্টারি চাকরি নিলাম। তিনটে জেলার যত

ইস্কুল পাঠশালা—ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করে বেড়াই। এ বাঙ্গলাটা এখানকার মাইনার ইস্কুল—আজ সকালেই এসেছি। কাল সকালে আবার স্থানান্তরে যাব। কথাগুলো বড় অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে—যাক। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, আমার মনে হতে লাগল, মরে গেলেই মানুষের সব শেষ হয় এ হতেই পারে না। তা হলে ত আর আমাদের দেখা হবে না—কস্মিন কালেও নয়। এ একবারেই অসম্ভব। নিশ্চয় আবার দেখা হবে। তখন বিশ্বাস করতে লাগলাম, নিশ্চয় আমার স্ত্রী আত্মারূপিণী হয়ে কোথাও আছেন। আমার আত্মা এই দেহ যখন পরিত্যাগ করবে, তখন আবার আমাদের মিলন হবে। পরলোকে বিশ্বাস ফিরে এল, সংশয়বাদ ঘুচে গেল। ঈশ্বরে বিশ্বাসও ফিরে পেলাম। তাই অবসর পেলেই আমি ভগবানকে ডাকি। বলি, হে প্রভু, সে আমার কোথায় আছে, তাকে ভাল রেখ, সুখে রেখ, আবার যেন তার দেখা পাই।"

বলিয়া বাবুটি নীরব হইলেন। মোহিত বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিল। বাবুটি যখন ওরূপ ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলেন, সে সময় আসিয়া ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার অনুশোচনা তীব্রতর হইল।

বাবুটি তক্তপোষ হইতে নামিয়া, কলসী হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া পান করিলেন। আর এক গেলাস জল লইয়া, বাহিরে গিয়া মুখ চক্ষু ধৌত করিয়া অসিলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "বাবাজী, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার আহার হয়েছে কিনা তা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে ভুলে রয়েছি।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার এখানে পৌঁছবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমার আহার হয়ে গেছে।"

"আপনাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। আপনি এই তক্তপোষে শয়ন করুন।"

"আপনি কোথা শোবেন?"

"বিছানার তলায় যে শতরঞ্জখানা আছে, সেইটে টেনে আমি মেঝের উপর শুচ্ছি।"

মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "না না, সে কি হতে পারে—আমি মেঝেতে শুচ্ছি। আমার কাছে কম্বল রয়েছে।"

বাবুটি বলিলেন, "না, মেঝেতে আপনার কষ্ট হবে। আপনি তক্তপোষেই শুন্।"

মোহিত বলিল, "কিছু কষ্ট হবে না। ঐ যে দুখানা বেঞ্চি রয়েছে, ঐ জুড়ে না হয় আমি শুচ্ছি।"

বাবুটি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি বেঞ্চিতে শুলেও আমায় মেঝেতে শুতে হবে। আমি ত তক্তপোষে শুই না। আপনি না এলেও, তক্তপোষ থেকে বিছানা নামিয়ে আমি মেঝেতে শুতাম।"

মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তক্তপোষে শোন না কেন?"

বাবুটি মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার স্ত্রীর দেহের অণু পরমাণু এই পৃথিবীর সঙ্গে মিশে রয়েছে যে! তাই আমি মাটীতে শুতেই ভালবাসি।"

মোহিত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার বিছানাটি নামাইয়া দিল। সেই তক্তপোষে শুইয়া, অধিকরাত্রে স্বপ্ন দেখিল, যেন চিনি আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিতেছে—'এস।'

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, ডেপুটি ইনস্পেক্টারবাবুর অনুরোধক্রমে তাঁহার সহিত গোরুর গাড়ীতে মোহিত খুলনা যাত্রা করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ রমণ ঘোষের দুর্গতি

সেদিন রমণ ঘোষ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেইমাত্র বড় ঘরের রকে বসিয়া একটি ছিলিম তামাক সাজিয়াছে, এমন সময় তাহার সপ্তদশবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র আসিয়া বলিল, "বাবা, দরজায় সেপাই।"

রমণ ঘোষ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেপাই কিরে? কেন এসেছে?"

বালক উত্তর করিল, "তা ত জানিনে। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম, বললে বাইরে যেতে পাবে না, হুকুম নেই।"

এমন সময় বাড়ীর ঝি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "ওগো ঘোষজা মশাই, খিড়কী দরজায় সিপুই দাঁড়িয়ে।"

শুনিয়া রমণ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, সেপাই কেন এল?"

ঝি বলিল, "আমি পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে যাচ্ছিলাম, সিপুই বললে যেতে পাবিনে, দারোগার হুকুম নেই।"

রমণ ঘোষ তখন উভয় দরজায় গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই লালপাগড়ীধারী

দুইজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল, "এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, কারু বাইরে যাবার হুকুম নেই।"

রমণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

"আমরা তা জানিনে। এখনি দারোগা সাহেব আসবেন, এলেই জানতে পারবে।"

রমণ ঘোষ চিন্তান্বিত হইয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কন্যা আসিয়া বলিল, "বাবা, গোয়াল ঘরের পিছনে যেখানে পাঁচিল খানিক ভাঙ্গা আছে, সেখানেও একজন সেপাই।"

রমণ ঘোষ সেইদিকে গিয়া দেখিল, যথার্থ কথা বটে। ভাঙ্গা প্রাচীরের বাহিরেও একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে। নির্গমনের সমস্ত পথই বন্ধ।

বাটীর লোকে সকলেই এই অভাবনীয় ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। একটা আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় সকলেরই মুখ অন্ধকার।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অশ্বারোহণে দারোগা শেফায়েৎ হোসেন আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিতেছে। একজনের স্কন্ধে একটা কাঠের বাক্স—তাহাতে দারোগা সাহেবের কাগজপত্র দোয়াত কলম প্রভৃতি আছে।

দারোগা সদর দরজায় পৌঁছিতেই, চৌকিদার দুইজন ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। রমণ ঘোষ বাহিরে গিয়া দারোগাকে সেলাম করিল।

দারোগা বলিল, "তোমার নাম কি?"

রমণ নাম বলিল।

"এ বাড়ী তোমার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর কেউ সরিকদার আছে?"

"কেউ না। আমি ষোল আনার মালিক।"

"তোমার বাড়ী খানাতল্লাসী হবে। স্ত্রীলোকদের সরাও।"

রমণ বলিল, "কেন দারোগা সাহেব? আমার বাড়ী খানাতল্লাসী হবে কেন?"

"তোমার বাড়ীতে চোরাই মাল আছে আমি খবর পেয়েছি।"

এমন সময় কেনারাম আসিয়া সেখানে পৌঁছিল।

রমণ বলিল, "চোরাই মাল ? আমার বাড়ীতে ? কখ্খনো নয়। কে খবর দিলে ?"

দারোগা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল, "কে খবর দিলে তা পুলিশ বলতে বাধ্য নয়।"

একজন চৌকিদার ঘোড়াটা ধরিল। অন্য চৌকিদারকে দারোগা বলিল, "পাড়ার দু'চারজন মাতব্বর লোককে ডেকে আন্।"

দারোগা অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া কেনারামকে দেখাইয়া বলিল, "এই লোকটির বাড়ীতে সিঁদ হয়েছিল—চুরি হয়ে গেছে। সেই মাল তোমার বাড়ীতে আছে সন্ধান পেয়েছি—যদি ভাল চাও, কোথা আছে এই বেলা দেখিয়ে দাও। না দেখাও ত তোমার বাড়ী ওলট পালট করে ফেলব।"

শুনিয়া রমণ ঘোষের মন হইতে আশঙ্কার বোঝা নামিয়া গেল। হাসিয়া বলিল—"এই কথা দারোগা সাহেব ? তা আপনি স্বচ্ছন্দে তল্লাস করতে পারেন। আমার বাড়ীতে কারু কোনও মাল নেই। এ খবর নিশ্চয় আমার কোনও শত্রু আপনাকে দিয়েছে। (কেনারামের প্রতি) কে হে বাপু তুমি ? তোমার নাম কি, বাড়ী কোথায় ?"

দারোগা তৎক্ষণাৎ কেনারামের প্রতি সরোষ কটাক্ষ করিয়া বলিল, "চুপ রও। বলিসনে।"

রমণ বলিল, "তা না বলুক ! আমার কোন্ শত্রু আমার নামে এ মিছে অপবাদ দিয়েছে তা আমার জানতে বাকী থাকবে না। আজ হয় কাল হয জানতে পারবই। তখন, দারোগা সাহেব, আমি আপনারই কাছে গিয়ে নালিশবন্দ হব। আমাকে এই যে খামকা অপমানটা করলে, আমাকে মিছে হায়রাণ করলে, তার বিচার ,আপনাকে করতে হবে। এখন আসুন, বাক্স পেটারা সব জিনিষের চাবি দিচ্ছি, যত খুসি তল্লাসী করুন।"

এই সময় পাড়ার তিন চারিজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কৃষিজীবী—অশিক্ষিত ও ভীতিগ্রস্ত। দারোগাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা কাগজ কলম বাহির করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নাম লিখিয়া লইল। শেষে বলিল—"বাড়ী খানাতল্লাসী হবে, তোমরা সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে থেকো।"

দারোগা তখন প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

করিল। বাক্স পেটারা যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত খোলাইয়া দেখিল। সমস্ত বাসন এবং অলঙ্কারাদি এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া কেনারামকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্, এ সবের মধ্যে তোর কোন মাল আছে?"

কেনারাম হাতযোড় করিয়া বলিল, "না হুজুর।"

দারোগা ছড়ির দ্বারা তাহার পাঁজরে খোঁচা দিয়া বলিল, "বেটা না দেখেই বলছিস যে! আগে সব জিনিষ ভাল করে দেখ্, দেখে বল্।"

কেনারাম সব জিনিষ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "না, এর মধ্যে আমার কিছু নেই।"

দারোগা তখন অঙ্গনে নামিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিবার কোন চিহ্ন কোথাও আছে কিনা দেখিবার জন্য কনেষ্টবলগণকে আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও সেরূপ কোন চিহ্ন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল না।

উঠানে দুইটা বড় বড় ধানের গোলা ছিল। দারোগা হুকুম দিল—"এই গোলা দুটোর মধ্যে মাল আছে কিনা দেখ্।"

কনেষ্টবলগণ আপন আপন উর্দ্দি খুলিয়া ফেলিয়া গোলা দুইটা হইতে সমস্ত ধান বাহির করিয়া ফেলিল। কোনও মাল পাওয়া গেল না।

দারোগা তখন সদলবলে রান্নাঘরের দিকে গেল। বলিল—"এই ঘরে নিশ্চয় আছে।"

রমণ ঘোষের আপত্তি সত্ত্বেও দারোগা ভিতরে প্রবেশ করিল। করিম খাঁ কনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিল, "হাণ্ডি সব তোড় ডালো। দেখো ভিতরমে মাল হ্যায় কি নেহি।"

তখন সেই মুসলমান কনেষ্টবল লাঠির আঘাতে সমস্ত হাঁড়ি চুরমার করিয়া ফেলিল। বাসি ভাত, ভাজা মাছ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, ঘরময় ছত্রাকার হইয়া পড়িল। কিছু কিছু সিপাহীর দাড়িতে ও গাত্রেও লাগিয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

অবশেষে দারোগা গোয়ালের নিকট গিয়া বলিল, "এই যে এখানে একটা মস্ত খড়ের পাঁজা রয়েছে। এটা এতক্ষণ দেখিনি।"

আজ্ঞানুসারে কনেষ্টবলগণ সেই পাঁজার খড় সরাইয়া খুঁজিতে লাগিল। অধিক খুঁজিবার পূর্ব্বেই তাহার মধ্য হইতে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন

বাহির হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কেনারাম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ঐ আমার বাসন। কাঁসারি মেরামৎ করে দিয়েছিল, ঐ দাগ রয়েছে।"

দারোগা মুহূর্ত্তের জন্য কেনারামের প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল, "কি ঘোষের পো? বড় যে সাধুপনা জানাচ্ছিলে? এখন?"

এই ব্যাপার দেখিয়া রমণ ঘোষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে কষ্টে বলিল—"এ আমার কোনও শত্রুর কায। আমাকে ফাঁসাবার জন্মে কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে।"

ব্যঙ্গস্বরে দারোগা বলিল, "শত্রুর কায!—আদালতে গিয়ে তাই জবাব দিও। বুদ্ধি দেখ একবার! খড়ের পাঁজার মধ্যে রেখেছে। মনে করেছে পুলিস আসে ত বাক্স পেটারা খুঁজবে, ঘর খুঁজবে, খড়ের পাঁজা আর কে খুঁজবে? ওরে—আমি আজ তেরো বচ্ছর দারোগাগিরি করছি। আমার চোখে তুই ধুলো দিবি? চোর বেটা।"

ইহা শুনিয়া রমণ ঘোষের চক্ষু দুইটা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "খপর্দ্দার দারোগা সাহেব, গাল মন্দ করো না। মুখ সামলে কথা কোয়ো।"

দারোগা বলিল, "কী! যত বড় মুখ তত বড় কথা? দারোগাকে চোখ রাঙানি?—পাজি বেটা নচ্ছার বেটা। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লাগাও শালে বেয়াদবকো।"

করিম খাঁ তৎক্ষণাৎ রমণ ঘোষকে এক ধাক্কা দিল। নিকটে একটা নারিকেল গাছ ছিল, কোন মতে তাহাই অবলম্বন করিয়া রমণ ঘোষ নিজেকে পতন হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু গাছের গুঁড়িতে লাগিয়া তাহার পঞ্জরের এক অংশ ছড়িয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রমণ উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে দুইজন কনেষ্টবল তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া ধরিল, করিম খাঁ হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা এ ব্যাপার দেখিয়া সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দারোগা মাটীতে দুই পা সজোরে ঠুকিয়া, স্ত্রীলোকগণের প্রতি চাহিয়া বলিল, "চুপ রও হারামজাদি লোগ।"—বলিয়া কদর্য্য ভাষায় তাহাদিগকে গালি দিল।

রমণ ঘোষ চীৎকার করিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব—তুমি নীচ, তুমি ছোটলোক। সাবধান, মেয়েদের অপমান কোরো না। আমি জেলায় গিয়ে তোমার নামে নালিশ করব।"—তাহার দুই চক্ষু দিয়া ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা বাহির হইতেছিল। নাসিকা ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতে লাগিল।

দারোগা রমণ ঘোষের গণ্ডস্থলে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "করিম খাঁ—শালেকে মুহমে থুক দেও।"

এই হুকুম তামিল করিতে করিম খাঁ ইতস্তত: করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকগণ আবার উচ্চরোলে ক্রন্দন আরম্ভ করিল।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অশ্রুগদ্‌গদস্বরে কেনারাম বলিল, "দারোগা সাহেব, এনাকে ছেড়ে দাও। ও বাসন আমার নয়।"

দারোগা চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "কি বললি ?"

পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর স্বরে কেনারাম বলিল, "আজ্ঞে ও বাসন আমার নয়। এনাকে ছেড়ে দাও।"

দারোগা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "কী!—তোর নয়? তবে কেন এখনি বললি যে তোর ?"

"আজ্ঞে সেটা মিছে করে বলেছিলাম।"

দারোগা সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "দারোগার কাছে মিথ্যে এজেহার? তবে তোকেই চালান করি।—তোর সাত বছর জেল হবে। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লে আও।"

যদিও দ্বিতীয় হাতকড়ি আর ছিল না, তথাপি করিম খাঁ তাহার ব্যাগের মধ্যে হাতকড়ি খুঁজিবার ভাণ করিল।

কেনারাম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে মিথ্যে এজেহার করলে জেল হয় ?"

দারোগা দন্ত খিঁচাইয়া, বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "না:—জেল হবে কেন? সন্দেশ খেতে দেয়। করিম খাঁ—হাঁথকড়ি লাগাও।"

কেনারাম কাঁপিতে কাঁপিতে, করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে—তবে—ও বাসন—আমারই।"—বলিয়া যেদিকে স্ত্রীলোকগণ ছিল, সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেনারাম দাঁড়াইয়া রহিল।

দারোগা কাগজ কলম প্রভৃতি লইয়া বাসনগুলির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া

ফেলিল। সেই ফর্দ্দে সাক্ষীগণের সহি লইল—এবং আবার পাছে কেনারাম বাসনগুলা নিজের বলিয়া অস্বীকার করে, তাই সেই ফর্দ্দের প্রান্তভাগে তাহারও বুড়া আঙুলের টিপসহি লইল।

ইতিমধ্যে অঙ্গনে আরও কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখা গেল একজন বৃদ্ধলোক, রমণের পুত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। ছেলেটি তাহার পর স্ত্রীলোকগণের কাছে গিয়া চুপিচুপি কি বলিতে লাগিল। এ সমস্ত কিছুই দারোগার চক্ষু এড়ায় নাই। ব্যাপার কি, তাহাও দারোগা ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে অনুমান করিতে সমর্থ হইল।

শেফায়েৎ হোসেন তখন উচ্চকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এ দিকের ত সব ঠিক হল। একজন চৌকিদার বাসনগুলো বেঁধে নে। করিম খাঁ, আসামীর কোমরে একগাছা দড়ি বাঁধ। হরি সিং আর রাম সিং, সেই দড়ির দু'ধার দুজন ধরে নিয়ে যাবে। পথে যদি বেটা বদমায়েসি করে, কি চলতে দেরী করে, তবে অমনি করিম খাঁ, তুমি মারবে বেটার পেটে রুলের গুঁতো। আর, পথে যেতে যেতে কোনও একটা জঙ্গল থেকে দুটো বড় বড় জলবিছুটির গাছ উপড়ে নিয়ে যাবে। থানায় গিয়ে, আসামী যদি সহজে দোষ স্বীকার না করে, তবে কসে জলবিছুটি লাগাতে হবে। কোমরে দড়ি বাঁধ।"

করিম খাঁ দড়ি বাহির করিল। তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ আবার চীৎকার করিতে লাগিল।

বৃদ্ধটি তখন দারোগার কাছে আসিয়া বলিল, "হুজুর, একবার এদিকে আসবেন?"

'হুজুর' অতি অমায়িকতার সহিত বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অঙ্গনের প্রান্তে গিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান হইলে বৃদ্ধ বলিল, "দারোগা সাহেব, একটা উপায় করুন, নইলে গরীব মারা যাবে।"

"আমি কি উপায় করব?"

"গরীব কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। দয়া করুন। ছেড়ে দিন।"

"আমি দয়া করবার কে? আমি ছাড়ব কি করে? আইন কি আমি তৈরি করেছি? আমরা সরকারের নুন খাই, সরকারের আইন যে ভঙ্গ করেছে, তাকে কি ছেড়ে দিতে পারি?"

"কেন পারবেন না হুজুর, আপনি গরীবের মা বাপ। আপনি মনে করলে সব করতে পারেন।"

আসল কথাটা বলিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া দারোগা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওসব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। কি বলতে চাও চট্‌পট্‌ বল।"

বৃদ্ধ তখন এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব, কত হলে ওকে খালাস দিতে পারেন?"

"খালাস দিতে পারি এমন ত বোধ হয় না। আচ্ছা সে কথা পরে হবে। আমি যা বলি শোন। আমি সেপাইদের কি হুকুম দিয়েছি স্বকর্ণে শুনেছ ত? আমি বড় কড়া হাকিম। যা বলেছি, তাই সমস্ত করব, বরং বেশী তবু কম নয়। এখনি যদি নগদ ১০০৲ আমায় দাও, তবে কোমরের দড়ি হাতের হাতকড়ি খুলে দেব, শুধু সেপাইদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। একরার করাবার জন্যে জলবিছুটি কি মারপিট কি অন্য কোন রকম অত্যাচার করব না। শুধু হাজতে রেখে দেব। তোমরা গিয়ে রেঁধে ওকে খাওয়াতে পাবে, কথাবার্ত্তা কইতে পাবে। শুধু এর জন্যে নগদ ১০০৲ চাই। অন্য সব কথা সন্ধ্যেবেলা থানায় বসে হবে।"

বৃদ্ধ বারকতক স্ত্রীলোকগণ ও দারোগার মধ্যে যাতায়াত করিল। শেষে রফা হইল দারোগার জন্য ৫০৲ তিনজন কনেষ্টবল ২৲ করিয়া এবং চৌকিদার দুইজন ৷৷০ হিসাবে—মোট ৫৭৲ টাকা। টাকা লইয়া আসামী লইয়া দারোগা প্রস্থান করিল।

পরদিন গদাই পাল পত্র দ্বারা গোপীকান্তবাবুকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। আরও লিখিল, 'রমণ ঘোষ অর্থশালী লোক বিধায় দারোগাকে ৫০০৲ পর্য্যন্ত ঘুষ দিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমি গিয়া দারোগাকে আরও ১০০৲ কবুল করাতে দারোগা অদ্য তাহাকে ৪১১ ধারায় চালান দিয়াছে। যেরূপ হয় পরে হুজুরে জানাইব।'

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ প্রত্যাবর্ত্তন

বেলা দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। ভদ্রেশ্বর হইতে ফরাসডাঙ্গা যাইবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথে মোহিত একাকী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ধীরে ধীরে,

কারণ তাহার দেহে আর সামর্থ্য নাই। পা ফাটিয়া বেদনা হইয়াছে। গতকল্য হইতে সে অভুক্ত। আজ দুই সপ্তাহ গৃহের বাহির হইয়াছে, যে দুই-দিন সে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর সহিত ছিল, সেই দুইদিন মাত্র তাহার নিয়মিত আহার জুটিয়াছিল। তাহার পর হইতে অন্নের সাক্ষাৎ তাহার অদৃষ্টে বড় ঘটে নাই। কোনও দিন কেবল ফলমূলমাত্র খাইয়া কাটিয়াছে—কোনও দিন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন। সে যদি মুখ ফুটিয়া লোকের কাছে চাহিতে পারিত তাহা হইলে তাহার এ অনশনক্লেশ সহিতে হইত না। কিন্তু ভিক্ষা করিতে সে একান্ত অক্ষম। তাহার কাশী যাইবার অভিলাষ শুনিয়া ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবু রেলভাড়া দিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে দান গ্রহণ করিতে মোহিতের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। পদব্রজে সে এতদূর আসিয়াছে। তাহার স্কন্ধে সেই ঝুলি, বামহস্তে সেই লোটাটি, বগলে সেই মৃগচর্ম্মখানি, তাহার গৈরিকবস্ত্র ও উত্তরীয় এখন অত্যন্ত মলিন, চুলগুলি ধূলিধূসরিত, চক্ষু কোটরান্তর্গত।

রাস্তার প্রান্ত দিয়া, গাছের ছায়ায় ছায়ায় মোহিত চলিয়াছে। পথে লোকজন কম। মাঝে মাঝে দুই চারিজন চাষী লোক যাতায়াত করিতেছে। রৌদ্রতাপ যত বৃদ্ধি হইতেছে, মোহিতের গতিবেগও তত হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আর দেড়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে ফরাসডাঙ্গা। সেখানে পৌঁছিলে যদি কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে কিছু খাইতে দেয়, তবে সে খাইবে। সেই কথাই বারম্বার তাহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে। চলিতে চলিতে ক্রমে পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল, তথাপি সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পথের ধারে একটা পাকা সাঁকো পাইল। বড় শ্রান্তি অনুভব করিয়া তাহারই উপর মোহিত বসিল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, মিনিট পাঁচেকের বেশী বিলম্ব করিবে না, কিন্তু দশ মিনিট, পনেরো মিনিট হইয়া গেল, উঠিতে আর ইচ্ছা করে না। পা যেখানে ফাটিয়াছিল, দেখিল সেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, "এখন বোধ হয় সাড়ে দশটা কি পৌণে এগারোটা হইয়াছে; যদি বাড়ীতে থাকিতাম, এতক্ষণ ঝি আসিয়া বলিত, 'ছোটবাবু, ভাতবাড়া হয়েছে, আসুন।' আসনে গিয়া বসিতাম। সম্মুখে চর্ব্ব্য, চোষ্য, উপাদেয় নানাবিধ খাদ্যসম্ভার।"—কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আকাশকুসুম চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কে যেন করুণস্বরে তাহার কাণে কাণে বলিল—'হায় অন্ন!—হায় মোহিত!'—সে তখন চমকিয়া, যেন জাগিয়া উঠিল। নিজের

দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া, নিজের উপর বড় বিরক্ত হইয়া, সে স্থান হইতে উঠিয়া পড়িল। আবার কষ্টে পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। ফরাসডাঙ্গা আর অধিকদূর নহে, অর্দ্ধক্রোশের কম হইবে। নগরপ্রান্তবর্ত্তী দুই একখানা উচ্চ ইষ্টকালয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু পিপাসায় মোহিত বড় কাতর। আর সে পারে না। নিকটেই গঙ্গা। রাস্তা হইতে নামিয়া মোহিত গঙ্গার দিকে গেল। তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানটা শ্মশানঘাট। অনেকগুলা ভাঙ্গা কলসী এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইতেছে। স্থানে স্থানে চিতাচিহ্নও বিদ্যমান। বাঁশের খুঁটির উপর একটা চালা বাঁধা রহিযাছে—সেইখানে গিয়া মোহিত উপবেশন করিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে জলপান করিবে।

বসিয়া বসিয়া সে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে ভাবী অন্নচিন্তাই প্রধান, কিছুতেই সে চিন্তাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া প্রবেশ করিলে, তাহার বুভুক্ষিত মুখ দেখিয়া, কেহ কি আহার করিতে আহ্বান করিবে না?—হায় মোহিত!—হায় অন্ন!—কলিতে জীবের যে অন্নগত প্রাণ—অন্ন বিনা যে গতি নাই!

আজ এখনও আহ্নিক পূজা কিছুই হয় নাই। ঝুলি উত্তরীয় সেই চালায রাখিয়া মোহিত স্নানার্থ জলে নামিল। স্নানান্তে আহ্নিক পূজা করিয়া তবে সে জল পান করিবে। গঙ্গার স্বচ্ছ জল, আর ত কিছুই নাই।

আহ্নিক সারিয়া জলপান করিয়া, সিক্ত বস্ত্র শুকাইতে দিয়া, মৃগচর্ম্মখানি পাতিয়া সেই চালায় মোহিত বসিল। ঝুলি হইতে বেদান্ত-রামায়ণখানি বাহির করিয়া দশম সর্গটি পাঠ করিতে লাগিল। ক্রমে এই শ্লোকটিতে আসিয়া পৌঁছিল—

সন্ন্যাসমাশ্রয়তি যো হি বিনৈব কর্ম্ম-
যোগং স চেহ লভতে খলু দুঃখমেব।
যঃ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতি বা মুনিঃ সন্
স ব্রহ্ম বিন্দতি পরং ন চিরেণ মর্ত্ত্যঃ॥

—যে কর্ম্মযোগ-বিরহিত হইয়া সন্ন্যাসকে আশ্রয় করে সে এখানে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। যে মননশীল হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে সেই মনুষ্যের অচিরে ব্রহ্মলাভ হয়।

এই শ্লোকটি মোহিত পূর্ব্বে যে পাঠ করে নাই এমন নহে, কিন্তু এখন এটিকে সে যেন নূতনভাবে উপলব্ধি করিল। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল, আমি যে জীবন অবলম্বন করিয়াছি তাহা ত একান্ত কর্ম্মহীন—সুতরাং দুঃখই আমায় পাইতে হইবে। শুধু যে অন্নের দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ, তাহা নয়। আমি যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভগবচ্চিন্তা অবাধে করিতে পাইব বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এই দুই সপ্তাহকাল তাহার কি করিতে পারিয়াছি? গৃহে থাকিতে আমি দুইদিনে যাহা করিতে পারিতাম, এ দুই সপ্তাহে সেটুকুও পারি নাই। আমার দেহ যেমন শুষ্ক হইযা যাইতেছে—আমার হৃদয মনও যেন তেমনি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

মোহিত গ্রন্থখানি খুলিয়া আবার পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু শাস্ত্রার্থ মনে ভাল করিয়া প্রবেশ করে না। ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন—মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। বসিয়া থাকাও যেন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। মোহিত তখন সেই মৃগ-চর্ম্মখানির উপর শয়ন করিল এবং অচিরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রাযোগে কেবল সে অন্নের স্বপ্ন—নানা বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র স্থানে বিচিত্র প্রকার অন্ন সে আহার করিতেছে—এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিযা মোহিত দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। উঠিয়া বসিয়া সে স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিল। ক্রমে অনুচ্চস্বরে--ধীরে ধীরে পূর্ব্বশ্রুত নিম্নলিখিত হিন্দি গানটি গাহিতে লাগিল—

যব দাঁত ন থে, তব দুধ দিয়েও ;
যব দাঁত দিয়েও, ক্যা অন্ন ন দেইহৈ ?
যো জলমে থলমে পশুপচ্ছিনকো
সুধ লেতি, সো তেরিহু লেইহৈ।
কাহেকো শোচ করৈ মন মূরখ ?
শোচ করে কছু হাঁথ ন আইহৈ।
জানকো দেত, অজানকো দেত,
জাহানকো দেত—সো তোহুকো দেইহৈ ॥

সম্মুখে তরঙ্গময়ী গঙ্গা কলকল্লোলে বহিয়া যাইতেছেন। দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে অসংখ্য বৃক্ষে বসিয়া অসংখ্য পক্ষী কূজন করিতেছে। তাহার মধ্যে

একমাত্র মনুষ্যকণ্ঠস্বরে ভক্তি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিলেন। মোহিতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গান শেষ হইলে কিয়ৎক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া মোহিত বসিয়া রহিল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া ভাবিতে লাগিল—'খৃষ্টানদের প্রার্থনায় আছে, Give us this day our daily bread—প্রভু, অদ্য আমাদের দৈনিক আহার দিও। পূর্ব্বে বলিতাম, খৃষ্টানদের এ প্রার্থনাটুকু বড় আধিভৌতিক রকমের; প্রভু আমায় ভক্তি দিও, মুক্তি দিও—না বলিয়া, প্রভু আমায় অন্ন দিও! কিন্তু অন্ন যে ঈশ্বরের কত বড় দান তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অন্ন বিনা উপায় নাই। অন্নই জীবের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রার্থনীয়।'

মোহিত তখন উঠিয়া, জিনিষপত্র লইয়া, আবার ধীরে ধীরে ফরাসডাঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হইল। অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। দূর হইতে যে অট্টালিকাগুলি দেখা গিয়াছিল—সেগুলি নগরোপান্তে ধনীদিগের বাগানবাড়ী। সেগুলি এখন বন্ধ। মোহিত যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথে লোকসমাগম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাহাকে প্রণাম করিতেছে।

সূর্য্য যখন পাটে বসিয়াছেন, মোহিতের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। চোখে যেন সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। নিকটেই প্রশস্ত বারান্দাযুক্ত একখানি বাড়ী ছিল, মোহিত উঠিয়া সেই বারান্দায় ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেও পারিল না। প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ইহার কয়েক মিনিট পরে, বাড়ীর মধ্য হইতে একজন পনের ষোল এবং একজন অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক বালক, মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরা, দুইখানি বাইসিক্ল হাতে লইয়া বাহির হইল। মোহিতকে উক্ত অবস্থায় পতিত দেখিয়া বাইসিক্ল ছাড়িয়া তাহারা উভয়েই সেখানে গেল। দেখিল, লোকটির চক্ষু মুদ্রিত, নিশ্বাস বহিতেছে। এ অসময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া পথের ধারে এরূপ ভাবে বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িবে, ইহা বালকগণের একটু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। তাহারা ভীতচিত্তে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। একজন বলিল, 'মূর্চ্ছা যায়নি ত?' অপর বালক বলিল, 'হয় ত কোন ব্যারাম হয়েছে। বাবাকে খবর দাওগে।' পথচারী একজন লোক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল,

'গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে—গাঁজার মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।'—কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন বালক গিয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া আনিল।

যে লোকটি আসিলেন, তাঁহার আকার খর্ব্ব, শ্যামবর্ণ, বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। মাথায় টাক, চক্ষে সোণার চশমা, হস্তে একখানি পুস্তক। তিনি আসিয়া মোহিতের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, বক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন। শেষে বলিলেন—"না, কোনও ব্যারাম হয়নি, কিন্তু নাড়ী বড় ক্ষীণ। বোধ হয় ক্ষিধেতে এমন হয়েছে।"—বলিয়া আবার তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মোহিত নেত্রোন্মীলন করিয়া তাঁহার পানে চাহিল।

বাবুটি বলিলেন, "তুমি কে?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"আমি সন্ন্যাসী।"

"তোমার কি হয়েছে?"

কোনও উত্তর নাই।

বাবুটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু খাবে?"

ক্ষীণতর স্বরে উত্তর হইল—"খাব।"

"কদিন খাওনি?"

"দু দিন।"

"বুঝেছি।"—বলিয়া বাবুটি, পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া মোহিতকে বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরে অনেকগুলি ঔষধের আলমারি সাজান রহিয়াছে—ইহা একটি ডাক্তারখানা। বাবুটি এখানকার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার।

মোহিতকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া, সুরাসারের চুল্লী জ্বালিয়া, একটা পাত্রে খানিকটা জলে খানিকটা বিলাতী চিকেন্ ব্রথ মিশাইয়া গরম করিয়া লইলেন। তাহাতে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি দিয়া, মোহিতকে পাঁচ ছয় চামচ পান করাইয়া দিলেন। মোহিতের মাথা চেয়ারের বাজুতে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। এই পথ্যসেবনের দুই মিনিট পরেই সে সিধা হইয়া বসিল।

ডাক্তারবাবু আবার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—"কেমন আছ?"

"ভাল।"

"একটু দুধ খাবে ?"

"খাব।"

আধপোয়া দুধ গরম করিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ততক্ষণ এই বাকী ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।"—বলিয়া পাত্রটি তিনি মোহিতের মুখে ধরিলেন। মোহিত সেটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ? শোবে ?"

"শোব।"

"এস।"—বলিয়া ডাক্তারবাবু হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে পাশের কামরায় লইয়া গেলেন। সেখানে তক্তপোষের উপর চাদর পাতা ছিল। দুই তিনটি তাকিয়া বালিসও ছিল। মোহিতকে শোয়াইয়া দিয়া তিনি নিকটে চেয়ার লইয়া বসিলেন।

মোহিত বলিল, "আজ আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দুদিন কিছু খাওনি ?"

"কিছু না। পরশু সন্ধ্যাবেলা দুধ আর সন্দেশ খেয়েছিলাম।"

ডাক্তারবাবু মোহিতের দিকে অর্দ্ধমিনিটকাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রাজপথের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আশ্চর্য্য কথা! নিজেদের আমরা হিন্দু হিন্দু বলে বড় জাঁক করে থাকি। এত বড় একটা সহরের মধ্যে, যেখানে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুর বসতি—একজন সন্ন্যাসী অনাহারে মারা যাচ্ছিল। আমরা বক্তৃতা করবার সময় হিন্দু, আর মুষ্টিভিক্ষা দেবার বেলায় সাহেব হয়ে যাই।"

মোহিত বলিল, "কারু দোষ নেই। আমি কারু কাছে চাইনি।"

বাবুটি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "না চাইলে কি দিতে নেই ?"—এমন সময় দুধ আসিয়া পৌঁছিল। মোহিত সেটুকু পান করিয়া আরও সুস্থ

বাবু বলিলেন, "আধ ঘণ্টা পরে, আর একটু দুধ খেতে হবে। তার পর ঘণ্টা দুই আর কিছু না। রাত্রে চারটি ভাত খাবে ?—চারটি মাছের ঝোল ভাত ?"

"মাছ আমি খাইনে।"

বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা-ও ত বটে। চারটি গরম গরম আলোচালের ভাত, গাওয়া ঘি দিয়ে—একটু ঝালের ঝোল—দু'ঘণ্টা পরে খেও এখন। আজ

তোমায় ছাড়ছিনে—রাত্রে এখানে থাকতে হবে। কাল তখন খাওয়া দাওয়া করে যেও।”

মোহিতের চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল।

সে রাত্রে আহারাদির পর শয়ন করিয়া, অনেকক্ষণ অবধি মোহিত নিদ্রা যাইতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে পথে সে পদার্পণ করিয়াছে, সেটা তাহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ নহে। এক সময় সে মনে করিত বটে, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে সাধনভজনের বিঘ্ন হয়, আত্মচিন্তার অখণ্ড অবসর পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুই সপ্তাহের অভিজ্ঞতায সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, তাহা ভ্রম। সংসারে থাকিয়া সে যে পরিমাণ সাধনভজন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে সক্ষম হইত, গৃহত্যাগী হইযা অবধি তাহার এক শতাংশও সে করিতে পারে নাই। গৃহত্যাগ করিয়া অবধি অন্নচিন্তা এবং আশ্রয়চিন্তাই তাহার মনে একাধিপত্য করিযাছে।

এই দুই সপ্তাহে প্রতিদিনকার প্রতি দণ্ডের ঘটনা সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। নিশীথ-নিস্তব্ধতার মধ্যে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর উপাসনাবিভোর সেই শান্ত ছবিখানি মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন বটে, গৃহীর কি মনস্থির হয় ?—কিন্তু গৃহত্যাগী মোহিত একটি দিনও কি তাঁহার মত তেমন করিয়া উপাসনা করিতে পারিয়াছে ? ভাবিল, সে ভদ্রলোকটি যদি তাঁহার পত্নীর প্রতি গভীর প্রণয়ানুভব না করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি অমন একান্তমনে ভগবানকে ডাকিতে পারিতেন ? তিনি ত নাস্তিকই ছিলেন—প্রেম তাঁহাকে আস্তিকতায়, ভগবদ্ভক্তির উচ্চালোকে উত্থিত করিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রের স্বপ্ন—চিনি তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বলিতেছে, ‘এস’—তাহাও মনে পড়িল। সেই যে গুরুদাসবাবুর বাড়ীতে, পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া রাত্রি তিনটা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ভগবানকে ডাকিয়াছিল, সেই তাহার জীবনের প্রথম ঐকান্তিক উপাসনা। কই, তাহার পূর্ব্বে কখনও ত মোহিত অমন একাগ্রভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারে নাই! এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মোহিত স্থির করিল—সংসারবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াই ঈশ্বরকে নিকটে পাওয়া যায়। একবার মনে হইল, ঈশ্বরের এ প্রকার উপাসনা ত সকাম উপাসনা, ইহা ত শ্রেষ্ঠতম উপাসনা নহে। কিন্তু তখনি আবার ভাবিল, শুষ্ক নিরুপাসনার চেয়ে সকাম উপাসনা ত ভাল ; পঙ্কিল জলযুক্ত নদী

যে প্রদেশে বহিয়াছে—সে প্রদেশ মরুভূমির চেয়ে ত ভাল। সুতরাং মোহিত স্থির করিল, সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া কল্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ফিরিবে কি করিয়া? পাথেয় নাই যে।

তখন ডিস্পেন্সারির ঘড়িতে একটা বাজিল। মোহিত ভাবিল, পাথেয় নাই—কিন্তু ঈশ্বর কি তাহার উপায় করিবেন না? এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে সেই ডিস্পেন্সারিতে বসিয়াই অকস্মাৎ একজন সতীর্থের সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট টাকা ধার করিয়া, গৃহস্থোপযোগী পরিচ্ছদে পুনর্ব্বার সজ্জিত হইয়া, বৈকালের গাড়ীতে মোহিত কমলপুর যাত্রা করিল।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ॥ বৃহস্পতির দশা

আজ আবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। আজ গদাই পালকে কমলপুর যাইতে হইবে। আজ রাত্রে বাক্স খুলিয়া হরিদাসীকে দেখাইতে হইবে, মা কালীর কৃপায় টাকা চতুর্গুণ হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া গদাই পাল কাছারির কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৌকিদার আসিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া গদাই দেখিল, থানায় দারোগা তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে—জরুরি কার্য্য।

গদাই তৎক্ষণাৎ কাছারি বন্ধ করিয়া, অশ্বারোহণে থানায় গমন করিল। দারোগা শেফায়েৎ হোসেন তক্তপোষে বসিয়া টিনের বাক্স সম্মুখে রাখিয়া কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিল। গদাইকে দেখিয়া বলিল—"এস পালজি—বস।"

গদাই উপবেশন করিয়া বলিল, "অসময়ে স্মরণ করেছেন যে?"

"বলছি—তামাক খাও।"—বলিয়া একখানি বাতিল সরকারী লেফাফা এবং কলিকাটি গদাই পালের হস্তে দিয়া পুনরায় কাগজপত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইল।

গদাই কলিকার নিম্নাংশ লেফাফার ছিন্নমুখে ভরিয়া বাম হস্তে সেটি বেশ করিয়া মুঠা করিয়া ধরিল। পরে লেফাফার একটি কোণে সামান্য ছিদ্র করিয়া, তাহাতে মুখ দিয়া সুখে ধূমপান করিতে লাগিল।

পাঁচমিনিট কাল পরে দারোগা সাহেব কাগজ হইতে মুখ তুলিল। গদাই কলিকাটি আলবোলায় বসাইয়া দিল।

দারোগা বলিল, "পরশু যে রমণ ঘোষের মোকদ্দমার তারিখ।"

গদাই বলিল, "সাক্ষী টাক্ষী সব ঠিক আছে ত?"

"কই আর ঠিক আছে? ফরিয়াদীকেই যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

গদাই বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি রকম?"

"আর সমস্ত সাক্ষী শেখান পড়ান সব ঠিকঠাক। কাল কেনারামকে ডাকতে দু'বার লোক পাঠিয়েছিলাম—লোক ফিরে এসে বললে সে বাড়ী নেই। কোথায় গেছে তাও বাড়ীর লোক কেউ বলতে পারে না। আজ আবার ভোরে চৌকিদার পাঠিয়েছিলাম, তোমার নামে চিঠিও তারই হাতে দিয়েছিলাম। বলা ছিল, কেনারামকে যদি না পায় তা হলে তোমাকে চিঠি দেবে। সে পায়ে হেঁটে আসছে—এখনও পৌঁছয়নি। তোমায় চিঠি যখন দিয়েছে, তাই থেকেই বুঝতে পারছি, আজও কেনারামের দেখা পায়নি। বেটা পালাল নাকি?"

গদাই উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দেখা পায়নি? বলেন কি? আজ ভোরেই যে তাকে পুকুরঘাটে আমি দেখেছি। বেটা নিশ্চয়ই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। হারামজাদা বেটা!"

দারোগা বলিল, "সেই ত ভাবনার কথা হয়েছে কিনা পালজি!"

"কেন? ভাবনা কি? আমার সঙ্গে দু'জন কনেষ্টবল দিন, আমি এক্ষণি গিয়ে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছি।"

"ধরিয়ে যেন দিলে। কিন্তু অনিচ্ছুক ফরিয়াদীকে নিয়ে কি মোকদ্দমা হয়?"

"রমণ ঘোষেরা ওকে হাত করেনি ত?"

আলবোলায় দুই চারি টান টানিয়া দারোগা বলিল, "না, তা বোধ হয় না। যে দিন খানাতল্লাসী করি, সেইদিন থেকেই ও একটু দো-মনা। সেদিন যখন ঐ বাসনগুলো খড়ের পাঁজা থেকে বেরুল—তার পর রমণ ঘোষকে একটু শাসন করতেই—বেশী কিছু নয়, গালমন্দ দিয়ে কেবল একটা চড় মেরেছিলাম—ও ওমনি বলে উঠল, দারোগা সাহেব, এনাকে ছেড়ে দাও—ও বাসন আমার নয়। আমি যাই ২১১ ধারার ভয় দেখালাম, বললাম মিথ্যে মোকদ্দমা আনার অপরাধে তোকেই জেলে দেব, তখন বেটা পথে আসে। তাই ভাবছি, আদালতে গিয়ে শেষে সকলই পণ্ড করে না দেয়।"

গদাই বলিল, "পণ্ড করে দেবে! এত বড় তার আস্পর্দ্ধা? যদি তা করে হলে জুতিয়ে তার পিঠের খাল খিঁচে দেব না?"

"কিছু করতে হবে না। তক্ষণি বাছাধন আদালত থেকেই মিথ্যে নালিসের জন্যে ২১১ ধারায় সোপর্দ্দ হয়ে যাবেন। এখন তাকে বাপু বাছা বলে কোন রকমে কায হাঁসিল করতে পারলেই ভাল।"

গদাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিযা থাকিয়া বলিল, "তবে অনুমতি করুন, এখন উঠি। আমি গিয়ে বলে কয়ে পাঠিয়ে দিই।"

গদাই পাল দরিয়াপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং কেনারামের বাড়ী গেল। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর, কেনারামের বালক পুত্র বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—তাহার পিতা অদ্য প্রভাতে গ্রামান্তরে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে এবং কবে আসিবে তাহা সে কিছুই বলিতে পারে না।

গদাই ভাবিল, কেনারাম নিশ্চয়ই বাড়ীর মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই সে অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—

"তাই ত গয়লাবৌ, এ যে বড় বিপদ হল! পরশু খুলনায় মোকদ্দমা—কেনারাম হল ফরিয়াদী—আর আজ সে কোথায় চলে গেল!—শিখবে পড়বে কখন? উকীলের জেরায় যে খান খান হয়ে যাবে। বড় বড় হুঁসিয়ার সাক্ষী রীতিমত তালিম না পেলে তারাই আদালতে টেঁকে না—কেনারাম ত কোন্ ছার! কোথায় গেল, কবে আসবে, বলেও গেল না? এমন ত মুখ্যু দেখিনি। কাল খাওয়া দাওয়া করে দুপুর একটার মধ্যে বেরুতে হবে, তবে ত খুলনায় ঠিক সময় পৌঁছতে পারবে। হাজির যদি না হতে পারে, তা হলে হাকিম তার নামে তক্ষণি ওয়ারিণ বার করে দেবে।—সদর থেকে সেপাই জমাদার এসে হাতে হাতকড়ি দিয়ে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাবে যে! মহারাণীর সমন অমান্য করা সোজা কথা? এসে যদি তাকে না পায়, তোমাদের হাল গরু ঘটি বাটি সব কোরক করে নেবে। গেলি গেলি, না হয় বলে যা যে কোথায় যাচ্ছিস—লোক দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনতে পারে। সাক্ষী দিতে হবে তার ভয়টা কিসের? সাক্ষী কি বিশ্ব বাঙ্গলায় কেউ আর কখনও দেয়নি, তুই প্রথম দিচ্ছিস? জজ মাজেষ্টাররা বাঘ না ভালুক, তোকে খেয়ে ফেলবে? যা হোক, সে বাড়ী এলেই ধূলোপায়ে আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিও—নইলে তার সমুহ বিপদ—সমুহ বিপদ!"

এই কথাগুলি বলিয়া গজেন্দ্রগমনে গদাই কাছারিতে ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে বিশ্বাস, কেনারাম যেখানে লুকাইয়া আছে সেখানে বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছে। ভয়ে দিশেহারা হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নিশ্চয়ই কাছারিতে আসিবে এবং বলিবে আমি এই মাত্র অমুক স্থান হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

স্নানাহার করিয়া গদাই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল, কিন্তু কেনারামের আগমন প্রতীক্ষায় তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অপরাহ্ণে উঠিয়া গোরুর গাড়ী করিয়া কমলপুর যাত্রা করিল। কাছারিতে বলিয়া গেল, কেনারাম যদি আসে তবে তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে তাহাকে যেন দারোগার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, গদাই পালের গাড়ী কমলপুরে প্রবেশ করিল। দীঘির কোণে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল, হরিদাসী জলের কলসী কাঁখে করিয়া উঠিয়া আসিতেছে। দুজনে চোখে চোখে বার্ত্তাবিনিময় হইয়া গেল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া, গাড়োয়ানকে দিয়া গদাই অঙ্গন ও গৃহাদি কতকটা পরিষ্কার করাইয়া লইল। দীঘি হইতে দুই কলসী জল আনাইয়া রাখিল। গাড়োয়ান তখন জলখাবারের পয়সা লইয়া, গাড়ী সেইখানে রাখিয়া, গোরু দুইটাকে খুলিয়া লইয়া, তাহার কোনও আত্মীয়ের বাড়ী রাত্রির মত আতিথ্য-গ্রহণ করিতে গেল। গদাই বলিয়া দিল, কল্য প্রাতেই আবার যাত্রা করিতে হইবে।

রাত্রি ক্রমে নয়টা বাজিল। দরিয়াপুর হইতে লুচি প্রভৃতি আনিয়াছিল, তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজন সমাধা করিয়া, পাণ চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে করিয়া গদাই বসিয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরেই সদর দরজার শিকল ঝম্ ঝম্ করিয়া উঠিল।

গদাই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "হরিদাসী—এস।"

প্রবেশ করিয়া, দরজায় খিল দিয়া হরিদাসী বলিল, "তোমার কি আক্কেল! দরজাটা খুলে রাখতে হয় না? শিকল ঝম্ ঝম্ করলাম, কেউ যদি শুনতে পেয়ে থাকে?"

গদাই বলিল, "এত সকালে তুমি আসবে তা কি জানি হরিদাসী? আমি ভেবেছি রাত্রি দশটার কম তুমি আসতে পারবে না। আজ এত সকালে তুমি ছুটি পেলে কি ভাগ্যি?"

হরিদাসী বারান্দায় উঠিয়া বলিল, "আমার ত এখন অষ্টপ্রহরই ছুটি। গিন্নী যে পশ্চিম গেছেন।"

"পশ্চিম গেছেন? কবে গেলেন?"

"কাল রাত্রে গেছেন। শোননি বুঝি? বাবুর যে বড় ব্যারাম। বদ্যিনাথ থেকে তার এসেছিল ছোটবাবু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম গেলেন।"

"বাবুর কি ব্যারাম হয়েছে কিছু শুনেছ?"

"জ্বরবিকার।"

"ছোটবাবু কোথা গিয়েছিলেন না? এলেন কবে?"

"কাল সকালবেলাই এসে পোঁছেছিলেন। দুপুরবেলা তার এল, রাত্রে রওনা হলেন।"

"তাই ত!—বড় ভাবনার কথা হল।"

"ভাবনার কথা নয় আবার? বাবা বদ্যিনাথের কৃপায় বাবু শীগগির ভাল হয়ে দেশে ফিরে আসুন। কাল থেকে বাড়ীসুদ্ধ কারু মনে সুখ নেই।"

"তাই ত—বড় ভাবনার কথা হল যে!"—বলিয়া গদাই কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া অধোবদন রহিল। তাহার ভাবনাটা হরিদাসীর হইতে ভিন্নজাতীয়। তাহার আশঙ্কা হইতেছে, মোহিত সম্বন্ধে বাবুর কাছে যে মিথ্যা অভিযোগগুলি সে সৃজন করিয়াছে, সেগুলি ধরা না পড়িয়া যায়। অবশেষে একটি ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভগবান যা করবেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই!"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে গদাধরের মনে হইল, ইহা ত ঠিক হইতেছে না। টাকা চতুর্গুণ হইয়াছে দেখিলে হরিদাসীও নিজের কিছু টাকা আজ বাক্সে দিবে—এই আশা করা যাইতেছে। কিন্তু মন এমন ভারি হইয়া থাকিলে, নাও দিতে পারে। একটু হাসিখুসীর হাওয়ায় মনটা বেশ হাল্কা থাকিলেই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। একটু কৌশল করিতে হইতেছে। বলিল—"হরিদাসী, তুমি কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ হয়ে এসেছ ত?"

"হ্যাঁ। এখন বাক্স খোলা হবে?"

"রোসো, আগে দশটা বাজুক। একটু গভীর রাত্রি না হলে মা কালীর ডাকিনী যোগিনীরা বেরোয় না। আমরা ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে, মা কালীর চরণামৃত একটু একটু খাই এস। আজ যদি মা কালী আমাদের পানে মুখ তুলে

চান—তা হলে আর আমাদের পায় কে? বিয়ে করে দুজনে টাকার বস্তার উপর বসে থাকব। আমি কাপড় ছেড়ে চরণামৃতটুকু নিয়ে আসি।”

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া গদাই সেই লাল চেলিখানি পরিধান করিল। তাহার পর একটা বোতল বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ তরল পদার্থের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ একটা তাম্র-কমণ্ডলুতে ঢালিয়া বাহির হইয়া আসিল। বসিয়া বলিল— “যাও ত হরিদাসী, ঘরের মধ্যে জলচৌকির উপর পাথরবাটি আছে, দুটো নিয়ে এস।”

হরিদাসী পাথরবাটি আনিয়া একটা নিজে লইল, একটা গদাইকে দিল। বলিল—“ও চরণামৃত কোথায় পেলে?”

কমণ্ডলুটির প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া গদাই বলিল, “এ এসেছে অনেকদূর থেকে। কামরূপ কামিখ্যে থেকে একজন সাধু এনেছিল, আমায় খানিকটে দিয়েছে।”—বলিয়া নিজের বাটি পূর্ণ করিয়া হরিদাসীর বাটি অর্দ্ধেকটা ভরিয়া দিল।

নিজের পাত্রটি নিঃশেষে পান করিয়া গদাই বলিল, “জয় মা কালী বলে খেয়ে ফেল।”

হরিদাসী পাত্রটি মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, “ওমা!—এযে দুর্গন্ধ!”

গদাই বলিল, “চুপ চুপ ক্ষেপি! ও কথা বলতে আছে? দুর্গন্ধ নয়—সুগন্ধ, সুগন্ধ। কামিখ্যেতে মার প্রতিমার নীচে কুণ্ড আছে—সেই কুণ্ড থেকে ও চরণামৃত তুলে আনা। সেখানে রাশি রাশি ফুল বিল্বিপত্র রাতদিন পড়ছে কিনা—সেই ফুল বিল্বিপত্র পচে পচে ও রকম—সুগন্ধ হয়েছে। বাঁ হাতে নাকটি টিপে, ডানহাতে ধরে ঢুক করে খেযে ফেল।”

হরিদাসী উপদেশ অনুসারে পান করিয়া, বাটি নামাইয়া রাখিয়া, নাক মুখ শিটকাইয়া বলিল, “ম্যাগোঃ—কি—সুগন্ধ! ছি ছি—রাম রাম!”

গদাই নিজে আর একপাত্র ঢালিয়া বলিঁল, “ওকি হরিদাসী? ছি ছি রাম রাম বলতে আছে? কার চরণামৃত জান? স্বয়ং মা কামরূপ কামিখ্যে দেবীর চরণামৃত। তুমি বললে ছি ছি? জিভ্যে খসে যাবে যে!—তাঁর চেয়ে জাগ্রত কালী কলিতে আর আছে নাকি!”—বলিয়া গদাই পাত্রটি ধরিয়া চুমুক দিল। তাহার পর কোঁচার খুঁট গলায় জড়াইয়া, যুগ্মকরে প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “হে মা কামরূপ কামিখ্যে কালী, হরিদাসীর অপরাধ নিও না

মা। ও নিতান্ত ছেলেমানুষ, অজ্ঞান, অল্পবুদ্ধি। ওর কথা ধরতে নেই মা। মাপ কর মা। দোহাই মা, সাত দোহাই তোমার।"

গদাধরের আচরণ দেখিয়া হরিদাসী কতকটা ভয়ে কতকটা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গদাই নিজে এক পাত্র ঢালিয়া, হরিদাসীর বাটি বারো আনা রকম পূর্ণ করিয়া দিল।

হরিদাসী বলিল, "আর না, আর আমি খেতে পারব না।"

গদাই বলিল, "খাও—না খেলে অপরাধ হবে। প্রথম বার খেয়ে তুমি নাক শিটকেছ—ছি ছি বলেছ। তাতেই তোমার ভয়ানক পাপ হয়েছে। টাকাগুলো চারগুণ না হয়ে একেবারে উড়ে না গেলে বাঁচি। তা হলে আমাদের বিয়েও হয়েছে—আমরা বড়লোকও হয়েছি!—খাও—খেয়ে বল—আঃ মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল।"

হরিদাসী তখন সেটুকু কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "আঃ—মার চরণামৃত খেয়ে প্রাণটা শীতল হল। বলি হ্যাঁগা, 'ঝাঁঝ' বলতে আছে?"

গদাই নিজের পাত্রটি পান করিয়া বলিল, "আছে।"

"আচ্ছা, এত ঝাঁঝ কেন?"

গদাই হাসিয়া বলিল, "হেঁ হেঁ—মা কামিখ্যে কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে না ত কি তোমার এই সব মেঠো কালী ঘেটো কালী কাঠকুড়ুনি কালীর চরণামৃতে ঝাঁঝ হবে? ঝাঁঝ যাকে বলছ, সেটা আসলে মা কালীর শক্তি—ব্রহ্মতেজ।"

হরিদাসী বলিল, "খুব তেজ কিন্তু। আমার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠেছে।"

"হবে না? কামরূপের কামিখ্যে কালীই হলেন সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা। তার নীচেই কালীঘাটের কালী। তুমি কখনও কালীঘাটে যাওনি ত?"

"নাঃ।"—হরিদাসীর চক্ষু এখন উজ্জ্বল—নাসিকা স্ফীত—নিশ্বাস প্রবল।

গদাই অত্যন্ত ভাবসিক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর তোমায় কালীঘাটের কালী, কামিখ্যে কালী, সব দেখিয়ে আনবো।"

হরিদাসী বলিল, "আমাদের বিঃ—বিয়ে কঃ—কবে—হবে?"

হরিদাসীর কথা জড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া গদাই ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিল, "মা কালীর যদি দয়া হয় তবে বিয়ের আর

ভাবনা কি হরিদাসী? আজ যদি দেখি আমার সে পঞ্চাশ টাকা দুশো টাকা হয়েছে, তা হলে মাসখানেকের পরেই বিয়ে হবে। আজ হ'ল গিয়ে ২৪শে অগ্রাণ—এ মাসে আর দিন নেই। পৌষমাসে ত হিঁদুর বিয়ে হবারই যো নেই। মাঘমাস পড়তেই শুভকর্ম্ম সেরে ফেলা যাবে।"

"কক:—কলকাতায় যেতে হবে? কালীঘাটের কা:—কালী আমায় দেখাবে?"

"দেখাব বইকি। কালী দেখাব—চিড়িযাখানা দেখাব—যাদুঘর দেখাব। একদিন থিয়েটার শুনতে নিয়ে যাব।"—বলিয়া গদাই নিজের জন্য আর এক পাত্র ঢালিল।

তাহা দেখিয়া হরিদাসী বলিল, "আঃ—আমাকেও দাও।"

গদাই বলিল, "না, তোমার আর খেয়ে কায নেই। তুমি মেয়েমানুষ বই ত নয়, বেশী ব্রহ্মতেজ সহ্য করতে পারবে না।"

হরিদাসী মিনতির স্বরে বলিল, "একটুখানি।"

গদাই হাসিয়া তাহার বাটিতে অল্প একটু ঢালিয়া দিল। হরিদাসী সেটুকু পান করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিল, "মায়ের চঃ—চর্ণ খেয়ে প্রাণটা—শীতল্ল।"

গদাই তখন তাহাদের বিবাহ এবং ভাবী সুখসম্পদের চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল। তাহাকে আর চাকরি করিতে হইবে না। মন্ত্রবলে টাকা বাড়াইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। কলিকাতায় একখানা এবং কাশীতে একখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। গদাই বলিল দ্বিতল—হরিদাসী বলিল ত্রিতল না হইলে মানাইবে না। এইরূপ কথোপকথনে দশটা বাজিল।

গদাই বলিল, "আর দেরী করা নয়। আসন পেতে ধুনোটুনো জেলে দাও।"

হরিদাসী উঠিয়া টলিতে টলিতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিল। গদাই তখন কাঠের বাক্সটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, "ঈশ—বড্ড ভারী হয়েছে।"

"দেখি?"—বলিয়া হরিদাসী বাক্সটি নিজহস্তে লইয়া দুইবার ঝাঁকানি দিল। ভিতরে টাকা ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

গদাই আসনে বসিয়া, বাক্সটি সম্মুখে রাখিয়া লালসূতার বন্ধনের উপর একশত আট বার 'মন্ত্র' জপ করিল। পরে বলিল—"হরিদাসী, বাক্স খুলে ফেল।"

আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া হরিদাসী তালা খুলিল। গদাই টাকা গণিয়া থাকে থাকে সাজাইতে লাগিল। অবশেষে দেখা গেল ঠিক ২০৮৲

হইয়াছে। গদাই আনন্দে যুগ্মহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "জয় মা কালী! এমনি দয়া যেন চিরদিন থাকে মা।"

হরিদাসীকে তাহার আটটি টাকা গণিয়া দিয়া, বাকীগুলি গদাই ভিতরে গিয়া সিন্দুকে তুলিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আর একটা ঘলঘসের শিকড় তুলে ফেল হরিদাসী। ত্রিশ টাকা মাইনে পেয়েছিলাম, তার পনেরটি খরচ করেছি, পনেরটি আছে। আগেকার সেই দশ ছিল। পঁচিশটি টাকা আবার রাখি, একশো হবে এখন। সবসুদ্ধ তিনশো হলে আমাদের বিয়েটা খুব ধুমধাম করেই হতে পারবে।"

প্রদীপ লইয়া গদাই হরিদাসীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনের প্রান্তে গেল। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে শিকড় তোলা হইল। গদাই ২৫৲ বাক্সে রাখিলে হরিদাসী বলিল, "দেখ, আমারও কিছু টাকা রাখলে হয় না?"

"বেশ ত। গিয়ে নিয়ে এস।"

"সঙ্গেই কিছু এনেছি—সামান্য।"

সামান্য শুনিয়া গদাইয়ের মনটি ছোট হইয়া গেল। বলিল—"আচ্ছা—যা এনেছ দাও।"

হরিদাসী কোমর হইতে একটি থলিয়া বাহির করিয়া, পঞ্চাশটি টাকা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া বলিল, "আমারও দুশো হবে?"

"নিশ্চয়—নিজের চোখেই ত দেখলে।"—বলিয়া গদাই বাক্স বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

হরিদাসী বলিল, "দাঁড়াও—দাঁড়াও—আরও কিছু দিলে হয় না?"

গদাই কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছে। যত দেবে ততই বাড়বে।"

হরিদাসী বলিল, "আগে ভেবেছিলাম, প্রথমবার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দেখি। কিন্তু পরখ ত হয়ে গেল, দেরী করে আর কি হবে?—আরও একশো"—বলিয়া কোমরের মধ্য হইতে একটি বৃহত্তর থলি বাহির করিয়া ঢালিয়া দিল। গদাই টাকাগুলি গণিয়া বাক্সে ভরিয়া ডালা বন্ধ করিবার উপক্রম করিল।

হরিদাসী বলিল, "থাম—থাম। এখন বন্ধ কোরো না। আচ্ছা, একখানা নোট যদি রাখা যায় ত চারখানা হবে?"

গদাই মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিল, "হতেই হবে। মা কালীর

হুকুম। নোট কি বলছ, যদি একটা খোলামকুচি এতে রেখে দাও ত চারটে খোলামকুচি হয়ে যাবে।”

হরিদাসী তখন আঁচলের গিরো খুলিয়া খানকতক নোট গদাইয়ের হাতে দিল। গদাই গণিয়া দেখিল, দশখানা আছে—দশ টাকার করিয়া।

হরিদাসী বলিল, “দেড়শো আর এই একশো—আড়াইশো। আমার হাজার টাকা হবে ত?”

“না হয়ে যায় কোথা! এবার বাক্স বন্ধ করি?”

“কর।”

“দেখ ভেবে চিন্তে। আর কিছু রাখতে হয় ত রাখ।”

“আর কিছু সঙ্গে নেই।”

“গিনি টিনি?”

“না। অন্যবারে দেখা যাবে।”

গদাই বাক্স বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল।

শেষে হরিদাসী বলিল, “রাত্রি হয়েছে, এখন আসি। আবার কবে আসবে?”

“একমাস পরে চতুর্দ্দশীর রাত্রে ত আবার আসবই। মাঝেও তুই একবার আসতে পারি।”

“বেশ করে মন্তর পোড়ো। হাজারটি টাকা আমার পাওয়া চাই।” বলিয়া হরিদাসী প্রস্থান করিল।

গদাই খিল দিয়া আসিয়া আর এক পাত্র ‘চরণামৃত’ পান করিল। শয্যায় শয়ন করিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, একদমে আড়াইশো টাকা লাভ। গদাধরের বৃহস্পতির দশা চলছে। একজন ভাল দৈবজ্ঞ পেলে জিজ্ঞাসা করি, এ দশা আমার আর কতদিন থাকবে।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ ॥ পীড়িত

দেওঘরে পৌঁছিয়া গোপীকান্তবাবু যতীন্দ্রনাথেরই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সহরের বহির্ভাগে বৃহৎ দ্বিতল রক্তবর্ণ অট্টালিকা—চারি পার্শ্বে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর নানা জাতীয় ফুলের বাগান। স্থানটি সুরম্য। দেখিয়া গোপীকান্তবাবুর বড়ই পছন্দ হইল।

প্রথম কয়েক দিবস প্রভাতে ও বৈকালে উভয়ে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যতীন্দ্রবাবুর নিরহঙ্কার সরল সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে গোপীকান্তবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

পাঁচ ছয়দিন অতীত হইলে গোপীকান্তবাবু একদিন বলিলেন, "যতীনবাবু, চলুন আজ একটু সকালে বেরিয়ে একটা বাসা ঠিক করে ফেলি।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "বাসা? বাসা কেন?"

গোপীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার উপর আর কতদিন উপদ্রব করব?"

"আমি ত উপদ্রবের মত কিছু অনুভব করছিনে। আপনাকে সাথী পেয়ে পরম আনন্দেই আছি। তবে, আপনার হয়ত এখানে অসুবিধে হচ্ছে।"

"আমার অসুবিধে কিছুমাত্র হয়নি।"

"আপনি ঠিক আন্তরিক কথাটি বলছেন কি? না, ভদ্রতার খাতিরে বলছেন? দেখুন, আমার মনে যেমনটি হয় বাইরে ঠিক সেই রকমটি প্রকাশ করে বলি। যদি এখানে আপনার বসবাসের কোনও রকম অসুবিধে হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহ করে বলুন—সে অসুবিধেটুকু দূর করতে আমরা চেষ্টা করব। যদি অক্ষম হই, তাহলে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক করে দেব।"

গোপীকান্তবাবু বলিলেন, "না যতীনবাবু, আমি আন্তরিক কথাই বলেছি, আমার এখানে এক তিলও অসুবিধে হয়নি। আপনারা আমাকে আত্মীয়ের অধিক করে যত্ন করছেন। আমার মনে হয় আপনাদেরই আমি নানা অসুবিধেয় ফেলেছি।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের কিছু অসুবিধেতে ফেলেন নি। বরং আপনি থাকতে আমার অনেক ভরসা আছে। মামা ঠিকই বলেছিলেন, বিদেশে ছেলেপিলে নিয়ে রয়েছি, একদিন যদি আমার অসুখ করে তাহলে আমার স্ত্রী মহা মুস্কিলে পড়ে যাবেন।"

গোপীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ঐটে আমার সুবিধে আছে। স্ত্রী না থাকাতে মুস্কিলে পড়বার কেউ নেই।"

যতীন্দ্রবাবু কিয়ৎক্ষণ গোপীবাবুর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনি কি বিপত্নীক?"

"না।"

গোপীবাবু আর কিছু বলিলেন না—যতীন্দ্রবাবুও জিজ্ঞাসা করিলেন না। যতীন্দ্রবাবু এটা লক্ষ্য করিয়াছেন, বাড়ীর কথা, আত্মীয়স্বজনের প্রসঙ্গমাত্র উঠিলেই গোপীবাবু নীরব হন। সেই জন্য তিনি এই সকল বিষয়ে গোপীবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বলা বাহুল্য তিনি গোপীবাবুকে যশোহর জেলার রাধামোহন গোস্বামী বলিয়াই জানেন। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জ্ঞাত নহেন।

বাসা পরিবর্ত্তনের আর কোনও প্রসঙ্গ উঠিল না। দশ দিন কাটিলে, একাদশ দিবসে হঠাৎ গোপীবাবুর জ্বর হইল। অল্পে অল্পে সারিয়া যাইবে ভাবিয়া প্রথম দিন চিকিৎসাদির কোনও ব্যবস্থা হইল না।

পরদিবস জ্বর প্রবলতর হইল। স্থানীয় ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, উহা বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু তৎপরদিবস ডাক্তারবাবুর রোগনির্ণয় ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইল। জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। গোপীবাবু অজ্ঞান।

যতীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়েই মিলিয়া যথাসাধ্য রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু ভীত হইযা পড়িলেন। বলিলেন—"লক্ষণ ভাল নয়। এঁর আত্মীয়স্বজনকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন।"

যতীন্দ্রবাবু মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। রোগীর আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে কিছুই তিনি জানেন না। এ অবস্থায় বিদেশে যদি মৃত্যু ঘটে তবে সেটা বড়ই পরিতাপের কারণ হইবে। আশা করিতে লাগিলেন যদি দিনের মধ্যে একটিবারও জ্ঞান হয় তবে আত্মীযস্বজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

কিন্তু সে সুযোগ হইল না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দই দেখা যাইতে লাগিল।' যতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী দুইটি শিশুসন্তান লইয়া ব্যস্ত—রোগীর কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন না। যতীন্দ্রবাবু একাকীই অধিকাংশ সময় পরিচর্য্যা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "দেখ, ওঁর ঐ টিনের বাক্সটার ভিতরে পুরোণো চিঠিপত্র নিশ্চয়ই আছে। খুলে দেখ না—আত্মীযস্বজনের নাম ঠিকানা তাতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

যতীন্দ্রবাবু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "সেটা কি উচিত হবে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "এখন এই বিপদের সময় উচিত অনুচিতের অত সূক্ষ্মবিচার করলে চলবে কেন? ঈশ্বর না করুন, যদি কোন ভালমন্দ হয়, ওঁর আত্মীয়-স্বজন হয়ত ভাববেন আমরা ওঁর যথেষ্ট সেবা করিনি, ভাল করে চিকিৎসা করাইনি, তাই এমন হয়েছে। দেখ তুমি বাক্স খুলে—তাতে কিছু অন্যায় হবে না।"

যতীন্দ্রবাবু স্ত্রীর যুক্তিই গ্রহণ করিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীবাবুর একটা জামার পকেটে চাবি পাওয়া গেল। বাক্স খুলিয়া যতীন্দ্রবাবু দেখিলেন, পাঁচখানা চিঠি রহিয়াছে। ঘরে যথেষ্ট আলোক না থাকাতে সেগুলি লইয়া পড়িবার জন্য তিনি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

বাহির হইতে যে চিঠিখানি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বলিয়া বোধ হইল, প্রথমেই সেইখানি খুলিলেন। সেখানিতে যদি আবশ্যকীয় সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য চিঠিগুলি খুলিবার প্রয়োজন হইবে না।

এখানি হুগলিতে প্রাপ্ত প্রথম পত্র। পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু বুঝিলেন, ইনি কমলপুর হইতে আসিয়াছেন এবং তথাকার জমিদার। রমণ ঘোষ থানায় নালিশ করিতে গিয়াছিল—সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়া খুলনায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে। তাহা হইলে কমলপুর খুলনা জেলায়। স্ত্রীলোক-ঘটিত মোকর্দ্দমা, খুলনা হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে—সুতরাং আপাততঃ হুজুরের দেশে আসার আবশ্যক নাই। সুতরাং ইনি ওয়ারেণ্টের ভয়ে পলাতক। পত্র-শেষে স্বাক্ষর শ্রীগদাধরচন্দ্র পাল। রমণ ঘোষ ফরিয়াদী—কোন্ রমণ ঘোষ? তাঁহাদের প্রজা হাজিপুরের সেই রমণ ঘোষ নয় ত? সেও ত খুলনা জেলায় তাহার মামার বাড়ীতে গিয়া বাস করিয়াছে। গদাধরচন্দ্র পাল!—সেই জালিয়াৎ গদাই পাল নয় ত?

যতীন্দ্রবাবু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আর একখানি ছোট পত্র খুলিলেন। এখানি পুলিশ কর্ত্তৃক রমণ ঘোষ গ্রেপ্তার হইবার পর গদাই পালের লিখিত পত্র। ইহা পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিলেন, গদাই পালই চক্রান্ত করিয়া, পুলিশকে ঘুষ দিয়া, মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে চালান দেওয়াইয়াছে। এই সেই রমণ ঘোষ এবং এই সেই গদাই পাল—এ ধারণা যতীন্দ্রবাবুর মনে বদ্ধমূল হইল। তখন স্মরণ হইল, রমণ ঘোষ তাঁহাকে বলিয়াছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের জমিদারীতে সে বাস করে। ইনি ত

গোস্বামী—তবে হয়ত এটা তাঁহার ছদ্মনাম। আবশ্যকীয় সংবাদ ইহাতেও না পাইয়া, এবার যতীন্দ্রবাবু বড় পত্রখানি খুলিলেন।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে অন্ধকার হইয়া আসিল। ভৃত্য আসিয়া, পার্শ্বে একটি ছোট টেবিল রাখিয়া তাহার উপর বাতি দিয়া গেল। পত্রখানি দুইবার পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু ঘটনাসূত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া লইলেন—আবশ্যকীয় সংবাদও প্রাপ্ত হইলেন। পরে অন্য দুইখানি পত্রও খুলিয়া পাঠ করিলেন। গদাই পাল মিথ্যা মোকর্দ্দমায় রমণ ঘোষকে জড়াইয়াছে ইহাতে রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিতে লাগিল। গদাই যে বৈরানির্য্যাতনের অভিপ্রায়েই এ কার্য্য করিয়াছে তাহাতে যতীন্দ্রবাবুর সন্দেহ মাত্র রহিল না। ভাবিলেন, সে গরীব হয়ত অর্থাভাবে নিজের মোকর্দ্দমার ভাল করিয়া তদ্বিরও করিতে পারিবে না—নির্দ্দোষ হইয়াও জেলে যাইবে। তাহার উদ্ধারের উপায় যতীন্দ্রবাবু তখনই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গদাই পালের শেষ পত্র পড়িয়া জানিতে পারিলেন, ২রা পৌষ রমণ ঘোষের মোকর্দ্দমার দিন স্থির আছে। আজ ২৯শে অগ্রহায়ণ। ইতিমধ্যে একটা কিছু উপায় করিবেন স্থির করিয়া তিনি ভিতরে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোহিতকে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন—

তোমার ভ্রাতা এখানে সাংঘাতিক পীড়িত, শীঘ্র এস।

যতীন্দ্রনাথ বসু।
লালকুঠি, দেওঘর।

দুইদিন পরে, সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে মোহিত তাহার ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া দেওঘর ষ্টেশনে রেলগাড়ী হইতে নামিল। সারাদিন উপবাস, তাহার উপর দারুণ দুশ্চিন্তা, উভয়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে একজন ঝি এবং একজন খানসামা। কুলীর মাথায় জিনিষপত্র দিয়া ফটক পার হইবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া ইঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অনেক কষ্টে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, লালকুঠি যাইবার জন্য মোহিত গাড়োয়ানকে আদেশ করিল।

গাড়ী ছাড়িলে সুলোচনা বলিলেন, "ঠাকুরপো!"—তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুকম্পিত।

"কি বউদিদি ?"

"টেলিগ্রামে কি লেখা ছিল ?"

এই কথাটি সুলোচনা ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মোহিত উত্তরও দিয়াছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সে বিরক্ত হইত ; কিন্তু এখন অবস্থা বুঝিয়া, স্নেহগর্ভস্বরে পুনরায় টেলিগ্রামের কথাগুলি আবৃত্তি করিল।

বউদিদি বলিলেন, "কি ব্যারাম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তোমার কি অনুমান হয় ?"

"কি করে বলব বউদিদি !—যাহোক, আর ত বেশী দেরী নেই—এখনি জানতে পারব।"

দুই মিনিট কাল নীরব থাকিয়া, সুলোচনা কাঁদিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, দেখতে পাব ত ?"

মোহিত বলিল, "ঈশ্বর কি করেন দেখি বউদিদি। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

পূর্ব্ববৎ কম্পিত অশ্রুসিক্ত স্বরে সুলোচনা বলিলেন, "আমি সারা পথ দুর্গানাম জপ করতে করতে এসেছি। মা দুর্গা কি আমার পানে মুখ তুলে চাইবেন না ?"

মোহিত নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুমোচন করিল। সেও একান্তমনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন গিয়া দাদাকে ভাল দেখিতে পায়।

এইরূপে কুড়ি মিনিট কাল অতীত হইলে গাড়ী থামিয়া গেল। জানালার ফাঁক দিয়া মোহিত দেখিল, বৃহৎ বাগানযুক্ত একটি রক্তবর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে।

গাড়োয়ান দরজা খুলিয়া বলিল, "বাবু, এই লালকুঠি।"

অবতরণ করিয়া, ফটক খুলিয়া মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখের বারান্দায় গিয়া দেখিল, একজন ভৃত্য বাতি জ্বালিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল— "এইখানে যতীন্দ্রবাবু থাকেন ?"

বলিতে বলিতে পাশের কামরা হইতে যতীন্দ্রবাবু বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে আসছেন ?"

"কমলপুর থেকে। আমার নাম শ্রীমোহিতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"মোহিতবাবু, আসুন আসুন। আমিই আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।"

"দাদা কেমন আছেন ?"

"আজ অপেক্ষাকৃত একটু ভাল।"

"কি হয়েছে ?"

"জ্বরবিকার।—গাড়ীতে আর কে আছেন ?"

"আমার বউদিদি।"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "ওরে কেষ্টা, গাড়োয়ানকে বল্ গাড়ী ভিতরে এনে অন্দরের দরজায় লাগায়।"

কেষ্টা চাকর বলিতে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোহিত গিয়া বউদিদিকে বলিল, "দাদা আজ অনেকটা ভাল আছেন, ভয় নেই।"

ফিরিয়া আসিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কই ?"

"আসুন।"—বলিয়া মোহিতকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গোপীবাবু নিদ্রিত। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে মোহিত উপবেশন করিল, যতীন্দ্রবাবু পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই অল্প শব্দে গোপীবাবু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন, "কে ?"

"দাদা—আমি মোহিত। কেমন আছেন দাদা ?"—বলিয়া মোহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, অগ্রজের পদযুগলে হস্তার্পণ করিয়া স্বীয় ললাট স্পর্শ করিল।

"ভাল আছি। আর কে এসেছে ?"

"বউদিদি এসেছেন।"

"কই ?"

সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া সুলোচনা প্রবেশ করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদযুগলে নিজ মস্তক রাখিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মোহিত উঠিয়া বাহিরে গেল।

তখন সুলোচনা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেমন আছ ?"

"ভাল আছি। তোমাকে দেখেই আমার অর্দ্ধেক ব্যারাম ভাল হয়ে গেল।" গোপীবাবুরও চোখে জল আসিতে লাগিল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ ॥ রহস্যভেদ

এক সপ্তাহ পর গোপীবাবু পথ্য পাইলেন। মোহিতের উপর সংসারের ভার দিয়া, সেইদিন অপরাহ্ণের ট্রেনে যতীনবাবু কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। যতীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

প্রাভাতিক চা পানাদির পর গোপীবাবু ও যতীনবাবু সম্মুখের বারান্দায় দুইখানি ঈজিচেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। গোপীবাবু ধূমপান করিতেছেন— যতীনবাবু, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আগত এক সপ্তাহের ডাক খুলিয়া দেখিতেছেন। বউদিদিকে লইয়া মোহিত বৈদ্যনাথদেবের দর্শনে গিয়াছে।

যতীন্দ্রবাবুর ডাক দেখা শেষ হইলে গোপীবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "যতীন্দ্রবাবু, আমার অসুখের সময় আপনি যে উপকার করেছেন, তা আমি ইহজন্মে ভুলতে পারব না। আপনি না থাকলে একা আমি এ বিদেশে বিঘোরে মারা যেতাম।"

যতীন্দ্রবাবু বিনয়সূচক প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া গোপীবাবু বলিলেন, "না না—ও কথা বলবেন না। আপনি আমার যা সেবা শুশ্রূষা করেছেন, আমার ভাই সে রকম করতে পারত কিনা সন্দেহ। বউমা যে রকম করেছেন তাতে মনে হয় আর জন্মে উনি আমার মা ছিলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার বড় খট্‌কা ঠেকেছে, যতীনবাবু। আমি আপনাদের কাছে নিজেকে রাধামোহন গোস্বামী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমি কে, আমার বাড়ী কোথা, আমার কে আছে, কিছুই প্রকাশ করিনি। আপনি কি রকম করে আমার পরিচয় জানতে পারলেন? দেখুন, মোহিত আসা অবধিই এ প্রশ্ন আমার মনে উঠেছে। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাতেও বটে, আর একদিন আপনার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা কবার অবসর অভাবেও বটে, আপনাকে এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।"

যতীন্দ্রবাবু বাগানের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"গোপীবাবু, এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার ইচ্ছা আমার বারম্বার হয়েছিল, কিন্তু আমিও লজ্জায় পারিনি। আমার দ্বারা একটা বড় অপরাধ হয়ে গেছে। সে জন্যে আপনার কাছে আমার ক্ষমাভিক্ষা করবার আছে।"

অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলুন দেখি?"

যতীনবাবু তখন, গোপীবাবু তাৎকালিক অবস্থা এবং তাঁহাদের বিষম সমস্যা বর্ণনা করিয়া কিরূপ অনন্যগতি হইয়া বাক্স হইতে চিঠি বাহির করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, সমুদায় বলিলেন। শেষে বলিলেন—"সেই চিঠিগুলি পড়ে আপনার প্রকৃত নাম, পরিচয়, আপনার ভাইয়ের নাম, কি কারণে আপনি নাম গোপন করে পশ্চিমে এসেছেন, সমস্তই জানতে পারলাম। আর জানতে পারলাম, আপনি একজন ভয়ানক বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছেন।"

গোপীবাবু বলিলেন, "কি রকম?"

"ঐ যে আপনার গদাই পালটি, ও একটি ভয়ানক লোক। ও পূর্ব্বে আমাদেরই এষ্টেটে ছিল। আপনার ওখানে কেন গিয়ে জুটেছে, আপনার সঙ্গে কি কি দাগাবাজি ও করেছে, পরে অনুসন্ধানে সমস্তই আমি জানতে পেরেছি।"

আরামকেদারায় উচ্চ হইয়া বসিয়া গোপীবাবু রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি?"

যতীন্দ্রবাবু তখন গদাই পালের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং রমণ ঘোষ ঘটিত ব্যাপারটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

"আপনার চিঠি পড়েই আমার মনে হয়েছিল, রমণ ঘোষকে মিথ্যা মোকর্দ্দমায় ফাঁসাবার যে কারণ গদাই আপনাকে লিখেছে, খুব সম্ভবতঃ তা অলীক—নিজের শত্রুদমন করবার অভিপ্রায়েই ও কায সে করেছে। যেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহিতবাবুকে টেলিগ্রাম করলাম, তার পরদিনই খুলনার একজন জমিদার—আমার পুরোণো বন্ধু—মোক্ষদাচরণ বাবুকে রেজিষ্ট্রি করে ১০০৲ পাঠিয়ে দিই আর লিখি যে ২রা পৌষ তারিখে রমণ ঘোষের নামে ৪১১ ধারায় মোকর্দ্দমা আছে, সে আমার পুরাণো প্রজা, তার তরফে ভাল ভাল উকীল মোক্তার নিযুক্ত করে যেন রীতিমত তদ্বির করা হয়—আর আমি সময় পেলেই নিজে খুলনায় আসছি। সে চিঠির উত্তর পাই—মোহিতবাবু তখন এখানে—২রা পৌষ তারিখে ফরিয়াদী উপস্থিত না হওয়ায় তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে—দশদিন পরে মোকর্দ্দমার তারিখ পড়েছে। আপনি যেদিন পথ্য করলেন, সেদিন আমি যে কলকাতা রওয়ানা হলাম, সে খুলনা যাব বলেই। যেদিন তারিখ ছিল সেদিনও মোকর্দ্দমা ওঠেনি—কেনারাম ফরিয়াদী উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন ডেপুটির অসুস্থতার জন্যে ফের মোকর্দ্দমা মুলতুবী

হয়েছে। ২২শে পৌষ আবার তারিখ। খুলনায় মোক্ষদাবাবুর বাড়ীতে অতিথি হয়ে আমি চারদিন ছিলাম। কতক নিজে, কতক গোপন চর নিযুক্ত করে—অনেক বিষয় অনুসন্ধান করে এসেছি। জানতে পেরেছি, শুধু গদাই পালের বদমায়েসিতেই নাহক আপনি এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন—বিস্তর টাকাও সে আপনাকে ঠকিয়ে নিয়েছে।"

গোপীবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "বলেন কি! কি জানতে পেরেছেন?"

"আপনাকে গদাই পাল লিখেছিল, গঙ্গামণিকে নিয়ে রমণ ঘোষ খুলনায় আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছিল, ক্ষুদিরাম মজুমদার মোক্তারকে নিযুক্ত করে নালিশও করেছিল কিন্তু তা ডিসমিস হয়ে যায়।"

"লিখেছিল ত।"

"ক্ষুদিরাম মজুমদার বলে কোন মোক্তারই খুলনায় নেই, কখনও ছিল না। খুলনায় নেই, খুলনার কোন সবডিভিসানেও নেই। আর গত তিনমাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোন স্ত্রীলোক খুলনায় কারু নামে কোনও নালিশ দায়েরও করেনি—তা ডিসমিসও হয়নি। আমার নিযুক্ত মোক্তার ইন্‌চার্য্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নালিশী দরখাস্তের রেজিষ্টার বই তন্ন তন্ন করে দেখে এসে আমায় এ কথা বলেছে।"

গোপীবাবু ত্রস্তভাবে বলিলেন, "মোক্তারকে আপনি কি বলেছিলেন?"

যতীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই। আপনার নাম করিনি। কি রকমের মোকর্দ্দমা তাও বলিনি। যা কিছু অনুসন্ধান করেছি, কারু কাছেই আপনার নাম কিম্বা ব্যাপারটা প্রকাশ করিনি। মোক্তারকে শুধু বলেছিলাম—রেজিষ্টার বই থেকে দেখে এস, গত তিনমাসের মধ্যে গঙ্গামণি বলে কোনও স্ত্রীলোক কারু নামে কোনও নালিশ দায়ের করেছিল কিনা, যদি করে থাকে তবে সে কোন্ ধারার মোকর্দ্দমা এবং তার ফলাফলই বা কি হয়েছে।"

ইহা শুনিয়া গোপীবাবু আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন—"আর কি জানতে পেরেছেন?"

"গদাই পাল আপনার কাছে বলেছে রমণ ঘোষ আর আপনার ভাই মোহিত দুজনে মিলে সে স্ত্রীলোকটাকে বাগানবাড়ী থেকে উদ্ধার করেছে—এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। রমণ ঘোষ আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছে, কেনারামের

সঙ্গে কোন পুরুষেই তার কোন সম্বন্ধ নেই, মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে তার নামও কখনও শোনেনি, গঙ্গামণির নামও কখনও শোনেনি।"

গোপীবাবু বলিলেন, "তাই ত আমি ভাবছিলাম, রমণ ঘোষ যদি কেনারামের অত বন্ধু—ভাই সম্পর্ক—তা হলে কেনারাম কেন রমণের নামে মিথ্যে মোকর্দ্দমা আনতে রাজি হল। গদাই লিখেছিল, দুশো টাকায় কেনারামকে বশীভূত করে থানায় নালিশ করিয়েছে।"

যতীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে দুশো টাকা গদাধরের গর্ভেই গিয়েছে। একে ঘুষ দেব তাকে ঘুষ দেব বলে ও কি কম টাকাটা আপনার খেয়েছে! হ্যাঁ—কি বলছিলাম? রমণ ঘোষ বললে, একজন উকীলের ছেলে শিশিরকুমার বাবু, কালীপুজোর কয়েক দিন পূর্ব্বে তার হাতে মোহিতের জন্যে একখানি চিঠি দিয়েছিল, আর মুখেও বলে দিয়েছিল কালীপুজোর দিন খুলনায় হিন্দুসভা হবে, সেই সময় সভায় মোহিতকে নিশ্চয় যেন সে সঙ্গে করে আনে। আপনাদের বাড়ী গিয়ে সেই চিঠি সে মোহিতকে দিয়েছিল—পরদিন সন্ধ্যাবেলা আবার এসে জবাব নিয়ে গিয়েছিল। কালীপুজোর পূর্ব্বদিন সকালবেলায় সে খুলনা রওনা হয়। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা শিশিরকুমারবাবুর হাতে মোহিতের চিঠি দিয়েছে, এ কথা শিশির আমায় নিজে বলেছে। পরদিন—অর্থাৎ কালীপুজোর দিন সকালবেলা মোহিত এসে পৌঁছলে—রমণ ঘোষ বেলা ৮টার সময় তাঁর সঙ্গে শিশিরকুমারের বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিল। এ কথাও শিশিরবাবু বললেন। রাত্রের মধ্যে খুলনা থেকে কমলপুরে গিয়ে গঙ্গামণিকে উদ্ধার করা, আবার সকালবেলায় খুলনায় ফিরে আসা রমণ ঘোষের পক্ষে কি সম্ভব?"

গোপীবাবু বলিলেন, "একেবারেই অসম্ভব।"

"আরও দেখুন, গদাই যে লিখেছিল, কালীপুজোর পরদিন প্রত্যূষে থানায় গিয়ে সে দেখে রমণ ঘোষ স্ত্রীলোকটাকে নিয়ে নালিশ করবার জন্যে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে, সে কথাও মিথ্যে। কারণ শিশিরবাবু বললেন—তাঁর বাপ উকীলবাবুটিও বললেন, কালীপুজোর পরও দু' তিনদিন তাঁরা রমণকে তাঁদেরই বাসায় দেখেছেন।"

গোপীকান্তবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধি হইয়া প্রায় পাঁচ মিনিটকাল বসিয়া রহিলেন। যতীন্দ্রবাবু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

অবশেষে গোপীবাবু বলিলেন, "সে স্ত্রীলোকটার কি হল কিছু খবর পেয়েছেন ?"

"আমি দরিয়াপুরে একজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম। সে এসে বললে, গ্রামে প্রকাশ, কেনারামের ভাজ গঙ্গামণি দু' তিনমাস তার বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল, কালীপুজোর দিন ফিরে এসেছে।"

শুনিয়া গোপীবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, যাক, তাঁহার বদনামটা প্রচার হয় নাই। কিন্তু গঙ্গামণি যে কি করিয়া পলাইল এবং সব কথা প্রকাশই বা করিল না কেন, ইহা তাঁহার পক্ষে এক সমস্যায় দাঁড়াইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য গদাই পালই নিশ্চয় তাহাকে কোনও উপায়ে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, এবং লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকটা আসল কথা প্রকাশ করে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোপীবাবু বলিলেন, "রমণ ঘোষের মোকর্দ্দমার অবস্থা কি রকম ?"

"অবস্থা কিছু মন্দ নয়। রমণ ঘোষের উঠানে যে খড়ের পাঁজা থেকে বাসন বেরিয়েছে, সেই পাঁজার কাছে দেওয়াল খানিকটা ভাঙ্গা। বাইরে থেকে কেউ অনায়াসে সেখানে গিয়ে বাসন লুকিয়ে রাখতে পারে। আমি উকীলের পরামর্শ নিয়েছি, তাঁরা বলেন এই কারণেই রমণ ঘোষের খালাস হওয়া উচিত। তবে কি জানেন, ফৌজদারী মোকর্দ্দমা, শেষ ফল কি দাঁড়ায় কিছুই বলা যায় না। কেনারামও শুনলাম মিথ্যে সাক্ষী দিতে খুব নারাজ। সাক্ষী দেবার ভয়েই প্রথমবার পালিয়েছিল। আমার বিবেচনায়, তার উপর একটু চাপ দিয়ে সমস্ত সত্য কথা বলতে তাকে বাধ্য করা উচিত। তাহলে রমণ ঘোষও খালাস পাবে, আর গদাই পালও ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবে। জেল না হলে গদাই পালের উপযুক্ত শাস্তি হবে না।"

"কেনারাম সত্য কথা বললে সে নিজে বিপদে পড়বে না ?"

"তা ত পড়বেই, কিন্তু হাকিম নিশ্চয়ই তার অপরাধ লঘু বিবেচনা করবে। সত্য কথা বললে অল্প-সল্প দণ্ডের উপর দিয়েই যাবে।"

"সে রাজি হবে কি ?"

"আপনি তার জমিদার। আপনি নিজে যদি তার উপর একটু চাপ দেন—তবে হয়ত সত্য বলবে। অন্ততঃ আমাদের চেষ্টা করে দেখা খুবই উচিত।"

"তা বেশ। আমি চেষ্টা করব। যেদিন আপনার সুবিধা হয় বলুন— কমলপুরে যাওয়া যাক—"

যতীন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "না, কমলপুরে গেলে ত হবে না। মোকর্দ্দমার তারিখ ২২শে পৌষ। আমরা দুজনে গিয়ে মোক্ষদাবাবুর বাসাতে উঠব। তারিখের আগের দিন রাত্রে তাকে ডাকিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করতে হবে, সেই বাসায় রাত্রে তাকে রেখে, আদালতে পরদিন হাজির করে দেওয়া। বেশী আগে থাকতে ঠিক করলে, কত লোক আবার তাকে কত রকম পরামর্শ দেবে, ভয় দেখাবে, সব গুলিয়ে যাবে।"

সেই পরামর্শই স্থির রহিল।

গোপীবাবু তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভ্রাতার প্রতি এতদিন তিনি অন্যায় সন্দেহ করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক মোহিত এই সন্দেহের কথা জানিতে পারে নাই, ইহাই মঙ্গল। রোগের সময় মোহিতের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় ইতিমধ্যে তাহার প্রতি গোপীবাবু প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন এ অন্যায় অবিচারের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। ইহার পর হইতে মোহিতের সহিত ব্যবহারেও সে ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। মোহিত একটু বিস্মিত হইল ; সুলোচনাও দেবরের প্রতি স্বামীর এই ভাবপরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত আরাম পাইলেন।

১৯শে পৌষ গোপীবাবুকে লইয়া যতীন্দ্রবাবু খুলনা যাত্রা করিলেন।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ ॥ ধর্ম্মের জয়

সন্ধ্যা হইয়াছে। মোক্ষদাবাবুর গৃহের একটি কক্ষে, গোপীবাবু ও যতীন্দ্রবাবু উপবিষ্ট। একজন লোক গিয়া বাজারের হোটেল হইতে কেনারামকে ডাকিয়া আনিল।

কেনারাম নিজ জমিদারকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া, ভীত হইয়া প্রণাম করিল।

যতীন্দ্রবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কেনারাম, আমরা সকল কথা জানতে পেরেছি। বাসন চুরির কথা সমস্ত মিথ্যে।"

কেনারাম একবার গোপীবাবুর পানে, একবার যতীন্দ্রবাবুর পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি কে হুজুর?"

গোপীবাবু বলিলেন, "ইনি হুগলি জেলার একজন বড় জমিদার—আমার বন্ধু। তুই যার নামে মিথ্যে নালিশ করেছিস, সেই রমণ ঘোষ আগে এঁরই প্রজা ছিল। ইনি রমণ ঘোষকে খালাস করে নেবার জন্যে এসেছেন। কেন তুই এ মিথ্যে মোকর্দ্দমা করলি?"

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া কেনারাম বলিল, "মিথ্যে কি করে হুজুর?"

গোপীবাবু ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হারামজাদা পাজি।"

যতীন্দ্রবাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "গোপীবাবু, রাগ করবেন না।—আমার হাতেই ওকে ছেড়ে দিন। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। হ্যাঁরে কেনারাম তুই আমাদের কাছে লুকোবি? আমরা যে সবই জানতে পেরেছি। তোদের নায়েব গদাই পালের পরামর্শ মতই তুই এ কায করেছিস। কাঁসারি সাক্ষী দেবে বলে তুই আগে থাকতে বাসন মেরামত করিয়েছিলি। নিজে ঘরে সিঁধ খুঁড়ে রেখেছিলি। তুই থানায় গিয়ে দারগাকে বাসন দিয়ে এসেছিলি। কেমন, এ সব কথা সত্যি না মিথ্যে?"

শুনিয়া কেনারাম একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গোপীবাবুর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"হুজুর, আমি নির্ব্বোধ মুখ্যু গয়লা। আমার কোন দোষ নেই। ঐ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া। জেলের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ কায করিয়েছে। আমার কোন দোষ নেই হুজুর—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। আমায় মাফ করা হোক।"

গোপীবাবু বলিলেন, "তোকে মাফ করতে পারি—যদি তুই কাল আদালতে সব সত্যি কথা বলিস।"

কেনারাম উঠিয়া দাঁড়াইল। করযোড়ে বলিল—"যদি সত্যি কথা বলি, তবে আমার দশা কি হবে হুজুর?"

যতীন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে—তোর কি পাপ পুণ্যের ভয় নেই? আহা, রমণ ঘোষ বেচারি, কোন দোষের দোষী নয়—কখনও কারু মন্দ করেনি। মেহনৎ করে শরীর খাটিয়ে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি পোষে। জেলে গেলে তাকে পাথর ভাঙতে হবে, ঘানি টানতে হবে। ক'দিন বাঁচবে বল্ দেখি? যদি

জেলে সে মরে যায় তবে নরহত্যার পাপ তোকে লাগবে না কি? তুইও কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করিস, সে পাপ কি তোর সইবে কেনারাম? তুই-ই কি অমর? একদিন তোকে মরতে হবে না? যমের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোর মাথায় যে তারা লোহার ডাঙ্গস্ মারতে থাকবে!"

কেনারাম অধোমুখ হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে মুখ তুলিয়া বলিল—"যা হবার তা হয়ে গেছে হুজুর। এখন কি করতে বলেন?"

যতীনবাবু বলিলে, "কাল আদালতে সমস্ত সত্যি কথা বলবি।"

"হ্যাঁ বাবু, দারোগো বলে তা হলে আমারই জেল হয়ে যাবে?"

"সম্ভব।"

"তা হলে আমি কি করে বলি?"

গোপীবাবু বলিয়া উঠিলেন, "পাজি বেটা! নিজের জেলের এত ভয়, আর অন্য একজনকে স্বচ্ছন্দে জেলে দিতে যাচ্ছিস? মিথ্যে সাক্ষী যদি দিস তবে তোর ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করব জানিস হারামজাদা?"

যতীনবাবু বলিলেন, "থাক্ থাক্, রাগ করবেন না গোপীকান্তবাবু। ও যদি সাক্ষীই দেয় তা হলেই কি নিস্তার পাবে। শোন্ কেনারাম, যা বলি বেশ করে বুঝে দেখ্। তোকে প্রবঞ্চনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, তা হলে বলতাম—নাঃ—তোর আবার কিসের জন্যে জেল হবে—তোর কিচ্ছু হবে না। তা ত বলছিনে। সত্যি কথা বললে, মিথ্যে নালিশ করবার অপরাধে খুব সম্ভব তোর কিছু সাজা হবে। যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, তা হলেই কি পার পাবি? খুলনার যত বড় বড় উকীল, সকলকেই আমরা রমণ ঘোষের পক্ষে নিযুক্ত করেছি। তারা যখন তোকে জেরা করতে উঠবে, তখন বাপের নাম ভুলে যাবি তা জানিস? জেরায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবি। তোর মিথ্যে কথা কতক্ষণ টিকবে? ওরা সাক্ষীর পেটে ডুবুরি নামিয়ে কথা বের করে ফেলে। বড় বড় বিদ্বান ভদ্রলোকই জেরার চোটে অস্থির হয়ে যায়—তুই ত মুখ্যু গয়লার ছেলে। ফল এই হবে—মোকর্দ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে—রমণ ঘোষ খালাস পাবে—উল্টে তোর নামে একদফা মিথ্যে নালিশ করবার একদফা মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার—এই দুই দফা মোকর্দ্দমা চলবে। কত টাকা তোর আছে?—সে সময় ক'জন উকীল মোক্তার তুই দিতে পারবি বল্ দিকিন?"

কেনারাম দেখিল, বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা বড় মিথ্যা নয়। যদি তাহার

উপর মোকর্দ্দমা চলে, একজন উকীল দিতেই তাহার হাল গরু বিক্রয় হইয়া যাইবে।

নিতান্ত ভীত হইয়া কেনারাম বলিল, "তা হুজুর—আমার কত দিন জেল হবে?"

যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোর মোকর্দ্দমা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেলে, অন্ততঃ পক্ষে মিথ্যে নালিশ করবার জন্যে এক বছর, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে এক বছর—এই দুই বছর জেল হবে।"

"আর, যদি আমি সত্যি কথা বলি?"

"যদি সত্যি বলিস, তাহলে হাকিমের নিশ্চয়ই দয়া হবে। সব অবস্থা হাকিম যখন শুনবে—তখন বুঝতে পারবে—তুই দোষ করেছিস বটে, কিন্তু অন্য লোকের কুমন্ত্রণায় করেছিস। একমাস কি দুমাস কি বড় জোর তিনমাস তোর জেল হবে—এর বেশী নয়।"

"আজ্ঞে, তিনমাস যদি আমার জেল হয়, এ তিনমাস আমার ছেলেপিলে খাবে কি?"

গোপীবাবু বলিলেন, "শোন্ কেনারাম। যদি সব সত্যি কথা বলে তোর জেল হয়, তবে যতদিন তুই জেলে থাকবি, আমি মাসে মাসে তোর ছেলেপিলের খোরাকীর জন্যে ২৫৲ করে দেব। তোর জমি চাষবাস করবার বন্দোবস্ত নিজে থেকে করে দেব—তা ছাড়া তোর এ বছরের হালবকেয়া খাজনা মাফ। আর, যদি মিথ্যে সাক্ষী দিস, আমার এলাকায় আর থাকতে পাবিনে।"

কেনারাম নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল—"আমার নামে যখন মোকর্দ্দমা চলবে হুজুর, আমি উকীল দিতে পাব কোথা?"

"আচ্ছা যা, সে ভারও আমার। এখন বল্, সত্যি কথা কথা বলবি কিনা?"

"আজ্ঞে, হুজুরের হুকুম কি আমি কোনও দিন অমান্য করেছি? আপনিই আমার বাপ, আপনিই আমার মা। আমি আদালতে সত্যি কথাই বলব। কিন্তু হুজুর, একটা নিবেদন আছে।"

"কি?"

"আমার জেল হলে হুজুর এই যে মাসে ২৫৲ আমার ছেলেপিলের খোরাকীর হুকুম করলেন, সে টাকাটা জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমিই নেব। ঘরে যা ধান চাল আছে, তাতে কোন রকমে আমার ছেলেপিলের খাওয়া পরা চলে যাবে।

টাকা যদি হুজুর আমার ইস্তিরীকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে তক্ষণি সে স্যাকরা ডেকে গয়না গড়াতে দেবে, আমি পাব না। তার চেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি টাকাটা হুজুরের কাছ থেকে নিয়ে একযোড়া বলদ কিনব। আমার ইস্তিরী বড় বজ্জাৎ হুজুর, তার হাতে টাকা দেবেন না।"

এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্রবাবুর অধরের কোণে একটু হাসি দেখা দিল।

গোপীকান্ত বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

কেনারাম রাত্রে সেখানেই রহিল।

পরদিন আদালতে সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিয়া, কেনারাম সমস্ত আমূল বৃত্তান্ত সত্যভাবে বর্ণনা করিল। কোর্টবাবু পুলিসের তরফ হইতে তাহাকে জেরা করিতে উঠিলেন। গত রাত্রে ডাকিয়া পাঠান, গোপীবাবু যতীনবাবুর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, জেরায় কেনারাম সমস্তই স্বীকার করিল। ইহাতে তাহার প্রতি ডেপুটিবাবুর বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

ডেপুটিবাবু রমণ ঘোষের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গদাই পাল আসামীকে ফাঁসাইবার জন্য চেষ্টিত কেন?"

উকীল, যতীনবাবুর নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন।

হাকিম তখন দারোগার সাক্ষ্য লইলেন। তাহার জেরায় প্রকাশ হইল, যে খড়ের পাঁজা হইতে বাসন বাহির হইয়াছে, সে স্থানের প্রাচীর ভগ্ন—বাহিরের লোক অনায়াসেই সেখান দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

আর কাহারও সাক্ষ্য না লইয়া ডেপুটিবাবু রমণ ঘোষকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিলেন। উকীলকে বলিলেন—"যতীনবাবু কোথা?—তাঁহার সাক্ষ্য লইয়া কেনারাম ও গদাই পালের উপর ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা চালাইতে চাহি।"

যতীনবাবু উঠিয়া, হলফ করিয়া, গদাই পাল ও রমণ ঘোষ ঘটিত সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। হাকিম তখন উভয়ের বিরুদ্ধে প্রসিডিং লিপিবদ্ধ করিয়া কেনারামকে হাজতে দিলেন এবং গদাই পালের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন।

আদালত হইতে বাহির হইয়া রমণ ঘোষ একবার যতীনবাবুর একবার গোপীবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল—"আপনাদের দুজনের কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম হল। আপনারা না থাকলে আজ আমার কি হত!"

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'কলিকালেও ধর্ম্মের জয় হইয়াছে।'

পরম আনন্দে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে মোক্ষদাবাবুর বাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমণ ঘোষও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যতীন্দ্রবাবুকে লইয়া গোপীবাবু সেই রাত্রেই কমলপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে একদিন অবস্থিতি করিয়া উভয়েই আবার দেওঘর যাইবেন।

কিন্তু কমলপুরে পৌঁছিয়া ইঁহাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গোপীবাবু দেওঘর হইতে একখানি পত্র পাইলেন—স্থলোচনা লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই—

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

প্রণামান্তে নিবেদন—

অভিন্নহৃদয়েষু, অদ্য প্রাতে ঠাকুরপো তোমার পত্র পাইয়াছেন। তুমি নিরাপদে খুলনায় পৌঁছিয়াছ শুনিয়া স্থখী হইলাম।

আজ তোমায় একটি শুভ সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি এ পত্র লিখিতেছি—আমায় কি পুরস্কার দিবে বল। তোমার ভাইটিকে বিবাহ করিতে রাজি করিয়াছি। তোমরা যেদিন যাত্রা কর, সেইদিনই বৈকালে রামকমলবাবুর বাটীর মেয়েরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন দেখিয়া গিয়াছ। গত কল্য যতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও আমি তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিলাম। রামকমলবাবুর একটি বিবাহযোগ্যা স্থন্দরী মেয়ে আছে। রামকমলবাবুর স্ত্রী আমায় বিশেষ করিয়া ধরিয়া বলেন, 'এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার দেবরের বিবাহ দাও।' আমি বলি, 'তাহা হইলে ত বড় স্থখের হইত কিন্তু আমার দেবর যে বিবাহ করিতে চাহেন না।' তথাপি রামকমলবাবুর স্ত্রী অনেক জিদ করাতে, মোহিতকে আবার অনুরোধ করিয়া দেখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরপোর কাছে কথাটা পাড়িলাম। অনেক তর্ক বিতর্ক অনুনয় বিনয়ের পর ঠাকুরপো বলিলেন, 'যদি তোমরা আমার বিবাহ দিবার জন্য এতই উৎস্থক হইয়া থাক, তবে ওখানে নয়, অন্য একস্থানে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কোন্ স্থান?' ঠাকুরপো বলিলেন, 'খুলনার নিকট সাগরদীঘি নামে একটি গ্রাম আছে। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জমিদার। পূর্ব্বে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন তিনি পেন্সন লইয়া নিজ জমিদারী দেখিতেছেন। তাঁহার একটি মেয়ে আছে, নাম

সরোজিনী—লোকে তাহাকে চিনি বলিয়া ডাকে। সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলে আমি বিবাহ করিতে পারি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁহাদের মত হইবে ত?' ঠাকুরপো বলিলেন, 'গত শ্যামাপূজার পর দুই সপ্তাহ আমি তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম। চিনির ভাই প্রমথনাথ আমার সহপাঠী বন্ধু। সে সময় চিনির মা বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি রাজি হই নাই।'

মেয়েটি নাকি বড় লক্ষ্মী ও খুব সুন্দরী। সুতরাং আমার ইচ্ছা, এখানে ফিরিবার পূর্ব্বে তুমি গিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া, পাকাপাকি কথা কহিয়া আস। পার ত যতীনবাবুকেও সঙ্গে লইও। যত শীঘ্র হয় বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিও, কারণ বিলম্বে ঠাকুরপোর মত আবার যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তবেই [illegible]

আমরা ভাল আছি। যতীনবাবুর স্ত্রী ভাল আছেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ভাল আছে। তুমি কবে এখানে ফিরিবে লিখিও। মেয়েটিকে দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না। মাঘমাসে যদি বিবাহের ভাল দিন থাকে তবে তাহাই স্থির করিয়া আসিও।

সেবিকা

শ্রীমতী সুলোচনা দেবী

পত্র পাঠ করিয়া গোপীবাবুর মুখে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন—"ওহে যতীন, আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।"

"কেন?"

"এই দেখ।"—বলিয়া সুলোচনার পত্রখানি তিনি যতীন্দ্রবাবুর হস্তে দিলেন।

পাঠ করিয়া যতীন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বেশ ত, আমিও যাব। কাল ভোরেই রওনা হওয়া যাক চলুন।"

তখন পাল্কী বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল।

যথাসময়ে উভয়ে সাগরদীঘিতে পৌঁছিলেন। বহু সম্মানে গুরুদাসবাবু ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কন্যা দেখিয়া গোপীবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল ২৪শে মাঘ।

দ্বাপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ ॥ শেষ কথা

কেনারামের সাক্ষীরা দরিয়াপুরে পৌঁছিবামাত্র সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল। গদাই পালের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছিল। শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। নিজের টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা পেটকাপড়ে বাঁধিয়া সে তৎক্ষণাৎ থানার দিকে ঘোড়া ছুটাইল।

অর্দ্ধ পথে গিয়া গদাই ভাবিল—আমি করিতেছি কি! ওয়ারেণ্ট ত দারোগার কাছেই আসিবে—হয় ত এতক্ষণ আসিয়াছে। আমি গেলেই ত দারোগা আমায় গেরেপ্তার করিবে। ২১১ ধারার মোকর্দ্দমা—জামিনও নাই। আমায় কল্য বন্দীভাবে খুলনায় পাঠাইয়া দিবে। সেখানে যদি ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের হুকুমও দেয়—তবে আমার জামিন হইবে কে? আমি বরং নিজেই খুলনায় গিয়া উকীল লইয়া জামিনের দরখাস্ত সহ হাজির হই। যদি কেহ জামিন হইতে না চাহে—জামিনের পরিমাণ টাকা জমা করিয়া দিব। কিন্তু যদি বেশী টাকার জামিনের হুকুম হয়? পাঁচশত কি হাজার? অত টাকা ত সঙ্গে নাই। যাই, কমলপুরে আমার বাসা হইতে পোঁতা টাকা তুলিয়া লইয়া যাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া গদাই পাল ঘোড়ার মুখ ফিরাইল—কমলপুরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে চলিল, কারণ এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কমলপুরে প্রবেশ করা তাহার অভিপ্রেত নহে।

কিছুদূর গিয়া আবার ভাবিল, যদি থানার লোক ওয়ারেণ্ট লইয়া আমায় গেরেপ্তার করিতে দরিয়াপুর যায়, এবং সেখানে না পাইয়া যদি কমলপুরে আসে?—তাহা হইলে ত বাসা হইতে বাহির হইবার সময় টাকাকড়ি সুদ্ধ ধরা পড়িয়া যাইব! তাহার অপেক্ষা একটু অন্ধকার হইলেই কমলপুরে পৌঁছিয়া, টাকাকড়ি লইয়া, সরিয়া পড়া ভাল। সুতরাং গদাই আবার ঘোড়া ছুটাইল।

রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। শয়নঘরের মেঝের ঈশান কোণে গদাই পালের অসদুপার্জ্জিত টাকাগুলি পোঁতা ছিল। সেইমাত্র গদাই সেগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। দ্বার অর্গলবদ্ধ। হঠাৎ বাহিরে কে করাঘাত করিতে লাগিল।

গদাই বলিল, "কেও?"

"দোর খোল।"

গদাই চিনিল, হরিদাসীর কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি বিছানাটা টানিয়া বমালের উপর ঢাকা দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, "হরিদাসী, এখন যাও।"

"কেন যাব?"

"আজ আমার শরীর ভাল নেই, যাও। কাল এস এখন।"

বিদ্রূপের স্বরে হরিদাসী বলিল, "ঈস্!—ভারি দয়া যে, কাল এস এখন! খোল বলছি, নইলে আমি গোলমাল করব—লোক ডাকব। আমি তোমার গুণ সব জানতে পেরেছি। দরজা খোল।"

গদাই দেখিল, না খুলিলে হরিদাসী এখনি গোলযোগ বাধাইবে। সুতরাং প্রদীপটা হাতে করিয়া আনিয়া, দরজা খুলিয়া বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু হরিদাসী তাহাকে ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিছানার কাছে গিয়া বলিল, "এ কি?"

"কি আবার? বিছানা।"

"কি খুঁড়ছিলে?"

"খুঁড়ব আবার কি?"

"নাঃ—খুঁড়ব আবার কি! আমি দোরের ফাঁক দিয়ে প্রায় দেখিনি?"—বলিয়া হরিদাসী সজোরে বিছানা টানিয়া সরাইয়া ফেলিল। মুখে সরা বাঁধা একটা হাঁড়ি বাহির হইল। গদাই 'কর কি? কর কি?' বলিতে বলিতে হরিদাসী হাঁড়ির মুখের সরা খুলিয়া ফেলিল। টাকা ও নোটে হাঁড়িটা পরিপূর্ণ।

হরিদাসী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দাও আমার ২৫০৲ গুণে দাও!"

"তোমার টাকা ত সেই বাক্সতে আছে।"

"তা থাকুক—তুমি তাই থেকে নিও। আমায় এই থেকে দাও।"

গদাই তখন অত্যন্ত প্রেমবিগলিতভাবে বলিল, "এ টাকা কি দেবার যো আছে হরিদাসী—এ যে সরকারি টাকা। এখনি এ টাকা নিয়ে গিয়ে খাজাঞ্চি মশায়ের কাছে জমা দিতে হবে। তোমার সে বাক্স দরিয়াপুরে আছে—যদি বল, কাল এনে দেব। তোমার টাকা নিও।"

হরিদাসী বলিল, "যাও যাও ন্যাকামি রাখ। কাল উনি আমার টাকা এনে দেবেন! তোমার নামে ওয়ারিণ বেরিয়েছে আমি প্রায় জানিনে?—তুমি এসেছ টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে বলে। বাবুরা বলাবলি করছিলেন, ওয়ারিণের নাম শুনে গদাই ফেরার না হয়—সে কথা আমি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রায় শুনিনি কিনা! তখনি আমি মনে জানি, পালাবার আগে তুমি নিশ্চয় নিজের জিনিষ পত্তর নিতে আসবে। আমি তোমার জন্যে ওৎ পেতে

বসেছিলাম। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলে, ফাঁক দিয়ে চুলের কাঁটা ঢুকিয়ে খিল সরিয়ে সরিয়ে দরজা খুলেছি। যে চুলোয় ইচ্ছে সে চুলোয় যাও— আমার ২৫০৲ দিয়ে যাও। এক্ষণি দাও—নইলে আমি খুন কল্লে গো, মেরে ফেল্লে গো বলে এমন চেঁচাব যে পাড়াসুদ্ধ লোক ছুটে আসবে। গোণ টাকা।”

গদাই দেখিল, দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাপকে বিদায় না করিতে পারিলে নিজের পলায়নেও বিলম্ব হইয়া যাইবে। সুতরাং গদাই টাকা গণিয়া হরিদাসীর আঁচলে দিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল, “আমার নোট চাই।”

গদাই কাতরভাবে বলিল, “টাকাই নাও হরিদাসী। নোটগুলো থাকলে নিয়ে আমার পালাবার সুবিধে হবে। ভারি টাকা নিয়ে আমি কোথা যাব?”

“আচ্ছা, টাকাই দাও।”

গদাই ২৪০৲ হরিদাসীকে দিয়া বলিল, “এই হল ২৫০৲ এখন যাও। যদি পুলিস এসে পড়ে আমাকেও ধরবে তোমাকেও ধরবে।”

“সাবধানে পালিও, যেন ধরে না ফেলে।”—বলিয়া হরিদাসী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গদাই তখন ভাবিল, ‘কি করি?—খুলনায় গিয়ে হাজিরই হই—না ফেরার হই? যদি সাজা দেয়, দুটি বছরের কম ত নয়। এ বয়সে আর পাথর ভাঙ্গতে পারব? এখনও প্রায় হাজার টাকা রয়েছে। তাই নিয়ে গয়া কাশী মথুরা বৃন্দাবন কোথাও গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে একটা দোকান টোকান খুলি। সেই ভাল। বুড়ো বয়সে আর পাথর ভাঙ্গতে পারব না। আশ্চর্য্য কথা, এটা কিন্তু আমার মনেই হয়নি। ভাগ্যিস হরিদাসী বললে। এত লোককে বুদ্ধি দিই—নিজের বেলাই বুদ্ধি লোপ হয়ে গিয়েছিল! খুব সময়ে এসেছিল হরিদাসী—তোমার ঋণ জন্মে ভুলতে পারব না।’

গদাই তখন টাকাকড়িগুলি গুছাইয়া লইয়া, ঘোড়াটা সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া, অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল। পুলিস অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্ধান পায় নাই।

যথাসময়ে কেনারামের বিচার হইল। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দয়ালু হাকিম তাহার মাত্র ছয় সপ্তাহ কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।

শুভদিন শুভলগ্নে চিনির সহিত মোহিতের বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষে গুরুদাসবাবুর গৃহে বহু কুটুম্বের সমাগম হইয়াছিল। বাসরঘরে তরুণীরা অর্দ্ধরাত্রি অবধি গান গাহিয়া, অবশেষে মোহিতকে গাহিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মোহিত বলিল, "আমি গাইলে যদি কনে একটি গান গায়, তবেই আমি গাইব।"

তরুণীরা চিনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লো, তোর বর গাইলে তুই একটি গান গাইবি?"

চিনি ঘোমটার মধ্য হইতে অনুচ্চস্বরে বলিল, "গাইব।"

তাহাকে জন্মে কেহ কখনও গান গাহিতে শোনে নাই। সকলেই ভাবিতে লাগিল, চিনি কি রকম গান গাহে দেখা যাইবে।

মোহিত, যথাবিদ্যা গাহিল।

অবশেষে চিনির প্রতিশ্রুতিপালনের সময় আসিলে, সে ঘরের কোণ হইতে তাহার গ্র্যামোফোনটি তুলিয়া আনিয়া বলিল, এইটি আমার প্রতিনিধি—একে যত গান গাইতে বলবে, গাইবে।"

চিনির বুদ্ধি দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। 'প্রতিনিধি' তখন রাগিণীর পর রাগিণী বর্ষণ করিয়া সভায় আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিল।

সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচয়

॥ ষোড়শী ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও একান্তভাবে সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার হয়নি। যদিও এই গল্পগুলিতে খাঁটি ছোটগল্পের উপাদান সমৃদ্ধ ছিল এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের স্থান পূর্ণ করেছিল; কিন্তু এর মধ্যের বাঙালী হৃদয়ের গভীরতা পাঠকসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেনি। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার গভীরতা ও কাব্যপ্রাণতা বোধগম্য হয়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের সমসাময়িক চিত্র সহজ সরলভাবে ব্যক্ত হওয়ায় সকল শ্রেণীর পাঠক তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। এই কারণেই প্রভাতকুমারের গল্প প্রকাশের অপেক্ষায় পাঠকবর্গ অধীর হয়ে থাকত। এ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন :

"একজন মাত্র কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের মত দীপ্তি পাইতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে একটি হাস্যোজ্জ্বল অথচ শিশির-স্নিগ্ধ বাস্তব কল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কল্পনায় সুপরিচিত দৈনন্দিন জীবনের আলোকচিত্র সংগ্রহ হইল। তার প্রকাশভঙ্গি যেমন অনবদ্য তার ভাবদৃষ্টিও তেমনই সহজ ও সরল, সে যেন কোথাও বাধে না।" ('আধুনিক বাংলা সাহিত্য', ১৩৪৩)

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে গ্রথিত এই ছোটগল্প সম্বন্ধে কবিগুরুর নিজের মন্তব্য থেকে জানতে পারি :

"...আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখ দুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে

রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।…"("সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা", 'সাহিত্যের স্বরূপ', বৈশাখ ১৩৫০)

এই গল্পগুলি সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন :

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাধনা'-পত্রিকার জন্য 'ছোটগল্প' লিখিতে লাগিলেন, তাহাতেই উৎকৃষ্ট বিলাতী ছোটগল্পেরই একটা মৌলিকরূপ আমাদের সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিল। কিন্তু বাঙালী পাঠক সাধারণ তাহাও পছন্দ করিল না।" ('বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি', ১৯৫১)

ইতিহাসের দিক লক্ষ্য করে দেখা যায় প্রভাতকুমারই প্রথম খাঁটী বাংলা গল্পকার। তাঁর গল্প রচনার সাধনা তাঁর সমসাময়িক বাংলা গল্পলেখক নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০); সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৮-১৯২৯); সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৭২-১৯২৭); প্রভৃতির লেখাকে প্রতিফলন ও অতিক্রম করে ঊর্দ্ধে উঠেছিল একথা যেমন বলা যায়, তেমনি পরবর্ত্তীকালের বহু উদীয়মান গল্প লেখকদের রচনায় রূপ-রসের যোগান দিয়ে সজীবতার সঞ্চার করেছিল সেকথাও দৃঢ়ভাবে বলা চলে। আধুনিককালের পরিচিত বহু গল্পকারের ছোট গল্পের মধ্যে প্রভাতকুমারের গল্প লেখার রূপটির প্রতিফলন এসে পড়েছে।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্যের আলোচনায় এই মতের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় :

"আসলে প্রভাতকুমারের গল্পে মানব হৃদয় এক উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সীমাহীন প্রসার লাভ করেছে বলেই সেখানে আকাশের হাসি মধুর জ্যোৎস্না হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রভাতকুমার হাস্যরসিক নন, কিন্তু হাসি তাঁর গল্পদেহে স্নিগ্ধ লাবণ্যের মত নয়নাভিরাম। তাঁর দৃষ্টিতে আছে প্রসাদগুণ, তাই তাঁর সৃষ্টিতে হাসির মধুস্বাদ। জীবনকে উদার চোখে দেখার সঙ্গে সহজ চোখে দেখারও সাধনা তিনি করেছেন।…

"বাংলা ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের মত প্রভাতকুমারও উত্তরসূরিদের অফুরন্ত প্রেরণার নিত্য উৎস। পরবর্তীকালের অনেক খ্যাতিমান লেখকের সার্থক

রচনায়ও তাঁর প্রভাব পরিদৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও এক সুবিশাল ঐতিহ্যের স্রষ্টা। অজস্রতায় ও বৈচিত্র্যে, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অনায়াস ভঙ্গিতে, সর্বোপরি প্রসাদগুণান্বিত রচনাশিল্পে প্রভাতকুমার অদ্বিতীয়। তাঁর প্রেরণায় অনেক প্রশংসনীয় রচনা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তাঁর শিল্পোৎকর্ষ এখনো অনধিগম্য।" ("ভূমিকা", 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বৈশাখ ১৩৬০)

রংপুরে ব্যারিষ্টারি কার্য্যকালে প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'ষোড়শী' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এর গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। এই কারণে গল্পগুলি পাঠকদের বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল, এটাও প্রভাতকুমারের কম সৌভাগ্য নয়। এর বিজ্ঞাপনে বলা হযেছিল: 'ইহাতে নানারসপূর্ণ ষোলটি গল্প আছে। অধিকাংশ ষোড়শী রূপসী লইয়া ঘটনা গ্রন্থন।' প্রথম প্রকাশকাল—আশ্বিন ১৩১৩ সাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০১ ও বিজ্ঞাপন ২ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকারের জীবিতকালের মধ্যে 'ষোড়শী' পাঁচবার ছাপা হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরী মতে প্রকাশকালের তারিখগুলি: প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯১১, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯১৬, চতুর্থ সংস্করণ মে ১৯২২ ও পঞ্চম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৩০।

'ষোড়শী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ ছিল:

"ষোড়শী / (ছোটগল্প) / শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / প্রণীত। / কলিকাতা। / ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, / মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। / ১৩১৩ / মূল্য ১৷৷০ বাঁধাই ১৷৵০ /

ষোলটি গল্পের সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশকাল সূচী অনুযায়ী দেওয়া হল:

১। বউ-চুরি—ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭
২। সারদার কীর্ত্তি—ভারতী, মাঘ ১৩০৬
৩। প্রিয়তম—ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৬
৪। বন্য-শিশু—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
৫। কাশীবাসিনী—ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮
৬। কলির মেয়ে—ভারতী, আশ্বিন ১৩০৮

৭। ধর্ম্মের কল—ভারতী, আষাঢ় ১৩০৮
৮। প্রণয় পরিণাম—ভারতী, ভাদ্র ১৩০৮
৯। ছদ্মনাম—ভারতী, মাঘ ১৩০৮
১০। বাস্তুসাপ—ভারতী, বৈশাখ ১৩০৯
১১। সচ্চরিত্র—ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৮
১২। ভুলশিক্ষার বিপদ—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯
১৩। অযোধ্যার উপহার—ভারতী, বৈশাখ ১৩১০
১৪। বলবান জামাতা—প্রবাসী, ১৩১৩
১৫। খুড়া মহাশয়—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১১
১৬। গুরুজনের কথা—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১১

'ষোড়শী'র প্রথম সংস্করণের কোন সমালোচনা কোন সাময়িক পত্রে পাইনি। তবে এর কয়েকটি গল্প সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে যা ব্যক্ত করেছেন সেগুলি সংগ্রহ করে নিবেদন করলাম :

সাহিত্য। পৌষ ১৩০৬

'প্রিয়তম' একটি চলনসই গল্প।

সাহিত্য। ফাল্গুন ১৩০৬

'সারদার কীর্ত্তি' একটি ক্ষুদ্র গল্প,—বিশেষত্বই নাই। বিশেষতঃ উপসংহার নিতান্তই গল্প।

সাহিত্য। আষাঢ় ১৩০৭

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বন্য-শিশু' নামক ক্ষুদ্র গল্পটির আরম্ভ সুন্দর, কিন্তু উপসংহার উদ্ভট হইয়াছে। শেষকালে একেবারে রক্তগঙ্গা।—লেখক সুকৌশলে গল্পটির অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্রপটের একটি চিত্র—যদুবাবু অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সজীব। লেখক সিমলা শৈলে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। গল্পটিতে স্থানীয় বিশেষত্বের বর্ণপাত করিয়া কলানিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি গল্পরচনায় ও তাহার পরিণামের দিকে আর একটু অবহিত হন, তাহা হইলে সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

'কাশীবাসিনী' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা। গল্পের আখ্যানবস্তু মন্দ নয়, কিন্তু লেখক শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই।

সাহিত্য। শ্রাবণ ১৩০৮

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত "ধর্ম্মের কল" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি হয়। লেখকের রচনাভঙ্গী ও গল্প বলিবার প্রণালী মনোরম। বারো বৎসরের ছেলেকে দশ বৎসর পরে বাইশ বৎসর বয়সে চিনিতে পারা সহজ বা সম্ভব বা স্বভাবসঙ্গত মনে হয় না। লেখক পুনর্মুদ্রণকালে গল্পটির এই অংশ স্বভাবসঙ্গত ও সংশয়প্রশ্নের অতীত করিলে গল্পটি আরও উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু হারাধন চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজহরি মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞাতি' হইলেন কিরূপে? সগোত্র নহিলে জ্ঞাতি হয় না, এবং হিন্দুমতে সগোত্রে বিবাহ—বিধবা বিবাহও—হইতে পারে না। লেখক লিখিতেছেন,—"কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কনেকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।" পাঠক মনে করিতে পারেন, সগোত্রে বিবাহ বিদ্যাসাগরের অনুমোদিত ছিল, অথবা বিধবাবিবাহে তিনি গোত্রবিচার আবশ্যক মনে করিতেন না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এরূপ মনে করিবার অণুমাত্র কারণ নাই। বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। প্রভাতবাবুর গল্পের সহিত শাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ না থাকুক, বিদ্যাসাগরের মতামত সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল না হয়, এই অভিপ্রায়ে এ কথার উল্লেখ করিলাম। প্রভাতবাবু গল্পটির সৌন্দর্য্য ও 'বস্তু' অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও এই অসামঞ্জস্যের পরিহার করিতে পারেন।

সাহিত্য। আশ্বিন ১৩০৮

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "প্রণয় পরিণাম" নামক গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি হইয়াছি। রচনাটির আদ্যোপান্ত সুমধুর হাস্যরসে অনুপ্রাণিত। কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে। হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল প্রতিবেশিনী 'কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে সে কত খেলা করিয়াছে,…কিন্তু তখন ত সে কোনওরূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই।' একদিন মাণিক কুসুমদের বাগানে গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িতেছিল; ঠিক সেই সময়ে কুসুম

মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার 'পরিহিত বসনখানি জলসিক্ত, পৃষ্ঠলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোণালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া, মাণিক হৃদয় হারাইল' সুতরাং 'মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া, বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোষো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।' চতুর্দ্দশবর্ষীয় মাণিক প্রেমে পড়িয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাই সে নির্ব্বিচারে সব পেয়ারা ফেলিয়া দেয় নাই। যদি সে আগে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রেমে পড়িত তাহা হইলে ভালমন্দ বিচার না করিয়া অম্লানবদনে সব পেযারা ফেলিযা দিত, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেদিন রবিবার ; সুতরাং মাণিক নিশ্চিন্তমনে প্রেমানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পড়িবার ঘরে ডিক্সনারী মাথায় দিয়া শুইযা পড়িয়া মাণিক কত কি ভাবিতে লাগিল। মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ মারবেল খেলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, কিন্তু প্রেমাতুর মাণিক সেদিন খেলিতে গেল না। তাহার পূর্ব্বরাগ যেমন সুন্দর, বিরহও তেমনিই রমণীয়! 'মাণিক আর ফুটবল খেলে না—জিমনাষ্টিক ছাড়িয়া দিয়াছে ; দ্বিপ্রহরে স্কুল পলাইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে, সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।' প্রেমিকজনসুলভ সহজাত সংস্কারবশে মাণিক ক্রমেই কুসুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিল। বৈশাখের শেষে স্কুল কলেজ বন্ধ হইল। একে নিদাঘের গ্রীষ্ম তদুপরি বিরহের তাপ, মাণিকের দুর্দ্দশা সহজেই কল্পনা করা যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মাণিকের পিসতুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিকের অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে গুরুজনের ন্যায় খাতির করিত, ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু বলিয়া রাখি, 'প্রভাস একজন নীরব কবি'—বোধকরি জন্ম-কবি। 'তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।' মাণিকের ভাবগতিক দেখিয়া প্রভাস বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—ব্যাপারটা কি? কিন্তু মাণিক কিছুতেই স্বীকার করিবে না।—সহজে কি মনের কপাট খোলা যায়? কিন্তু একদিন

মাণিকের কবিতার খাতা প্রভাসের হস্তগত হইল; সে নিপুণ 'বেদে', অনায়াসে 'সাপের হাঁচি' ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে মাণিক সব স্বীকার করিল। তখন কবিবর প্রভাস মাণিকের দুঃখে বিগলিত হইয়া মাণিক কুসুমের মিলন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কুসুমের মন বুঝিতে হয়। কুসুম মাণিককে ভালবাসে ত? প্রভাসের পরামর্শে মাণিক কুসুমের মন বুঝিতে গেল, এবং যে কৌশলে সে কুসুমের নিকট বিবাহ-প্রস্তাবের অবতারণা করিল, তাহাও চমৎকার, কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। কুসুমলতার উদ্দেশে লিখিত মাণিকলালের কবিতাটি পড়িয়া কুসুমের দিদি নলিনী যে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে কেবল কুসুমই দগ্ধ হইল, মাণিকের গায়ে তাহার আঁচটি লাগিল না। কিন্তু মাণিকের অদৃষ্টে তদপেক্ষা গুরুতর দুর্গতি সঞ্চিত ছিল। প্রভাস স্থির করিল মাণিকের বাপকে বলিয়া কুসুমের সহিত মাণিকের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিবে; কিন্তু বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধে? অনেক চিন্তার পর প্রভাসই মাণিকের পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে গেল। নন্দ চৌধুরীর সহিত প্রভাসের কথোপকথন উপভোগ যোগ্য। দৌত্যের উপসংহারে প্রভাস বলিল, 'মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয়, তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।' চৌধুরী বলিলেন, 'মরুভূমি? ওঃ!' তামাক টানিতে টানিতে নন্দ চৌধুরী বলিলেন, 'ম্যান্‌কাকে ডাক।' প্রভাসের আশা হইল তবে বোধ করি উভয়ের মিলন অসম্ভব নয়! কিন্তু মাণিক ত ভয়ে বাপের কাছে আসিতেই চাহে না। প্রভাস অনেক বুঝাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। 'মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আর্সির কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁফ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাণিকের ছায়া আর্সিতে পড়িল।' নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর এগ্‌জামিন কবে?' মাণিক বলিল, 'আর বারোদিন আছে।' 'কি রকম তৈরি হল?' 'আজ্ঞে হয়েছে এক রকম।' 'পড়াশুনো করছিস মন দিয়ে? না খালি খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিস?' 'আজ্ঞে না, খেলা বেশী করিনে।' 'তবে কি করিস? লবে পড়েছিস্ নাকি শুনলাম?' মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া, বাম হস্ত দ্বারা মাণিকের দক্ষিণ কর্ণটি

ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, 'উত্তর দিচ্ছিস নে যে?' প্রেমিক নিরুত্তর। নন্দ চৌধুরীর কর-কমল-কল্পিত কতিপয় চপেটপুষ্পাঞ্জলি দক্ষিণা লইয়া মাণিকের প্রেম চম্পট দান করিল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, নন্দ চৌধুরী ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার 'চিকিৎসা' আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর।' মুক্তকণ্ঠে বলিব, নন্দ ডাক্তারের চিকিৎসা-প্রণালী অতি চমৎকার,—যথার্থ ই আশুফলপ্রদ। প্রভাতবাবু গল্পটির রচনায় বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে নির্ম্মল হাস্যরস অত্যন্ত বিরল। আমাদের সাহিত্যে অতিরঞ্জন-মূলক হাস্যরসের অভাব নাই বটে কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে বিকৃত রস-রচনার অতিরঞ্জনমূলক হাস্যরসের মূল্য অধিক নহে। সামাজিক বা সাময়িক 'সং' অতি সহজে প্রাকৃত জনের দন্তরুচি-কৌমুদীর বিকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও সাহিত্যের অঙ্গীভূত বা চিরস্থায়ী হয় না। যাহা স্বভাবসঙ্গত ও মানবপ্রকৃতির অনুগত, অথচ হাস্যরসের উদ্দীপক, সাহিত্যে তাহাই বরণীয়। প্রভাতবাবুর 'প্রণয় পরিণামে' সেই হাস্যরস-নিপুণতার পরিচয় আছে। অকালপক্ক মাণিকের চপলতা মাত্র ভিত্তি করিয়া তিনি হাস্যরস ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও স্বভাবের অতিরিক্ত অতিরঞ্জনের উপাদান ব্যবহার করেন নাই। ইহাই তাঁহার ক্ষমতার নিদর্শন। তাঁহার এই রস-রচনা শক্তি পূর্ণ পরিণতিলাভ করুক।

সাহিত্য। ফাল্গুন ১৩০৮

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ছদ্মনাম' একটি ক্ষুদ্র গল্প। বিলাতী 'বোটকা' গন্ধ অত্যন্ত প্রবল। নির্ম্মলার 'নারাঙ্গি রঙ্গের শালের শাড়ীখানির' অন্তরাল হইতেও 'গাউন' দেখা যাইতেছে।

সাহিত্য। চৈত্র ১৩০৮

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সচ্চরিত্র' নামক গল্পটির আমরা রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না। প্রভাতবাবুর প্রভাব 'সচ্চরিত্রে' একেবারে প্রতিফলিত হয় নাই। তা, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কখনও সমান হয় না।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাস্তুসাপ' একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্প বটে

কিন্তু 'আষাঢ়ে'। প্রভাতের 'ছাপ' নাই। ছোট গল্পের 'জান' যাহা, তাহারই অভাব। সুতরাং রসভঙ্গ হইয়াছে।

সাহিত্য। চৈত্র ১৩১১

বহু দিনের পর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গুরুজনের কথা' নামক গল্পটি বড় আগ্রহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রভার শাড়ী গাউন ঢাকিতে পারে নাই। স্বদেশী গঙ্গাজলে বিলাতী 'বোটকা' গন্ধ ধৌত করা যায় না।

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি অতি সুন্দর। আখ্যানবস্তু মনোহর ও হাস্যরসের কিরণে সমুজ্জ্বল। বহুদিন আমরা এমন মনোরম গল্প পড়ি নাই।

'প্রবাসী'র ১৩১৮ মাঘ পুস্তক-পরিচয় বিভাগে দ্বিতীয় সংস্করণ 'ষোড়শী'র সমালোচনাটি এরূপ ছিল:

"ষোড়শী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটার্য্যি কোম্পানি। মূল্য ১॥০ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভাতবাবুর গল্প সর্ব্বজন সমাদৃত; সুতরাং তাহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই ষোড়শীর ষোলটি গল্প লেখকের গল্প-রচনা শক্তির মধ্যাহ্ন কালের রচনা; সুতরাং এগুলি তাঁহার অ-সাধারণ শক্তির বিশেষত্ব সমূহে যে অলঙ্কৃত তাহাও বলা বাহুল্য। এ গল্পগুলি হাস্য ও করুণ উভয় রসের সমাবেশে পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ভাষা সহজ, ব্যঞ্জনা যথাযথ, আখ্যান ঘরোয়া; সুতরাং ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রীতিপ্রদ। অতিসূক্ষ্ম বিচারে রচনা-রীতিতে যে সব ছোটখাটো ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, তবে সে ত্রুটিটুকুও না থাকিলে নিখুঁত হইত। কিন্তু জগতে নিখুঁত কিছুই নাই। গুণের প্রাধান্যই অমিশ্র প্রশংসা লাভের যোগ্য।"

প্রভাতকুমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় সংস্করণের 'ষোড়শী' ও 'নবকথা' উপহার দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকারকে একটি চিঠিতে নিজের মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গ্রন্থকারকে শুধু

উৎসাহিত করেনি, বাংলা সাহিত্যকেও এক অমূল্য সম্পদে ভূষিত করবার জন্য উপযুক্ত সহায়তা দান করেছিল। রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি এরূপ ছিল :

শান্তি নিকেতন, বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার গল্পের বই দুটি [দ্বিতীয় সংস্করণের 'নব-কথা' ও 'ষোড়শী'] এখানে আসিয়া পাইয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই ত পূর্ব্বে পড়া হইয়াছে—ইহা আর পড়িব কি ? অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্ব্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্ত অলস ভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে সুরু করিলাম—দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিযাছে, কোথাও যে কিছু-মাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত—গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা হউক, তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকেরা দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে, নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রসিদ্ধ হাস্যকৌতুক, অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 'ক্যারিকেচারে' "বলবান জামাতা"র অভিনয় দেখাতেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় "বলবান জামাতা" গল্পটির নাট্যরূপ "গ্রহের ফের" (পৃঃ ৪৭) নামে রূপান্তরিত করেন। এই নাটিকাটির আখ্যাপত্র ও ভূমিকা এরূপ ছিল :

গ্রহের ফের / কৌতুক-নাট্য / কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত; / প্রথমাভিনয় রজনী, ৪ঠা কার্তিক, ১৩১৮। / শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়,

বি-এল / প্রকাশক / শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী / ৬৫, হরিশ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর / কলিকাতা। / মূল্য চারি আনা।

পূর্ব্বকথা

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বার-এট্-ল, মহাশয় রচিত "বলবান জামাতা" শীর্ষক ক্ষুদ্র গল্প অবলম্বনে 'গ্রহের ফের' রচিত হইয়াছে।

যে কারণে 'দশচক্র' প্রকাশের প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম, ঠিক সেই কারণেই 'গ্রহের ফের' প্রকাশিত হইল।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 'গ্রহের ফের' প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

ভবানীপুর,
রাখী সংক্রান্তি, ১৩১৮ — শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমারই বাঙালী গ্রন্থকারদের মধ্যে প্রথম শিল্পী যিনি বিখ্যাত বাঙালী চরিত্রকে তাঁর লেখার মধ্যে রূপদান করেন। ষোড়শীর 'ধর্ম্মের কল' গল্পটির মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরকে এনে গ্রন্থকার গল্পের মাধুর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছেন।

Miriam S. Knight-ই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ছোটগল্প বাংলার বাহিরের পাঠক সমাজের মধ্যে অনুবাদ করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রভাতকুমার বাঙালী লেখকদের মধ্যে এ বিষয়ে ভাগ্যবান যে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প সর্ব্বপ্রথম ইংরাজিতে অনূদিত হয় ও বিদেশীগণ দ্বারা সমাদৃত হয়। ষোড়শীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (১৯০৬) গ্রন্থকার শ্রীমতী নাইটকে এ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পরে শ্রীমতী নাইট ও গ্রন্থকার দু-জনের নামে একটি গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হয় **Stories of Bengalee Life** নামে। এর প্রকাশকাল ৬ আগষ্ট ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সঙ্কলনে ষোড়শীর বন্য-শিশু, কাশীবাসিনী, কশির মেয়ে, ছদ্মনাম ও ভুলশিক্ষার বিপদ—এই পাঁচটি গল্প আছে।

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত রাইনহার্ট ভাগনার বাংলা লেখার একটি সঙ্কলন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এর পরিচয় দেওয়া হল :

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTRAGEN/ VON / REINHARDT WAGNER

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর "পঞ্চতন্ত্র" (চৈত্র ১৩৫৯)-এ 'বর্বর জর্মন' প্রসঙ্গে এই বই-এর আলোচনা করেছেন।

দশজন বাঙালী লেখকের রচনা এতে আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী'র বউ-চুরি ও 'গল্পাঞ্জলি'র রসময়ীর রসিকতা—এই দুটি গল্প স্থান পেয়েছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস হইতে প্রকাশিত "Ten Tales"-এ "বলবান জামাতা" গল্পটির ইংরাজি অনুবাদ "Muscular Son-in-law" নামে অনুবাদিত হয়েছে।

প্রভাতকুমারের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ "ষোড়শী" ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয। এটা ছিল ষোড়শীর পঞ্চম সংস্করণ। এই সংস্করণ প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

এই গ্রন্থাবলীতে "ষোড়শী"র পঞ্চম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

॥ নবীন সন্ন্যাসী ॥

"নবীন সন্ন্যাসী" প্রভাতকুমারের দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস। ১৩১৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন এক বিজ্ঞপ্তিতে 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পাঠকবর্গকে জানান:

"আগামী বৎসরের উপন্যাস

নূতন বৎসরের প্রবাসীতে কোন উপন্যাস বাহির হইবে কিনা, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আগামী বৈশাখ মাস হইতে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 'তপস্যার ফল' নামক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইবে।"

কিন্তু গ্রন্থকার এই নাম পরিবর্তন করে উপন্যাসটির নামকরণ করেন 'নবীন সন্ন্যাসী'। 'প্রবাসী'তে 'নবীন সন্ন্যাসী'র সূচনায় প্রভাতকুমার বলেছেন:

"আমি প্রথমে এই উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছিলাম—'তপস্যার ফল' এবং তদনুসারে 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় গত চৈত্র সংখ্যায় এই নামেই ইহার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত 'তপস্যার ফল' নামক একটি উপন্যাস ইতিপূর্ব্বেই 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে আমার উপন্যাসের নামটি পরিবর্ত্তন করিতে হইল।—লেখক।" ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩১৭)

"নবীন সন্ন্যাসী" 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার ও অঙ্গসজ্জাকর অন্যতম চিত্রকরকে আক্রমণ করে সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে ভাষা প্রয়োগ করেন তা এখানে উপস্থাপিত করলাম :

"শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নবীন সন্ন্যাসী নামক একখানি উপন্যাস ফাঁদিয়াছেন। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অতএব আমরা প্রতীক্ষা করিব। এই উপন্যাসেও একখানি চিত্র আছে। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'প্রবাসী'র জন্য শাদা কাগজে কালীর আঁচোড় কাটিয়া এই অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা যদি চিত্র হয়, তাহা হইলে চিত্রের অপমান কাহাকে বলিব? 'প্রবাসী' কি ক্রমে 'ভারতীয় চিত্রকলা'-পদ্ধতির 'পড়ুয়া'দিগের তালপাতায় পরিণত হইল। কেহ 'অহল্যা আঁকো' বলিয়া রঙ্গ ছড়াইতেছেন ; কেহ বা 'মৃত্যুশয্যায়—ব্রজকিশোর লেখো' বলিয়া কালী ছিটাইতেছেন।" ('সাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সাল)।

বলা বাহুল্য শ্রীসমরেন্দ্র গুপ্ত পরে লাহোর সরকারী কারু-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদ অলঙ্কৃত করেন। 'অহল্যা' ছবিটি ছিল প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা।

"নবীন সন্ন্যাসী" 'প্রবাসী'তে দু-বছর (১৩১৭-১৮ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। "নবীন সন্ন্যাসী"র জন্য মোট ছটি ছবি প্রবাসীতে দেওয়া হয়। প্রথমটি আঁকেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বাকী পাঁচটি ছিল সুকুমার রায় চৌধুরীর আঁকা। ১৩১৭ সালে বারটি সংখ্যায় (১-২৮) অষ্টবিংশতি পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালের গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ১৩১৭ সালের প্রকাশিত অংশটি প্রবাসীর আকারে (পৃঃ ৯৭) পুনর্মুদ্রিত হয় ও একটাকা দামে বিক্রি হয়। এর আখ্যাপত্রটি এরূপ ছিল :

নবীন সন্ন্যাসী / (১৩১৭ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশ) / শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, ব্যারিষ্টার ; / কলিকাতা ;

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে / শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত / মূল্য ১৲ টাকা।

"নবীন সন্ন্যাসী"র আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'(১৯১০) উপন্যাসের অনুরূপ পুনর্মুদ্রণ প্রবাসী সম্পাদক করেছিলেন।

পরবর্ত্তী ১৩১৮ সালে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত বারটি সংখ্যায়—সর্ব্ব মোট দু-বছরে মোট চব্বিশটি সংখ্যায় 'নবীন সন্ন্যাসী' শেষ হয়। পরের বছর আশ্বিন ১৩১৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ নবীন সন্ন্যাসী প্রকাশিত হয়।

"নবীন সন্ন্যাসী" গ্রন্থকারের জীবিত কালের মধ্যে তিনবার পুনর্মুদ্রণ হয়। প্রকাশকালের তারিখ, প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯১২; দ্বিতীয় সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯১৬ ও তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৯।

অবাঙালী লেখকগণ প্রথম থেকেই প্রভাতকুমারের রচনা বিনা অনুমতিতে বা অনুমতি নিয়ে তাঁদের মাতৃভাষায় প্রচার করেন। প্রভাতকুমার এ বিষয়ে ঐ শ্রেণীর লেখকদের নবীন সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সতর্ক করে দেন। কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্য এটি দেওয়া হল:

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই উপন্যাসের হিন্দী এবং মারাঠী ভাষায় অনুবাদাধিকার যথাক্রমে এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ এবং বোম্বাই নিবাসী শ্রীযুক্ত বিঠল সীতারাম গুর্জ্জর মহাশয়গণ আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

কোন কোনও প্রদেশের লেখকগণের ধারণা আছে, যে বাঙ্গালা গ্রন্থে 'All rights reserved' কিম্বা 'Copyright registered' বলিয়া লেখা থাকে না, কাহারও বিনা অনুমতিতেই সে সকল গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে ছাপান যায়। আইন কিন্তু তাহা নহে। এই 'নবীন সন্ন্যাসী' একজন গুজরাটী লেখক আমার বিনা অনুমতিতে নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়া, বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা আমার গ্রন্থ অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন পত্রদ্বারা সে অভিপ্রায় আমায় জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" কার্য্যালয়
৪নং চৌরঙ্গি, কলিকাতা
৬ আশ্বিন, ১৩২৩

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানাশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী যুবকগণ সংসার ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় ব্রতী হন। মহাপুরুষের আদর্শবাদ অনুসরণ রক্ষা করা বেশীর ভাগ ব্যক্তিরই সাধ্যে কুলায়নি। প্রভাতকুমার "নবীন সন্ন্যাসী"র মোহিতকুমারের চরিত্রে সেই রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় (১৯০৬) "নবীন সন্ন্যাসী" সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> A social story intended to warn the young men of Bengal against the pseudo-religious movements which are flooding the province.

'নবীন সন্ন্যাসী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে 'প্রবাসী'তে (অগ্রহায়ণ ১৩১৯ সাল) এইভাবে সমালোচিত হয় :

"নবীন সন্ন্যাসী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী চাটুয্যে কোম্পানি। ডঃ ক্রাঃ ১৩ অঃ ৪৪৬ পৃষ্ঠা। এন্টিক কাগজে নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে ছাপা। মূল্য ১৸০ বাঁধাই ২।০

এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপন্যাসের প্লটটি ঘোরালো নয়; এক গদাই পাল ছাড়া কোনো চরিত্র সুপরিস্ফুট হয় নাই। হরিদাসী ও দারোগা, মালী ও রামদাসোয়া অস্ফুট অবস্থাতেও কৌতুককর বলিয়া জীবন্ত; গুরুদাসবাবু ও চিনি, সুশীলা ও সুলোচনা চরিত্র স্নিগ্ধ বলিয়া মুগ্ধ করে। তা ছাড়া আসল চরিত্র মোহিত বা গোপীকান্ত একটুও ফুটে নাই; এবং কোনো চরিত্রই একটি কেন্দ্রগত ভাব বা ঘটনাকে বেষ্টন করিয়া ফুলের বীজকোষের পাশে পাপড়ির মতো বিকশিত হইয়া উঠে নাই। গদাই পালের চরিত্র-চিত্রণ অসাধারণ নৈপুণ্যে জীবন্ত করিয়া তোলা হইয়াছে—ইহাই এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ এবং সমগ্রের সকল ত্রুটি অংশের সফলতায় ঢাকা পড়িয়া যায়—ইহা লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাও অবান্তর ও অনাবশ্যক ঘটনার দ্বারা অকারণে ভারাক্রান্ত হইয়াছে—আগা ও গোড়ায় একটি সঙ্গতি পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই—তথাপি প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্রভাবে হাস্যে বৈচিত্র্যে ঝলমল করিতেছে—

নিপুণভাবে অঙ্কিত খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি মনকে মুগ্ধ করিয়া সমগ্রের অভাব ও দৈন্য ভুলাইয়া দেয়। সর্ব্বোপরি মুগ্ধ করে রচনার সহজ সরস অনাড়ম্বর হাস্যরস-অনুস্যূত ভাষা। উপন্যাসের আসল ভাবটি তাহার কেন্দ্রিকতায়, (unity of action) এবং আসল পটুতা চরিত্র-বিকাশে ; এই প্রধান উপাদানের নিতান্ত অভাব আছে এই গ্রন্থে। তথাপি ভাষার প্রবাহে, চিত্রের মোহে, হাস্যের প্রলোভনে পাঠকের মন বরাবর অগ্রসর হইয়াই চলে, এত বড় গ্রন্থের কোথাও ক্লান্তি অনুভব করে না—ইহা লেখকের অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক।"

অনেকদিন পরে অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সঙ্গে নিজের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে—বিশেষভাবে প্রবাসীতে 'নবীন সন্ন্যাসী'র সমালোচনার ব্যাপারে প্রভাতকুমার তাঁর বক্তব্যে বলেছেন :

"প্রবাসীর সমালোচক, নবীন সন্ন্যাসীর সমালোচনায় একটু ভুল করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান অভিযোগ এই যে, নবীন সন্ন্যাসীতে Unity of action-এর অভাব আছে—লিখিয়াছিলেন, কোন চরিত্রই কেন্দ্রগভাব বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ফুলের বীজকোষের পাশে পাপড়ির মত ফুটিয়া উঠে নাই। এখন, এই Unity of action জিনিষটি নাটকেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ উপন্যাসের নয়। তবে যে সকল উপন্যাস নাটক লক্ষণাক্রান্ত, যেমন বঙ্কিমবাবুর—সেগুলিতে Unity of action দেখা যায় বটে, কিন্তু আরও এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে—তাহা চিত্র জাতীয় বলা যাইতে পারে। Dickens-এর উপন্যাসগুলি এ জাতীয় উপন্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে প্লটও ঘোরালো হয় না—বীজকোষ পাপড়িরও কোন হাঙ্গামা নাই। আমার 'নবীন সন্ন্যাসী'ও সেইরূপ চিত্র জাতীয় উপন্যাস। প্রবাসী নবীন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন—এক সময় কোনও কোনও বিলাতী সমালোচক Dickens-এর বিরুদ্ধেও ঠিক কথাই বলিয়াছেন 'প্লট ঘোরালো নহে—Unity of action নাই' তাই বলিয়া মনে করিবেন না, Dickens-এর সহিত আমি নিজেকে তুলনা করিতেছি। এক জাতীয়ত্ব দাবী করিতেছি মাত্র—যেমন সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে—আর আমাদের ঐ রসুয়ে বামুন আর কি!" ('মনীষা-মন্দিরে'—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১)

"নবীন সন্ন্যাসী" 'প্রবাসীর' প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ হলে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই চিঠিটি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাঠোদ্ধার করে যথাযথ দেওয়া হল :

কল্যাণীয়েষু ১১ বৈশাখ ১৩১৭

তোমার গল্প······দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তা······মোহিত যে ধর্ম্মগুরু হয়ে উঠবে তা······কিন্তু মোহিতের চরিত্র চিত্রণের মধ্যে······বিদ্রূপ আছে। প্রথম থেকেই বোঝা······ওর প্রতি তোমার মন প্রসন্ন নয়।······ যদি লিখতুম ওকে খুব কড়া চরিত্রওয়ালা······করে আঁকতুম বটে কিন্তু ওর সম্ভ্রম নষ্ট······করতুম না—অর্থাৎ এই রকম moral লো······point of viewটা বেশ যথেষ্ট······দেখাবার চেষ্টা করতুম এবং অবশেষে······দেখাতুম এই রকম কঠোর নীতিপরা······ভিতরে গুরুতর অভাবটা কি আছে······ লোকে আমাকে মনে করত আমি······পক্ষপাতী। দেখা যাক্ তুমি ওকে ······লীলা কর।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"য় (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৬) প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী' সম্বন্ধে বলেছেন :

"নবীন সন্ন্যাসী উপন্যাসে (১৩১৯) সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র গদাই পালের—পেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রগুলি তাহার সহিত তুলনায় নির্জীব ও রক্তহীন লিয়া মনে হয়। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের জটিল ব্যবস্থার মধ্যে য়েব-গোমস্তা জাতীয় একপ্রকার জীবের উদ্ভব হইয়াছে—ঔপন্যাসিক ইহাদের ধ্যে ি জ আর্টের যথেষ্ট মৌলিক উপাদান আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু খের বিষয় প্রায় কোন ঔপন্যাসিকই এই জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ও মূল্য ম্বন্ধে সেরূপ সচেতন না হইয়া মামুলী নায়ক-নায়িকার চরিত্রের চর্বিত-চর্বণ করিতেছেন। এক দীনেন্দ্রকুমার রায় নীলকুঠীর নায়েবের কার্যকলাপ ও নৈতিক বিশেষত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া উপন্যাসের মধ্যে কতকটা নূতন রসের সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাদের অদ্ভুত ষড়যন্ত্র-কৌশল, ক্ষুরধার বুদ্ধি, জালজুয়াচুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, প্রভৃতি সর্বপ্রকার পাপাচরণের প্রতি অতিশয় প্রবণতা, অথচ একপ্রকারের বিকৃত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা, মিথ্যাচারে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও

ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত ভক্তি, স্বাভাবিক নেতৃত্বশক্তি ও লোকবশী-করণের আশ্চর্য ক্ষমতা—এই সমস্ত ভাল-মন্দ মিশাইয়া ইহাদের চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা আনিয়া দিয়াছে যাহা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অত্যন্ত স্পৃহনীয়। আমাদের পল্লীজীবনে ইহাদেরই প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল—ইহারাই পল্লীজীবনের কাপুরুষতা, নৈতিক জড়তা, হেয় দাসত্বপ্রবণতা ও কপট মিথ্যাচারের জন্য সর্বাপেক্ষা দায়ী। পল্লীজীবনের বিষ-জর্জর ও লাঞ্ছনা-মূৰ্ছিত যে মূর্তি আমাদের অতি পরিচিত, ইহারাই তাহার শিল্পী ও স্রষ্টা। মোট কথা, আমাদের মৃতপ্রায় নিষ্ক্রিয় সমাজে এই জাতীয় লোকের মধ্যেই কিছু প্রাণস্পন্দন কিছু বিপথগামী উদ্যমশীলতা ও কর্মশক্তি, কিয়ৎ-পরিমাণ বিকৃত রাজনীতি ও কূট-কৌশল, স্রোতোহীন শুষ্কপ্রায় জলাশয়ে দূষিত জলের মত সঞ্চিত ছিল।"

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখনীর প্রশংসা করেছেন। সত্যই দীনেন্দ্রকুমার তাঁর উপন্যাসে "গদাই পাল" শ্রেণীর লোকের চরিত্র সুন্দরভাবে এঁকেছেন। কিন্তু আমরা প্রথম বাংলা উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮)-এ 'ঠক চাচার' চরিত্রে (গ্রন্থকাররূপে 'টেকচাঁদ ঠাকুর'—অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনায়) এ শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাই। ঠক চাচার বর্ণনায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

"মোকাজান [ঠকচাচা] আদালতের কর্মে বড় পটু।...জাল করিতে—সাক্ষী সাজাইয়া দিতে—দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে—গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে—দাঙ্গা হাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর এক জন পাওয়া ভার।" ('আলালের ঘরের দুলাল' পরিষৎ সংস্করণ, পৌষ ১৩৬২, পৃঃ ১৮)

"নবীন সন্ন্যাসী"র মধ্যে কয়েকটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ আছে। 'চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে' "একটি ভৌতিক কাণ্ড" সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী প্রভাতকুমারকে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। তাঁর পুত্র শ্রীঅম্বুজনাথ ঘোষ (এ্যাডভোকেট) বর্ত্তমানে গয়ায় বাস করেন। তিনিও প্রভাতকুমার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।

নবীন সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেক দেশী-বিদেশী প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। "রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, দাশু রায় ও হাক্সলি" এবং "গীতা ও হোলিবাইবেল" ইত্যাদি তো আছেনই। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান যা 'হিন্দু মেলায়' গাওয়া হয়েছিল "হোক্ ভারতের জয়" গানটির প্যারডি "হোক্ বিদ্যুতের জয়" রূপে স্থান পেয়েছে। এই বইটিতে বিশুদ্ধ 'হিউমার' অনেক পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যাবে। এরূপ রচনা একমাত্র প্রভাতকুমারের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

"নবীন সন্ন্যাসী"র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক ছিলেন জনার্দ্দন ঝা। এছাড়া "নবীন সন্ন্যাসী"র গুজরাটী অনুবাদ বম্বে থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন বিঠল এস গুর্জ্জর। অনূদিত "নবীন সন্ন্যাসী"র নাম হয়— "সংসার অসার।"

প্রভাতকুমারের মৃত্যুর (৫ এপ্রিল ১৯৩২) পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায় "নবীন সন্ন্যাসী"র চতুর্থ সংস্করণ ১ আগষ্ট ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থাবলীতে "নবীন সন্ন্যাসী"র চতুর্থ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হযেছে।

সনৎকুমার গুপ্ত